C. U.

M. A. Modern History

HISTORY OF BENGAL

বাংলার ইতিহাস

[PAPER I]

General Editor :

Prof. S. GHOSE

To be had of :

J. N. GHOSE & SONS
6, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073
Phone : 32-6504

USHA PUBLISHING HOUSE
13/1, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700 073
Phone : 32-6171

Price Rs. 60·00

1947

M. A. Mod[illegible]

(IN ENGLISH AN BENGALI)

Edited by : Prof. S. GHOSE

Paper	I.	History of Bengal (1757 1857)
Paper	II.	History of India (1858-1947)
Paper	III.	East Asia (1839-1940)
Paper	IV	Industrial Revolution (A Selected Theme of the History of the West)
Paper	V.	International Relations (Since 1945)
Paper	VI	History of European Political Thought (Machiavelli to Marx)

SPECIAL PAPERS :

Modern European History (1871-1923) (English)

Late Medieaval Indian History (1658-1761) (Bengali)

C. U. MODERN HISTORY QUESTION PAPERS

SUGGESTIONS FOR EVERY YEAR

M. A. Modern History

HISTORY OF BENGAL

[1757-1857 A.D.]

[বাংলার ইতিহাস]

[১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ]

General Editor :

Prof. S. GHOSE

To be had of :

J. N. GHOSE & SONS
6, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700073
Phone : 32-6504

USHA PUBLISHING HOUSE
13/1, Bankim Chatterjee Street
Calcutta-700073
Phone : 32-6171

CONTENTS

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর

সংযোজনী

প্রকাশক ঃ এস. ঘোষ, জে. এন. ঘোষ এণ্ড সন্স, ৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩। মুদ্রাকর ঃ রঘুনাথ প্রিন্টার্স নিরঞ্জনকুমার ঘোষ, ১৫৩এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৬, বৈশাখী প্রেস ৪২, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ ও জয়দুর্গা প্রেস।

হিস্ট্রি অব্ বেঙ্গল

(১৭৩৭-১৮৫৭)

Q. 1. *How far is it true to say that the stage for Siraj-ud-daulah's war with East India Company was set long before his accession?*

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা

আলীবর্দী খানের মৃত্যু আসন্নপ্রায় এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ ইয়োরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রস্তুতির অজুহাতে বাংলাদেশে অবস্থিত তাদের ঘাঁটিগুলোতে দুর্গ নির্মাণের ব্যবস্থা করে। আলীবর্দী খানের মৃত্যুতে নতুন নবাবের মসনদে আরোহণের আনুষঙ্গিক ব্যস্ততার সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। বাংলাদেশের ভাবী নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার প্রতি ইংরেজগণ প্রথম থেকেই উদ্ধত ব্যবহার ও অবহেলা প্রদর্শন করতে শুরু করে। আলীবর্দী খানের মৃত্যুর কিছু-দিন পূর্বে সিরাজ-উদ্-দৌলা সংবাদ পান যে, ইংরেজগণ আলীবর্দীর মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগমকে সিরাজের বিরুদ্ধে সাহায্য দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাশিমবাজারের ইংরেজ বাণিজ্যকুঠির ডাক্তার ফোর্থ আলীবর্দী খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তাঁকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। ফোর্থ অবশ্য ইংরেজ জাতির নামে শপথ করে বলেন যে, ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরেজগণ কখনও অংশগ্রহণ করবেন না। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে সিরাজ কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি পরিদর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল সিরাজের কাছ থেকে কুঠির ও কুঠির অধিবাসীদের নানারূপ ক্ষতিসাধনের আশঙ্কায় ইংরেজগণ তাঁকে কুঠিতে প্রবেশ করতে অনুমতি দেয় নি। ইংরেজদের এইরূপ ব্যবহারে সিরাজ অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন এবং ইংরেজদের প্রতি ক্ষুব্ধ হন। এমনকি সিংহাসন আরোহণের পরও ইংরেজরা নতুন নবাব হিসাবে সিরাজকে উপঢৌকন প্রেরণের চিরাচরিত রীতি অমান্য করেন। তা ছাড়া, ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে সিরাজ রাজস্বের হিসাব দাখিল করতে বললে রাজবল্লভের গোপন নির্দেশে তাঁর পুত্র কৃষ্ণদাস পরিবার-পরিজন ও প্রভূত ধনরত্নসহ পালিয়ে এসে কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিরাজ-উদ্-দৌলা কৃষ্ণদাসকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলে ইংরেজ-গণ কৃষ্ণদাসের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। নবাব কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলকে নির্দেশ দিলে ইংরেজরা তাও অমান্য করে এবং গুপ্তচর আখ্যা

দিয়ে নবাবের দূতকে অপমান করে কলকাতা থেকে বহিষ্কৃত করে দেয়। অপরদিকে নবাবের নির্দেশ অনুযায়ী ফরাসীরা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করলেও ইংরেজগণ নবাবের আদেশ উপেক্ষা করে। ইতিমধ্যে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা ঘসেটি বেগমকে বন্দী করে রাজ-প্রাসাদের ষড়যন্ত্র বন্ধ করেন এবং পূর্ণিয়ার নবাব সৌকৎ জঙ্গকে দমন করার জন্য যুদ্ধ-যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে ইংরেজদের ঔদ্ধত্যের কথা দতমুখে জানতে পেরে তিনি পূর্ণিয়ার অভিযান আপাততঃ স্থগিত রেখে কলকাতা অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করেন। ২৪মে নবাব ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করেন এবং কাশিম-বাজার কুঠি অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজ-উদ্-দৌলার সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়।

(২) বাংলার নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের প্রকৃত কারণ

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজ-উদ্ দৌলা কর্তৃক কাশিম বাজার কুঠি ও কলকাতা অধিকৃত হলে নবাবের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হলেও, বহু দিন পূর্ব থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের কারণ দেখা দেয়। ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলার সুবাদার শাহ সুজার কাছ থেকে একটি নিশান্ আদায় করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের সঙ্গে সরাসরিভাবে বাণিজ্য শুরু করে। এই নিশানের নির্দেশ অনুসারে শাহ সুজা বছরে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ইংরেজ বণিকদের বিনাশুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার অধিকার দান করেন। কিন্তু পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই ইংরেজ বণিকগণ শাহ্ সুজার নিশানের নির্দেশকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাবার জন্য মোগল রাজকর্মচারীদের কাছ থেকে আরও দুটি পরোয়ানা আদায় করে। তখন থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে দেশীয় রাজকর্মচারীদের সংঘর্ষের সূত্রপাত। এই সংঘর্ষ দূর করার উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট থেকে আরও একটি নতুন ফরমান আদায় করে। এই ফরমান অনুযায়ী সাড়ে তিন শতাংশ শুল্ক দিয়ে ইংরেজরা সুরাট বন্দরে বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করে। কিন্তু ফরমানের ভাষার অস্পষ্টতার সুযোগ নিয়ে ইংরেজরা দাবি করে যে, সুরাট বন্দর ব্যতীত এদেশের সর্বত্র সম্রাট আওরঙ্গজেব বিনা শুল্কে তাদের বাণিজ্য করার অধিকার দান করেন—সুতরাং পূর্বে বাংলাদেশে বাণিজ্য করার জন্য তারা যে প্রতি বছর তিন হাজার টাকা শুল্ক দিতে বাধ্য ছিল বর্তমানে তার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু অপর দিকে মোগল রাজকর্মচারীরা দাবি করে যে, সম্রাটের নতুন ফরমানের নির্দেশ অনুসারে মোগল

সাম্রাজ্যের যে কোন স্থানে বাণিজ্য করার জন্যই ইংরেজ বণিকরা সাধারণভাবে সাড়ে তিন শতাংশ শুল্ক দিতে বাধ্য। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনীতিতে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে এবং মুর্শিদকুলি খান স্বাধীনভাবে বাংলাদেশে রাজত্ব শুরু করেন। মুর্শিদকুলি খান বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যের সুযোগ দিলেও কঠোর হস্তে তাদের দমন করার পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং বাণিজ্যিক সুযোগের সদ্ব্যবহারের জন্য ইংরেজ বণিকরা ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ ফারুকশিয়ারের কাছ থেকে বহু অর্থের বিনিময়ে একটি নতুন ফরমান ও হুকুমনামা হসব-উল-হুকুম আদায় করে। কিন্তু এবারও ফরমানের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিয়ে কোম্পানী ও রাজকর্মচারীদের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধিতা দেখা দেয়। বাদশাহী ফরমানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে জলপথে ও স্থলপথে সকল প্রকার আমদানি ও রপ্তানি পণ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জন্য বিনাশুল্কে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য অথবা কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য সম্পর্কে এই নিয়ম কোন ভাবেই প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু ফরমানের নির্দেশের অস্পষ্টতার জন্য কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই সব সুযোগ পুরোপুরি ভোগ করার জন্য অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে চেষ্টা করতে থাকে। ইংরেজদের এরূপ ব্যবহারে মোগল রাজকর্মচারীরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফরমানের অন্য একটি শর্ত অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতার নিকটবর্তী আটত্রিশ খানা গ্রাম ক্রয় করার অনুমতি লাভ করে। কিন্তু বাংলাদেশের সুবাদার এই সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন যে, বাদশাহের এই আদেশ বাধ্যতামূলক নয়। ফরমান অনুসারে কোম্পানীর প্রদত্ত মুদ্রা-নির্মাণের অধিকারের প্রশ্নেও কোম্পানীর সঙ্গে স্থানীয় শাসকদের প্রচণ্ড মতবিরোধ দেখা দেয়।

(৩) বাংলার নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জমি অধিকার করবে অথবা মুদ্রা-নির্মাণের কোনপ্রকার সুযোগ লাভ করবে বাংলাদেশের শাসকগণ তা চিরদিনই অপছন্দ করতেন। তা ছাড়া বিনা শুল্কে কোম্পানীকে বাণিজ্যের অধিকার দেওয়ার ব্যাপারেও তাদের যথেষ্ট আপত্তি ছিল। মুর্শিদকুলি খান নানাভাবে ইংরেজ বণিকদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করায় হস্তক্ষেপ করতে শুরু করেন। প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ বণিকরা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ব্যাপারে, বিশেষতঃ ব্যক্তিগত বাণিজ্যে, যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত তার কোন আইন-সঙ্গত কারণ ছিল না। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিকরা এই সব বিশেষ

সুবিধা লাভ করার ফলে বাংলাদেশের নবাব এবং দেশীয় বণিকদের প্রচুর পরিমাণে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। সুতরাং নবাব অনেক সময়ই বিদেশী বণিকদের নিকট থেকে জোর করে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতেন। ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব নির্দিষ্ট কর বাদে অতিরিক্ত চুয়াল্লিশ হাজার টাকা কোম্পানীর কাছে দাবি করেন। মুর্শিদকুলি খানের পর সুজা-উদ্-দিন বাংলাদেশের সিংহাসনে বসেন। ইংরেজ বণিকদের নিকট ১৭৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি অতিরিক্ত পঞ্চান্ন হাজার টাকা দাবি করেন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে আলীবর্দী খানের সময় এই দাবির পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে তিন লক্ষ টাকায় পরিণত হয়। অতিরিক্ত টাকা দিতে কোম্পানী বাধ্য হলেও বাংলাদেশের শাসকদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অসন্তোষ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ফলে কোম্পানীর এজেন্টরা মনে করতেন যে ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের বাদশাহী ফরমানের দ্বারা অনুমোদিত সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দিতে নবাবের কর্মচারিগণ রাজি নয়। অপর দিকে নবাব পক্ষের বক্তব্য ছিল যে, কোম্পানী বাদশাহী ফরমানের নির্দেশের অপব্যবহার করে নবাবের রাজস্বের প্রচুর ক্ষতিসাধন করছে। স্বার্থান্বেষী, সংকীর্ণচেতা, লোভী ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী একদল বণিক কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। তা ছাড়া, কর্মচারীদের অসাধুভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোম্পানীর দস্তকের অপব্যবহার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারী বিনা শুল্কে পরিবহণের জন্য এই দস্তক মঞ্জুর করতে পারতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্বে কোম্পানীর পক্ষ থেকে মঞ্জুর করা দস্তকের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী এই বিষয়ে কাউন্সিলকে বারবার সতর্ক করে দেওয়া সত্ত্বেও অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নি। ঐতিহাসিক জেমস মিল দস্তকের অপব্যবহার সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতায় অবস্থিত বাণিজ্য কুঠির অধ্যক্ষ দেশীয় সরকারের প্রাপ্য বাণিজ্য শুল্ক ও অন্যান্য কর মকুবের জন্য শুধুমাত্র কোম্পানীর বাণিজ্য সম্ভারের নয়, কোম্পানীর কর্মচারীদের বাণিজ্য সম্ভারের জন্যও দস্তক মঞ্জুর করতেন এবং দেশীয় রাজকর্মচারিগণ সম্ভবতঃ কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ বিধিব্যবস্থার সঙ্গে অত্যন্ত সামান্যভাবে পরিচিত ছিলেন বলে, কোম্পানীর ও কোম্পানীর কর্মচারীদের বাণিজ্য সম্ভারের মধ্যে পার্থক্য সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে অসমর্থ ছিল। দস্তকের অপ-ব্যবহারের ফলে নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর সরাসরি মতবিরোধ শুরু হয়। জেমস মিল এ সম্পর্কে বলেন যে, দস্তকের এই অপব্যবহার নবাব যুগপৎ তাঁর রাজস্বের ক্ষতিকারক এবং দেশীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ধ্বংসকারী বলে

মনে করেন। সুতরাং দেশীয় বণিকদের স্বার্থ রক্ষার কথা চিন্তা করেই একমাত্র আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র বাণিজ্য কুঠির প্রদত্ত দস্তকের উপর কোনরূপ গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য নবাব তাঁর কর্মচারীদের উপর বিশেষ এক আদেশ জারী করেন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ্ দৌলা দাবি করেন যে গত চল্লিশ বছরে কোম্পানী বাংলাদেশের রাজস্ব বিভাগকে বাণিজ্য শুল্ক বাবদ আঠারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ড ফাঁকি দেয়। বাণিজ্যিক স্বার্থের এই অর্থনৈতিক কারণই নবাবের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের সংঘর্ষের প্রথম সূত্রপাত করে।

(৪) সংঘর্ষের রাজনৈতিক কারণ

বাণিজ্যিক স্বার্থের প্রয়োজনেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলসমূহকে স্থানীয় শাসকবর্গের ও ফরাসীদের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করার ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীদের সর্বদাই নির্দেশ পাঠাতেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের শক্তি বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার জন্যই বাংলাদেশের বাণিজ্য কুঠিগুলোকে সুরক্ষিত করা তখন তাদের একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং এই বিষয়ে তারা নবাবের নিষেধ-আজ্ঞা অমান্য করতেও বদ্ধপরিকর হয়। অপরদিকে নবাবের সামরিক শক্তি সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর মনে গভীর সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং ফরাসীদের আক্রমণ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে রক্ষা করা নবাবের পক্ষে যে সম্ভব নয়, এ কথাও তারা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে। তবে শুধুমাত্র ফরাসীদের আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া বা বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও তারা ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধির পক্ষপাতী ছিল। আবার মিলস্ প্রভৃতি সেনাপতি ফরাসী সেনাপতি ডুপ্লের পথ অনুসরণ করে বাংলাদেশের উপর ইংরেজ কর্তৃত্ব স্থাপন করার পক্ষপাতী ছিল। এই উদ্দেশ্যে ১৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে মিলস্ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় জর্জকে জানান, মোগলদের নীতি খারাপ, "তাদের সৈন্যবাহিনী আরও খারাপ, তাদের কোনপ্রকার নৌবাহিনী নেই। স্পেনের অধিবাসীরা যেমন খুব সহজেই আমেরিকার নিরস্ত্র ইণ্ডিয়ানদের পরাজিত করেছে,-তেমন অনায়াসেই এই দেশ জয় করে করদ রাজ্যে পরিণত করা সম্ভব।" রাজা দ্বিতীয় জর্জ সেনাপতি মিলসের এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে রাজি হলেও, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আপত্তির জন্য তাঁর পক্ষে তখন তা করা সম্ভব হয় নি। মিলসের মতো সেনাপতি স্বটও অনুরূপ

একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। তবে সেনাপতিদের এইসব পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হলেও ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নবাবের প্রত্যক্ষ অনুমতি বা গোপন সম্মতি লাভ করে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ শক্তিশালী করে তোলার জন্য নির্দেশ দেয়। ফরাসীরাও এই সময়ে চন্দননগরে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে শুরু করে। নবাব আলীবর্দী ইংরেজ ও ফরাসীদের দুর্গ নির্মাণের সংবাদে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে তাদের প্রতিনিধিদের দরবারে ডেকে পাঠান এবং বলেন, "তোমরা বণিক— তোমাদের দুর্গের প্রয়োজন কি? তোমরা আমার রাজ্যে আছো, আমিই তোমাদের রক্ষা করব।" কিন্তু নবাবের কথায় কর্ণপাত না করে উভয়পক্ষই দুর্গ নির্মাণকাজে তৎপর হয়। কিন্তু আলীবর্দী প্রকাশ্যে তাদের দমন করার জন্য সামরিক অভিযান প্রেরণ করতে রাজি হন নি। সম্ভবত তিনি ইংরেজ ও ফরাসীদের শক্তি ও কূটকৌশল সম্পর্কে মানসিক ভীতি পোষণ করতেন। এই সম্পর্কে লুক স্ক্র্যাফটন মন্তব্য করেন, "নবাব আলীবর্দী ইয়োরোপের বণিকদের মধুমক্ষিকার মধুচক্রের সঙ্গে তুলনা করতেন,— যার মধু তুমি নিজের উপকারের জন্য পুরস্কারস্বরূপ পেতে পার, কিন্তু তুমি যদি তাদের মধুচক্রে উপদ্রবের সৃষ্টি কর তাহলে তারা দংশন করে তোমাকে হত্যা করবে।" বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ নবাব আলীবর্দী খান তাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা রক্ষা সম্পর্কেও গভীর সন্দেহ পোষণ করতেন। গোলাম হোসেন খানের মতে আলীবর্দী খানের আশঙ্কা ছিল যে, একদিন টুপীওয়ালা লোকগুলোই ভারতের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের উপর আধিপত্য করবে। ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে কোনরূপ সংঘর্ষে লিপ্ত হতেও তাঁর প্রচণ্ড আপত্তি ছিল। আলীবর্দী খানের সভাসদবর্গ মাঝে মাঝে নবাবকে বিদেশী বণিকদের বিতাড়িত করার পরামর্শ দিলেও তিনি তাদের এই পরামর্শে কর্ণপাত করতে রাজি ছিলেন না। তা ছাড়া, সমরকুশলী আলীবর্দী খান যুদ্ধে নৌবহরের গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করেন। ইয়োরোপের বণিকদের শক্তিশালী নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা তাঁর পক্ষে যে প্রায় অসম্ভব, এ কথাও নবাবের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। প্রায় ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার ন্যায় তিনি মন্তব্য করেন, "আমি যদি জয়লাভ করি একথা বলে লোকে আমাকে দোষারোপ করবে যে আমি আমার রাজ্যের বণিকদের লুণ্ঠন করেছি। যদি বিপরীত কিছু ঘটে, আমি আমার প্রজাদের কাছ থেকে অপমান ও গঞ্জনা সহ্য করতে বাধ্য হব।" আলীবর্দী খানের এই কথা কিছুদিনের মধ্যেই অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়। আলীবর্দী খানের উত্তরাধিকারী নবাব সিরাজ উদ্-দৌলা ইংরেজ বণিকদের দমনের উদ্দেশ্যে কলকাতা আক্রমণ করে লুণ্ঠনকারী আখ্যা লাভ করেন। তারপর পলাশীর যুদ্ধে

পরাজয় বরণ করে, দুরপনেয় কলঙ্কের টীকা ললাটে ধারণ করে ভারতের ইতিহাসে সিরাজ-উদ্-দৌলা চিরদিনের জন্য অসম্মানের পাত্ররূপে চিহ্নিত হন।

Q 2 *Analyse the political forces that shaped the relation between Siraj and the English Company from the treaty of February 1757 to the Battle of Plassey.*

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কলকাতা অধিকারের সংবাদ পেয়ে মাদ্রাজ কাউন্সিল কর্নেল ক্লাইভও নৌসেনাপতি ওয়াটসনকে কলকাতা পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। ক্লাইভ ও ওয়াটসন বিনা বাধায় ফলতা উদ্বাস্তু ইংরেজদের সঙ্গে মিলিত হন এবং ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ইংরেজ সৈন্য ও নৌবহর কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। কলকাতার শাসনকর্তা মানিকচাঁদের ইচ্ছাকৃত অসতর্কতার জন্য ইংরেজ সৈন্য প্রায় বিনা যুদ্ধে নবাবের বজবজ ও থানায় অবস্থিত দুর্গ দুটি অধিকার করে কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়। ইংরেজদের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত মানিকচাঁদ ইংরেজ সৈন্যদের বাধা না দিয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পলায়ন করলে কর্নেল ক্লাইভ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা জানুয়ারী বিনা যুদ্ধে কলকাতা অধিকার করেন। কলকাতা অধিকার করেই ইংরেজরা সিরাজের বিরুদ্ধে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী যুদ্ধ ঘোষণা করে। অপর দিকে সিরাজও কলকাতা অধিকারের সংবাদ পেয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১০ই জানুয়ারী ক্লাইভ হুগলী অধিকার করে শহরটি লুটপাট করেন এবং নিকটবর্তী অনেক গ্রাম পুড়িয়ে দেন। ১৯শে জানুয়ারী সিরাজ হুগলী পৌঁছুলে ইংরেজরা কলকাতা প্রস্থান করে। ৩রা ফেব্রুয়ারী সিরাজ কলকাতার শহরতলীতে উপস্থিত হয়ে আমীরচাঁদ বা উমিচাঁদের বাগানে শিবির স্থাপন করেন। ৪ঠা জুন ইংরেজরা সন্ধি প্রস্তাব করে নবাবের শিবিরে দুজন দূত পাঠায়। নবাব সন্ধ্যার সময় তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তবে পরদিন পর্যন্ত আলোচনা মুলতুবী থাকে। কিন্তু ইংরেজ দূতরা রাত্রির অন্ধকারে নবাবের শিবির পরিত্যাগ করে। শেষ রাত্রে ক্লাইভ অকস্মাৎ নবাবের শিবির আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে নবাবের পক্ষের প্রায় ১৩০০ লোক নিহত হয়, কিন্তু ভোরবেলা নবাবের একদল সৈন্য সুসজ্জিত হওয়ায় ক্লাইভ প্রস্থান করেন। মনে হয়, ইংরেজ দূতেরা নবাবের শিবিরের সন্ধান নিতে আসে এবং তাদের নিকট সংবাদ পেয়েই ক্লাইভ অকস্মাৎ আক্রমণ করে নবাবকে হত বা বন্দী করার জন্যই এই আক্রমণ করেন। কিন্তু কুয়াশায় পথ ভুল করে ক্লাইভ নবাবের তাঁবুতে প্রবেশ করতে অনেক দেরী করেন এবং সিরাজ এই সুযোগে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেন।

(২) ৯ই ফেব্রুয়ারীর চুক্তি

অতর্কিতভাবে এই নৈশ আক্রমণের ফলে সিরাজ-উদ-দৌলা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন এবং ইংরেজরা যেসব দাবি করে, নবাব সেই সকল দাবি মেনে নিয়ে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারী ইংরেজদের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি স্থাপন করেন। এই শান্তি চুক্তি সাধারণভাবে আলীনগরের চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তি অনুসারে নবাব বাদশাহ ফারুকশিয়ারের ফরমান প্রদত্ত সকল সুযোগ-সুবিধা সহ ইংরেজদের কলকাতা প্রত্যর্পণ করতে সম্মত হন। কাশিমবাজার ও অন্যান্য স্থানের ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠির যে সকল জিনিসপত্র নষ্ট হয় নবাব তাও ইংরেজদের ফিরিয়ে দিতে স্বীকার করেন। কলকাতা আক্রমণের সময় কোম্পানী, সাধারণ ইংরেজ ও কলকাতার ক্ষয়ক্ষতির আর্থিক ক্ষতি-পূরণ দিতে কলকাতার টাঁকশালে মুদ্রা নির্মাণের এবং কলকাতায় ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দিতেও নবাব স্বীকৃত হন।

(৩) ফেব্রুয়ারী চুক্তি সম্পাদনের কারণ

ফেব্রুয়ারী চুক্তি সম্পাদনের সময় নবাবের সৈন্যসংখ্যা ৪৫০০০ ও কামানের সংখ্যা ইংরেজদের অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। তথাপি দুটি কারণে সীমাহীন দীনতা স্বীকার করে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে এই সন্ধি স্থাপন করেন। প্রথমতঃ, এই সময় আফগানরাজ আহম্মদশাহ আবদালী দিল্লী, আগ্রা, মথুরা বিধ্বস্ত করে বিহার ও বাংলাদেশের দিকে অগ্রসর হন। ফলে নবাব অত্যন্ত ভীত হয়ে যে কোন শর্তে ইংরেজদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করতে সঙ্কল্প করেন। দ্বিতীয়তঃ, নবাবের কর্মচারী ও পরামর্শদাতারা প্রায় সকলেই তাঁকে সন্ধি করতে পরামর্শ দেন। নবাবের পরামর্শদাতাদের অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এবং নবাবও তার কিছু কিছু আভাস পান। তবে এই সন্ধির ফলে নবাবের প্রতিপত্তি অনেক কমে যায় এবং ইংরেজদের শক্তি, প্রতিপত্তি ও ঔদ্ধত্য যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কতকটা এই কারণেই রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্র শুরু করেন। সিরাজ সিংহাসনে আরোহণ করেই সেনাপতি মীরজাফর ও দেওয়ান রায় দুর্লভকে পদচ্যুত করেন এবং জগৎ শেঠকে প্রকাশ্যে অপমানিত করেন। এই তিনজনই ছিলেন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা। সিরাজের বিরুদ্ধে ঘসেটি বেগমের যথেষ্ট আক্রোশের কারণ ছিল—সুতরাং তিনিও অর্থ দিয়ে ষড়যন্ত্রকারীদের সাহায্য করতে শুরু করেন। আমীরচাঁদ বা উমিচাঁদ নামক একজন ধনী বণিক সিরাজের বিশ্বাসভাজন ছিলেন। তিনিও এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন।

(৪) ইংরেজ শক্তি কর্তৃক চন্দননগর অধিকার ও নবাবের প্রতিক্রিয়া ঃ

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে ইয়োরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়। ফলে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। এই সময় ইংরেজরা ফরাসীদের প্রধান কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করে বাংলাদেশের ফরাসী শক্তি নির্মূল করতে মনস্থ করে। সিরাজ-উদ্-দৌলা ইংরেজদের চেষ্টা ব্যর্থ করতে প্রস্তুত হন এবং হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমারকে ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করলে তাদের বাধা দিতে নির্দেশ দেন। কিন্তু উমিচাঁদ ইংরেজদের পক্ষ থেকে ঘুষ দিয়ে নন্দকুমারকে হাত করেন এবং ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে মার্চ কর্নেল ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করেন।

ইংরেজদের পক্ষ থেকে চন্দননগর আক্রমণের সময় থেকেই সিরাজ-উদ-দৌলার চরিত্র ও আচরণে গুরুতর পরিবর্তন দেখা যায়। তিনি ক্লাইভকে ভয় দেখান যে ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইংরেজরা যুদ্ধ করলে তিনি নিজে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করবেন। ক্লাইভ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে চন্দননগর আক্রমণ করেন। চন্দননগর আক্রমণের সময় রায়দুর্লভ, মানিকচাঁদ ও নন্দকুমারের অধীনে প্রায় বিশ হাজার সৈন্য ছিল। তাঁরা ক্লাইভকে কোন বাধা দেন নি, নবাবও সেজন্য তাঁদের কোন কৈফিয়ৎ তলব করেন নি। এমনকি, চন্দননগর পতনের পর তিনি ক্লাইভকে অভিনন্দন জানান। চন্দননগর অধিকারের কিছুদিন পরে ফরাসীদের ও তাদের সম্পত্তি ইংরেজদের দেওয়ার জন্য ক্লাইভ নবাবকে অনুরোধ করেন। কিন্তু নবাব ক্লাইভের এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন এবং কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ জঁ্যাল সাহেবকে অনুচরসহ আশ্রয় দেন। কিন্তু কিছুদিন পরে, সম্ভবতঃ অবিশ্বাসী অমাত্যদের পরামর্শে জঁ্যাল সাহেবকে বিদায় দেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের নিজামের রাজ্যে ফরাসীদের প্রতিপত্তির উল্লেখ করে অমাত্যগণ সিরাজের মত পরিবর্তন করতে সমর্থ হন। এমনকি, ফরাসী সেনাপতি বুশির দক্ষিণ ভারত থেকে বাংলাদেশ অভিমুখে যাত্রার কথা শুনে নবাব ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি বুশিকে দু হাজার সৈন্য বাংলাদেশে পাঠাতে অনুরোধ করেন। অপর দিকে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে পেশোয়া বালাজি রাও ইংরেজ কোম্পানীর কলকাতার গভর্নরকে জানান যে, দুভাগে বিভক্ত করে বাংলাদেশের একভাগের উপর মারাঠাদের কর্তৃত্ব স্থাপনের সুযোগ দিলে পেশোয়া ১,২০,০০০ সৈন্য দিয়ে ইংরেজদের সাহায্য করতে রাজি আছেন। ইংরেজদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং ফরাসীদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন করে তোলার জন্য ক্লাইভ সিরাজকে পেশোয়ার মতের মর্মার্থ জানিয়ে দেন। ক্লাইভের এরূপ ব্যবহারে নবাব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।

(৫ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

উপরি-উক্ত ঘটনাসমূহ বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্বেই সিরাজের বিরুদ্ধে গুরুতর ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং ষড়যন্ত্রকারীরা ইংরেজদের সহায়তায় সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য তাঁদের স্বার্থ অনুযায়ী নবাবকে পরামর্শ দিতেন। সিরাজ কূটনীতি ও লোকচরিত্র এই উভয় বিষয়েই বিশেষ অনভিজ্ঞ ছিলেন। যদিও মীরজাফরকে তিনি সন্দেহ করতেন, তবুও তাঁকে বন্দী করতে তিনি সাহসী হন নি। নবাব একবার ক্রুদ্ধ হয়ে মীরজাফরকে লাঞ্ছিত করতেন এবং আবার তাকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে তার সঙ্গে আপোস করতেন। রায়দুর্লভ, উমিচাঁদ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতকদের কথায় তিনি ফরাসীদের বিদায় করে দেন অর্থাৎ একমাত্র যারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে নবাবকে সাহায্য করতে পারত তাদের দূর করে দিয়ে তিনি চক্রান্তকারীদের পথ সুগম করে দেন।

ষড়যন্ত্রকারীরা প্রথমে সেনাপতি ইয়ার লতিফকে সিরাজের পরিবর্তে নবাবের পদে নিযুক্ত করতে সম্মত হন। ইয়ার লতিফ ইংরেজদের সাহায্য লাভের জন্য গোপনে দূত পাঠান। ইংরেজরা এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করে। কারণ তাদের ধারণা ছিল যে, সিরাজ ইংরেজদের শত্রু এবং সুযোগ পেলেই তিনি ফরাসীদের সাহায্যে ইংরেজদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করবেন। এমনকি, ইংরেজদের সন্তুষ্ট করার জন্য নবাব ল সাহেবকে বিদায় দিলেও ইংরেজরা ফরাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠায়। ইংরেজদের এইরূপ আচরণে ক্রোধান্ধ হয়ে নবাব তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং পলাশীতে একদল সৈন্য পাঠান। ফলে ইংরেজদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে সিরাজের রাজত্বে বাংলাদেশে তারা নিরাপদে রাজত্ব করতে পারবে না। সুতরাং সিরাজকে তাড়িয়ে ইংরেজদের অনুগত ব্যক্তিকে নবাব করতে পারলে তারা বাংলাদেশে প্রতিপত্তি লাভ করতে পারবে। ইংরেজদের এই মনোভাব জানতে পেরে মীরজাফর স্বয়ং নবাব পদের প্রার্থী হন। তিনি নবাবের সেনাপতি। সুতরাং তিনিই ইংরেজদের বেশি সাহায্য করতে পারবেন, এইজন্যই ইংরেজরা তাকে মনোনীত করে।

(৬) মীরজাফরের সঙ্গে চুক্তি

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে কলকাতার ইংরেজ কমিটি অনেক বাদানুবাদ ও আলোচনার পর মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সন্ধি করা স্থির করে এবং সন্ধির শর্তগুলো কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ ওয়াটস সাহেবের নিকট পাঠানো হয়। প্রধান শর্ত ছিল ইংরেজদের ক্ষতিপূরণ প্রদান, বাংলাদেশ থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করা

এবং প্রয়োজনবোধে ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ ও সৈন্যসংগ্রহের অধিকার লাভ, ফরমানের সকল সুযোগ ভোগের ব্যবস্থা। এই আত্মরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক চুক্তির অন্যান্য প্রধান শর্ত ছিল নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কলকাতা দখলের ফলে কোম্পানী ও অন্যান্য ইংরেজদের ক্ষতির উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ইংরেজ কোম্পানী কর্তৃক ফরমানের সকল অধিকার ভোগ, কাশিমবাজার ও ঢাকার কুঠিতে দুর্গ নির্মাণের অধিকার; হুগলীর দক্ষিণে নবাবের পক্ষ থেকে কোন দুর্গ না নির্মাণ করা; কলকাতার সীমানার মধ্যে ইংরেজদের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি; সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোম্পানীকে পর্যাপ্ত জমি দান; নবাবের প্রয়োজনে নিযুক্ত সৈন্যবাহিনীর ব্যয়নির্বাহের জন্য অতিরিক্ত অর্থ মঞ্জুর এবং কোম্পানীর একজন প্রতিনিধিকে নবাবের দরবারে স্থায়ী আসন দান। ওয়াটস সাহেবের চেষ্টায় ৫ই জুন মীরজাফর এই চুক্তি পালন করার শপথ গ্রহণ করলে ইংরেজরা তাঁকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিযুক্ত করতে রাজি হয়। ১১ই জুন মীরজাফরের স্বাক্ষরিত চুক্তি কলকাতা কাউন্সিলের হস্তগত হয় এবং পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থা অনুসারে ১২ই জুন ওয়াটস সাহেব ও তাঁর সহকর্মিবৃন্দ কাশিমবাজার ত্যাগ করেন।

(৭) ক্লাইভের যুদ্ধযাত্রা

ওয়াটসের পলায়নের সংবাদ পেয়ে সিরাজ ইংরেজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন এবং মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধেও নিঃসন্দেহ হন। কিন্তু এই বিষম সঙ্কটের সময় সিরাজ তাঁর অস্থিরমতিত্ব, কূটরাজনীতিজ্ঞান ও দূরদর্শিতার অভাব এবং লোক-চরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতার চূড়ান্ত প্রমাণ দেন। সেনাপতি মোহনলাল ও মীরমদনের পরামর্শে তিনি মীরজাফরকে বন্দী করার জন্য তাঁর বাড়ী আক্রমণ করেন, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে স্বয়ং সিরাজ তাঁর সঙ্গে দেখা করে অনুনয় বিনয় করে তাঁকেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরও পবিত্র কোরান স্পর্শ করে নবাবের পক্ষ অবলম্বন করতে সম্মত হন এবং এক বিশাল সৈন্যদল সহ যুদ্ধযাত্রা করেন। ইতিমধ্যে ১৩ই জানুয়ারী ক্লাইভ চন্দননগর থেকে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করেন। ইংরেজদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হুগলীর ফৌজদার তাঁকে কোনরূপ বাধা দেবার চেষ্টা করে নি। ফলে বিনা বাধায় ইংরেজ সৈন্য কাটোয়ায় উপস্থিত হয় এবং ১৯শে জুন নবাবের কাটোয়ার দুর্গ ইংরেজরা অধিকার করে। ২২শে জুন ইংরেজ বাহিনী কাটোয়া দুর্গ পরিত্যাগ করে এবং গঙ্গানদী অতিক্রম করে মধ্যরাত্রিতে পলাশীতে উপস্থিত হয়। পরদিন ২৩শে জুন নবাবের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হয়।

(৮) উপসংহার

সিরাজ-উদ্-দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করার বহু পূর্ব থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে বাংলার নবাবের সংঘর্ষের কারণ দেখা দেয়। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব এবং নবাবের বিরুদ্ধে প্রধান প্রধান অমাত্যদের ষড়যন্ত্রের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হলে এই সংঘর্ষ আরও ত্বরান্বিত হয়ে ওঠে। সিরাজ উদ্-দৌলাও এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত ছিলেন এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পূর্ণিয়ার নবাব সৌকৎজঙ্গকে দমন করেন এবং কলকাতা অধিকার করে নিজের সিংহাসন নিষ্কণ্টক করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সিরাজের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ষড়যন্ত্রকারীরা শঙ্কিত হয়ে আত্মরক্ষার জন্য আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ, ক্লাইভের বাংলাদেশে আগমন, ইয়োরোপে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ শুরু এবং আহম্মদ শাহ আবদালীর বাংলাদেশ আক্রমণের আশঙ্কা অবস্থাকে দ্রুত পরিবর্তিত করে তোলে, ফলে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার কর্মক্ষমতা স্তিমিত হয়ে আসে এবং ধীরে ধীরে তিনি গ্রীক ট্রাজেডির নায়কের মতো নিজেকে নিয়তির হাতে সমর্পণ করেন এবং নিয়তির হাতে নিজেকে সমর্পণ করার শেষ পরিণতি পলাশী প্রান্তরের প্রহসন।

Q. 3. *How far was Siraj personally responsible for the outbreak of the war with English ?*

উত্তরঃ (১) পলাশীর যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু আসন্ন প্রায়, এই সংবাদ পাওয়া মাত্র ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ ইয়োরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রস্তুতির অজুহাতে বাংলাদেশে অবস্থিত তাদের ঘাঁটিগুলোতে দুর্গ নির্মাণের ব্যবস্থা করে। আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর নতুন নবাবের মসনদে আরোহণের আনুষঙ্গিক ব্যস্ততার সুযোগ গ্রহণ করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তা ছাড়া একদিকে সিরাজ-উদ্-দৌলার উদ্ধত চরিত্র এবং অপরদিকে তাঁর প্রতি সকলে যেরূপ বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন তার ফলে অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁর পক্ষে বাংলাদেশের সুবাদারী লাভ করা একেবারেই অসম্ভব। অনেকের মতে ইংরেজরাও তাই বিশ্বাস করত। দরবারে উপস্থিত হয়ে সিরাজ-উদ্-দৌলার সঙ্গে তারা কখনই তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোন রূপ আলাপ-আলোচনা করত না। পক্ষান্তরে তাঁর সঙ্গে তারা সকল যোগাযোগ রক্ষা করার নীতিও পরিত্যাগ করে। কোন এক সময় কাশিমবাজার বাণিজ্য কুঠির পল্লী অঞ্চলে নবাবকে প্রবেশ করার সুযোগ দিতেও তারা অস্বীকার করে, কারণ অপরিমিত দাম্ভিক ও

উচ্ছৃঙ্খল সিরাজ-উদ্-দৌলা গৃহের আসবাব পত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে অভ্যস্ত ছিলেন, এমন কি, তাঁর পছন্দসই আসবাবপত্র বিনাদ্বিধায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও তাঁর কোন প্রকার সঙ্কোচ ছিল না। কিন্তু ইংরেজ বণিকদের বিরূপ ব্যবহারে বাংলাদেশের ভাবী নবাব খুব অসন্তুষ্ট হন।

আলীবর্দী খানের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সিরাজ-উদ্-দৌলা সংবাদ পান যে ইংরেজগণ বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পর ঘসেটি বেগমকে সিরাজের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কাশিমবাজারের ইংরেজ বাণিজ্য কুঠির ডাক্তার মিস্টার ফোর্থ আলীবর্দীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে এই সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি ইংরেজ জাতির নামে শপথ করে বলেন যে, ভারতের রাজনীতিতে ইংরেজগণ কখনও অনুপ্রবেশ করবে না। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বরের লিখিত চিঠিতে মিস্টার ফোর্থ কলকাতার গভর্নর রোজার ড্রেকের কাছে এই মত প্রকাশ করেন যে, সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলাদেশের সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হবেন। এমন কি, সিংহাসনে আরোহণের পরও ইংরেজরা নতুন নবাব হিসাবে সিরাজকে উপঢৌকন প্রেরণের চিরাচরিত প্রথা অমান্য করেন। ফলে ইংরেজদের প্রতি সিরাজের বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পায়।

অপরদিকে, ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভকে সিরাজ-উদ্-দৌলা রাজস্বের হিসাব দাখিল করতে বললে রাজবল্লভের গোপন নির্দেশে তার পুত্র কৃষ্ণদাস পরিবার-পরিজন ও প্রভূত ধনরত্নসহ পালিয়ে এসে কলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয় গ্রহণ করে। সিরাজ-উদ্-দৌলা কৃষ্ণদাসকে গ্রেপ্তারের আদেশ দিলে ইংরেজগণ কৃষ্ণদাসের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে। নবাব কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলকে নির্দেশ দিলে ইংরেজরা তাও অমান্য করে এবং গুপ্তচর আখ্যা দিয়ে নবাবের দূতকে অপমানিত করে কলকাতা থেকে বহিষ্কার করে দেয়।

তা ছাড়া, নবাবের নির্দেশে চন্দননগরের ফরাসীগণ দুর্গ নির্মাণের কাজ বন্ধ করলেও ইংরেজগণ নবাবের নির্দেশ অমান্য করে। ইতিমধ্যে সিরাজ-উদ্-দৌলা ঘসেটি বেগমকে বন্দী করে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র আপাততঃ বন্ধ করেন এবং পূর্ণিয়ার নবাব সৌকৎ-জঙ্গকে দমন করার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে ইংরেজদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার এবং ইংরেজদের হাতে নবাবের দূত নারায়ণ দাসের অপমান ও লাঞ্ছনার কথা জানতে পেরে তিনি পূর্ণিয়ার অভিযান স্থগিত রেখে কলকাতা অভিমুখে অগ্রসর হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মে নবাব মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অধিকার করলে ইংরেজদের সঙ্গে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়। কাশিমবাজারের বাণিজ্য কুঠি অধিকার করার পর তিনি

দ্রুত সৈন্য পরিচালনা করে কলকাতা আক্রমণ করার ব্যবস্থা করেন এবং ২০শে জুন ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গের উপর বাংলার নবাবের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়।

(২) পলাশীর যুদ্ধের পরোক্ষ কারণ

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলাদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তার পূর্ব থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে বাংলাদেশের শাসকদের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। কোম্পানীর এজেন্টরা মনে করেন যে, ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের বাদশাহ ফারুকশিয়ারের ফরমানের দ্বারা অনুমোদিত সকল সুযোগ ভোগ করতে দিতে নবাবের কর্মচারিগণ রাজি নয়। অপর দিকে নবাবের পক্ষের বক্তব্য ছিল যে, কোম্পানী বাদশাহী ফরমানের নির্দেশের অপব্যবহার করে নবাবের রাজস্বের প্রচুর পরিমাণ ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করছে। স্বার্থান্বেষী, সঙ্কীর্ণচেতা, লোভী ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী একদল বণিক কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। কর্মচারীদের অসাধুভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়ার ফলে কোম্পানীর দস্তকের অপব্যবহার ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। কাউন্সিলের গভর্নর ও সেক্রেটারী বিনা শুল্কে পরিবহণের জন্য এই দস্তক মঞ্জুর করতে পারতেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কোম্পানীর পক্ষ থেকে মঞ্জুর করা দস্তকের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে যায়। দস্তকের অপ-ব্যবহারের ফলে নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর সরাসরি মতবিরোধ শুরু হয়। নবাব দাবি করেন যে, বাদশাহী ফরমানের নির্দেশ অনুযায়ী কোম্পানী শুধুমাত্র আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনা শুল্কে পরিবহণের সুযোগ পেতে পারে। কিন্তু কোনক্রমেই এই সুযোগ অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা দাবি করেন যে তিনি প্রমাণ করতে পারেন যে, গত চল্লিশ বছরে কোম্পানী বাংলাদেশের রাজস্ব বিভাগকে বাণিজ্য হিসাবে আঠারো লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ফাঁকি দেয়। কোম্পানীর কর্মচারীদের এইরূপ অসাধু নীতির ফলে ভারতীয় বণিকদের প্রচুর ক্ষতি হয় এবং তারা ইংরেজ বণিকদের দমন করার উদ্দেশ্যে তাদের সমস্ত বাজেয়াপ্ত করার জন্য বাংলাদেশের শাসকদের অনুরোধ করেন। পরবর্তীকালে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কাসিমবাজার ও কলকাতা আক্রমণ করলে কোম্পানীর কর্মচারীরা সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করতে শুরু করে যে, একমাত্র লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যেই নবাব তাদের বাণিজ্য কুঠি অধিকার করেন।

নবাবের নিষেধ অমান্য করে বাণিজ্য কুঠি সুরক্ষিত করে তোলার জন্য দুর্গ নির্মাণও

ছিল নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধিতার আর একটি পরোক্ষ কারণ। শোভা সিংহের বিদ্রোহ, মারাঠা আক্রমণ, ইয়োরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের প্রস্তুতি প্রভৃতি অজুহাতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরা যথাক্রমে, কলকাতা ও চন্দননগরে সুদৃঢ় দুর্গ তৈরি করতে শুরু করে। বিদেশী ব্যবসায়ীদের দুর্গ নির্মাণ ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করায় স্বাভাবিকভাবেই বাংলার শাসকগণ আপত্তি করেন। কিন্তু ফরাসীরা নবাবের মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করলেও ইংরেজরা নবাবের নিষেধ-আজ্ঞার প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

নতুন নতুন স্থানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন সিরাজ-উদ্-দৌলার অভিযোগের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বাদশাহ ফাররুখশিয়ারের ফরমান অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতার নিকটবর্তী আটত্রিশখানা গ্রাম কিনে নেওয়ার আদেশ লাভ করে। কিন্তু বাংলার তদানীন্তন শাসনকর্তা মুর্শিদকুলি খান কোম্পানীকে এই সুযোগ দিতে অস্বীকার করেন। কোম্পানী তখন নতুন জমি অধিকার করার একটি চাতুর্যপূর্ণ নীতি গ্রহণ করে। কোম্পানীর নিকট জমি বিক্রয় সম্পর্কে নিষেধ আজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, দেশীয় কর্মচারীদের নামে জমি ক্রয় করে কোম্পানী তার অধিকারভুক্ত অঞ্চলের সীমানা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করে। ডবলু ডবলু হান্টারের বিবরণ অনুসারে ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে জমিদারী থেকে কোম্পানীর আয়ের পরিমাণ ছিল এগারো হাজার একাত্তর টাকা, আর ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে সেই আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে এক লক্ষ সাত হাজার একশ একত্রিশ টাকায় পরিণত হয়। নবাবও কোম্পানীর কাছ থেকে অতিরিক্ত আয়ের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করতে চেষ্টা করলে উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি হয়।

কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলে দেশীয় অধিবাসীদের ধন-প্রাণ-সম্পত্তি বজায় রাখার প্রশ্নেও নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধের কারণ দেখা দেয়। এদেশের প্রথা অনুযায়ী জমিদাররা যে পরিমাণ ক্ষমতা ভোগের অধিকারী তার চেয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অনেক বেশি ক্ষমতা ভোগ করার চেষ্টা করলে নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর বিবাদ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় আইন অনুসারে জমিদারগণ রাজস্ব আদায় ও নিজস্ব এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব পালন করত। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই দুটি ক্ষমতা বাদেও স্বাধীনভাবে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দাবি করে এবং চিরাচরিত প্রথা লঙ্ঘন করে নবাবের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত নবাবের প্রজাদেরও তারা অকুণ্ঠিতচিত্তে আশ্রয় দিতে শুরু করে। কোম্পানীর অধিকৃত অঞ্চলে নবাবের প্রজাদের মৃত্যু হলে তাদের সম্পত্তিও

তারা বিনা দ্বিধায় বাজেয়াপ্ত করতে শুরু করে। এইসব ঘটনাকেকেন্দ্র করে নবাব আলীবর্দীর আমলে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে নবাবের বিরোধিতা শুরু হয়। নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই দেশীয় অধিবাসীদের উপর কোম্পানীর অধিকারের প্রশ্নের মীমাংসার জন্য নবাব সিরাজ উদ্ দৌলা কলকাতা আক্রমণ করতে বাধ্য হন।

(৩) কোম্পানীর সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য সিরাজের ব্যক্তিগত দায়িত্ব

কোম্পানীর সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য সিরাজ উদ্-দৌলার ব্যক্তিগত দায়িত্ব খুবই কম। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বাংলাদেশের নবাবের মধ্যে সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কারণ থাকা সত্ত্বেও সিরাজ কখনও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে অথবা কোম্পানীর বাণিজ্য বন্ধ করে দিতে চেষ্টা করেন নি। তবে কলকাতার গভর্নর রোজার ড্রেকের প্রতি তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন, সুতরাং তাঁর পরিবর্তে অন্য কোন গভর্নর পাঠালে এবং ফরমানের নির্দেশ অনুযায়ী বাণিজ্য করলে তিনি সানন্দে ইংরেজদের তাঁর রাজত্বে বসবাস করতে দিতে রাজি ছিলেন। মাদ্রাজের ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের গভর্নর মিস্টার পিগটকে তিনি এই সম্পর্কে চিঠি-পত্র লিখতেও কোনপ্রকার আপত্তি করেন নি। কিন্তু কলকাতা অধিকারের পর তিনি ইংরেজদের সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করেন, ইংরেজরা নবাবের সেই নীতিকে তাঁর দুর্বলতা মনে করতে শুরু করে এবং তাদের উচ্চাশা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। নবাবের জ্ঞাতসারে কলতায় নির্বিঘ্নে বসবাস করার সুযোগ লাভ করে ইংরেজরাও বিস্মিত হয়। ইংরেজদের শক্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণার অভাবের জন্য সম্ভবতঃ নবাব তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। নবাবের নিযুক্ত কলকাতার গভর্নর রাজা মানিক-চাঁদের সঙ্গে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পেরেও নবাব তাঁর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নি অথবা বজবজ থানা, কলকাতা প্রভৃতি স্থানের দুর্গগুলোকে সুরক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা করেন নি। ফলে বিনা বাধায় ইংরেজরা এইসব দুর্গ অধিকার করে এবং নবাবের সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজদের শক্তি সম্পর্কে মিথ্যা ভীতির সঞ্চার হয় ও নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সিংহাসনে আরোহণের ছ'মাসের মধ্যে সিরাজ যেভাবে ঘসেটি বেগম ও সৌকৎ জঙ্গকে দমন করেন, ঠিক সেভাবেই যদি ইংরেজদের দমন করতেন, তাহলে রাজদরবারের নবাব-বিরোধী দল নবাবের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হত এবং পলাশীর যুদ্ধের প্রহসনের সম্ভাবনা সুদূর পরাহত হয়ে উঠত।

৯ই ফেব্রুয়ারীর চুক্তি নবাবের দুর্বলতার আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। যুদ্ধে

পরাজিত না হওয়া সত্ত্বেও নবাব ইংরেজদের প্রায় প্রতিটি দাবি মেনে নিতে স্বীকৃত হন কিন্তু এই চুক্তির সুযোগ গ্রহণ করেই রবার্ট ক্লাইভ ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী এবং নবাবের সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য মিত্র চন্দননগরের ফরাসীদের দমন করতে সমর্থ হন। সিরাজ-উদ্-দৌলার অবিমৃষ্যকারিতার জন্যই চন্দননগর ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং তাঁর পতনও অনিবার্য হয়ে পড়ে। চন্দননগর সম্পর্কে নবাবের নীতি তাঁর রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

চন্দননগরের পতনের পর ইংরেজের অগ্রগতি রুদ্ধ করার জন্য কাটোয়া দুর্গের শক্তি বৃদ্ধি করার দিকে নবাবের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন ছিল। কিন্তু নবাবের ঔদাসীন্য ও সামরিক দূরদর্শিতার অভাবের জন্য এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও তিনি অবহেলা প্রদর্শন করেন। ফলে রবার্ট ক্লাইভ অনায়াসে কাটোয়া দুর্গ জয় করতে সমর্থ হন। কাটোয়া দুর্গ অধিকারের পর রাজধানী মুর্শিদাবাদের পথ তাঁর কাছে উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

সেনাপতি মোহনলাল ও মীরমদনের পরামর্শ অনুযায়ী সেনাপতি মীরজাফরকে বন্দী করলে সিরাজ হয়ত নিজের সিংহাসন ও প্রাণ রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু অপরিণামদর্শী নবাব মীরজাফরকে বন্দী করেও আবার তাঁকে মুক্তি দিয়ে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করেন। অপর দিকে একটু সতর্কভাবে নীতি প্রণয়ন করলে উচ্চপদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারিগণ, মুসলিম অভিজাতবর্গ ও বিদেশী বণিক সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল তিনি তাও দমন করতে পারতেন, কিন্তু মানসিক দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতা নবাবের কর্মশক্তিকে এমনভাবে গ্রাস করে যে, তিনি তাঁর জীবনের চরমতম মুহূর্তে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে পলাশীর যুদ্ধের পথ সুগম করে তোলেন।

(৪) উপসংহার ঃ

বজবজ দুর্গ অধিকারের পর থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত নবাবের সঙ্গে সংঘর্ষের প্রতিটি পর্বেই রবার্ট ক্লাইভ অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদের ন্যায় চাতুর্য ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন—অপর দিকে বাংলাদেশের ইতিহাসের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার কার্যকলাপ সীমাহীন অপরিণামদর্শিতা ও চরম ব্যর্থতার ইতিহাস মাত্র। বিশ্বাস-ঘাতক ষড়যন্ত্রকারী ও স্বার্থান্বেষী পারিষদবর্গের উদ্দেশ্যমূলক পরামর্শ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করার মতো উপযুক্ত মানসিক শক্তির অভাবের ফলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় নবাব ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার দৃঢ়নীতি স্থিরভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি। ফলে রবার্ট ক্লাইভ ও চার্লস ওয়াটসন অল্প সময়ের মধ্যেই বাংলাদেশের রাজনীতির উপর ইংরেজদের

প্রভাব বৃদ্ধি করার সুযোগ পান। উইলিয়ম ওয়াটসের ন্যায় বিচক্ষণ কূটনীতিবিদ্, রবার্ট ক্লাইভের ন্যায় সুচতুর ও ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন সৈন্যাধ্যক্ষ এবং ওয়াটসনের ন্যায় তীব্র ফরাসী বিদ্বেষী স্বজাত্যাভিমানী নৌ-সেনাপতির সঙ্গে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ক্ষমতালোভী মীরজাফর, অর্থলোলুপ জগৎশেঠ, উচ্চাভিলাষী রায়দুর্লভ, নীচ মনোবৃত্তিসম্পন্ন উমিচাঁদ প্রভৃতির ন্যায় প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে অবিরাম মানসিক সংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত, কূটনীতি ও শাসনকার্যে অনভিজ্ঞ সিরাজ-উদ্-দৌলা বুদ্ধিমত্তার ভারসাম্য রক্ষা করতে অসমর্থ হন এবং রাজ্যের নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে সামান্য দৃঢ়তার পরিচয় দেওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। সিংহাসনে আরোহণের পর প্রথম কয়েকমাস নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা শাসনকার্যে দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় দিতে সমর্থ হন কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁর চরিত্র থেকে তা লুপ্ত হয়ে যায়। আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণের আশঙ্কা ও ইংরেজদের শক্তিবৃদ্ধির বিভীষিকা ক্রমে ক্রমে তাঁর মানসিক শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত ও পঙ্গু করে তোলে এবং তিনি নিয়তির ক্রীড়নকে পরিণত হন।

Q. 4. *"Siraj proved impossible, so he had to be removed."—Do you agree?*

উত্তর : (১) ভূমিকা :

সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব থেকেই ইংরেজগণ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। ইংরেজদের ধারণা ছিল যে, সিরাজ কখনও বাংলাদেশের মসনদে আরোহণ করার সুযোগ পাবেন না। বিশেষতঃ, বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দীর অসুস্থতার সুযোগ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম ও অন্যতম দৌহিত্র পূর্ণিয়ার নবাব সৌকৎজঙ্গ সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান সহায়ক ছিলেন ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজা রাজবল্লভ। সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষভাবাপন্ন ইংরেজরাও এই ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে। নবাব আলীবর্দী ও সিরাজ-উদ্-দৌলা এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত ছিলেন, সেজন্যই উভয়ই তাঁরা ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ ও সামরিক শক্তিবৃদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করেন। ইংরেজদের শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে সিরাজের মনোভাব জানার পর থেকেই ইংরেজগণ তাঁর প্রতি আরও বিরূপ হয় এবং তাঁর পরিবর্তে নবাব আলীবর্দীর অন্যতম দৌহিত্র পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৌকৎজঙ্গকে সিংহাসনে স্থাপন করার চেষ্টা করে। ঘসেটি বেগমও সৌকৎজঙ্গের পক্ষ অবলম্বন করায় ইংরেজদের আশা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সিংহাসনে উপবেশন করার কিছু দিনের মধ্যেই সিরাজ ঘসেটি বেগমকে বন্দী করতে সমর্থ হন এবং তারপরই ইংরেজদের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনা করে

কলকাতা অধিকার করেন। ইংরেজদের দমন করার পর সিরাজ-উদ্-দৌলা সৌকৎজঙ্গের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং সৌকৎজঙ্গ মণিহারীর যুদ্ধে সিরাজের নিকট পরাজিত ও নিহত হন। কলকাতা থেকে ইংরেজরা বহিষ্কৃত এবং সৌকৎজঙ্গ নিহত হলে সামগ্রিকভাবে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র বন্ধ হলেও রবার্ট ক্লাইভের বাংলাদেশে আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজরা পুনরায় সিরাজের বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়। রবার্ট ক্লাইভ ফলতায় পৌছেই কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন নবাবের অন্যতম সেনাপতি কলকাতার গভর্নর রাজা মাণিকচাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। রাজা মাণিকচাঁদের মাধ্যমেই ক্লাইভ সিরাজ-উদ্-দৌলাকে জানিয়ে দেন যে, "কোম্পানীর এবং তার কর্মচারী ও প্রজাদের ক্ষয়-ক্ষতির উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা এবং তাদের বাণিজ্যকুঠি প্রত্যর্পণ করে তাদের পুরাতন সমস্ত বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার ব্যবস্থা আপনার করতে হবে।"

(২) নবাবের মনোভাব ঃ

নবাবের অসতর্কতা এবং তাঁর কর্মচারীদের ইচ্ছাকৃত শৈথিল্যের জন্যই ই রেজদের পক্ষে অতি সহজে কলকাতা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে সিরাজ-উদ্-দৌলা ইংরেজদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চান নি অথবা তাদের বাণিজ্য বন্ধ করার চেষ্টাও করেন নি। দুর্গ নির্মাণ, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় প্রদান, কলকাতার গভর্নর রোজার ড্রেকের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি কারণেই সিরাজ-উদ্-দৌলা ইংরেজদের দমন করার জন্য কলকাতা অধিকার করেন। কিন্তু ইংরেজরা নবাবের এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং সিরাজের পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপন করে নিজেদের রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বৃদ্ধি করার জন্য চিন্তা করতে শুরু করে। এই উদ্দেশ্যেই তারা কলকাতা পুনরুদ্ধারের পর ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে। পরদিন ৪ঠা জানুয়ারীই ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল হুগলী আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে কলকাতা পুনরুদ্ধারের পরদিন থেকেই বিদেশী বণিক সংস্থা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রকৃতপক্ষে নবাবের প্রতিপক্ষে পরিণত হয় এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে ইংরেজদের পরিকল্পনা বাস্তবে রূপদানের উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গ নির্মাণের জন্য একজন উপযুক্ত ও দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার পাঠাতে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল লণ্ডনে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে। ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল বাংলাদেশে একদল শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল

সৈন্য পাঠাবার জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা জানায়। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য এই ব্যবস্থা ছিল প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র।

(৩) ইংরেজদের মনোভাব ঃ

কলকাতা পুনরুদ্ধার এবং হুগলী আক্রমণ ও লুণ্ঠনের সংবাদ পেয়ে সিরাজ-উদ্-দৌলা দ্বিতীয়বার কলকাতা জয় করার জন্য সসৈন্যে উপস্থিত হন। কিন্তু নবাবের এই অভিযান ব্যর্থ হয় এবং ইংরেজদের অতর্কিত আক্রমণে ভীত হয়ে নবাব তাদের সঙ্গে ৯ই ফেব্রুয়ারী আলীনগরের চুক্তি সম্পাদন করেন। এই ফেব্রুয়ারী চুক্তি নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। তাঁর রাজত্বকালের পরবর্তী সকল ঘটনার প্রধান উৎস তথাকথিত আলীনগরের চুক্তি। আলীনগরের চুক্তিতে অর্বাচীন নবাবের সমস্ত প্রকার রাজনৈতিক দূরদর্শিতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং ইংরেজরা দ্বিধাহীন চিত্তে তাদের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। ভারতীয় বণিকগণও শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরাপদে ব্যবসা-ব্যাণিজ্য করার জন্য সিরাজের বিরুদ্ধে গোপনে ইংরেজদের পক্ষ অবলম্বন করে। এস. সি. হিল এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন। "সরফরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে এই বণিক সম্প্রদায়ই আলীবর্দী খানকে বাংলাদেশের মসনদে স্থাপন করে, এখন তারাই আবার নবাবের বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হয়। তবে প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ইংরেজরা নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রয়োজন উপলব্ধি করে। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসের ১৩ তারিখে ফোর্ট সেন্ট জর্জের সিলেক্ট কমিটি ক্লাইভ ও ওয়াটসনকে প্রয়োজন অনুসারে নবাবের উৎপীড়নে অসন্তুষ্ট অথবা বাংলাদেশের মসনদের দাবিদারদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করার পরামর্শ দেন। রবার্ট ক্লাইভও নবাব দরবারের ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটসকে নির্দেশ দেন যে, নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটলে, সে যেন অবশ্যই নবাব-বিরোধী দলের সঙ্গে যোগ দিতে কোনরূপ ইতস্ততঃ না করে। এপ্রিল মাসের ৩০ তারিখের চিঠিতে ক্লাইভ ওয়াটসকে আবার লিখলেন, "নবাব দুর্বৃত্ত এবং বিশ্বাসেরও অযোগ্য, তাঁকে অবশ্যই বিপর্যস্ত করা প্রয়োজন, না হলে আমাদের পতন অবশ্যম্ভাবী।" ("The Nawab is a villain and cannot be trusted, he must be overcast, or we must fall.") ওয়াটসের সহকারী লুক স্ক্রাফটনও ইংরেজদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নবাবের বিরোধী দলের সঙ্গে যোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন। ৯ই

এপ্রিল তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের সদস্যদের জানান, "কোম্পানীর প্রতি অনুরক্ত সিংহাসনে আসীন একজন নবাব কোম্পানীর পক্ষে অবশ্যই গৌরবজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে।"

ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পরই ইংরেজরা নবাবের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। পরবর্তীকালে হাউস অফ কমন্সের প্রতিনিধিদের নিকট রবার্ট ক্লাইভ বলেন যে. ইংরেজদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিপ্লব সাধনের প্রয়োজনের কথা তিনি চার্লস ওয়াটসন, জর্জ পকক্ ও সিলেক্ট কমিটির নিকট ব্যক্ত করেন। কমিটির সদস্যবৃন্দ রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা সমর্থন করেন এবং নবাবের দরবারের ইংরেজ দূত উইলিয়ম ওয়াটস ও রবার্ট ক্লাইভের উপর এই রাজনৈতিক বিপ্লব আনয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তবে উয়লিয়ম ওয়াটস এবং লুক স্ক্রাফটনের কাছ থেকে কোন প্রস্তাব আসার পূর্বেই ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল সিরাজ-উদ্-দৌলার পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কাউন্সিল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, "নবাব যদি তাঁর ফেব্রুয়ারীর চুক্তির শর্ত পালনে কোন একটি বিষয়েও বিচ্যুত হন, আমরা তাহলে তাঁর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে অন্য কোন নবাবকে সিংহাসনে স্থাপন করব।" এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিপ্লব বা ষড়যন্ত্র গড়ে তোলার উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে চার্লস ওয়াটসন ক্লাইভকে জানান, "জেনে সুখী হয়েছি মীরজাফরের অনুগামীদের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করি এই যুদ্ধযাত্রার সকল কিছুই আপনার ইচ্ছানুযায়ী ঘটবে এবং এই অভিযানের সাফল্যের জন্য আমি শীঘ্রই আপনাকে অভিনন্দন জানাতে সক্ষম হব।"

নবাবের উচ্চপদস্থ অভিজাত মুসলিম ও হিন্দু রাজকর্মচারিগণ, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ প্রভৃতি ভারতীয় বণিক সম্প্রদায় ও নবাবের সৈন্যবাহিনীর একটি বিরাট অংশের ষড়যন্ত্রের ফলে রবার্ট ক্লাইভ পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পরাজিত ও সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের ফলে ইংরেজদের বিশ্বাসভাজন ও একান্ত অনুগত মীরজাফর ক্লাইভের দ্বারা বাংলাদেশের সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিংহাসনের বিনিময়ে মীরজাফর ফেব্রুয়ারী চুক্তির সমস্ত শর্ত পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং যুদ্ধের জন্য ইংরেজদের ক্ষয়-ক্ষতির ও ব্যয়ের জন্য মোট তিন কোটি টাকা দিতে স্বীকৃত হন। তা ছাড়া, কলকাতার পুরাতন সীমানার বাইরে বিরাট অঞ্চলের উপর ইংরেজদের পূর্ণ অধিকার স্বীকার করতে

মীরজাফর প্রতিশ্রুতি দেন এবং কিছু রাজস্বের বিনিময়ে কলকাতা থেকে কুলপী পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলও ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করতে তিনি সম্মত হন। সিরাজ-উদ্-দৌলার পতন ও মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের বহুদিনের স্বপ্ন সার্থক হয় এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিরঙ্কুশভাবে ভোগ করার পথ তাদের কাছে সুগম হয়ে ওঠে।

(৪) উপসংহার ঃ

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা কোন দিনই ইংরেজদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করতে চেষ্টা করেন নি। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ইংরেজ বণিকদের গুরুত্ব সম্পর্কেও তাঁর সম্যক ধারণা ছিল। প্রকৃতপক্ষে নবাব ইংরেজ বণিকদিগকে প্রদত্ত বাদশাহী ফরমান অনুযায়ী বাণিজ্য সংস্থা পরিচালনা করার জন্য নির্দেশ দেন এবং এই বণিক সম্প্রদায় যাতে যথাযথভাবে এই নির্দেশ পালন করে তিনি সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার চেষ্টা করতে শুরু করেন। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। নবাব সুজা-উদ্-দিন, নবাব আলীবর্দী খান প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রাক্তন শাসকগণ কেউই কোন দিন ইংরেজদের দুর্গ নির্মাণ বা সাময়িক শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা সুনজরে দেখেন নি। তবে, তারা কেউই ইংরেজদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে প্রস্তুত ছিলেন না। মুজাফফ্রনামার লেখক করম আলীর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পূর্বে আলীবর্দী খান সিরাজকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে নিষেধ করেন। চহার-গুলজার-ই-সুজাই গ্রন্থের লেখক হরিচরণ দাস লেখেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে নবাব আলীবর্দী সিরাজকে নিষেধ করেন। কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের পরই নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী, অন্যায়ভাবে নবাবের রাজস্ব আত্মসাৎকারী এবং বেআইনীভাবে সুরক্ষিত দুর্গের নির্মাণকারী ইংরেজদের সঙ্গে সকল প্রকার বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। তবে এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্যও ছিল ইংরেজদের শিক্ষা দেওয়া। কারণ ইংরেজদের শক্তি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত হীন ধারণা পোষণ করতেন এবং তিনি মনে করতেন যে, বাণিজ্যিক অসুবিধার সৃষ্টি হলেই ইংরেজ বণিকগণ নবাবের আনুগত্য স্বীকার করে আইন-কানুন মেনে নিয়ে বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করতে বাধ্য হবে। সামরিক শক্তির দ্বারা তারা যে পুনরায় কলকাতা উদ্ধার করবে তা সিরাজ কখনও ভাবতে পারেন নি। কাশিমবাজারের ফরাসী বাণিজ্যকুঠির অধ্যক্ষ মঁসিয়ে জাঁ ল মনে করেন যে,

ইয়োরোপীয়দের শক্তি সম্পর্কে অত্যন্ত খারাপ ধারণা থাকার জন্য বলপূর্বক আবার ইংরেজরা কলকাতা উদ্ধার করতে পারে, সে কথা নবাব কখনও কল্পনা করেন নি। "Siraj-ud-daulah had the most extravagant contempt for the Europeans, 'a pair of slippers' said he, 'is all that is required to govern them.' He was far from thinking that the English would entertain the idea of re-establishing themselves by force." সেইজন্যই তিনি ফলতায় নিরুপদ্রবে ইংরেজদের বসবাস করতে দেন। প্রকৃতপক্ষে কলকাতার গভর্নর রোজার ড্রেকের দুর্ব্যবহারে এবং ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণে অনন্যোপায় হয়ে তিনি ইংরেজদের কলকাতা ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থান থেকে সাময়িকভাবে বিতারিত করেন। মাদ্রাজ কাউন্সিলের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার সন্তোষজনক মীমাংসার ব্যবস্থা করে ইংরেজদের বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ দানই ছিল নবাবের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ইংরেজরা নবাবের এই মনোভাব উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণভাবে অসমর্থ হয় এবং তাদের ধারণা হয় যে, সিরাজ-উদ্-দৌলার রাজত্বকালে তাদের পক্ষে বাণিজ্য পরিচালনা অসম্ভব হয়ে উঠবে। সুতরাং তারা সিরাজকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। "Siraj is impossible, so he should be removed." অন্যায়ভাবে অধিকৃত বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার জন্যই সিরাজের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ দেখা দেয়। তারা অন্যায়ভাবে অধিকৃত বাণিজ্য অধিকারকে আরও সম্প্রসারিত করতে সি হাসন থেকে সিরাজকে অপসারিত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। সামরিক শক্তির সাহায্যে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত ও বন্দী করে প্রয়োজন হলে ইংলণ্ডে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সম্পর্কে জাঁ ল মন্তব্য করেন, " · With a much more serious attack and even to capture him and take him to England." নবাব কর্তৃক দ্বিতীয়বার কলকাতা আক্রমণের সময় রবার্ট ক্লাইভের পক্ষে সিরাজ-উদ্-দৌলার শিবিরে অতর্কিতে নৈশ অভিযানের মূল উদ্দেশ্যও ছিল নবাবকে বন্দী করে প্রয়োজনীয় সুযোগ লাভের ব্যবস্থা করা। রবার্ট ক্লাইভের নৈশ অভিযান জয়যুক্ত হলেও তার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। সুতরাং ইংরেজরা তখন নবাবের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নবাবকে মসনদ থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার অবিমৃষ্যকারিতা এবং তাঁর কর্মচারীদের স্বার্থান্বেষী মনোভাবের জন্য ইংরেজদের এই চেষ্টা সার্থকতা লাভ করে এবং সিরাজ-উদ্-দৌলার সিংহাসনচ্যুতির পরেই ইংরেজরাই পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সকল অধিকার লাভ করে।

উপরি-উক্ত আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, ইংরেজগণ নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে তাদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার প্রধান শত্রু বলে মনে করত। সুতরাং নবাবের ইংরেজ বণিকদের প্রতি সদিচ্ছার মনোভাব থাকা সত্ত্বেও ইংরেজরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌলা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সতর্ক যে কোন শাসকই সেই নীতি গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করতেন না। শক্তিমান ও স্বাধীন যে কোন শাসকের পক্ষে এইরূপ নীতি গ্রহণ করাই ছিল খুব স্বাভাবিক। অপর দিকে ইংরেজদের ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণভাবে ন্যায়-নীতি বিগর্হিত। কিন্তু এই স্বার্থান্বেষী অন্যায় নীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েই তারা নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং তাদের এই আচরণকে সমর্থন করার কোন প্রকার যুক্তি খুঁজে পাওয়া একান্তই অসম্ভব।

Q. 5. *"Plassey was decisive for the British in India and for Clive."—Comment on the statement*

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা ঃ

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন সকালবেলা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিচলিত এবং উদ্বিগ্ন মন নিয়ে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সৈন্যবাহিনীর অবস্থান ও প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণ করার উদ্দেশ্যে একজন সঙ্গীসহ রবার্ট ক্লাইভ গতরাত্রির আশ্রয়স্থল 'পলাশী হাউসের' ছাদের উপর আরোহণ করেন এবং শত্রুপক্ষের সুন্দর, সুসজ্জিত ও বীরত্ব-ব্যঞ্জক আকৃতিবিশিষ্ট অসংখ্য সেনানীর অপূর্ব সমাবেশ অবলোকন করে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও ভীত হন। যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে তাঁর সঙ্গী তাঁকে প্রশ্ন করলে বিমর্ষ ও চিন্তাক্লিষ্ট রবার্ট ক্লাইভ তাঁকে উত্তর দেন, "সারাদিন আমরা অবশ্যই যথাসাধ্য ভালভাবে যুদ্ধ করব এবং রাত্রিবেলা কাঁধের উপর বন্দুক ফেলে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করব।" তারপর পলাশীর যুদ্ধের পনের বছর পরে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের তদন্ত কমিটির নিকট পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের ফলাফল খুব অল্প কথায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন, "একবার বিবেচনা করে দেখুন, পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আমি কিরূপ স্থান অধিকার করার সুযোগ পাই। একজন শক্তিশালী ,শাসক আমার অনুগ্রহপ্রার্থী, একটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত নগরী আমার দয়ার উপর নির্ভরশীল, রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী শেঠগণ আমার হাসিমুখ দেখার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ; নবাবের কোষাগার একমাত্র আমার কাছেই উন্মুক্ত হল—ভূগর্ভস্থ কোষাগারের উভয় পার্শ্বস্থ স্তূপীকৃত স্বর্ণপিণ্ড ও

অন্যান্য মনিমুক্তার মধ্য দিয়ে আমি পায়চারী করে বেড়িয়ে এলাম,···মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমার সে সময়ের সংযমের কথা ভেবে এখনও আমি বিস্মিত বোধ করছি।"

(২) অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঃ

প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার লাভ করে। এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে চার্লস ওয়াটসন মন্তব্য করেন যে, "পলাশীর যুদ্ধ শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে নয়, ইংরেজ জাতির পক্ষেও অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ।" ("The Battle of Plassey is of extraordinary importance not only to the company but to the English nation in general"). নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয় ও পতনের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতিতে যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দেয় তার ফলাফল শুধু বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে অনতিবিলম্বেই সমগ্র ভারতবর্ষের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ লাভ করে। বিদেশী বণিকদের নিষ্ঠুর শোষণের ফলে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানারূপ জটিলতা ও শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি মীরজাফর আলি খান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রিত নবাব রূপে পরিগণিত হওয়ার ফলে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ জাতির কর্তৃত্ব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়।

সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফর আলি খানকে সিংহাসনে স্থাপনের বিনিময়ে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রচুর পরিমাণ অর্থ, অন্যান্য নানারকম সুযোগ-সুবিধা ও নানাপ্রকার উপঢৌকন দিতে স্বীকৃত হন। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরের নিকট থেকে দুকোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা আদায় করে। কিন্তু কোম্পানীর মোট দাবির পরিমাণ ছিল দুকোটি উনত্রিশ লক্ষ টাকা—কোম্পানীর ক্ষতির পরিমাণ ছিল এককোটি টাকা, কলকাতার ইয়োরোপীয়ান অধিবাসীদের ক্ষতির পরিমাণ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, হিন্দু ও আর্মেনিয়ান অধিবাসীদের ক্ষতির পরিমাণ সাতাশ লক্ষ টাকা ও নৌবাহিনীর এবং সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহের জন্য বাহান্ন লক্ষ টাকা। পলাশীর যুদ্ধের পর ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের সদস্যগণও প্রচুর অর্থ পুরষ্কার হিসাবে লাভ করেন। তা ছাড়া, সিংহাসনে আরোহণের পর মীরজাফর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দুকোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যতীত কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপহার স্বরূপ নগদ পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা দেন। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে এক

বিশাল জমিদারীও নবাবের কাছ থেকে লাভ করেন। ১৭৬১-৬২ খ্রীস্টাব্দে এই জমিদারী থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

পলাশীর যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে ইংরেজগণ যে অর্থ লাভ করেন ভারতের অর্থনীতি ও ইংলণ্ডের অর্থনীতিতে তার প্রচুর পরিমাণ প্রভাব প্রতিফলিত হয়। বিশেষতঃ ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্য ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া প্রভাব বিস্তৃত হয়। এই গৌরবজনক সাফল্যের জন্য ইংরেজরা প্রায় তিন কোটি টাকা লাভ করে, প্রকৃতপক্ষে এই সুবা থেকে আদায়ীকৃত বিপুল পরিমাণ অর্থই শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডে কেন্দ্রীভূত হয়। কোম্পানীর প্রাপ্য অংশ হিসাবে কলকাতার কোষাগারে এই সময় যে পরিমাণ অর্থ জমা পড়ে, বাইরের থেকে এক আউন্স রৌপ্য বা স্বর্ণ পিণ্ড আমদানি না করেও, সেই অর্থের দ্বারাই পরপর তিন বছর পর্যন্ত একমাত্র চীন দেশ ব্যতীত সমগ্র পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য দেশের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সকল প্রকার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিকল্পনা করার সুযোগ লাভ করে। অন্যান্য কোম্পানীর মাধ্যমেও প্রচুর পরিমাণ অর্থ ইংলণ্ডে পাঠানো হয়, ফলে আমদানি ও রপ্তানির তুলনামূলক হিসাবে ঐসব জাতির কাছ থেকে ইংরেজরা অনেক সুযোগ পেতে সমর্থ হয়। এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে লুক স্ক্রাফটন মন্তব্য করেন, "এইসব সুযোগ-সুবিধার সঙ্গে আমাদের শত্রু ফরাসীদের যে ক্ষতি করার সুযোগ আমরা পেলাম তাও যোগ করে নিতে হবে, কারণ ভারতের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে অঞ্চল ছিল তাদের সব চাইতে বড় অবলম্বন এবার সেখান থেকে তারা সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কৃত হল।"

(৩) রাজনৈতিক পরিবর্তন ঃ

পলাশীর যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফলও—অর্থনৈতিক ফলাফলের ন্যায় যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে মীরজাফরের পরিবর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়, মীরজাফর ধীরে ধীরে অধিকারহীন ও দায়িত্বহীন নামেমাত্র বাংলাদেশের সিংহাসনের অধিকারী রূপে পরিগণিত হন। দেশের শক্তিশালী ভূ-স্বামীগণ মীরজাফরের পরিবর্তে রবার্ট ক্লাইভের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে শুরু করে। রবার্ট ক্লাইভ বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এমন কি, মীরজাফরের জন্য তিনিই দিল্লীর বাদশাহের নিকট থেকে সনদ আদায় করার ব্যবস্থা করেন। অপরদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি ও স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ নবাবের কর্মচারীদের

অনেক ক্ষমতা ও অধিকার অবৈধভাবে আত্মসাৎ করে এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের এই সকল অবৈধ ও অসঙ্গত কার্যকলাপ দেশের রাজনৈতিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। নবাবের কর্মচারীরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করতে অস্বীকৃত হলে অনিবার্যভাবেই তারা প্রচণ্ড বাধা ও নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরই কোম্পানীর কর্মচারীদের উপরে প্রকৃতপক্ষে নবাবের কর্মচারীদের ক্ষমতা প্রয়োগের সকল ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারেও ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নবাবের উপর অসঙ্গতভাবে প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করার সুযোগ লাভ করে এবং নবাব ধীরে ধীরে বিদেশীদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। বাস্তবিক পক্ষে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত দ্বৈত শাসন পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী কালের বাংলাদেশের শাসনক্ষেত্রে সর্বপ্রথম দেখা দিতে শুরু করে। পলাশীর যুদ্ধের পরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রূপান্তর ঘটে এবং বণিকের মানদণ্ড সকলের অজ্ঞাতসারে রাজদণ্ড রূপে দেখা দেওয়ার সুযোগ পায়। এডমণ্ড বার্ক ইংরেজ বণিকদের এই রাজনৈতিক পরিবতন সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, "ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপ বিচার করে দেখলে মনে হয় না যে, কেবলমাত্র ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্য বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে এই বাণিজ্য সংস্থা গঠিত হয়েছে, কারণ প্রকৃতপক্ষে যে রাজ্য থেকে তাদের প্রাচ্যদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়, তারা সেই রাজ্যের সমস্ত শক্তি ও সাবভৌম ক্ষমতার অধিকারীর ভূমিকা গ্রহণ করতে শুরু করে।"

(৪) ক্লাইভের ক্ষমতা বিস্তার ঃ

মাদ্রাজ কাউন্সিলের কর্মচারী রবার্ট ক্লাইভ কলকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য বাংলাদেশে প্রেরিত হন এবং কলকাতাতে উপস্থিত হয়েই তিনি বেসরকারীভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের উপর নিজের একাধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হন। কলকাতা পুনর্দখল করার পর সিরাজ-উদ-দৌলার কলকাতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ব্যাহত করে এবং সর্বোপরি পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে পরাজিত করে রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে চন্দননগর অধিকার করে তিনি বাংলাদেশ থেকে ফরাসীদের বিতাড়িত করেন এবং পলাশীর যুদ্ধের পর বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করে তিনি ওলন্দাজ শক্তির মূলেও চরম আঘাত করতে সমর্থ হন। অপর দিকে মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণের পর রবার্ট ক্লাইভ প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ পান। জগৎশেঠের সহায়তায় দিল্লীর বাদশাহের নিকট থেকে-

প্রয়োজনীয় সনদ মঞ্জুর করে এনে রবার্ট ক্লাইভ মীরজাফরের উপর সীমাহীন প্রভাব বিস্তার করেন। আবার চৌথ সংক্রান্ত বিষয়ে পেশোয়া বালাজি রাও এবং মীরজাফরের বিরোধ নিষ্পত্তি করে তিনিই নতুন নবাবের সিংহাসন নিরাপদ করে তোলার ব্যবস্থা করেন। তা ছাড়া, এমন কি মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণের পর রবার্ট ক্লাইভ রাজ্যের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগের ব্যাপারেও নিজের কর্তৃত্ব কার্যকরী করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা শুরু করেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জুলাই তিনি মীরজাফরকে চিঠি লিখে জানান, "আমি জানতে পারলাম যে, আগামী ঈদের দিন আপনি রাজ্যের সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মনোনীত করবেন, এই সমস্ত কর্মচারীদের নামের তালিকা একবার দেখার সুযোগ পেলে আমি আমাকে আপনার একান্ত অনুগ্রহভাজন পাত্র বলে বিবেচনা করার সৌভাগ্য অর্জন করতাম এবং যদি দেখি যে ঐ সকল কর্মচারীদের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি আপনার প্রতি অনুরক্ত নয়, তাহলে তাদের নাম আপনাকে জানিয়ে দেওয়া আমার অবশ্য কর্তব্য বলে বিবেচনা করি।" প্রকৃতপক্ষে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থের পরিপন্থী কোন ব্যক্তি যাতে নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারী রূপে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করাই ছিল ক্লাইভের মূল উদ্দেশ্য। কারণ মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণের পর রাজা রায় দুর্লভরাম দেওয়ানের পদ লাভ করেন। ২১শে জুলাই রবার্ট ক্লাইভ তাঁকে লিখলেন, "আমি সব সময়ই মনে করি যে, কোম্পানীর স্বার্থকে আপনার নিজের স্বার্থ বলে মনে করবেন।" নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেও ক্লাইভ কুণ্ঠা বোধ করেন নি। ১৪ই অক্টোবর তিনি দেওয়ান রায় দুর্লভকে লিখলেন, "একজন বিচক্ষণ দেওয়ানের মতো সবদা নবাবের সমস্ত কাজ সম্পাদন করবেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজে আপনার আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করার চেষ্টা করবেন।" সিংহাসনে আরোহণের অল্পদিন পরেই মীরজাফরের সঙ্গে মেদিনীপুরের রামসিংহ এবং বিহারের শাসনকর্তা রাজা রামনারায়ণের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ক্লাইভের কূটনীতি ও সামরিক শক্তির সাহায্যে নবাব তাদের দুজনকেই বশীভূত করতে সমর্থ হন। আবার নবাব যখন রায় দুর্লভ এবং রাম নারায়ণকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করে তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সংকল্প করেন, ক্লাইভই তাঁদের রক্ষা করেন। প্রকৃতপক্ষে মুসলমান সামরিক শক্তিসম্পন্ন অভিজাত শাসকশ্রেণীর হাত থেকে হিন্দু জমিদারদের রক্ষা করে ক্লাইভ ইংরেজদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। তবে মীরজাফরের দুর্বলতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের ফলে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ক্লাইভ বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ লাভ করেন।

(৫) **উপসংহার ঃ**

ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্য বিবর্তনের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ অন্যতম প্রধান ঘটনা। পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ইংরেজদের সমরকুশলতার পরিচয় হিসাবে পলাশীর যুদ্ধ উল্লেখযোগ্য না হলেও এই যুদ্ধের ফলে সিরাজ মসনদচ্যুত হওয়ায় দেশীয় রাজগণ ও জনসাধারণের মনে ইংরেজদের সামরিক শক্তি ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে এক উচ্চ ও ভীতিপূর্ণ ধারণার সৃষ্টি হয়। অন্যান্য ইয়োরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের চক্ষেও ইংরেজদের মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। অপর দিকে মীরজাফরের সঙ্গে কোম্পানীর যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সেই চুক্তি অনুসারে মীরজাফরকে প্রয়োজন মত ইংরেজগণ সামরিক সাহায্য দানে বাধ্য থাকবে বলে প্রতিশ্রুতি দেয়। মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিনের মধ্যেই ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং মারাঠাগণ ও দিল্লীর বাদশাহ্ শাহআলম বাংলাদেশ আক্রমণ করে। এই সকল বিপদে মীরজাফর কোম্পানীর নিকট থেকে সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করেন। ফলে বাংলাদেশের নবাব ধীরে ধীরে ইংরেজদের সামরিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজগণ বাংলার শাসনব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে অতি শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়। তা ছাড়া, পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আপাতদৃষ্টিতে ইংরেজগণের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব স্থাপিত না হলেও ইংরেজ কোম্পানী যে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পূর্বেকার অধীনতা থেকে তারা এখন বহুল পরিমাণে মুক্ত, অধিকতর শক্তিশালী এবং নবাবের অপরিহার্য সহায়ক শক্তিতে পরিণত হয় এবং রবার্ট ক্লাইভ প্রায় এককভাবেই এই শক্তি ভোগ ও প্রয়োগ করার সুযোগ পান।

Q. 6. *Briefly estimate the Character of Siraj-ud-daulah.*

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা ঃ

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই এপ্রিল নবাব আলীবর্দী খান মহবৎ জঙ্গ পরলোকে গমন করেন এবং ১৫ই এপ্রিল তাঁর দৌহিত্র মীর্জা মোহম্মদ সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার শাসন দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু বীরযোদ্ধা, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্ আলীবর্দী খান সিরাজকে ভবিষ্যৎ জীবনের দায়িত্ব ও রাজকার্যের জন্য উপযুক্তভাবে শিক্ষাদানের প্রতি বিন্দুমাত্র দৃষ্টিপাত করেন নি ; বিশেষতঃ তৎকালীন জটিল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধেও চরম উদাসীনতার পরিচয় দেন। এমন কি, বৃদ্ধ নবাব এই উদ্ধত অসংযত সিংহাসনের উত্তরাধিকারীর অন্যায়

আসক্তি এবং নানা প্রকার পাপকার্য সম্পাদন থেকেও প্রতিনিবৃত্ত করার কোন প্রকার চেষ্টা করেন নি। আলীবর্দীর এইরূপ উদাসীনতার ফল অত্যন্ত বিষময় হয়ে ওঠে। স্যার যদুনাথ সরকার এই সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, "বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দীর নয়নের মনি একজন ইন্দ্রিয়পরায়ণ, উদ্ধত, অপরিণামদর্শী, কাপুরুষ যুবকে পরিণত হয় এবং বাংলাদেশের সিংহাসনের উপর তাঁর অধিকার স্থাপনের সম্ভাবনার সংবাদে সমস্ত লোক সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।" ফলে নবাব আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই মুর্শিদাবাদের রাজপ্রাসাদে সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয় এবং নবাবের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারিগণ ও ইংরেজ বণিকরা এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে।

(২) ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের মতামত ঃ

অদূরদর্শী এবং লোকচরিত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ সিরাজ-উদ্-দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেই তাঁর অবস্থা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। কিন্তু সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত চরিত্রের নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁর পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রায় অসম্ভব ছিল। তবে সিরাজ-উদ্-দৌলার চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণও পরস্পর বিরোধী মতামত ব্যক্ত করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ তাঁর চরিত্রে বহু কলঙ্ক লেপন করেন। সিরাজের প্রতি ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতার ত্বরপনেয় কলঙ্ক অপনোদনের জন্য যে তাঁদের এই সব মতামত প্রকাশিত ও প্রচারিত, নিরপেক্ষ তথ্যানুসন্ধানীর চোখে তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত। সিরাজের চরিত্র বর্ণনা করতে গিয়ে রবার্ট ওরম বলেন, "অপরের সুখ-দুঃখে সহানুভূতিহীন মীর্জা মোহম্মদের ছেলেবেলার অন্যতম আমোদ-প্রমোদই ছিল পশু-পাখির উপর নানাপ্রকার অত্যাচার ও নিপীড়ন; সমস্ত প্রকার অমিতাচার ও লাম্পট্যের মধ্যে তিনি জীবন যাপন করতেন, বিশেষতঃ কড়া জাতীয় মাদক-দ্রব্য অতিরিক্ত পরিমাণে পান করার ফলে তাঁর মানসিক উত্তেজনা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং যে সামান্যতম বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাও ক্রমে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়।"

কোন কোন ইংরেজ ঐতিহাসিক সিরাজ-উদ্-দৌলাকে নির্মম অত্যাচারী, নির্বিচারে হত্যাকারী এবং সীমাহীন স্বৈরাচারী শাসকরূপে চিহ্নিত করেন। হেনরী ডডওয়েল সিরাজ-উদ্-দৌলাকে বিবেকবুদ্ধি-রহিত দানব রূপে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে "সিরাজ-উদ্-দৌলা কৌতূহল নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে গর্ভবতী নারীদের উদর বিদীর্ণ করে দেখতেন" এবং "গঙ্গানদীতে লোক-বোঝাই নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে তিনি নিমজ্জমান ব্যক্তিদের দুঃসহ মৃত্যু-যন্ত্রণা দেখে আনন্দ উপভোগ করতেন।"

(৩) সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতামত ঃ

সমসাময়িক ঐতিহাসিক গোলাম হোসেনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, সিরাজের চপলমতি, দুশ্চরিত্রতা, অপ্রিয় ভাষণ ও নিষ্ঠুরতার জন্য দরবারের সকল সভাসদই তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তবে সিরাজের প্রতিপক্ষ গোলাম হোসেনের এই মন্তব্যও যথেষ্ট পক্ষপাতদুষ্ট বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর পলাশীর যুদ্ধ কাব্যে সিরাজের যে কলঙ্কময় চরিত্র অঙ্কন করেন তাও যেমন অতিরঞ্জিত, ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং বাংলাদেশের কয়েকজন নাট্যকার সিরাজকে যে প্রকার দেশপ্রেমিক ও মহানুভব রূপে বর্ণনা করেন তাও অনুরূপভাবে অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট। সুতরাং সিরাজের চরিত্র সম্পর্কে যেসকল কাহিনী সাধারণভাবে প্রচলিত আছে নির্বিচারে তা গ্রহণ করা যায় না। কিন্তু কাশিমবাজারের ফরাসী বাণিজ্য কুঠির অধ্যক্ষ জঁা ল সিরাজ-উদ্-দৌলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় সিরাজের চারিত্র সম্বন্ধে যে বর্ণনা করেন তা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। তিনি তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেন যে, "আলীবর্দীর মৃত্যুর পূর্বেই সিরাজ অত্যন্ত দুশ্চরিত্র বলে কুখ্যাত ছিলেন। গঙ্গার ঘাটে যে সকল হিন্দু মেয়েরা স্নান করতে আসত তাদের মধ্যে সুন্দরী কেউ থাকলে সিরাজ তাঁর অনুচর পাঠিয়ে ছোট ডিঙ্গি নৌকায় করে তাদের ধরে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করতেন। লোক বোঝাই ফেরী নৌকা ডুবিয়ে জলমগ্ন পুরুষ-স্ত্রী ও শিশুদের অবস্থা দেখে সিরাজ আনন্দ উপভোগ করতেন।"

(৪) চারিত্রিক পরিবর্তন ঃ

কিন্তু সিংহাসনে আরোহণের পর সম্ভবতঃ সিরাজের চরিত্রের কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়। এমন কি, মৃত্যুশয্যায় শায়িত নবাব আলীবর্দীর নিকট পবিত্র কোরাণ স্পর্শ করে তিনি মদ্যপান পরিত্যাগ করার শপথ গ্রহণ করেন। কাশিমবাজারের ইংরেজ বাণিজ্য কুঠির সহ-অধ্যক্ষ লুক স্ক্রাফটন এই সম্পর্কে বলেন, "পূর্বেই আমি উল্লেখ করেছি যে, সিরাজ-উদ্-দৌলা ঘন ঘন অত্যধিক মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁর অন্তিম অসুখের সময় নবাব আলীবর্দী সিরাজ-উদ্-দৌলাকে অতিরিক্ত মদ্যপানের কুফল স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করাতে সমর্থ হন এবং তাঁকে কোরাণ স্পর্শ করে আর কখনও মদ্যপান না করার শপথ গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। তারপর থেকে এই শপথ তিনি কখনও লঙ্ঘন করেন নি।" তবে লুক স্ক্রাফটনের পরের মন্তব্যটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, "ইতিপূর্বে মাদক জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করার ফলে তাঁর মানসিক ও

শারীরিক বৃত্তিসমূহ প্রচুর মাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কোনরূপ সামঞ্জস্যহীন কল্পনার পর প্রবল ভাবাবেগে কখনও কখনও তিনি উন্মত্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ লোকজনের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন,—তারপর আবার তুচ্ছ কারণেই তাদের সঙ্গে তিনি সোহাগপূর্ণ আচরণ করতে শুরু করেন এবং এই সকল কাজ ও কথার সঙ্গে তাঁর প্রচণ্ড উদ্ধত ও সঙ্গতিহীন মেজাজের সঙ্গে কোন সাদৃশ্যই খুঁজে পাওয়া যায় না।"

(৫) মূল্যায়ন ঃ

ব্যক্তিগত জীবনে সিরাজ-উদ্-দৌলার বহু দোষ-ত্রুটি ছিল একথা অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টি সহকারে সমসাময়িক অভিজাত-বর্গের এবং ১৭৫৬ থেকে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের বাংলাদেশের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের নায়কদের চরিত্রের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করলে সিরাজ-উদ্-দৌলাকে চারিত্রিক দুরপনেয় কলঙ্কের হাত থেকে অতি সহজেই অব্যাহতি দেওয়া সম্ভব। বিশেষতঃ ব্যক্তিগত চরিত্রের অপকর্ষতা ভিন্ন অনভিজ্ঞতাবশতঃও সিরাজ কতকগুলো ত্রুটির জন্য দায়ী হয়ে পড়েন। তিনি মীরজাফরের দুরভিসন্ধির কথা জানতে পেরেও মীরজাফরকে কারারুদ্ধ না করে ভুল করেন। যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের পরামর্শ গ্রহণে সম্মত হন। মোহনলালকে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করার সুযোগ দান করেও তিনি জয়ের মুহূর্তে পরাজয় ডেকে আনেন। এই সমস্ত ঘটনা থেকে সিরাজের দৃঢ়তা ও দূরদর্শিতার অভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য তিনি যে কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন নি তা বলা সঙ্গত নয়। ঘসেটি বেগমকে আকস্মিকভাবে নিজ প্রাসাদে অন্তরীণ করে তিনি রাজনৈতিক কূটকৌশলের পরিচয় দেন। সৌকৎজঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করেও তিনি আর একটি বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেন।

অপরদিকে ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা অপেক্ষা বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি মীরজাফরকে বাংলার নবাবের উষ্ণীষের মর্যাদা রক্ষার জন্যই কাতর অনুরোধ জানান। আহম্মদ শাহ আবদালীর আক্রমণে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশঙ্কায়ও তিনি অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং যত শীঘ্র সম্ভব ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের মীমাংসা করে তিনি বৈদেশিক আক্রমণকারীকে প্রতিহত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। রবার্ট ক্লাইভের সঙ্গে তাঁর পত্রালাপে তাঁর এই আশঙ্কা ও মনোভাব বারবার সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে মোহনলাল ও

মীরমদনের মতো তিনি দেশপ্রেমিক না হলেও মীরজাফর বা উমিচাঁদের ন্যায় তিনি দেশদ্রোহী ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে অনেকেই সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক জি. বি ম্যালেসন-এর সঙ্গে একমত হতে দ্বিধাবোধ করবেন না। "মীরজাফরের তুলনায় সিরাজ-উদ্-দৌলা অনেক বেশি ভাগ্যবান ছিলেন এবং তাঁর প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণ করার কারণও অবশ্যই যৎসামান্য মাত্র। ত্রুটি-বিচ্যুতি তাঁর যা কিছু থাকুক না কেন, তিনি কোনদিন তাঁর প্রভুর সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি অথবা মাতৃভূমি বিক্রয় করেন নি। অধিকন্তু একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে ৯ই ফেব্রুয়ারী ও ২৩শে জুনের অন্তর্বর্তী সময়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গিয়েছে সে সম্পর্কে রায় দেওয়ার জন্য বিচারকের আসনে উপবেশন করে পক্ষপাতহীন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন যে কোন ইংরেজও অকপটে স্বীকার করবেন যে, সম্মানের মানদণ্ডে সিরাজ-উদ্-দৌলার নাম ক্লাইভের নাম অপেক্ষা অনেক উচ্চস্থানের অধিকারী। এই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান প্রধান অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই কখনও কোনপ্রকার প্রতারণা করার চেষ্টা করেন নি।
"Whatever may have been his faults, Siraj-ud-dulah had neither betrayed his master nor sold his country. Nay more, no unbiased Englishman sitting in judgement on the events which passed in the interval between the 9th February and the 23rd June, can deny that the name of Siraj-ud-dullah stands higher in the scale of honour than does the name of Clive. He was the only one of the principal actors in the tragic drama who did not attempt to deceive."—Malleson.

(৬) উপসংহার

আধুনিক অর্থে দেশপ্রেমিক বিশ্লেষণটি সিরাজ-উদ্-দৌলার নামের পূর্বে কোন ক্রমেই প্রযোজ্য নয়। কিন্তু একথা সত্য যে, সিরাজ-উদ্-দৌলা তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের সমূলে উৎপাটিত করে বাংলার নবাবের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন এবং ইংরেজ বণিকদের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করেন। ভীরু, কাপুরুষ এবং রাজ্যের মঙ্গল অমঙ্গল সম্পর্কে উদাসীন হলে তিনি কখনই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে রাজি হতেন না। সিংহাসনে আরোহণের কয়েক মাসের মধ্যে রাজ্যের সর্বত্র নিজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, সে সব ব্যবস্থার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে তরুণ নবাবের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে সম্ভবতঃ নবাবের বিরুদ্ধে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হওয়ার

পর তাঁর সকল উদ্যম ও উৎসাহ একেবারে স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং তিনি অসহায় ভাবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘূর্ণিবাতায় নিজেকে সমর্পণ করেন।

Q. 7. *Briefly discuss the rule of Mir Jafar, Nawab of Bengal.*

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা

পলাশীর যুদ্ধের পরদিন (২৩শে, জুন, ১৭৫৭) পলাশীর নিকটবর্তী দাউদপুরের ইংরেজ শিবিরে মীরজাফর ক্লাইভের সহিত সাক্ষাৎ করলে ক্লাইভ তাঁকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব বলে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই সাক্ষাৎকারের পর মীরজাফর ইংরেজদের অভিসন্ধি সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। ইতিমধ্যে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা প্রাণভয়ে গোপনে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন। ফলে বিনাবাধায় মীরজাফর রাজধানীতে প্রবেশ করার সুযোগ পান এবং ২৮শে জুন তাঁর অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ২৯শে জুন ক্লাইভ দু'শ ইয়োরোপীয়ান ও দু'শ দেশীয় সৈন্য সহ বিজয়গর্বে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করেন। সেদিনই সন্ধ্যায় উপস্থিত হয়ে দরবারে ক্লাইভ মীরজাফরকে মসনদে বসতে অনুরোধ করেন। মীরজাফর ইতস্ততঃ করায় ক্লাইভ নিজে তাঁর হাত ধরে তাঁকে মসনদে বসান এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার বলে অভিনন্দিত করেন। ক্লাইভ ও জগৎ শেঠের তৎপরতায় দিল্লীর বাদশাহও বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক পরিবর্তন অনুমোদন করেন।

(২) মীরজাফরের সিংহাসন লাভ

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইংরেজদের সহিত গোপন চুক্তি করার সময় মীরজাফর ইংরেজদের যে টাকা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন, দেখা গেল রাজকোষে সে পরিমাণ টাকা নেই। জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, আপাততঃ দাবির অর্দ্ধেক টাকা ইংরেজদের দেওয়া হবে। বাকি অর্দ্ধেক তিন বছরে সমান কিস্তিতে শোধ করা হবে। এই ব্যবস্থার ফলে ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মীরজাফর ইংরেজ কোম্পানীকে নগদ দু কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা এবং প্রধান প্রধান কর্মচারীদের আটান্ন লক্ষ সত্তর হাজার টাকা দেন। ক্লাইভকে ব্যক্তিগতভাবে যে জমিদারী দেওয়া হয় তার বার্ষিক আয় ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জুলাই সামরিক বাদ্য সহকারে শোভাযাত্রা করে প্রথম কিস্তির টাকা দুশো নৌকায় বোঝাই করে ক্লাইভ কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন।

(৩) সিরাজের মৃত্যু

৩০শে জুন সিরাজ-উদ্-দৌলা রাজমহলের নিকট মীরজাফরের অনুচরদের দ্বারা বন্দী হন। ২রা জুলাই রাত্রে গোপনে তাঁকে মুর্শিদাবাদে আনা হোল। তাঁর সম্বন্ধে কি

ব্যবস্থা করা হবে স্থির করতে না পেরে মীরজাফর তাঁকে পুত্র মীরনের হেফাজতে রাখেন। মীরন সেই রাত্রেই তাঁকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেন।

(৪) জমিদারদের বিদ্রোহ

মীরজাফরের সিংহাসনলাভের পর তিনজন জমিদার ব্যতীত আর সকলেই তাকে নবাব বলে স্বীকার করতে রাজি হন। মেদিনীপুরের রাণা রামসিংহ সিরাজের অনুগত ছিলেন। তিনি প্রথমে মীরজাফরের বশ্যতা স্বীকার করেন নি কিন্তু কিছুদিন পরেই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হন। পূর্ণিয়ার হাজীর আলি খান নিজেকে স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেন, কিন্তু নবাবের সৈন্য তাঁকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। পাটনার শাসনকর্তা রামনারায়ণ মীরজাফরের আনুগত্য স্বীকার না করায় তাঁর বিরুদ্ধে নবাব সসৈন্যে উপস্থিত হন। কিন্তু রামনারায়ণ ক্লাইভের শরণাপন্ন হওয়ায় নবাব তার কোন অনিষ্ট করতে পারেন নি এবং রামনারায়ণকে তিনি পূর্ব পদেই বহাল রাখতে বাধ্য হন। ইতিমধ্যে নবাব মীরজাফর সংবাদ পান যে, উপরি-উক্ত তিনটি বিদ্রোহেরই মূলে ছিলেন রায়দুর্লভ। কারণ, যদিও তিনি রায়দুর্লভের সঙ্গে চক্রান্ত করেই সিরাজের সর্বনাশ করেন তথাপি নবাব হওয়ার পর তাঁর সন্দেহ হয় যে, ভবিষ্যতে অন্যান্য হিন্দু ও ইংরেজদের সাহায্যে রায়দুর্লভ তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে পারেন। সুতরাং তিনি রায়দুর্লভকে হত্যা করার ব্যবস্থা করেন। রায়দুর্লভ উপায়ান্তর না পেয়ে ক্লাইভের শরণাপন্ন হন। ক্লাইভ রায়দুর্লভকে রক্ষা করেন। সুচতুর ক্লাইভ জানতেন যে মীরজাফর ইংরেজদের সহায়তায় নবাব হলেও তিনি ইংরেজদের কর্তৃত্ব খর্ব করার চেষ্টা করবেন। সুতরাং তিনিও রায়দুর্লভ, রামনারায়ণ প্রভৃতিকে নিয়ে নিজের একটি দল গঠন করার চেষ্টা করেন। ক্লাইভের মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মীরজাফরের পুত্র মীরন রায়দুর্লভকে দেওয়ানের পদ থেকে বরখাস্ত করে রাজবল্লভকে তাঁর স্থানে নিযুক্ত করেন। রায়দুর্লভ আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে ক্লাইভের নিকট কলকাতায় আশ্রয় গ্রহণ করেন।

(৫) সৈন্যদের অসন্তোষ

জমিদারদের বিদ্রোহ দমিত হতে না হতেই মীরজাফরের সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাদের অনেকদিনের বেতন বাকি ছিল, সুতরাং তারা এই অর্থ পরিশোধের জন্য নবাবের নিকট আবেদন করেন। নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে অনেক সৈন্যকে বরখাস্ত করেন। ফলে সৈন্যরা তাঁর প্রাসাদ অবরোধ করে। নবাবের দুর্ব্যবহারে বিহারের দুজন জমিদার সুন্দর সিং ও বলবন্ত সিংও বিদ্রোহ করেন।

(৬) দিল্লীর রাজনৈতিক পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

১৭৫৮ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী বাদশাহ দ্বিতীয় আলমগীর তাঁর পুত্রকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত করেন। বাংলার নবাব পরিবর্তন, আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে অকর্মণ্য মীরজাফরকে পদচ্যুত করে বাংলার মসনদে বাদশাহজাদাকে বসাবার জন্য এলাহাবাদের সুবাদার মোহম্মদ কুলি খান এবং অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা বাদশাহজাদাকে সম্মুখে রেখে বিহার আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হন। এই আক্রমণের সংবাদে মীরজাফর অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, কারণ তাঁর সৈন্যরা পূর্ব হতেই বিদ্রোহী ছিল। অনেক জমিদারও বাদশাহজাদার দলে যোগ দিতে উদ্যোগী হন। নবাব অনন্যোপায় হয়ে সোনারূপার তৈজসপত্র বিক্রয় করে সৈন্যদের বাকি বেতন পরিশোধ করেন এবং ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ইতিমধ্যে বাদশাহজাদা পাটনা দুর্গ আক্রমণ করেন, কিন্তু ক্লাইভের হস্তে পরাজিত হন। এই বছরের শেষের দিকে বাদশাহজাদা আবার বিহার আক্রমণ করতে উদ্যত হন, কিন্তু দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থার আকস্মিক পরিবর্তনে তিনি তাঁর এই অভিযান পরিত্যাগ করেন। কিন্তু বাদশাহ আলমের আক্রমণের সুযোগ নিয়ে মারাঠা সেনানায়ক শিবভট্ট কটক আক্রমণ করেন এবং পরে মেদিনীপুর জয় করেন। মীরজাফর ইংরেজ সৈন্যদের সাহায্যে রাজ্য থেকে মারাঠাদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হন। অপর দিকে পূর্ণিয়ার নাজির খাদিম হোসেনও বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। নবাবের সৈন্যদের নিকট পরাজিত হয়ে তিনি আত্মগোপন করেন। কিন্তু এই সামরিক অভিযানের সময়ই অকস্মাৎ বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হয়।

(৭) মীরজাফরের অন্যান্য সমস্যা

১৭৫৯ ও ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের মোগল, মারাঠা ও খাদিম হোসেনের তিনটি আক্রমণই মীরজাফর ইংরেজদের সহায়তায় দমন করতে সমর্থ হন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই আর একটি নতুন সমস্যার সৃষ্টি হ'ল। ইংরেজ ও ফরাসীদের মতো ওলন্দাজরাও বাংলাদেশে বাণিজ্য করত এবং হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ায় তাদের বাণিজ্যকুঠি ছিল। মীরজাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ায় ওলন্দাজরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং মীরজাফরের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা দেখাতে আপত্তি করে। নবাব ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের নিকট সেজন্য জবাবদিহি করেন। কিন্তু তারা ত্রুটি স্বীকার না করে লম্বা এক দাবি-দাওয়ার ফর্দ পেশ করে। ক্লাইভের পরামর্শে নবাব

ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করার পরওয়ানা জারী করেন এবং তখন বাধ্য হয়ে ওলন্দাজরা মীরজাফরকে প্রাপ্য সম্মান দিতে শুরু করে।

এই ঘটনার পর ওলন্দাজদের সহিত নবাবের বিরোধের নিষ্পত্তি হলেও ইংরেজদের সহিত তাদের গোলমাল মিটল না। মীরজাফরের সিংহাসন লাভের পর থেকেই ইংরেজদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা ক্রমেই বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ওলন্দাজদের খুব ক্ষতি হতে শুরু করে। উপায়ান্তর না দেখে ওলন্দাজরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা স্থির করে এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র মালয় থেকে বহু সৈন্য আনার ব্যবস্থা করে। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২১শে নভেম্বর ওলন্দাজরা যুদ্ধের জন্য ৭০০ ইয়োরোপীয় এবং প্রায় ৮০০ মালয় সৈন্য জলপথে আনয়ন করতে সমর্থ হয়। ক্লাইভ এই সংবাদ পেয়েই জেনারেল ফোর্ডের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝখানে বেদারা নামক স্থানে দুদলে যুদ্ধ হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ওলন্দাজরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। অনেকে মনে করেন যে, মীরজাফরের গোপন সম্মতি পেয়েই ওলন্দাজরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হতে সাহসী হয়ে ওঠে এবং ইংরেজদের একাধিপত্য খর্ব করার উদ্দেশ্যেই মীরজাফর ওলন্দাজদের সহিত সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু এই মত প্রমাণ করার কোন উপযুক্ত তথ্য আজ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া যায় নি।

(৮) মীরজাফরের বিরুদ্ধে ইংরেজদের ষড়যন্ত্র

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে ইংরেজগণ মীরজাফরকে মসনদে অভিষিক্ত করলেও তাঁর অযোগ্যতা ও অকর্মণ্যতার জন্য ইংরেজ কোম্পানী মীরজাফরের প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। বিশেষতঃ দক্ষ প্রশাসক ও নবাবের প্রধান পরামর্শদাতা মীরনের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে মীরজাফরের শাসনযন্ত্র আরও বিকল হয়ে পড়ে। ইংরেজরা এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে নবাবের উপর তাঁদের আধিপত্য আরও কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। যদিও মীরজাফর ইংরেজ কর্মচারীদের ও কোম্পানীকে বহু অর্থ দেন তথাপি তাঁদের দাবি মিটল না। ওদিকে মুর্শিদাবাদের রাজকোষ একেবারে শূন্য। সুতরাং মীরজাফরের আর টাকা দেওয়ার সামর্থ্য ছিল না। নতুন ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট প্রস্তাব করেন যে, চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজদের ইজারা দেওয়া হোক। কিন্তু মীরজাফর এই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি হলেন না। ফলে ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফরের বিরোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। অপরদিকে

মীরনের মৃত্যুর পর মীরজাফরের উত্তরাধিকারীর প্রশ্নও জটিল হয়ে ওঠে। মীরজাফরের জামাতা মীরকাশিম এবং মীরনের পুত্র উভয়ই নবাবী পদ দাবি করতে শুরু করেন। ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট মীরকাশিমের পক্ষ অবলম্বন করেন কারণ তাঁর ধারণা হয় যে অর্থবান্ মীরকাশিমের নিকট থেকে ইংরেজদের পক্ষে অনেক টাকা-পয়সা লাভ করা সম্ভব। কিছুদিন পরে মীরকাশিম ও ইংরেজদের মধ্যে এই মর্মে একটি চুক্তি সম্পন্ন হয় যে, মীরজাফর নামে নবাব থাকবেন, কিন্তু মীরকাশিম নায়েব সুবাদার হবেন এবং শাসন-সংক্রান্ত সকল বিষয়েই তাঁর পুরোপুরি কর্তৃত্ব থাকবে। ইংরেজরা প্রয়োজন হলে মীরকাশিমকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন এবং এই সৈন্যবাহিনীর ব্যয়ের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চটগ্রাম জেলা তিনি ইংরেজদের 'ইজারা বন্দোবস্ত' করে দেবেন। ইংরেজদের প্রাপ্য টাকা কিস্তিবন্দী করে শোধ করা হবে।

কলকাতার কাউন্সিল মীরজাফরকে এই সন্ধির শর্ত স্বীকার করার জন্য গভর্নর ভ্যান্‌সিটার্ট ও সৈন্যাধ্যক্ষ ক্যাইলোডকে একদল সৈন্যসহ মুর্শিদাবাদে পাঠায়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ভ্যান্‌সিটার্ট নবাব মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করে মীরকাশিমের সহিত সন্ধি অনুযায়ী বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু মীরজাফর কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। পাঁচদিন ধরে উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যর্থ আলোচনার পর ২০শে অক্টোবর ক্যাইলোড ও মীরকাশিম একদল সৈন্যসহ নবাবের প্রাসাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে গভর্নরের পত্র নবাবের নিকট পাঠান। এই পত্রে লিখিত ছিল, "আপনার বর্তমান পরামর্শদাতাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে অচিরেই আপনার ও কোম্পানীর সর্বনাশ হবে। দু-তিনটি লোকের জন্য আমাদের উভয়ের এরূপ সর্বনাশ বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং আমি ক্যাপটেন ক্যাইলোডকে পাঠাচ্ছি তিনি আপনার কুপরামর্শদাতাদের তাড়িয়ে রাজ্যশাসনের সুবন্দোবস্ত করবেন।"

নবাব এই চিঠি পেয়ে ভীষণ ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হন এবং ইংরেজদের বাধাদানের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই তিনি মীরকাশিমকে নবাবী পদ গ্রহণ করতে আহ্বান করেন। তারপর তিনি ক্যাইলোডকে তার জীবন রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। এই কথার উত্তরে ভ্যান্‌সিটার্ট বলেন যে, শুধু তাঁর জীবন কেন, তিনি ইচ্ছা করলে তার রাজ্যও নিরাপদ রাখতে পারেন, কারণ তাঁকে রাজ্যচ্যুত করার কোন অভিসন্ধি তাঁদের নেই। মীরজাফর বললেন, "আমার রাজ্যের শখ মিটেছে। আর এখানে থাকলে মীরকাশিমের হাতে আমার জীবন বিপন্ন হবে, সুতরাং কলকাতায় বাসের ব্যবস্থা করলে আমি সুখে-শান্তিতে থাকতে পারব।" ২২শে

অক্টোবর মীরজাফর একদল সৈন্য পরিবৃত হয়ে কলকাতায় যাত্রা করেন। মীরকাশিম বাংলাদেশের মসনদে উপবেশন করেন।

মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের বিরোধ শুরু হলে ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজগণ পুনরায় মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

(৯) উপসংহার

নবাব মীরজাফর যে অযোগ্য ও অপদার্থ ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ইংরেজদের কর্মতৎপরতার ফলেই মীরজাফরের অযোগ্যতা আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। 'নবাব পরিবর্তন' ইংরেজদের কাছে একটি লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ইংরেজরা মীরজাফরের পরিবর্তে মীরকাশিমকে সিংহাসন দানের ব্যবস্থা করেন। ঐ যুগের বাংলাদেশের ইতিহাসে ইংরেজদের এইরূপ স্বার্থলোলুপতা ইংরেজ জাতির চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করেছে, সন্দেহ নেই। 'মানবতা' ও 'ঈশ্বরের' নামে শপথ করে তাঁরা মীরজাফরকে বাংলাদেশের মসনদে স্থাপন করেন এবং তাঁকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হয়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে তারা কুণ্ঠাবোধ করেন নি। এই সময়ের ইংরেজদের নীচ স্বার্থপরতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে স্যার আলফ্রেড লায়েল বলেন যে, এই স্বার্থপরতা ইংরেজ নামে কলঙ্ক লেপন করে। তিনি বলেন, "The only period of Anglo-Indian history which throws grave and unpardonable discredit on the English name."

Q 8. *Analyse the causes and consequences of the battle of Bidderah (1759).*

উত্তর ঃ (১) মীরজাফরের সঙ্গে ওলন্দাজদের সম্পর্ক

ইংরেজ ও ফরাসীদের ন্যায় ওলন্দাজরাও বাংলাদেশে বাণিজ্য করত এবং হুগলীর নিকটবর্তী চুঁচুড়ায় তাদের বাণিজ্যকুঠি ছিল। মীরজাফরকে নবাবী পদে প্রতিষ্ঠিত করে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাওয়ায় ওলন্দাজ বণিকগন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয় এবং নবাবের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদা প্রদর্শন করতে অস্বীকার করে। ওলন্দাজদের ব্যবহারে নবাব অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তাদের নিকট জবাবদিহি করেন। কিন্তু তারা তাদের ত্রুটি স্বীকার না করে লম্বা এক দাবি-দাওয়ার ফর্দ পেশ করে। কর্নেল ক্লাইভের পরামর্শে নবাব ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ করার পরওয়ানা জারী করার সঙ্গে সঙ্গেই ওলন্দাজরা মীরজাফরের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে বাধ্য হয়।

(২) ইংরেজদের সঙ্গে ওলন্দাজদের সম্পর্ক

ওলন্দাজ বণিকরা মীরজাফরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার পর নবাবের সহিত ওলন্দাজদের বিরোধের অবসান হলেও ইংরেজদের সহিত ওলন্দাজদের গোলমাল মিটল না। মীরজাফরের সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব থেকেই ইংরেজরা বাংলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার সুযোগ ভোগ করতেন, তারপর মীরজাফরের কাছ থেকে তাঁরা আরও কতগুলো বাণিজ্যিক সুযোগ লাভ করেন। এইসব সুযোগের ফলে তাঁরা ওলন্দাজদের যত জাহাজ গঙ্গা নদী দিয়ে যেত, ইংরেজরা তা খানাতল্লাসী করার সুযোগ পান এবং ইংরেজ ভিন্ন অন্য কোন জাতির লোককে চালক নিযুক্ত করতে দিতে সম্মত হতেন না। ফলে ওলন্দাজদের বাণিজ্য অনেক পরিমাণে কমে যায় এবং তারা নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। উপায়ান্তর না দেখে ওলন্দাজগণ ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করা স্থির করে এবং এই উদ্দেশ্যে তাদের শক্তির প্রধান কেন্দ্র বাটাভিয়া থেকে যুদ্ধজাহাজ ও মালয় সৈন্য আমদানি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে ইয়োরোপীয় ও মালয় সৈন্য বোঝাই ছ-সাতখানি জাহাজ গঙ্গায় পৌছায়। মীরজাফর তখন কলকাতায় ছিলেন। তিনি ওলন্দাজদের সৈন্য আমদানির সংবাদে ভীত হয়ে বাংলাদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করার জন্য ইংরেজদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কিন্তু নবাবের এই প্রস্তাবে ইংরেজরা সম্মত হলেন না। কারণ, তখন ইয়োরোপে ইংলণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডের মধ্যে শান্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। ফলে কলকাতার ইংরেজদের পক্ষে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা অসম্ভব ছিল। কিন্তু ওলন্দাজগণ যাতে ইংরেজদের বিরোধিতা না করে সেজন্য তাঁরা নবাবকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। ইংরেজদের পরামর্শ অনুসারে নবাব মীরজাফর কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ প্রত্যাবর্তনের পথে হুগলী ও চুঁচুড়ার মাঝামাঝি এক জায়গায় দরবারের আয়োজন করেন এবং এই দরবারে ওলন্দাজদের উপস্থিত হতে নির্দেশ দেন। দরবারে ওলন্দাজ বাণিজ্য কুঠির কর্তৃপক্ষ নবাবকে বুঝাবার চেষ্টা করেন যে, তার দুর্বলতা ও দেশের দুর্দশার একমাত্র কারণ ইংরেজ বণিকগণ ও তাঁদের কার্যকলাপ, সুতরাং নবাবের অনুগ্রহ ও নির্দেশ পেলে তাঁরা নবাবকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের কথা শুনে মীরজাফর সরাসরি কোন উত্তর না দেওয়ায় তাদের ধারণা হয় যে, নবাব তাদের প্রস্তাবে সম্মত, সুতরাং তাঁরা নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন যে বিনা বাধায় নবাব যেন তাদের সৈন্যদের আসতে দেন এবং ইংরেজরা যাতে কোনরূপ বাধা না দেয় তারও যেন তিনি ব্যবস্থা করেন। কিন্তু নবাব তাঁদের এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলে তাঁরা নবাবকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিদেশাগত সৈন্য বোঝাই জাহাজগুলো অবিলম্বে ফেরৎ পাঠানো

হবে। ওলন্দাজদের কথা শুনে নবাব অনেকটা আশ্বস্ত হলেন এবং ওলন্দাজ কর্তৃপক্ষের প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করেন এবং তাঁদের বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু নবাবের মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্তনের পর ওলন্দাজ বণিকগণ তাঁর কথা অগ্রাহ্য করেই সৈন্য বোঝাই জাহাজ গঙ্গায় আনার ব্যবস্থা করেন এবং নতুন সংগ্রহের দিকেও মনোনিবেশ করেন।

(৩) ইংরেজদের মনোভাব

চুঁচুড়ার নিকটে দরবারের আয়োজন এবং ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে মীরজাফরের আলাপ-আলোচনার জন্য ইংরেজদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাদের ধারণা হয় যে, নবাব গোপনে গোপনে ওলন্দাজদের সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছেন। ইংরেজদের অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে, নবাবই গোপনে ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে সৈন্য আনার ব্যবস্থা করেছেন। ক্লাইভও নবাবকে এক কড়া চিঠি লিখলেন যে, ওলন্দাজের সহিত মিত্রতা করলে ভবিষ্যতে তিনি মীরজাফরের সহিত কোন সম্পর্ক রাখবেন না। নবাব এই চিঠির প্রতিবাদে ক্লাইভকে জানালেন যে, ইংরেজদের সহিত বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে তিনি সর্বদাই প্রস্তুত আছেন। ক্লাইভ তখন তাঁকে সসৈন্যে কলকাতা এসে ইংরেজদের সহিত মিলিত হতে আমন্ত্রণ করেন। এই চিঠির উত্তরে নবাব তাঁকে লিখে জানালেন যে, কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ যাতায়াতের ফলে তিনি বড়ই ক্লান্ত, সুতরাং তিনি নিজে না গিয়ে পুত্রকে কলকাতায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

(৪) নবাবের দুর্বলতা

ইতিমধ্যে ওলন্দাজরা ইংরেজদের আটখানি জাহাজ আটক করেন এবং ফলতায় নেমে ইংরেজদের নিশান ছিঁড়ে ফেলে ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। স্বাভাবিকভাবেই ক্লাইভ মনে করলেন যে, নবাবের সহায়তা না থাকলে ওলন্দাজগণ এতদূর সাহসী হোত না। সুতরাং তিনি নবাবকে লিখলেন যে, তাঁর পুত্রকে অথবা সৈন্যদের কলকাতায় পাঠাবার প্রয়োজন নেই, কিন্তু তিনি যদি সত্যসত্যই ইংরেজদের বন্ধু হন তবে ওলন্দাজদের যতদূর সম্ভব অনিষ্ট করবেন। তিনি তখন বিহারের শাসনকর্তা রাম-নারায়ণকে ওলন্দাজদের পাটনার বাণিজ্যকুঠি অবরোধ করতে এবং তাদের উপর নানাভাবে উৎপীড়ন করতে আদেশ দেন। নবাবের পরামর্শদাতাদের অনেকেই তাঁকে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তাঁদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করেন নি। এমনকি, হুগলীতে ওলন্দাজদের বাণিজ্য বন্ধ

করার জন্য তিনি স্থানীয় ফৌজদারের নিকট একখানা পরওয়ানা পাঠান। ওলন্দাজদের প্রতি নবাবের কঠোর মনোভাব জানার পর কালবিলম্ব না করে ইংরেজরা বরাহনগরের বাণিজ্যকুঠি অধিকার করেন। ওলন্দাজরা ইংরেজদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের কথা জানিয়ে নবাব মীরজাফরের নিকট নালিশ করেন। কিন্তু নবাব ওলন্দাজ বণিকদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রস্তুত ছিলেন না।

(৫) ইংরেজ-ওলন্দাজ যুদ্ধ

নবাবের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ হয়ে এবং নিজেদের বাণিজ্য-স্বার্থ বিপন্ন মনে করে ওলন্দাজ-বণিকগণ আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হন। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২১শে নভেম্বর তাঁরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে সাতশ ইয়োরোপীয় এবং আটশ মালয় সৈন্য জাহাজ হতে অবতরণ করার ব্যবস্থা করেন। কর্নেল ক্লাইভ ওলন্দাজদের যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা জানতে পেরে অবিলম্বে জেনারেল ফোর্ডের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। চন্দননগর ও চুঁচুড়ার মাঝখানে বেদারা নামক স্থানে উভয় দলে যুদ্ধ হয় এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ওলন্দাজরা এই যুদ্ধে পরাজিত হন।

(৬) সমালোচনা

তৎকালীন ইংরেজদের মধ্যে প্রায় সকলেরই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, মীরজাফর ওলন্দাজদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করেন। এই মতের সপক্ষে প্রধান দুটি যুক্তি প্রদর্শন করা যায়। প্রথমতঃ, মীরজাফরের সহায়তায় ভরসা না থাকলে তাঁরা কখনও ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করতে ভরসা পেত না এবং ওলন্দাজ কোম্পানী তাদের কর্তৃপক্ষের নিকট চিঠিতে স্পষ্টই এই সাহায্যলাভের সম্ভাবনার কথা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয়তঃ, মীরজাফরের দরবারের একদল অমাত্য যে ওলন্দাজদের সাহায্যে বাংলাদেশের ইংরেজদের প্রভাব খর্ব করে নবাবের স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার ব্যবস্থা করতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিলেন এবং এই দলে যে মীরন, রামনারায়ণ প্রভৃতি ছিলেন, তখন তা মনে করারও যথেষ্ট কারণ আছে।

মীরজাফরের সপক্ষেও দুটি প্রবল যুক্তি আছে। প্রথমতঃ, সন্দেহে থাকলেও ইংরেজরা মীরজাফরের বিরুদ্ধে কোন নিশ্চিত প্রমাণ পায় নি। যদি কোন নিশ্চিত প্রমাণ ইংরেজরা পেত তাহলে মীরজাফরের প্রতি তাঁদের ব্যবহার অন্যরূপ হোত। দ্বিতীয়তঃ, ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর, অর্থাৎ সৈন্য বোঝাই ওলন্দাজ জাহাজগুলো

বাংলাদেশে পৌঁছাবার পর, কলকাতার কাউন্সিল ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়ে চিঠিতে জানিয়ে দেন এবং সেই চিঠিতে তাঁরা একথাও লেখেন যে নবাব মীরজাফর এই বিষয়ে কিছু জানতেন না এবং তিনি ওলন্দাজদের ব্যবহারে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

কোন কোন ইংরেজ লিখেছেন যে, মীরজাফর রাজা রাজবল্লভের সাহায্যে ওলন্দাজদের সহিত গোপনে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। আবার অনেক ইংরেজদের এইরূপ ধারণাও ছিল যে, মহারাজ নন্দকুমারের এই চক্রান্তের সহিত যুক্ত ছিলেন। তবে এইসব মতামত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সুতরাং এই সম্পর্কে আলোচনাও অপ্রয়োজনীয়।

বেদারার যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ওলন্দাজদের শক্তি সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে। ভবিষ্যতে ইংরেজদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কোন সুযোগই তাদের আর ছিল না। ফলে নিরঙ্কুশভাবে ইংরেজগণ বাংলাদেশে তাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার সুযোগ লাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে নবাব-সিরাজ উদ্‌দৌলা চন্দননগরের ফরাসীদের সাহায্য না করে যে ভুল করেন তার পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতে হল সিংহাসন ও প্রাণ বিসর্জন দিয়ে। চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের সাহায্য না করেও মীরজাফর তেমনই ভুল করলেন যার ফলে ইংরেজরা তখন থেকে বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিঃশঙ্ক চিত্তে যে-কোন পরিবর্তন আনয়ন করতে সমর্থ হওয়ার সুযোগ পান।

Q 9. *Trace the progress of the English power in Bengal under the first administration of Mir Jafar. Was it the result of any conscious drive of the English ?*

উত্তরঃ (১) ভূমিকা

সিংহাসনে আরোহণের পর নবাব মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে যে চুক্তি সম্পাদন করতে বাধ্য হন তার ফলেই ইংরেজরা বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হন। মীরজাফরের নতুন চুক্তি এবং পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল ইংরেজ শক্তিকে বাংলাদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করার পথ সুগম করে দেয়। এই প্রসঙ্গে রবার্ট ক্লাইভের একটি স্বীকারোক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ পার্লিয়ামেন্টের তদন্তকমিটির সদস্যদের নিকট পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলার পরাজয়ের ফলাফল খুব অল্প কথায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন, "একবার বিবেচনা করে দেখুন, পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের পর আমি কিরূপ স্থান অধিকার করার সুযোগ পাই। একজন শক্তিশালী শাসক আমার অনুগ্রহপ্রার্থী, একটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত নগরী আমার দয়ার উপর নির্ভরশীল, রাজ্যের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী

শেঠগণ আমার হাসিমুখ দেখার সৌভাগ্য অর্জনের জন্য পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ; নবাবের কোষাগার একমাত্র আমার কাছেই উন্মুক্ত হোল—ভূগর্ভস্থ কোষাগারের উভয় পার্শ্বস্থ স্তূপীকৃত স্বর্ণপিণ্ড ও অন্যান্য মণিমুক্তার মধ্য দিয়ে আমি পায়চারী করে বেড়িয়ে এলাম মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমার সে সময়ে সংযমের কথা ভেবে এখনও আমি বিস্মিত বোধ করছি।”

(২) অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ

প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার লাভ করে। পলাশীর যুদ্ধ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে নয়, ইংরেজ জাতির পক্ষেও অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয় ও পতনের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতিতে ও অর্থনীতিতে যে সুদূর-প্রসারী পরিবর্তন দেখা দেয় তার ফলাফল শুধু মাত্র বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অনতিবিলম্বেই সমগ্র ভারতবর্ষের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ লাভ করে। বিদেশী বণিকদের নিষ্ঠুর শোষণের ফলে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানারূপ জটিল ও শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অপরদিকে সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের ফলে ভারতের রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি মীরজাফর আলি খান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রিত নবাব রূপে পরিগণিত হওয়ার ফলে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ জাতির কর্তৃত্ব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়।

সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করার বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা প্রচুর পরিমাণ অর্থ. অন্য নানারূপ সুযোগ-সুবিধা ও মূল্যবান্ নানাপ্রকার উপঢৌকন লাভ করেন। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরের নিকট থেকে দুকোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা আদায় করে। ফোর্ট উইলিয়মের কাউন্সিলের সদস্যগণও প্রচুর অর্থ পুরস্কার হিসাবে লাভ করেন। পলাশীর যুদ্ধ এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের ফলে ইংরেজগণ যে অর্থলাভ করেন ইংলণ্ডের রাজনীতিতেও তার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। অপরদিকে ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পায়। কোম্পানীর প্রাপ্য অংশ হিসাবে কলকাতার কোষাগারে এই সময় যে পরিমাণ অর্থ জমা পড়ে. বাইরের থেকে এক আউন্স রৌপ্য বা স্বর্ণপিণ্ড আমদানি না

করেও পূর্বাঞ্চলের দেশগুলোর সহিত প্রায় একাদিক্রমে তিন বছর বাণিজ্য পরিচালনা করার সুযোগ পায়।

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার কার্যকলাপ ও পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রকৃত অর্থক্ষতির তুলনায় তারা যথেষ্ট বেশি পরিমাণ অর্থ লাভ করতে সমর্থ হয় এবং কোম্পানীর এই উদ্বৃত্ত অর্থ শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের অন্যান্যস্থানে ব্যবসা-বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে এবং যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যয় করতে সমর্থ হয়। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের ইংরেজদের বাণিজ্যের চুয়াত্তর শতাংশ ইংলণ্ড থেকে আমদানিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ডের সাহায্যে পরিচালিত হোত, কিন্তু এই যুদ্ধের পরবর্তীকালে কোম্পানীর পক্ষ থেকে এই দেশ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ড আমদানি করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয়। অপরদিকে এই যুদ্ধের পর থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্য, ভারতের অন্যান্য স্থানে, এমন কি চীনদেশেও রপ্তানি করতে শুরু করে। কোম্পানীর এই নীতির ফলে বাংলাদেশের প্রচুর অর্থ দেশ থেকে বাইরে চলে যায় এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় আকার ধারণ করে।

তা ছাড়া, ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া শোরার ব্যবসা পরিচালনা করার অধিকার লাভ করে এবং ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এক শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ইংরেজরা শোরারের দামও হ্রাস করার ব্যবস্থা করে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতি বছর এক লক্ষ মণ শোরা ক্রয় করত এবং শোরার মূল্য হ্রাসের ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের প্রতি বছর প্রচুর লোকসান স্বীকার করতে হোত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আফিম ও লবণের ব্যবসার উপরও একচেটিয়া অধিকার লাভ করে এবং ফলে ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাকশাল স্থাপনের ফলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। দস্তকের অপব্যবহারের ফলে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজয়ের ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় তারা তাদের অর্থনৈতিক শোষণযন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করে তোলার সুবিধা লাভ করে।

(৩) রাজনৈতিক অনুপ্রবেশ

সিংহাসনে আরোহণের পর নবাব মীরজাফর আলিখান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দুকোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যতীত কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের উপহারস্বরূপ নগদ পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা দেন। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট

ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে ২৪ পরগণা জেলার এক বিশাল জমিদারী নবাবের কাছ থেকে লাভ করেন। ১৭৬১-৬২ খ্রীস্টাব্দে এই জমিদারী থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। তা ছাড়া, কলকাতার পূর্বপার্শ্বস্থ মারাঠা ডিচের সংলগ্ন ভূ-ভাগ এবং অন্যান্য জমিদারদের বেশ কিছু ভূ সম্পত্তির উপর ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ দেওয়া হয়। অপর দিকে কলকাতার দক্ষিণে অবস্থিত কুলপী পর্যন্ত অঞ্চলও ইংরেজদের জমিদারীতে পরিণত করা হয়। হুগলী শহরের নীচের দিকে গঙ্গানদীর তীরে নবাব কোনরূপ দুর্গ নির্মাণ করার অধিকারও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। নবাবের এই সব প্রতিশ্রুতির ফলে ইংরেজদের শক্তি বৃদ্ধির পথ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দের বাদশাহ ফারুখ-সিয়ারের ফরমান অনুযায়ী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে সকল সুবিধা এত দিন পর্যন্ত লাভ করার চেষ্টা করছিল কিন্তু বাংলার নবাবদের বিরোধিতার জন্য লাভ করা সম্ভব হয় নি, মীরজাফরের অনুগ্রহে তারা তাদের ঐ সনদের দাবি সহজেই বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ পায়। মীরজাফরের কার্যকলাপের ফলে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এক বিরাট অঞ্চল ইংরেজদের জমিদারীতে পরিণত হয় এবং এই জমিদারীর উপর নবাবের কর্তৃত্বের পরিবর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আধিপত্য স্থাপিত হয়। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি সার্বভৌম শক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং বিদেশী এই বাণিজ্য সংস্থায় নবাবের কোন কর্তৃত্বই আর অবশিষ্ট রইল না।

প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের রাজনৈতিক ফলাফলও অর্থনৈতিক ফলাফলের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতা বাস্তব ক্ষেত্রে মীরজাফরের পরিবর্তে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত করা হয়, মীরজাফর ধীরে ধীরে অধিকারহীন ও দায়িত্বহীন সিংহাসনের একজন নামেমাত্র অধিকারীরূপে পরিগণিত হন। দেশের শক্তিশালী ভূস্বামীগণ মীরজাফরের পরিবর্তে ক্লাইভের অনুগত ছিলেন। রবার্ট ক্লাইভই বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতি পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এমন কি, মীরজাফরের জন্য তিনিই বাদশাহের সনদ আদায় করার ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ নবাবের কর্মচারিদের অনেক ক্ষমতা ও অধিকার অবৈধভাবে আত্মসাৎ করেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের এই সকল অবৈধ ও অসঙ্গত কার্যকলাপ দেশের রাজনৈতিক দিক থেকেও যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করে। নবাবের কর্মচারীরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের নির্দেশ পালন করতে অস্বীকৃত হলে অনিবার্যভাবেই তাঁরা প্রচণ্ড বাধা ও নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হতে বাধ্য হন। পলাশীর যুদ্ধের

পরই কোম্পানীর কর্মচারীদের উপর নবাবের কর্মচারীদের ক্ষমতা প্রয়োগের সকল অধিকার সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়ে যায়। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির ব্যাপারেও ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিল নবাবের উপর প্রভূত ক্ষমতা বিস্তার করার সুযোগ লাভ করে এবং নবাব ধীরে ধীরে বিদেশীদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। বাস্তবিক পক্ষে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন পদ্ধতির মৌলিক ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী-কালের বাংলাদেশের শাসনক্ষেত্রে সবপ্রথম দেখা দিতে শুরু করে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রূপান্তর ঘটে এবং বণিকের মানদণ্ড সকলের অজ্ঞাতসারে রাজদণ্ড রূপে দেখা দেওয়ার সুযোগ পায়। এই প্রসঙ্গে এডমণ্ড বার্কের উক্তি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়, "The East India Company did not seem to merely a company formed for the extension of the British commerce, but in reality a delegation of whole power and sovereignty of this kingdom sent into the East" মীরজাফরের আমলে ইংরেজ বণিকদের এই নগ্নরূপ সুস্পষ্ট-ভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে।

Q. 10 *"The sponsored state became a plundered state." (Spear) Examine the statement in the light of the consequence of the battle of plassey in Bengal.*

উত্তর : (১) ভূমিকা

পলাশীর যুদ্ধ শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে নয়, ইংরেজ জাতির পক্ষেও অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয় ও পতনের ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সুদূর প্রসারী পরিবর্তন দেখা দেয় তার ফলাফল শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে অনতিবিলম্বেই সমগ্র ভারতের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ লাভ করে। বিদেশী বণিকদের নিষ্ঠুর শোষণের ফলে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে নানারূপ জটিল ও শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অপরদিকে সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয় ও সিংহাসনচ্যুতির ফলে ভারতের রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি মীরজাফর খান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রিত নবাব রূপে পরিগণিত হওয়ার ফলে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ জাতির কর্তৃত্ব বিস্তারের পথ উন্মুক্ত হয়।

(২) অর্থনৈতিক মুনাফা

সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁকে সিংহাসনে স্থাপনের বিনিময়ে

মীরজাফর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তাঁর কর্মচারীদের এবং তাঁর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের প্রচুর পরিমাণ অর্থ ও অন্যান্য নানারূপ সুযোগ-সুবিধা ও মূল্যবান্ নানাপ্রকার উপঢৌকন প্রদান করতে স্বীকৃত হন। ১৭৫৮ থেকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরের নিকট থেকে দুকোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা আদায় করে। রবার্ট ক্লাইভের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, রাজকোষে ঐ পরিমাণ অর্থ সঞ্চিত না থাকার জন্য জগৎশেঠের মধ্যস্থতায় স্থির হয় যে, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসের শেষ তারিখে এক কোটি তের লক্ষ টাকা ইংরেজদের দেওয়া হবে এবং অবশিষ্ট অর্থ তিন বছরে সমান কিস্তিতে পরিশোধ করা হবে। অপরদিকে ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রেও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ লাভ করে। এই সময় থেকেই কোম্পানী অন্য কোন স্থান থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড আমদানি না করেও বাংলাদেশে আদায়ীকৃত অর্থের সাহায্যেই পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। পরবর্তীকালে বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজয়ের ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরেজদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে অর্থনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধির পথ আরও সুগম হয়ে ওঠে। বাংলাদেশ থেকে আদায়ীকৃত অর্থের একটি বিরাট অংশ ইংলণ্ডে নানাভাবে সঞ্চিত হওয়ার ফলে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক জগতেও এই অর্থের প্রভাব গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। অপরদিকে সিংহাসনে আরোহণের পর নবাব মীরজাফর আলি খান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দুকোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যতীত কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপহারস্বরূপ নগদ পাঁচ লক্ষ সাতাশি হাজার টাকা দেন। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ব্যক্তিগতভাবে এক বিশাল জমিদারী নবাবের কাছ থেকে লাভ করেন। ১৭৬১-১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে এই জমিদারী থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকা।

(৩) অন্যায়ভাবে অর্থোপার্জন

পলাশীর যুদ্ধের পরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের অদৃষ্ট পরিবর্তনের শুভলগ্ন উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের মসনদে নতুন নবাব স্থাপন এবং পুরাতন নবাব বিতাড়নের অভূতপূর্ব ব্যবসার মাধ্যমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রচুর অর্থ লাভ করতে সমর্থ হয়। মীরজাফর ও তাঁর পরবর্তী নবাবগণ সিংহাসন লাভের দক্ষিণা স্বরূপ কোম্পানীকে ২১,৬৯,৬৬৫

পাউণ্ড উপহার দান করতে বাধ্য হন। এই প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যতীত ঐ একই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর কর্মচারীরা আরও ১০,৭৩১,৬৮৩ পাউণ্ড আদায় করতে সমর্থ হয়। যার মধ্যে ছিল নবাবের কাছ থেকে পাওয়া নগদ ৩,৭৭০,৮৮৩ পাউণ্ড এবং নবাবের নিকট থেকে প্রাপ্ত জায়গীরের রাজস্ব ৬,৯৬০,৮০০ পাউণ্ড।

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার কার্যকলাপ ও পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রকৃত ক্ষয়-ক্ষতির তুলনায় তারা যথেষ্ট বেশি পরিমাণে অর্থ লাভ করতে সমর্থ হয় এবং কোম্পানীর এই উদ্বৃত্ত অর্থ শুধু বাংলাদেশে নয়, ভারতের অন্যান্য স্থানে, এমন কি চীনদেশেও ব্যবসা বাণিজ্য-সংক্রান্ত বিষয়ে ও যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যয় করতে সমর্থ হয়। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে বাংলাদেশের ইংরেজদের বাণিজ্যের চুয়াত্তর শতাংশ ইংলণ্ড থেকে আমদানিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ডের সাহায্যে পরিচালিত হয়। কিন্তু এই যুদ্ধের পরবর্তীকালে কোম্পানীর পক্ষ থেকে ঐ দেশ হতে স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড আমদানি করা সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করা হয়। অপরদিকে এই যুদ্ধের পর থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড ভারতের অন্যান্য স্থানে, এমন কি চীনদেশেও রপ্তানি করতে শুরু করে। কোম্পানীর এই নীতির ফলে বাংলাদেশের প্রচুর অর্থ দেশ থেকে বাইরে চলে যায় এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় আকার ধারণ করে। বাংলাদেশের আমদানিকৃত ও রপ্তানিকৃত স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মূল্যের পরিমাণ বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের অর্থ নির্গমনের যথাযথ হিসাব নিরূপণ করা সম্ভব। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই দশ বছরে বাংলাদেশে রপ্তানিকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ৬৪,৮৫,৮৩১ পাউণ্ড এবং আমদানিকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল ১৪, ০১, ২৮৬ পাউণ্ড। সুতরাং এই সময়ে রপ্তানিকৃত অর্থের সহিত আমদানিকৃত অর্থের মোট পার্থক্য ছিল ৫০,৮৪,৫৪৫ পাউণ্ড।

(৪) বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া শোরার ব্যবসা পরিচালনা করার অধিকার লাভ করে, ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এক শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। ইংরেজ বণিকরা শোরার ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার লাভের পর শোরার মূল্য ৬ টাকা ১২ আনা ৬ পাই থেকে ৩ টাকা ১২ আনায় পরিণত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতি বছর এক লক্ষ মণ শোরা ক্রয় করত এবং শোরার মূল্য হ্রাসের ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের প্রতি বছর একাত্তর হাজার আটশ পঁচাত্তর টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আফিম ও লবণের ব্যবসায়েরও একচেটিয়া অধিকার লাভ করে এবং ফলে ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হতে শুরু করে।

(৫) টাকশাল নির্মাণ

কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাকশাল স্থাপনের ফলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। প্রতি বছর কোম্পানী এই টাকশাল থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা তৈরি করে মুদ্রামূল্যের উপর মোট সাত শতাংশ লাভ করার সুযোগ পায়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ এই কয় বছরের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে শোরা, লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা পরিচালনা এবং মুদ্রা তৈরির সুযোগ পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতির মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৮৫,৮১০ পাউণ্ড। তা ছাড়া, পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। বাংলাদেশের সিংহাসনে ইংরেজদের আশ্রিত নবাবদের নিকট থেকে উপহার স্বরূপ প্রচুর অর্থ ও ভূ-সম্পত্তি লাভ করে কর্মচারীরা কোম্পানীর যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের মালিকে পরিণত হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে সেই অর্থ লগ্নী করে লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করার আরও সুযোগ পায়। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার বাণিজ্য-নীতির পরিবর্তন করে এবং রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ ও ক্রয় এবং আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের জন্য দাদন দেওয়ার নীতির পরিবর্তন করে নিজস্ব এজেণ্ট নিযুক্ত করতে শুরু করে। কোম্পানীর পক্ষ থেকে এরূপ নীতি গ্রহণের ফলে কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য কোম্পানীর দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহার শুরু করে। মিস্টার ভ্যান্সিটার্টের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, মোটামুটিভাবে নবাবের হিসাব অনুসারে দস্তকের অপব্যবহার ও বিনা শুল্কে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে পণ্যদ্রব্যের চলাচলের ফলে রাজ্যের রাজস্বের প্রতি বছর পঁচিশ লক্ষ টাকা ক্ষতি হ'ত।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর আধিপত্য স্থাপনের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের পণ্যদ্রব্যও অসঙ্গত মূল্যে বিক্রয় করার ব্যবস্থা করে এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রায় জোর করেই তাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে বাধ্য করে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের কর্মচারীদের অন্যায় এবং অসৎ ব্যবসায় সম্পর্কে সকল তথ্যই সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় এবং এইসব কর্মচারীদের আচার-আচরণ, রীতি-নীতির পরিবর্তন সাধনে যত্নবান হন এবং ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা অত্যন্ত অসহায়ভাবে মন্তব্য করেন, "দস্তকের অপব্যবহার দূর করার উদ্দেশ্যে প্রতিটি সংস্কারমূলক ব্যবস্থাই দস্তকের অপব্যবহারের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেছে এবং দেশের জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট আরও বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করেছে।" ইংরেজ কর্মচারীদের দুর্নীতি দেখে রবার্ট ক্লাইভের মতো লোকও খুব ক্ষুব্ধ হন। "I will only say that

such a scene of anarchy, confusion, bribery, corruption was never seen or heard of in any country but Bengal, nor such and so many fortune acquired in so unjust and rapacious manner." তবে এইসব অসাধু কর্মচারীদের লভ্যাংশের পরিমাণ নির্ধারণ করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। পার্লিয়ামেণ্ট কমিটির এক সমীক্ষা অনুসারে পলাশীর যুদ্ধের দশ বছরের মধ্যে শুধুমাত্র ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বণিকরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় কোম্পানীর মাধ্যমে দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং স্বদেশে পাঠাতে সক্ষম হয়। অনেকে আবার নগদ অর্থের পরিবর্তে হীরা-জহরৎ ইত্যাদিও স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে। ইংরেজ বণিকদের এইরূপ শোষণে বাংলাদেশ থেকে বিপুল ধন-সম্পত্তি বাইরে চলে যাওয়ার ফলে দেশের সর্বত্র প্রচণ্ড অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয় এবং সাধারণ লোকের জীবন যাত্রার উপরও অত্যন্ত সাংঘাতিকভাবে তার প্রভাব বিস্তৃত হয়।

(৬) বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন

বিদেশ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড আমদানি বন্ধ হওয়ার ফলেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে সাধারণতঃ বিদেশ থেকে প্রতি বছর দশ লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং মূল্যের স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড বাংলাদেশে আমদানি করা হত এবং বিদেশী বণিকদের মধ্যে ওলন্দাজরাই সর্বাপেক্ষা বেশি স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড বাংলাদেশে আমদানি করত। কিন্তু ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের পর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওলন্দাজ কোম্পানীর গুরুত্ব সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে প্রচুর পরিমাণে অর্থ লাভের পর ইংরেজদের পক্ষেও আর বাইরে থেকে কোনপ্রকার মূল্যবান্ ধাতু আমদানি করার প্রয়োজন ছিল না। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীরা ইংরেজদের নিকট পরাজিত হয় এবং ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে তারা আবার বাংলাদেশে বাণিজ্য করার সুযোগ লাভ করতে সমর্থ হয়নি। ফরাসীদের অনুপস্থিতির ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর ইংরেজ বণিকদের প্রভাব আরও দৃঢ়ভাবে স্থাপিত হয়। তাছাড়া মূল্যবান ধাতুপিণ্ড স্বদেশ থেকে আমদানি করার পরিবর্তে অন্যান্য বিদেশী বণিক সম্প্রদায় ইংলণ্ডে পরিশোধ করা হবে এই শর্তে প্রচুর অর্থ ইংরেজদের নিকট ঋণ করতে শুরু করে। এই প্রসঙ্গে মিস্টার ভেরলেস্ট বলেন, "চন্দননগরের পতনের পর থেকে শুরু করে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করার কাজ শুরু না করা পর্যন্ত, প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে এই অঞ্চলে স্বর্ণ বা রৌপ্যপিণ্ড আমদানি না করার নীতি গ্রহণ করা এবং বাইরের দেশে রৌপ্যপিণ্ড রপ্তানি করার ফলে বাংলাদেশের আট মিলিয়ন পাউণ্ড স্টার্লিং ক্ষতি হয়।"

বাংলাদেশের অর্থনীতির এইসব পরিবর্তনের ফলে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তী দশ বছরে বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ কমপক্ষে একশ সত্তর লক্ষ পাউণ্ড স্টার্লিং। তাছাড়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চীনদেশ ও অন্যান্য স্থানেও প্রচুর অর্থ প্রেরণ করে। প্রকৃতপক্ষে পলাশীর যুদ্ধের পরই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত অবনতির পথে অগ্রসর হয়। নবাবের শাসনতন্ত্রের প্রায় সমান্তরাল আর একটি অবৈধ শাসনতন্ত্র গঠন করে এবং নিশ্চিন্ত ধ্বংসের পথে বাংলাদেশের অর্থনীতি পরিচালনা করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আরও বিপর্যয় সৃষ্টি করার সুযোগ লাভ করে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই নবাব মীর কাশিম ইংরেজদের ব্যবহারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট এবং মর্মাহত হয়ে ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মার্চ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে জানালেন, "কলকাতা, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি সকল কুঠির ইংরেজ অধ্যক্ষ ও তাদের গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারিগণ, খাজনা আদায়কারী জমিদার, তালুকদার প্রভৃতির মতো ব্যবহার করেন—আমার কর্মচারীদের তাঁরা কোন আমলই দেন না। প্রতি জেলা ও পরগনায়, প্রতি গঞ্জে, এমন কি প্রতি গ্রামে কোম্পানীর গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীরা তেল, মাছ, খড়, বাঁশ, ধান, চাল, সুপুরি এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা করেন এবং কোম্পানীর দস্তক যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেন। তাঁরা কোম্পানীর মতোই সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করেন।" ব্যাবিংটন মেকলেও ইংরেজদের ব্যবহার সম্পর্কে অত্যন্ত বিরূপ মন্তব্য করেন, "কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রায় সকল প্রকার অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উপর একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। দেশীয় জনসাধারণকে তাঁরা সস্তা দামে জিনিস বিক্রয় করতে এবং অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে জিনিষপত্র ক্রয় করতে বাধ্য করেন। রাজস্বের ক্ষতিসাধন করে তাঁরা বিচারবিভাগ, দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ও রাজস্ব সম্বন্ধীয় কর্তৃপক্ষকে অবজ্ঞা করতেন। কোম্পানীর প্রতিটি কর্মচারীই তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সমস্ত অধিকার ভোগ ও প্রয়োগ করতেন, আর কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা কোম্পানীর প্রাপ্য সমস্ত সুযোগ সুবিধা ও ক্ষমতা ভোগ করতেন। এরূপ পরিস্থিতিতে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই কলকাতায় প্রচুর ঐশ্বর্য সঞ্চিত হতে থাকে এবং অন্যদিকে তিন কোটি মনুষ্য সন্তান ধীরে ধীরে নিদারুণ দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হয়।"

(৭) উপসংহার

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের রাজনীতির উপর ইংরেজদের পরোক্ষ কিন্তু অর্থনীতির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তৃত হয়। বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা ভোগের

ক্ষেত্রে যে সব বাধা পূর্বে আরোপ করা হয়েছিল, সিরাজ-উদ্-দৌলার পতনের পরই তা সযত্নে দূর করে ইংরেজগণ নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী বাণিজ্য পরিচালনা করতে শুরু করে। ইংরেজদের দয়ায় সিংহাসনের অধিকারী হওয়ার ফলে মীরজাফরের পক্ষে ইংরেজদের এই অন্যায় আচরণের কোনরূপ প্রতিবাদ করা সম্ভব হয়নি। মীরজাফরের আমলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়। সুতরাং ঐতিহাসিক Percival Spear-এর মন্তব্য, "The sponsored state became a plundered state" যথার্থই সত্য। নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের এই লুণ্ঠন বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন বলেই তাঁর সঙ্গে ইংরেজদের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। মীরকাশিমের পরাজয় ও অপসৃতির ফলে অর্থনৈতিক এই লুণ্ঠনের পথ ইংরেজদের কাছে আবার চিরদিনের জন্য উন্মুক্ত হয়।

Q. 11. *Briefly discuss the history of the reign of Mir Qasim.*

উত্তর ঃ (১) মীরকাশিমের সিংহাসন লাভ

মীরজাফরের পদচ্যুতির ফলে মীরকাশিম ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার মসনদে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন দূরদর্শী রাজনীতিবিদ্। তিনি দেশাত্মবোধসম্পন্ন সুদক্ষ শাসকও ছিলেন। মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর প্রতিনিধি থাকাকালীন ওয়ারেন হেস্টিংস মীরকাশিমকে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন, ধৈর্যশীল, মিতব্যয়ী, সুদক্ষ ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেন। ("...a man of understanding of an uncommon talent for business and great application and perseverance joined to a thriftness.") ঐতিহাসিক টম্সন এবং গ্যারাটিও তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "Mir Qasim was a genuine patriot, an able ruler, who quickly retrenched expenditure and suppressed disorders." মীরজাফরের পতনের প্রধান কারণই ছিল তাঁর আর্থিক দুর্বলতা একথা মীরকাশিম উপলব্ধি করতে সমর্থ হন, সুতরাং তিনি নবাব পদে অধিষ্ঠিত হয়েই আর্থিক সচ্ছলতা আনয়ন করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। তিনি বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিনটি জেলা কোম্পানীকে তাদের যাবতীয় প্রাপ্যের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে দিয়ে দিলেন। এভাবে ইংরেজ কোম্পানীর সহিত দেনা-পাওনা মিটিয়ে দিলে শাসনকার্যে মনোনিবেশ করেন। শাসন ব্যাপারে যথাসম্ভব ব্যয়সঙ্কোচ করে এবং কয়েকটি নতুন 'আবওয়াব' বা নতুন কর স্থাপন করে তিনি অর্থাভাব দূর করতে সমর্থ হন। রাজস্ব বিভাগের পুনর্গঠন বহু এবং কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তিনি রাজস্ব বৃদ্ধিরও ব্যবস্থা করেন। তারপর তিনি রাজকোষে নগদ অর্থ সঞ্চয় করার

বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মীরকাশিম নবাব হয়ে দেখেন যে, রাজকোষে মণি-মরকতাদি ও নগদ মাত্র চল্লিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকা আছে। তিনি সব মণি-মুক্তা ও অন্যান্য রত্নাদি বিক্রয় করেন। তা ছাড়া প্রায় তিন লক্ষ টাকার সোনা ও রূপার তৈজসপত্র ছিল, এগুলো গালিয়ে তিনি টাকা ও মোহর তৈরির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইংরেজদের এই পরিমাণ অর্থ অপেক্ষা অনেক বেশি টাকা দেওয়ার কথা ছিল, সুতরাং তিনি তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে তাদের অনেক টাকা দিলেন। নবাবী পাওয়ার দু সপ্তাহের মধ্যে তিনি ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয় নির্বাহের জন্য নগদ দশলক্ষ টাকা দিলেন এবং মাসিক একলক্ষ টাকা কিস্তিতে আরও দশলক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হন। পাটনার ইংরেজ সৈন্যদের জন্য তাঁর আরও পাঁচলক্ষ টাকা দিতে হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম এই তিন জেলার রাজস্বও কোম্পানীর হস্তগত হল। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট পাঁচলক্ষ, ক্যাইলোড্ দুলক্ষ এবং আরও পাঁচজন ইংরেজ কর্মচারী পদানুযায়ী মোটা টাকা পান। সিংহাসনে আরোহণের পর মীরকাশিমের মোট বত্রিশ লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা ইংরেজদের দিতে হয়।

(২) বিদ্রোহী জমিদারদের দমন ও সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন

রাজ্যের আর্থিক সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করার পর উদ্ধত ও বিদ্রোহী জমিদারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সঙ্কল্প করেন। মীরজাফরের দুর্বল শাসন বাদশাহজাদার আক্রমণ ও নবাবী পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে অনেক জমিদার বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। মীরকাশিম ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে মেদিনীপুরের বিদ্রোহী দলকে দমন করেন। তারপর তিনি বীরভূমের দিকে অগ্রসর হন। বীরভূমের জমিদার আসাদ জামান খান প্রায় বিশ হাজার পদাতিক ও পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় নেন, কিন্তু নবাবের বাহিনীর অকস্মাৎ আক্রমণে তিনি পরাজিত হয়ে মীরকাশিমের বশ্যতা স্বীকার করেন। বর্ধমানও সহজেই মীর কাশিমের পদানত হয়। ইতিমধ্যে মুঙ্গেরের নিকটবর্তী কবকপুরের রাজা বিদ্রোহী হয়ে মুঙ্গেরের দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু ইংরেজ ও নবাবের সৈন্যদের নিকট তিনি পরাজিত হন। বীরভূম ও বর্ধমানের যুদ্ধে মীরকাশিম স্বয়ং সেনানায়ক ছিলেন। সুতরাং নবাবী সৈন্য ইংরেজ সৈন্যের তুলনায় কত অপদার্থ ও অকর্মণ্য তা তিনি প্রত্যক্ষ করেন। এই উপলব্ধির ফলে, এবং সম্ভবতঃ ইংরেজদের সহিত সংঘর্ষের অবশ্যম্ভাবিতা বুঝতে পেরে তিনি অবিলম্বে তাঁর সৈন্যদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করেন।

(৩) মীর কাশিমের উদ্দেশ্য ও কার্যাদি

মীরকাশিম ছিলেন মীরজাফর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি ছিলেন সুদক্ষ শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ ও একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। ইংরেজদের সহিত বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা তাঁর না থাকলেও তাঁদের হস্তে ক্রীড়নক হয়ে থাকার মতো হীন মনোবৃত্তিও তার ছিল না। মীরকাশিম প্রকৃত নবাব হিসাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেই কৃতসঙ্কল্প হন। সেজন্য সিংহাসনে উপবেশন করার পরেই কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। (১) তিনি বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণের ইংরেজ প্রীতি ও অসাধুতা লক্ষ্য করে তাঁকে পদচ্যুত করেন। (২) ইংরেজ কোম্পানীর প্রভাব থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ হতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং নব প্রতিষ্ঠিত রাজধানীকে দুর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। (৩) মীরকাশিম বুঝতে পারেন যে, নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁকে হয়ত শেষ পর্যন্ত ইংরেজ কোম্পানীর সহিত প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে হবে। সুতরাং তিনি সমরু ও মার্কার নামক দুজন ইয়োরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে নিজ সেনাবাহিনীকে ইয়োরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। (৪) তিনি ইয়োরোপীয় দক্ষ-শিল্পীগণের উপদেশে ও নির্দেশে কর্মকুশল দেশীয় শিল্পীকারগণ উৎকৃষ্ট কামান, গুলি-গোলা, বারুদ প্রভৃতি সামরিক উপকরণ প্রস্তুত করার ব্যবস্থা করেন।

(৪) ইংরেজদের সহিত মীরকাশিমের দ্বন্দ্ব

উপরি-উক্ত ব্যবস্থা হতে স্পষ্ট বুঝতে পারা যায় যে, মীরকাশিম মীরজাফরের ন্যায় বিনাযুদ্ধে মসনদচ্যুত হতে প্রস্তুত ছিলেন না। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিনাকারণে মীরকাশিম কোম্পানীর সহিত বিবাদ-বিসংবাদের পক্ষপাতীও ছিলেন না। কলকাতার ইংরেজ গভর্নর ভ্যান্সিটার্টের সহিত আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের শুল্ক সম্পর্কে মতানৈক্যের সময় মীরকাশিমের ব্যবহার থেকেও একথা প্রমাণিত হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিনাশুল্কে কেবলমাত্র আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করেছিল। উচ্চপদস্থ দস্তক নামে ছাড়পত্র মাল আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য-সংক্রান্ত একথা লিখে দিলেই বিনাশুল্কে কোম্পানীর পণ্য দ্রব্যাদি একস্থান হতে অপর স্থানে নিয়ে যাওয়া যেত। এইসব দস্তক স্বাক্ষরের ভার নবাব ইংরেজ কোম্পানীর পদস্থ কর্মচারিদের উপর বিশ্বাস করে ছেড়ে দিতে সম্মত হন। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণ এই দস্তকের অপব্যবহার করে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। দস্তক দেখিয়ে তারা একস্থান থেকে অপরস্থানে বিনাশুল্কে পণ্যদ্রব্য চালান দিত, কিন্তু

এই মাল তারা দেশীয় বাজারেই বিক্রি করত। পক্ষান্তরে, দেশীয় ব্যবসায়িগণ সরকারী শুল্ক ঘাঁটিগুলোতে শুল্ক দিতে বাধ্য হত। শুল্ক ফাঁকি দিয়ে ইংরেজ বণিকগণ স্বভাবতঃই অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে দ্রব্যাদি বিক্রি করতে পারত, অথচ শুল্ক দেওয়ার ফলে দেশীয় বণিকগণ ঐ দামে মাল বিক্রয় করলে তাদের প্রচুর লোকসান দিতে হত। ফলে দেশীয় বণিকদের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়ে পড়ে। কোন স্বাধীন রাজা বা নবাবের পক্ষে বিদেশী বণিকদের এক চেটিয়া ব্যবসা করার অবৈধ অধিকার স্বীকার করে নেওয়া সম্ভবপর ছিল না। মীরজাফর এই বিষয়ে ইংরেজ গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং প্রতিবাদ জানান। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক টম্‌সন ও গ্যারাট বলেন যে, "No Indian ruler would or could, have granted foreigners leave to wreck his whole system by a monopoly duty-free trade along every road and river of his kingdom." কিন্তু মীরকাশিমের প্রতিবাদেও এই অন্যায় আচরণের কোন প্রতিকার হল না এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষের নিশ্চেষ্টভাব দেখে মীর কাশিম অনন্যোপায় হয়ে দেশীয় প্রজাদের উপর হতেও শুল্ক রহিত করে দেন। ফলে রাজকোষের অনেক ক্ষতি হয়, কিন্তু মীর কাশিম দেশীয় প্রজাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই এইরূপ আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করতে সম্মত হন। এই ব্যবস্থা ইংরেজদের মনঃপুত হল না। পাটনায় ইংরেজদের বাণিজ্য কুঠির এজেন্ট এলিস নবাবের এই ব্যবস্থায় বিরক্ত হয়ে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণই একমাত্র পন্থা বলে স্থির করেন। ঐতিহাসিক রামসে মুর স্পষ্টভাবে বলেন যে, এলিস্ নিজের এবং বন্ধুবান্ধবদের অবৈধ অর্থোপার্জনের পথের বাধা দূর করার উদ্দেশ্যে মীরজাফরের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ওমিয়ট্, হে, স্মিথ ও ভেরলেস্ট প্রভৃতি ইংরেজ-কর্মকর্তাগণও এলিসের প্রস্তাব যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করেন। মিস্টার এলিস্ পাটনা শহর আক্রমণ করলে মীরকাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হন। তিনি পাটনা শহর থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে সেখানে নিজের অধিকার পুনরায় স্থাপন করেন। কিন্তু তারপর তিনি ক্রমান্বয়ে কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট শাহ আলমের সাহায্য নিয়ে পুনরায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্‌সার নামকস্থানে মীরকাশিম, সুজা-উদ্-দৌলা ও শাহ আলমের সম্মিলিত সৈন্যবাহিনী ইংরেজ-সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধক্ষেত্রেও মীর কাশিমের পরাজয় ঘটে। বক্‌সারের যুদ্ধে জয়লাভ করার ফলে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের দিক

থেকে বিচার করলে বক্সারের যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ অপেক্ষাও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। এই যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তিকে আর নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করতে হয়নি। পরবর্তী সব যুদ্ধই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ। বক্সারের যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হওয়ার ফলে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা এবং সম্রাট শাহ আলম ইংরেজ কোম্পানীর উপর সম্পূর্ণ নিভরশীল হয়ে পড়েন। মীরকাশিম আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করেন। পলাতক অবস্থায়ই ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে অতি দরিদ্র অবস্থায় দিল্লীর এক জীর্ণ কুটিরে তাঁর মৃত্যু হয়।

(৫) উপসংহার

নিজের প্রভু, রাজা ও শ্বশুরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে মীরকাশিম যে গুরুতর অপরাধ করেন তা কোন রকমেই ক্ষমা করা যেতে পারে না। কেউ কেউ মনে করেন যে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁর প্রাণপণ চেষ্টার দ্বারা তিনি তাঁর অপরাধের ক্ষালন করার চেষ্টা করেন। অবশ্য সিরাজ-উদ্-দৌলার পরবর্তী নবাবদের সহিত তুলনা করলে এ বিষয়ে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত। বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিমকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আখ্যা দিয়ে বাঙ্গালীর হৃদয়ে তাঁকে উচ্চ স্থান দিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রদত্ত উপাধি কেবল আংশিকভাবে সত্য। মীরকাশিমের চার বছর নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বছর স্বাধীনভাবে তিনি কিছুই করতে পারেন নি। প্রকৃত পক্ষে তিনি স্বাধীনতালাভের জন্য চেষ্টা করেন কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মীরকাশিমকে স্বাধীন নবাব বলে মনে করার কোন কারণ নেই। তবে ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে মসনদে আসীন হলেও তিনি তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে শাসন-যন্ত্রকে শক্তিশালী করে তোলার চেষ্টা করেন। আর একটু ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সহিত তাঁর নীতি অনুসরণ করলে হয়ত মীরকাশিমের পতন এত দ্রুত হত না এবং শাসক হিসাবে তিনি স্থায়ী কীর্তি অর্জন করার সুযোগ পেতেন। ডক্টর নন্দলাল চট্টোপাধ্যায় খুব সুন্দরভাবে মীরকাশিমের চরিত্রের দোষত্রুটি বর্ণনা করেন। "More inhuman and cynical than the much abused Siraj-ud-dulah, more artful and perfidious than Mir Jafar, more aspiring and persistent than Haider Ali, more calculating and greedy than Shuja-ud-dulah, more egoistical literary than Shah Alam, more suspicious and exacting than Muhammed Ali, more timid and nervous than Nigam Ali, Mir Qasim lacked the impertuosity of Siraj-ud-dulah, the indolence of Mir-

Jafar, the bravery of Haider, the extravagance of Muhammed Ali the sagacity of Shuja-ud-dulah, the chivalry of Shah Alam and the prudence of Nizam Ali. Mir Qasim was obviously one of the most intriguing figures among the contemporary Muslim rulers in India."

Q 12. *Do you think that in the revolution of 1763 the real issue was economic and not political or administrative ?*

or

Q. *Do you think that it was the internal trade which ultimately generated the crisis between Mir Qasim and the English.*

or

Q. *Was the assertion of sovereignty rights by the Nawab the real issue in the conflict between Mir Qasim and the East India Company ?*

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা

রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সিংহাসন অধিকার করলেও মীরকাশিম ছিলেন সুদক্ষ শাসক, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ্ এবং একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক। ইংরেজদের সহিত বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হওয়ার ইচ্ছা তাঁর না থাকলেও ইংরেজদের হস্তে ক্রীড়নক হয়ে থাকার হীন মনোবৃত্তিও তাঁর ছিল না। সিংহাসনে আরোহণের পর মীরকাশিম প্রকৃত নবাব হিসাবেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে কৃতসঙ্কল্প হন। সেজন্য তিনি ইংরেজ কোম্পানীর প্রভাব থেকে দূরে থাকার উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানীকে দুর্গের দ্বারা পরিবৃত করেন। তাছাড়া সিংহাসনে আরোহণের পরই মীরকাশিম বুঝতে পারেন যে নিজ অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে শেষ পর্যন্ত হয়ত ইংরেজ কোম্পানীর সহিত প্রকাশ্য দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হতে হবে। সুতরাং তিনি সমরু ও মার্কার নামে দুজন ইয়োরোপীয় সৈনিকের সাহায্যে নিজ সৈন্য বাহিনীকে ইয়োরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। উচ্চমানের কামান ও বন্দুক নির্মাণ করেও তিনি সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অথবা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্য মীরকাশিম তাঁর সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করেন নি, আভ্যন্তরীণ শান্তি, শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং পার্শ্ববর্তী দু-একটি ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকারের উদ্দেশ্যেই তিনি সামরিক শক্তি

পুনর্গঠনের দিকে মনোনিবেশ করেন, অনেকে মীরকাশিমকে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব আখ্যায় ভূষিত করলেও এই উপাধি আংশিকভাবে সত্য। মীরজাফরের চার বছরের (১৭৬০-১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দ) নবাবীর মধ্যে প্রায় তিন বছর স্বাধীনভাবে তিনি বিশেষ কিছু করতে পারেন নি। তিনি স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করেন, কিন্তু কৃতকার্য হতে পারেন নি। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে মীরকাশিমকে স্বাধীন নবাব বলে মনে করার কোন্ সঙ্গত কারণ নেই। স্বাধীনতালাভের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।

অপরদিকে আভ্যন্তরীণ শাসন ক্ষমতা অধিকার করার চেষ্টার জন্য মীরকাশিমের সহিত ইংরেজদের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় নি। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ও বিহারের অধিকাংশ জমিদারই স্বাধীনভাবে স্থানীয় শাসন পরিচালনা করতে শুরু করেন। আবার দেশীয় জমিদারদের একটি বিরাট অংশ ইংরেজদের অনুগত হয়ে ওঠে। এই উভয় দলই নবাবের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে অসম্মত হয়। বিশেষতঃ বাদশাহ শাহ্ আলমের তৃতীয়বার বিহারে অভিযানের ফলে মীরকাশিমের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। শাহ্ আলম মীরকাশিমের পরিবর্তে ইংরেজদিগকেই তাঁর সাহায্যের জন্য অধিকতর উপযুক্ত মনে করতেন এবং মীর কাশিমের পরিবর্তে তিনি ইংরেজদের বাংলা বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারি দিতে প্রস্তুত হন। কিন্তু ইংরেজরা এই সুবাদারী গ্রহণ করতে আপত্তি করলে তিনি তাদের বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে একটি ফরমান দিলেন। সুতরাং ধীরে ধীরে বাংলাদেশের উপর ইংরেজদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যায় এবং মীরকাশিমের ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক হ্রাস পায়। ফলে বাংলাদেশের শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে নানারূপ অসুবিধা দেখা দেয় এবং মীরকাশিমের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। ইংরেজদের অনুগৃহীত বিহারের শাসনকর্তা রামনারায়ণ নবাবের প্রতি কোনরূপ গুরুত্বই আরোপ করতেন না। মীরকাশিম বারবার তাঁর নিকট হিসাব-নিকাশের দাবি করলেও তিনি নানা অজুহাতে তা স্থগিত রাখেন। পাটনার ইংরেজ কর্মচারীরাও নবাবকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর নবাবের আদেশের বিরোধিতা করতেও তারা দ্বিধা বোধ করেনি। ইংরেজ সৈন্যাধ্যক্ষ কর্নেল কুট মীরকাশিমকে পদে পদে লাঞ্ছিত করতেন। পাটনা শহরের প্রবেশ দ্বারে ইংরেজ সৈন্য পাহারা দিত এবং কোন ব্যক্তিকেই ঢুকতে বা বাইরে যেতে দিত না। নবাব কর্নেলকে এই সৈন্য সরিয়ে নিতে বললে তিনি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, "আবার বাদশাহ আলমকে বাংলায় নিয়ে আসব।" বড় বড় পদে কাদের নিযুক্ত করা হবে সে বিষয়েও কর্নেল মীরকাশিমকে আদেশ পাঠাতেন।

কর্নেলের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হয়ে ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন মীরকাশিম কলকাতার গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে পত্র লিখে জানান যে, কর্নেল পাটনা পৌছাবার পরই নির্দেশ দেন যে তিনি যা বলবেন নবাবকে তাই করতে হবে। উপসংহারে মীরকাশিম আরও লেখেন যে, "আমার ভয় যে সিপাহীরা আমার জীবন বিপন্ন করে তুলবে এবং আমার মান-সম্মান সমস্তই নষ্ট করবে। গত আটমাস পর্যন্ত আমার আহার নিদ্রা নেই বললেই হয়।" ১৭ই জুন তিনি আবার কলকাতায় লিখে জানান, "কাল রাত তুপুরে মহারাজ রাম নারায়ণ কর্নেলকে খবর পাঠান যে, আমি তুর্গ আক্রমণের জন্য সৈন্য জড় করেছি। এই মিথ্যা সংবাদে বিচলিত হয়ে কর্নেল সৈন্য সজ্জিত করেন। আজ সকালে মিস্টার ওয়াটস জেনানা মহলের নিকটে আমার খাস কামরায় ঢুকে চীৎকার করে বলেন 'নবাব কোথায় ?' কর্নেল কুট ক্রোধান্বিত হয়ে পিস্তল হাতে ঘোড়সওয়ার, পিওন, সিপাহি প্রভৃতি সঙ্গে করে আমার তাঁবুতে প্রবেশ করেন – তারপর ৩৫জন ঘোড়সওয়ার এবং ২০০ জন সিপাহী নিয়ে প্রত্যেকে তাঁবুতে ঢুকে 'নবাব কোথায় ?' বলে চীৎকার করতে থাকেন, ফলে আমার কতদূর লাঞ্ছনা ও অপমান হয়েছে এবং আমার শত্রু, মিত্র ও সৈন্যদের চোখে আমি কতদূর হেয় হয়েছি তা আপনি সহজেই বুঝতে পারবেন।" ইংরেজ কর্মচারীদের এরূপ ব্যবহারে পদে পদে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হলেও অথবা ইংরেজদের নির্দেশে শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেও মীরকাশিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হতে প্রস্তুত হন নি। অপমান সহ্য করেও তিনি নবাবী পদে অধিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে বাণিজ্যিক শুল্কের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে এমন তিক্ততার সৃষ্টি হয় যে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য মীরকাশিমের পক্ষে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতীত অন্য কোন পথ অবশিষ্ট ছিল না।

(২) শুল্ক সংক্রান্ত বিরোধ

মীর কাশিমের আমলে ইংরেজ কর্মচারীদের ব্যবহারে বাংলাদেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক তুর্দশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত দস্তক দেখিয়ে কোম্পানীর কর্মচারীরাও দেশের সর্বত্র জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য করতেন। ইংরেজ বণিকদের এই কার্যকলাপে একদিকে রাজকোষের ক্ষতি হত, অপরদিকে দেশীয় বণিকদের শুল্ক দিতে হত বলে তারা ইংরেজ বণিকদের সহিত প্রতিযোগিতায় অসমর্থ হয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হ'ত। বিলাতের কর্তৃপক্ষ বারবার এইরূপ বে-আইনী কাজের তীব্র নিন্দা করা সত্ত্বেও ইংরেজ কর্মচারীরা এই বাণিজ্য বন্ধ করেনি। কারণ স্থানীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীরাও ওই প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত ছিল। তা ছাড়া গভর্নর

ও কাউন্সিলের সদস্যদের প্রচুর উৎকোচ গ্রহণের ফলে অবৈধভাবে অর্থ সঞ্চয় করা কেউই দূষণীয় মনে করত না।

শুল্কের ব্যাপার ছাড়াও কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের প্রজাদের উপর নানারকম উৎপীড়ন করত। ইংরেজদের সঙ্গে কলহ যুদ্ধের আশঙ্কায় অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীকে নিজে দণ্ড না দিয়ে প্রজাদের দুরবস্থা সম্বন্ধে মীরকাশিম গভর্নরের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করেন। ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে মার্চ তিনি কোম্পানীকে জানান, কলকাতা, কাশিমবাজার, পাটনা, ঢাকা প্রভৃতি সকল কুঠির ইংরেজ অধ্যক্ষ তাদের গোমস্তা ও অন্যান্য কর্মচারীসহ খাজনা, আদায়কারী জমিদার তালুকদার প্রভৃতির মতন ব্যবহার করেন—আমার কর্মচারীদের কোন আমলই দেন না। প্রতি জেলা ও পরগনায় প্রতি গঞ্জে, গ্রামে কোম্পানীর কর্মচারী ও গোমস্তাগণ তেল, মাছ, খড়, বাঁশ, চাল, সুপারী এবং অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা করে এবং তারা কোম্পানীর দস্তক দেখিয়ে কোম্পানীর মতই সকল সুযোগ-সুবিধা আদায় করে।" আর একখানা পত্রে নবাব লেখেন যে, "তারা বহু নতুন কুঠি নির্মাণ করে ব্যবসা উপলক্ষে প্রজাদের উপর বহু অত্যাচার করে। তারা জোর করে সিকি দামে দ্রব্য কেনে এবং আমার প্রজা ও ব্যবসায়ীদের উপর নানা অত্যাচার করে। কোম্পানীর দস্তক দেখিয়ে তারা শুল্ক দেয় না এবং সেজন্য আমার পঁচিশ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। এই অবস্থার ফলে দেশের ব্যবসায়ীরা ও বহু প্রজা সর্বস্বান্ত হয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে।"

(৩) ইংরেজ কর্মচারীদের স্বেচ্ছারিতা

শুধুমাত্র নবাবের পত্রে নয়, ইংরেজ কর্মচারীরাও এই অত্যাচারের কথা উল্লেখ করেন। সার্জেন্ট ব্রেগোর পত্রে বাখরগঞ্জের ইংরেজ কর্মচারীদের অত্যাচারের কথা জানা যায়। এমন কি তারা নবাবের বিচার বিভাগের উপর হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। "পূর্বে সরকারী কাছারীতে বিচার হত, কিন্তু এখন প্রতি গোমস্তাই বিচারক এবং তার বাড়ীই কাছারী। তারা জমিদারদেরও দণ্ড বিধান করে এবং মিথ্যা অভিযোগ করে তাদের নিকট থেকেও টাকা আদায় করে।" ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস এইসব অত্যাচারের কাহিনী গভর্নরকে জানান। তিনি বলেন যে, "কেবল কোম্পানীর গোমস্তা ও সিপাহী নয়, অন্য লোকও সিপাহীর পোশাক পড়ে বা গোমস্তা বলে পরিচয় দিয়ে সর্বত্র লোকের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে।" ২৬শে এপ্রিলের পত্রে হেস্টিংস আবার লেখেন "সর্বত্র নবাবের কর্তৃত্ব প্রকাশ্যে অস্বীকৃত ও অপমানিত, নবাবের কর্মচারীরা কারারুদ্ধ, নবাবের দুর্গ আমাদের সিপাহি দ্বারা আক্রান্ত।" গভর্নর ভ্যান্সিটার্টও এই সম্পর্কে বলেন যে,

"আমি গোপনে অত্যাচারী ইংরেজ কর্মচারীদের সাবধান করেছি, কিন্তু অত্যাচারের কোন উপশম না হওয়ায় বোর্ডের সভায় তা পেশ করেছি। অথচ বোর্ডের সদস্যরা এ বিষয়ে কোন মনোযোগই দিলেন না। কারণ তাদের বিশ্বাস নবাব আমাদের সঙ্গে কলহ করার জন্যই এইসব মিথ্যা সংবাদ রটনা করেন। নবাবের অভিযোগ বিশ্বাস করি বলে তাঁরা আমাকে গালি দেন ও শত্রু বলে মনে করেন। যদিও প্রতিদিন অভিযোগের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে, তথাপি প্রতিকার তো দূরের কথা, একটি অভিযোগ সম্বন্ধেও কোন তদন্ত হয় নি।"

(৪) নবাবের সহিত ইংরেজদের নতুন চুক্তি

নবাবের প্রধান অভিযোগ ছিল ইংরেজদের বেআইনী ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে। বাদশাহের ফরমান অনুযায়ী যে সকল দ্রব্য এদেশে জাহাজে আমদানি হয় অথবা এদেশ থেকে জাহাজে রপ্তানি হয়, কেবল সেই সকল দ্রব্যই কোম্পানী বেচা-কেনা করতে পারবে এবং কোম্পানীর মোহরাঙ্কিত দস্তক দেখালে তার উপর কোন শুল্ক ধার্য হবে না। কিন্তু কেবল কোম্পানী নয়, তাদের ইংরেজ কর্মচারীরাও লবণ, সুপারী, তামাক প্রভৃতি বেচা-কেনা করত এবং কোম্পানীর দস্তক দেখিয়ে কেউই শুল্ক দিত না। লবণের ব্যবসার উপর ইংরেজদের একচেটিয়া অধিকার স্থাপিত হয়, ফলে নবাবের প্রচুর লোকসান হয়। তাছাড়া ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে নবাবের কর্মচারীদের বিবাদ উপস্থিত হলে ইংরেজরাই তার বিচার করত। ফলে অপরাধী কর্মচারীদের বিচারের ভার ইংরেজদের উপর থাকার ফলে কখনও অপরাধীদের শাস্তি হত না। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট নবাবের অভিযোগগুলো ন্যায়সঙ্গত মনে করেন এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা করেন। ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে তিনি নবাবের নতুন রাজধানী মুঙ্গেরে গিয়ে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে একটি নতুন সন্ধি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিতে স্থির হয় যে, ইংরেজরা লবণের উপর শতকরা ৯ টাকা হারে শুল্ক দিবে। কিন্তু পূর্বে দেশীয় বণিকরা শতকরা ৪০ টাকা শুল্ক দিত। সুতরাং নবাব নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও ইংরেজদের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করার চেষ্টা করেন। ওই সন্ধির আর একটি প্রস্তাবে ঠিক হয় যে নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক বা তার গোমস্তার কোন বিবাদ বাধলে নবাবের আদালতেই তার বিচার হবে। কিন্তু ভ্যান্সিটার্টের এই চুক্তিতে ইংরেজ বণিকরা ক্রুদ্ধ হয়ে কলকাতা বোর্ডের নিকট নতুন সন্ধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে এবং বোর্ড এই বন্দোবস্ত নাকচ করে দেয়। ভ্যান্সিটার্ট বোর্ডের সদস্যদের স্মরণ করে দেন যে, বাদশাহী ফরমানে এরূপ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয় নি এবং

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বারবার এই বাণিজ্যের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরেজরা বহুদিন ধরে যে সুযোগ ভোগ করে এসেছে তা ছেড়ে দিতে সম্মত হল না। অগত্যা ভ্যান্সিটার্ট নবাবকে লিখলেন, "বাদশাহী ফরমান এবং বাংলার নবাবের সহিত সন্ধি অনুসারে কোম্পানীর দস্তকের বলে বিনা শুল্কে আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী বাণিজ্য করার অধিকার ইংরেজ বণিকদের আছে। সুতরাং ইংরেজ বণিকরা এই অধিকারের জোরে পূর্বের ন্যায় বিনা শুল্কে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সকল প্রকার বাণিজ্য করতে পারে ও পারবে। তবে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী লবণের উপর শতকরা আড়াই টাকা হারে শুল্ক দেবে। কেবল দুটি কুঠিতে তামাকের উপর শুল্ক দিবে।"

(৫) সংঘর্ষের সূত্রপাত

কলকাতার কাউন্সিলের এই নতুন সিদ্ধান্ত প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই পাটনায় নবাবের সহিত ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ এলিস সাহেবের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। নবাবের সহিত ভ্যান্সিটার্টের যে নতুন বন্দোবস্ত হয় তদনুসারে নবাবের কর্মচারীরা ইংরেজদের কাছে শুল্ক দাবি করে। এলিস এই ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে নবাবের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য পাঠান এবং তাদের অধ্যক্ষ আকবর আলি খানকে বন্দী করেন। নিজের চোখের উপর এইরূপ অত্যাচারে নবাব ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর কর্মচারীকে উদ্ধার করার জন্য পাঁচশ সৈন্য পাঠান। নবাবের সৈন্যদের সহিত সংঘর্ষে চারজন ইংরেজ প্রহরী নিহত হয় অবশিষ্ট সৈন্য তাদের হস্তে বন্দী হয়। পরে নবাব তাদের ভর্ৎসনা করে ছেড়ে দেন। কলকাতার কাউন্সিল ভ্যান্সিটার্টের সহিত নবাবের নতুন চুক্তি নাকচ করে দেওয়ায় ভবিষ্যতে এইরূপ গোলযোগ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মার্চ নবাব সমস্ত জিনিসের উপরই শুল্ক তুলে দেন। ঐদিনই তিনি গভর্নরকে লিখলেন, "তাঁর রাজত্ব করার আর কোনো ইচ্ছা নেই, সুতরাং তাঁকে রেহাই দিয়ে ইংরেজরা যেন অন্য নবাব নিযুক্ত করেন।" সমস্ত শুল্ক তুলে দেওয়ায় বাংলার রাজস্বের অর্ধেক কমে গেল। অত্যাচার, অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্য নবাব এ ক্ষতিও সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কলকাতার কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য নবাবের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। তাঁরা ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্য সকলের উপর শুল্ক বসাবার জন্য নবাবের উপর চাপ দেন এবং কলকাতা কাউন্সিল মুঙ্গেরে নবাবের নিকট অ্যামিয়ট ও হে নামক দুই সাহেবকে পাঠিয়ে নিম্নলিখিত দাবিগুলো উপস্থাপিত করেন।

(১) নবাব ও ভ্যান্সিটার্টের মধ্যে নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে নবাবের কর্মচারী-দিগকে যে সকল আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করা এবং সেজন্য ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করা ;

(২) শুল্ক রহিত করার আদেশ প্রত্যাহার করা ,

(৩) নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিক বা তাদের গোমস্তার এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হলে কোম্পানীর কুঠির ইংরেজ অধ্যক্ষের হস্তেই তার বিচারের ভার দেওয়া ;

(৪) বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্ব বা জায়গীর দেওয়া :

(৫) দেশীয় মহাজনরা যাতে কোম্পানীর টাকা বিনা বাটায় গ্রহণ করে এবং কোম্পানী যাতে ঢাকা ও পাটনার টাকশালে তিন লক্ষ টাকা তৈরি করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা ; এবং

(৬) নবাবের একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখা।

নবাব এই সন্ধির দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, "ইংরেজরা বহু সন্ধি করেছে এবং অবিলম্বে তা ভেঙ্গেছে, আমি কোন সন্ধি ভঙ্গ করিনি। সুতরাং নতুন সন্ধির কোন অর্থ হয় না। এদিকে নবাব নতুন সন্ধির শর্ত না মানায় অ্যামিয়ট ও হে মুঙ্গের ত্যাগ করেন। ২৪শে জুন রাত্রে এলিস পাটনা আক্রমণ করেন এবং পাটনার দুর্গ জয় করতে না পারলেও পাটনা নগরী অধিকার করে অবাধ হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন করেন। এই সংবাদ পেয়েই মীর কাশিম পাটনা পুনরুদ্ধারের জন্য একদল সৈন্য পাঠান এবং পাটনা নগরী ও ইংরেজদের কুঠি তারা অধিকার করে। ইংরেজ সৈন্যগণ আত্ম-সমর্পণ করে এবং এলিস ও আরও অনেকে বন্দী হন।

নবাব এলিসের আকস্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানান এবং ক্ষতি-পূরণের দাবি করেন। অ্যামিয়ট সাহেব মীরকাশিমের নিকট দৌত্যকার্যে বিফল হয়ে আরও কয়েকজন ইংরেজ সহ মুঙ্গের হতে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। মীরকাশিম পাটনার খবর পেয়ে অ্যামিয়টের নৌকা আটক করার জন্য মুর্শিদাবাদে আদেশ পাঠান। তাঁকে হত্যা করার কোন আদেশ ছিল না, তবুও অ্যামিয়ট নবাবের আদেশে নৌকা হতে নামতে অথবা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন না বরং নবাবের প্রেরিত সৈন্যদের উপর গুলিবর্ষণ করতে আদেশ দেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর নবাবের সৈন্য অ্যামিয়টের সৈন্যরা পরাজিত ও বন্দী হয় এবং অ্যামিয়ট নিহত হন। পাটনায় এলিস ও অন্যান্য ইংরেজদের বন্দী করায় এবং অ্যামিয়টের মৃত্যু সংবাদে কলকাতা কাউন্সিলের সদস্যগণ

খুব উত্তেজিত হন এবং ৩রা জুলাই তাঁরা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মীরজাফরকে আবার বাংলার নবাবী পদে প্রতিষ্ঠা করেন। তবে ইংরেজদের পক্ষ থেকে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এপ্রিল মাসেই তারা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পাটনা ও মুর্শিদাবাদের ঘটনা এই যুদ্ধকে ত্বরান্বিত করে তোলে।

(৬) উপসংহার

সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই ইংরেজদের বাংলার শাসনতান্ত্রিক ও বিচার বিভাগীয় ব্যাপারে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে তিনি বারবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ নবাবের এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করলেও তার প্রতিকার করার কোন প্রকার চেষ্টা করেন নি। অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করেও মীরকাশিম রাজত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইংরেজদের অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে সমস্ত দেশে যে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয় মীরকাশিমের পক্ষে তা সহ্য করা সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ দেশীয় ব্যবসায়ীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই তিনি সকলপ্রকার শুল্ক রহিত করেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা ইংরেজদের স্বার্থ বিরোধী হওয়ায় তারা মীরকাশিমের স্বাধীনভাবে শাসন নীতি নির্ধারণের পথেও বাধার সৃষ্টি করেন। ইংরেজদের এই সময়ের আচরণ প্রসঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিক মিল বলেন, "স্বার্থের প্ররোচনায় মানুষ যে কতদূর ন্যায়-অন্যায় বিচার রহিত ও লজ্জাহীন হতে পারে, এই ঘটনাই তার একটি চরম দৃষ্টান্ত। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল কারণ শাসনতান্ত্রিক বা রাজনৈতিক নয়, প্রকৃত কারণ অর্থনৈতিক। অপরদিকে নবাব পরিবর্তন ও ইংরেজদের কাছে খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল, সুতরাং তাঁরা মীরকাশিমের পরিবর্তে মীরজাফরকে সিংহাসনে পুনরায় স্থাপন করে আবার প্রচুর অর্থ লাভ করার ব্যবস্থা করেন।

Q 13 *Discuss the different stages of the armed conflict between Mir Qasim and the English.*

উত্তরঃ (১) ভূমিকা

আভ্যন্তরীণ শুল্কের বিষয় নিয়ে ইংরেজদের সহিত মীরকাশিমের বিরোধ উপস্থিত হলে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ মীরকাশিম সমস্ত পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক একেবারে তুলে

দিলেন। পরিস্থিতি সম্যকরূপে উপলব্ধি করে তিনি এই সময় গভর্নর ভ্যান্সিটার্টকে লিখলেন, "তাঁর আর রাজত্ব করার সখ নেই ; সুতরাং তাঁকে রেহাই দিয়ে ইংরেজরা যেন অন্য নবাব নিযুক্ত করে।" সমস্ত শুল্ক তুলে দেওয়ার ফলে বাংলার রাজস্বের অর্ধেক কমে গেল। অত্যাচার, অপমান ও অরাজকতা নিবারণের জন্য নবাব এই ক্ষতিও সহ্য করতে প্রস্তুত হন। কিন্তু কলকাতা কাউন্সিলের অধিকাংশ সদস্য নবাবের প্রস্তাবে অমত করলেন। তাঁরা বলেন যে ইংরেজ বণিক ছাড়া আর সকলের কাছ থেকেই শুল্ক আদায় করতে হবে, কারণ, তা নাহলে ইংরেজ বণিকদের অতিরিক্ত মুনাফা হবে না। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে কলকাতার কাউন্সিল মুঙ্গেরে নবাবের নিকট অ্যামিয়ট ও হে নামক দুই সাহেবকে পাঠিয়ে নিম্নলিখিত দাবিগুলো উপস্থাপিত করেন।

(১) নবাব ও ভ্যান্সিটার্টের মধ্যে নতুন বন্দোবস্ত অনুসারে নবাবের কর্মচারী-দিগকে যে সকল আদেশ দেওয়া হয়েছিল তা প্রত্যাহার করতে হবে এবং সেজন্য ইংরেজদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা পূরণ করতে হবে ;

(২) শুল্ক রহিত করার আদেশ প্রত্যাহার করতে হবে ;

(৩) নবাবের কর্মচারীদের সহিত ইংরেজ বণিকদের বা তাদের গোমস্তাদের এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের কোন বিবাদ উপস্থিত হলে কোম্পানীর কুঠির ইংরেজ অধ্যক্ষের কাছেই তার বিচার হবে ;

(৪) বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা ইংরেজ কোম্পানীকে বর্তমান ইজারার পরিবর্তে সম্পূর্ণ স্বত্ব বা জায়গীর দেওয়া ;

(৫) দেশীয় মহাজনরা যাতে কোম্পানীর টাকা বিনা বাটায় গ্রহণ করে এবং কোম্পানী যাতে ঢাকা ও পাটনা টাকশালে তিন লক্ষ টাকা তৈরি করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা এবং

(৬) নবাবের দরবারে একজন ইংরেজ প্রতিনিধি রাখা।

নবাব এই সন্ধির দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তে রাজি হলেন না। তিনি বললেন যে, "ইংরেজরা বহু সন্ধি করেছে এবং তা অবিলম্বে ভঙ্গ করেছে—আমি কোন সন্ধি ভঙ্গ করি নি। সুতরাং নতুন সন্ধির কোন অর্থ হয় না।" তারপর একখানি কাগজ তাদের হাতে দিয়ে বললেন, "তোমাদের যা ইচ্ছা লিখে দাও, আমি সই করব—কিন্তু আমার কেবল একটি দাবি—দেশের যেখানে যত ইংরেজ সৈন্য আছে তাদের সরিয়ে নেবে।"

(২) প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সূত্রপাত

নবাব বুঝতে পারলেন যে, শীঘ্রই ইংরেজদের সহিত তাঁর যুদ্ধ বাধবে। সুতরাং কলকাতা থেকে যে ক'খানা নৌকা অস্ত্র বোঝাই হয়ে পাটনা পাঠানো হয়েছিল, তিনি

সেগুলো আটক করেন এবং বলেন যে পাটনা থেকে ইংরেজ সৈন্য না সরালে তিনি সেগুলো ছাড়বেন না। কিন্তু যখন তিনি জানতে পারলেন যে, পাটনার ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ মিস্টার এলিস পাটনা দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত, তখন তিনি নৌকাগুলো ছেড়ে দিলেন এবং ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে বাইশে জুন গভর্নরকে জানান, "আমি পুনঃ পুনঃ আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে আপনি রেহাই দিয়ে অন্য নবাব নিযুক্ত করুন।"

নবাব নতুন সন্ধির শর্ত না মানায় অ্যামিয়ট ও হে নবাবের রাজধানী মুঙ্গের পরিত্যাগ করেন। চব্বিশে জুন রাত্রে এলিস পাটনা আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে নবাবের সৈন্যরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং এলিস পাটনা দুর্গ জয় করতে না পারলেও পাটনা নগরী জয় করে অবাধে হত্যাকাণ্ড ও লুঠতরাজ করেন। এবার মীরকাশিমের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায় তিনি পাটনা পুনরায় অধিকারের জন্য সেনাপতি মার্কারের অধীনে একদল সৈন্য পাঠান। তারা পাটনা শহর পুনরুদ্ধার করে এবং ইংরেজ কুঠি দখল করে। ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করে এবং এলিস ও অনেকে বন্দী হন।

(৩) প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ

নবাব এলিসের আকস্মিক আক্রমণের কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানান এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। মিস্টার অ্যামিয়ট মীরকাশিমের নিকট দৌত্যকার্যে ব্যর্থ হয়ে আরও কয়েকজন ইংরেজ সহ কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। মীরকাশিম পাটনার সংবাদ পেয়ে অ্যামিয়টের নৌকা আটক করার জন্য মুর্শিদাবাদে সংবাদ পাঠান। কিন্তু মিস্টার অ্যামিয়ট নবাবের আদেশ সত্ত্বেও নৌকা থেকে নামতে অথবা আত্মসমর্পণ করতে রাজি হলেন না বরং নবাবের নৌকা লক্ষ্য করে গোলা বর্ষণের আদেশ দেন। কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর নবাব সৈন্য অ্যামিয়টের নৌকা দখল করে। ইংরেজ সৈন্যদের অনেকেই বন্দী অথবা নিহত হয়। মিস্টার অ্যামিয়টও মৃত্যু মুখে পতিত হন। পাটনায় এলিস ও অন্যান্য ইংরেজদের বন্দী করায় কলকাতার কাউন্সিল মীরকাশিমের বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার পর ৭ই জুলাই অ্যামিয়টের মৃত্যু সংবাদে তারা মীর কাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং মীর জাফরকে পুনরায় নবাবী পদে অধিষ্ঠিত করেন। তবে এই দুর্ঘটনার অনেক পূর্বেই ইংরেজরা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এপ্রিল মাসে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং জুন মাসের মধ্যে সামরিক প্রস্তুতি সমাপ্ত হয়।

মীরকাশিম যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, এমন কথা বলা যায় না। এই যুদ্ধের সম্ভাবনায় তিনি ইয়োরোপীয় প্রথায় একদল সৈন্যকে সুশিক্ষিত করে তোলেন। নবাবের সৈন্য সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের বেশি ছিল। ইংরেজ সেনাপতি অ্যাডামস্ চার হাজার

সিপাহি ও সহস্রাধিক ইংরেজ সৈন্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মীরকাশিম মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য নিযুক্ত করেন এবং তাদের ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি অধিকার করার আদেশ দেন। কাশিমবাজার সহজেই নবাবের সৈন্য দ্বারা অধিকৃত হল এবং বন্দী ইংরেজদের প্রথমে মুঙ্গেরে ও পরে পাটনায় পাঠানো হয়। কিন্তু নবাবের সৈন্যাধ্যক্ষ তকীখানের সহিত মুর্শিদাবাদের নায়েব সৈয়দ মোহম্মদ খানের সদ্ভাব ছিল না। ফলে নবাবের সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে নবাবের একদল সৈন্যের সহিত অজয় নদীর তীরে ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। নবাবের সৈন্যদের সঙ্গে কোন কামান না থাকায় তারা খুব অসুবিধায় পড়ে এবং কিছুক্ষণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধের পর তারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য কলকাতা থেকে আগত জেনারেল অ্যাডামসের সঙ্গে যোগ দেওয়ার পরই ১৯শে জুলাই কাটোয়ার নিকট তকীখানের সহিত ইংরেজদের তুমুল যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তকীখান খুব বীরত্বের ও সাহসের পরিচয় দেন। কিন্তু মুঙ্গেরের সৈন্যবাহিনী ওই যুদ্ধে কোন অংশ গ্রহণ না করায় কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়। তকীখান যুদ্ধক্ষেত্রেই বীরের মৃত্যু বরণ করেন।

কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিজয়ী ইংরেজ সৈন্য মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়। মুর্শিদাবাদ রক্ষার জন্য যথেষ্ট সৈন্য ছিল, কিন্তু অযোগ্য ও অপদার্থ নায়েব নবাব মোহম্মদ মুঙ্গের পলায়ন করেন। এক রকম বিনাযুদ্ধেই মুর্শিদাবাদ ইংরেজদের হস্তগত হয়। মুর্শিদাবাদের অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ হিন্দুগণ মীরকাশিমের হাতে উৎপীড়িত হন। জগৎশেঠ, মহারাজ রাজবল্লভ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত হিন্দুগণকে মীর কাশিম মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ করে রেখেছিলেন, কারণ তাঁর মনে সন্দেহ হয় যে তাঁরা ইংরেজদের পক্ষভুক্ত। সুতরাং মুর্শিদাবাদে মীরজাফর ও ইংরেজ সৈন্য বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন।

(৪) গিরিয়ার যুদ্ধ

কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজদের বহুলোক ক্ষয় হয়। সুতরাং তারা নতুন দুই পলটন সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় অগ্রসর হয়। ২রা আগস্ট গিরিয়ার প্রান্তরে দুই দলে যুদ্ধ হয়। মীর বদরুদ্দিন ও আসাদুল্লা প্রভৃতি মীরকাশিমের সেনাপতিগণ অসীম বিক্রমে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত নবাবের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয় এবং ইংরেজ সেনাপতি অ্যাডামসের আক্রমণে নবাব সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করতে শুরু করে। নবাবের দুই প্রধান নায়ক সমরু ও মার্কার এই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থেকেও বিশেষ কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। সেজন্য অনেকে মনে করেন যে, তাঁরা নবাবের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নেই।

(৫) উধুয়ানালার যুদ্ধ

গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত নবাব সৈন্য কিছুদূর উত্তরে উধুয়ানালার দুর্গে আশ্রয় নেয়। এই দুর্গের একপার্শ্বে ভাগীরথী, অপর পাশে উধুয়া নামক নালা এবং মাঝখানে মুর্শিদাবাদ থেকে পাটনা যাওয়ার বাদশাহী সড়ক এবং রাজপথের পাশেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বতমালা উত্তর দিকে ক্রমশঃ বিস্তারিত। এই দুর্ভেদ্য গিরিসঙ্কটের দুর্গের নতুন প্রাচীর তৈরি করে মীরকাশিম তার উপর সারি সারি কামান সাজান। নবাব এই দুর্গ রক্ষার জন্য বহু সংখ্যক সৈন্যও মোতায়েন করেন। ইংরেজরা বহু গোলাবর্ষণ করেও দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু পরে এক বিশ্বাসঘাতক নবাবী সৈন্যের ষড়যন্ত্রে গোপনে রাত্রিবেলা ইংরেজ সৈন্য দুর্গে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে নবাবের সেনাপতি আরাটুন, মার্কাট ও গরগিন খাঁ বিনাযুদ্ধে শত্রুর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করে পলায়ন করেন। অনেকে মনে করেন যে, বিদেশী সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই উধুয়ানালা দুর্গ মীরকাশিমের হস্তচ্যুত হয়।

(৬) মীরকাশিমের প্রতিক্রিয়া

এইরূপ বারবার পরাজয় ও সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী শুনে মীরকাশিম উন্মাদের মতো আচরণ করতে শুরু করেন। তিনি ৯ই সেপ্টেম্বর ইংরেজ সেনাপতিকে পত্র লিখে জানান যে তাঁর সৈন্যদের অত্যাচারে তিনমাস যাবং বাংলাদেশ বিধ্বস্ত, সুতরাং তারা যদি এখনও নিরস্ত না হয় তাহলে তিনি এলিস ও অন্যান্য ইংরেজ-বন্দীদের হত্যা করবেন। সেনাপতিদের বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি সকলের উপরই সন্দিহান হয়ে ওঠেন এবং মুঙ্গের দুর্গে বন্দী জগৎশেঠ, রাজবল্লভ স্বরূপ চাঁদ, রামনারায়ণ প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের এবং আরও বহু বন্দীদের গলায় পাথর ভরা বস্তা বেঁধে দুর্গ প্রাকার হতে গঙ্গাবক্ষে নিক্ষেপ করে নির্মমভাবে হত্যা করেন। তারপর আবার আলি খান নামক একজন সেনানায়কের হাতে মুঙ্গের দুর্গের ভার অর্পণ করে তিনি পাটনায় গমন করেন। পথিমধ্যে দুজন সৈন্য গরগিন খানকে হত্যা করে। ইংরেজ সৈন্য ১লা অক্টোবর মুঙ্গের দুর্গ অবরোধ করে এবং আবার আলিখানের বিশ্বাসঘাতকতায় ঐ দুর্গ অধিকার করে। কিছু নবাবী সৈন্য ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে। এই সংবাদ শুনেই নবাব ইংরেজ বন্দীদের হত্যা করার আদেশ দেন। নৃশংস সমরু অতি নিষ্ঠুরভাবে এই আদেশ পালন করেন। • ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর একমাত্র ডাক্তার ফুলার্টন ব্যতীত পাটনার অন্যান্য ইংরেজ নর-নারী বালক-বালিকা সকলেই নিহত হয়।

(৭) মীরকাশিমের পলায়ন

ইংরেজ সৈন্য ২৮শে অক্টোবর পাটনায় উপনীত হয়। মীরকাশিম তার পূর্বেই সুশিক্ষিত অশ্বারোহীসহ পাটনা পরিত্যাগের ব্যবস্থা করেন। পাটনার দুর্গ রক্ষার যথেষ্ট বন্দোবস্ত থাকা সত্ত্বেও ৬ই নভেম্বর ইংরেজ সৈন্য এই দুর্গ অধিকার করে। ইতি মধ্যে পাটনা পরিত্যাগ করে তিনি অযোধ্যার নবাব উজীর সুজা-উদ্-দৌলার আশ্রয় ও সাহায্য ভিক্ষা করেন। কর্মনাশা নদীর তীরে পৌছে তিনি সুজা-উদ্-দৌলার চিঠি পান। তিনি তাঁকে আশ্রয় দিতে রাজি হন। মীর কাশিম সুজা-উদ্-দৌলার আশ্বাসের উপর নির্ভর করে এলাহাবাদে সসৈন্যে শিবির স্থাপন করেন। এই সময় বাদশাহ শাহ্ আলমও সুজা-উদ্-দৌলার আশ্রয়ে বাস করছিলেন। এই তিন দল যাতে মিত্রতাবদ্ধ হতে পারে সেজন্য মীরকাশিম শাহ্ আলম ও সুজা-উদ্-দৌলার নিকট গোপনে দূত পাঠান। ইতিমধ্যে মীরাকশিম প্রচুর অর্থ দিয়ে উভয়ের পাত্র-মিত্রকে বশীভূত করেন। ফলে শাহ আলম ও সুজা-উদ্-দৌলা বাংলাদেশ উদ্ধারের জন্য মীরকাশিমকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতি দেন।

(৮) বক্সারের যুদ্ধ

ইতিমধ্যে ইংরেজ পক্ষের অনেক পরিবর্তন ঘটে। অ্যাডামসের মৃত্যুর পর কারন্যাক এবং কারন্যাকের পর মেজর মনরো ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি নিযুক্ত হন। অপর দিকে পাটনার পশ্চিমের সমস্ত অঞ্চল বিনাযুদ্ধেই মীরকাশিমের হস্তগত এবং তিনি ও অযোধ্যার নবাব মিলিত হয়ে পাটনার ইংরেজ শিবির অবরোধ করেন। পরে বর্ষাকাল উপস্থিত হলে তিনি বক্সারে শিবির সন্নিবেশ করেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্য তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেনি। তবে বক্সারের শিবিরে অবস্থানকালে সমরু ও অন্যান্য কুচক্রীদের ষড়যন্ত্রে সুজা-উদ্-দৌলা মীরকাশিমের প্রতি খুব খারাপ ব্যবহার করেন। এমনকি মীরকাশিম সুজা-উদ্-দৌলার হস্তে বন্দীও হন। ইতিমধ্যে নবাব সৈন্য ইংরেজদের হস্তে পরাজিত হতে শুরু করে এবং ইংরেজ সৈন্য বক্সারের নিকট উপস্থিত হলে সুজা-উদ্ দৌলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর সুজা-উদ্-দৌলা ইংরেজদের আক্রমণ করেন। যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হয়। সঙ্গে সঙ্গে শাহ্ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। সুজা-উদ্-দৌলা ও মীরকাশিম রোহিলা-খণ্ডে পলায়ন করেন।

(৯) উপসংহার

ইংরেজদের সহিত মীরকাশিমের যুদ্ধের একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইভ মীরজাফর ও রায় দুর্লভের বিশ্বাসঘাতকতার ফলেই—জয়লাভ করেন এবং সেখানে বিশেষ কোন যুদ্ধও হয়নি। কিন্তু মীরকাশিমের সৈন্যদল ইংরেজ সৈন্যের তিন-চার গুণ বেশি ছিল। অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে তারা বীর বিক্রমে যুদ্ধও করে। সুতরাং তাদের পুনঃ পুনঃ পরাজয় এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করে যে ইংরেজরা সামরিক শক্তি ও নৈপুণ্যে ভারতীয়দের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং বাহুবলেই তারা বাংলাদেশে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে।

Q. 14. *Estimate the career and achievements of Robert Clive in Bengal.*

উত্তর ঃ (১) ক্লাইভের প্রথম জীবন

রবার্ট ক্লাইভ ১৭২৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কেরানীর চাকুরি নিয়ে মাদ্রাজে আসেন। কিছুদিন পরে তিনি কোম্পানার সামরিক বাহিনাতে যোগ দেন এবং ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই ক্যাপ্টেন পদে উন্নীত হন। কর্ণাটের দ্বিতায় যুদ্ধে ইংরেজ পক্ষ যখন ফরাসীদের হস্তে পরাভূত তখন রবার্ট ক্লাইভ এক নতুন যুদ্ধ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। তিনি শত্রুপক্ষকে ত্রিচিনোপল্লী আক্রমণ না করে আর্কট আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ক্লাইভের পরিকল্পনা অনুযায়া যুদ্ধ পরিচালিত হওয়ার ফলে ইংরেজদের পক্ষে কর্ণাটকের রাজধানী আর্কট অধিকার করা সম্ভব হয়। ক্লাইভ স্বয়ং এই যুদ্ধ পরিচালনা করেন। আর্কট অধিকারের পর দীর্ঘ ৫৩ দিন ধরে তিনি শত্রুপক্ষের আক্রমণ হতে আর্কট রক্ষা করতে সমর্থ হন। তারপর আর্ণি ও কাবেরীপাকের যুদ্ধে তিনি ফরাসীদের পরাজিত করে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করেন। ফলে কর্ণাটের সিংহাসনে ইংরেজদের সমর্থিত প্রার্থী মোহম্মদ আলিকে স্থাপন করে ইংরেজগণ কর্ণাটে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়। কাবেরীপাকের যুদ্ধে পরাজয়ের পর দক্ষিণ ভারতে ফরাসীদের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়। এইভাবে ক্লাইভের সামরিক দূরদৃষ্টি, সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে ইংরেজ স্বার্থ যেমন রক্ষা পায় তেমনই তাঁর খ্যাতি এবং মর্যাদা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

(২) ক্লাইভের বাংলাদেশে আগমন

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজ-উদ্-দৌলা কর্তৃক কলকাতা অধিকারের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছাবার পর ক্লাইভ ও ওয়াটসন্‌কে কলকাতার পুনর্দখলের জন্য প্রেরণ করা হয়। ক্লাইভ ও ওয়াটসন্ খুব সহজেই কলকাতা অধিকার করেন। কলকাতা জয়ের জন্য

নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলা পুনরায় সসৈন্যে উপস্থিত হ'লে একপ্রকার বিনাযুদ্ধেই ক্লাইভ তাঁকে পরাজিত করে এবং আলিনগরের সন্ধি বা ৯ই ফেব্রুয়ারীর চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই সন্ধির দ্বারা ইংরেজরা বিনাশুল্কে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার এবং অপরাপর নানাপ্রকার স্ববিধালাভ করে। তাছাড়া কলকাতায় তাদের দুর্গ নির্মাণের অধিকারও স্বীকৃত হয়।

(৩) ক্লাইভের ষড়যন্ত্র

আলিনগরের সন্ধির পরবর্তীকালে রবার্ট ক্লাইভ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তি ও স্বার্থবৃদ্ধির জন্য চক্রান্ত, জালিয়াতি, দুর্নীতি, অন্যায়, অবিচার প্রভৃতি সর্ব প্রকারের নীচ ও জঘন্য পন্থা অবলম্বন করেন। নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন কর্মচারীদের সহিত তিনি এক গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। এই সকল নবাব বিরোধী বিশ্বাসঘাতক কর্মচারিবর্গের নেতৃত্ব দেন সিরাজের সেনাপতি মীরজাফর আলি খান। ক্লাইভ প্রভূত পরিমাণ অর্থ ও বাণিজ্যের নানাপ্রকার সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলাকে মসনদচ্যুত করে মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপনের জন্য গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন।

(৪) পলাশীর যুদ্ধ

মীরজাফরের সহিত গোপন চুক্তির অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ক্লাইভ সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতির বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ঘটলে মীরজাফর বাংলার মসনদ অধিকার করেন। ক্লাইভ তথা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাবের পশ্চাতে থেকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তগত করেন। মীরজাফর কোম্পানীকে চব্বিশ পরগণার জমিদারী দান করলে কোম্পানী কর্তৃক ক্লাইভ এই জমিদারীর গভর্নর নিযুক্ত হন। ক্লাইভ স্বয়ং প্রভূত পরিমাণ অর্থ এবং একটি জায়গীর পারিতোষিক হিসাবে গ্রহণ করেন। মীরজাফরের চরম অর্থাভাবের কথা জেনেও রবার্ট ক্লাইভ মীরজাফর কর্তৃক প্রতিশ্রুত কোম্পানীর প্রাপ্য আদায় করতে বিলম্ব করেন নি। ঢাকা ও পূর্ণিয়ার বিদ্রোহ দমন এবং শাহজাদা আলি গৌহর কর্তৃক বিহার আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মীরজাফরকে সামরিক সাহায্য দানের জন্য প্রাপ্য অর্থও তিনি অবিলম্বে আদায় করেন। ইতিমধ্যে ইংরেজ প্রাধান্যে বিরক্ত হয়ে মীরজাফর ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদের বিতাড়িত করার চেষ্টা করলে ক্লাইভ ওলন্দাজদের বিদারার যুদ্ধে পরাজিত করেন, ফলে মীরজাফরের ইংরাজ প্রাধান্য

থেকে মুক্তির আশা যেমন বিনষ্ট হয়, তেমনই ওলন্দাজদের শক্তি হ্রাস পায়। এইভাবে যুদ্ধ, জালিয়াতি প্রভৃতির সাহায্যে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে ও প্রভূত পরিমাণ অর্থ নিয়ে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে রবার্ট ক্লাইভ ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ভ্যান্সিটার্ট বাংলাদেশের গভর্নর পদে নিযুক্ত হন।

(৫) ক্লাইভের বিদায়ের পর বাংলার রাজনীতির দুরবস্থা

ক্লাইভের স্বদেশ গমনের পর বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে দারুন অরাজকতা দেখা দেয়। মীরজাফরের দুর্বলতার অজুহাতে ইংরেজ কোম্পানী তাঁর পরিবর্তে মীরকাশিমকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। নতুন নবাব মসনদে স্থাপন করা কোম্পানীর অর্থাগমের এক অভিনব পন্থা হয়ে দাঁড়ায়। কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় দুর্নীতিও প্রবলভাবে দেখা দেয়। কোম্পানীর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে ইংরেজ কর্মচারিগণ ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে বাণিজ্য শুল্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে মীরকাশিমের সহিত ইংরেজ কোম্পানীর দ্বন্দ্ব দেখা দিলে তাঁরা মীর কাশিমকে পদচ্যুত করে আবার মীর জাফরকে সিংহাসনে স্থাপন করে। অপরদিকে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় ইংলণ্ডের ডাইরেক্টর বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে দারুণ চিন্তা দেখা দেয়। এই অব্যবস্থা ও দুর্নীতির অবসানের জন্য তাঁরা রবার্ট ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্নর পদে নিযুক্ত করেন। ভারতবর্ষে কোম্পানীর স্বার্থবৃদ্ধি ও কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ লর্ড উপাধিতে ভূষিত হন।

(৬) ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনকাল

ক্লাইভের প্রথমবারের শাসন অভিজ্ঞতা তাঁকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। প্রথমতঃ, তিনি বুঝতে পারেন যে, কোম্পানীর অধিকৃত রাজ্যের সীমা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং সেজন্য একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর তার শাসন দায়িত্ব ন্যস্ত করা উচিত নয়। এই বিষয়ে তিনি ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী পিটের নিকট পত্রও লেখেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি একথা মনে করতেন যে, দেশীয় নৃপতিদের উপর নির্ভর করে ইংরেজগণের পক্ষে ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়, এজন্য ইংরেজদের স্বার্থের খাতিরে দেশীয় নৃপতিদের ইংরেজ কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল করে তুলতে হবে। তৃতীয়তঃ, কোম্পানীর পক্ষে প্রকাশ্যভাবে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ এইরূপ করা হ'লে অপরাপর ইয়োরোপীয় বণিক

সম্প্রদায় এবং দেশীয় নৃপতিদের মনে সন্দেহ ও ঈর্ষার উদ্রেক হবে। চতুর্থতঃ, ইংরেজদের অধিকার বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সমাচীন হবে এবং এই তিনটি প্রদেশের নিরাপত্তা বিধানের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গভর্নর হয়ে উপরি-উক্ত নীতিগুলোকে কার্যকরী করার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা শুরু করেন।

(৭) সুজা-উদ্-দৌলার সহিত সন্ধি এবং শাহ্ আলমের কাছ থেকে দেওয়ানী লাভ

ক্লাইভ ভারতে পদার্পণ করেই বক্সারের যুদ্ধে পরাজিত সুজা-উদ্-দৌলা এবং শাহ আলমের সহিত বোঝাপড়া করতে অগ্রসর হন। তিনি তখন ইচ্ছা করলেই অযোধ্যার নবাবকে পদচ্যুত করতে পারতেন কিন্তু দেশীয় নৃপতিদের ইংরেজের উপর নির্ভরশীল রাখার এবং প্রকাশ্যে ক্ষমতা গ্রহণ না করা এবং সর্বোপরি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সীমানার বাইরে রাজ্য বিস্তার না করার নীতি অনুসরণ করে তিনি সুজা-উদ্-দৌলার নিকট থেকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং কারা ও এলাহাবাদ—এই দুটি স্থান আদায় করেন। দিল্লীর সম্রাট শাহ্ আলম তখন নামেমাত্রই সম্রাট। তাঁর পিতার নৃশংস হত্যার পর তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করে সিংহাসন অধিকার করতে তখনও সমর্থ হন নি। লর্ড ক্লাইভ শাহ্ আলমকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুটি দান করেন এবং তার পরিবর্তে প্রতি বছরে ২৬ লক্ষ টাকা কর দানের শর্তে সম্রাটের নিকট থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই আগস্ট বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। দেওয়ানী লাভের সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর আইনতঃ বাংলা সুবার রাজস্ব আদায়ের অধিকার প্রাপ্ত হয়। বাংলাদেশে তথা ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপনের ইতিহাসে ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ এক যুগান্তকারী ঘটনা। দেওয়ানী লাভের ফলে একদিকে যেমন বাংলার নবাব কোম্পানীর উপর অর্থের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে অপর দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মর্যাদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

(৮) নবাব নাজিম-উদ্-দৌলার সহিত বন্দোবস্ত

নবাব নাজিম-উদ্-দৌলাকে ক্লাইভ প্রতি বছর ৫৩ লক্ষ টাকা ভাতাদানের বিনিময়ে বাংলা সুবার রাজস্বের উপর তাঁর দাবি ত্যাগ করতে সম্মত হন। নাজিম-উদ্-দৌলার মসনদ লাভের পর মোহম্মদ রেজা খানকে নায়েব নাজিম বা সহকারী সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। ক্লাইভ দুর্লভ রায় ও জগৎ শেঠকে রেজা খানের সহকারী নিযুক্ত করে একই

হস্তে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া রাজা সীতাব রায়কে পাটনার বাণিজ্য কুঠির প্রধান-এর সহিত যুগ্মভাবে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শাসনকার্যে নাজিম-উদ্-দৌলা নিযুক্ত থাকলেও মীরকাশিমের মতো তাঁর উত্থানের সম্ভাবনা চিরতরে বিনষ্ট হয়।

(৯) দ্বৈত-শাসন প্রবর্তন

কোম্পানীর কর্মচারীদের দেশীয় রাজস্বব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, তাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং সবোপরি বিদেশী বণিক-সম্প্রদায়ের ঈর্ষা প্রভৃতির কথা বিবেচনা করে ক্লাইভ দেওয়ানীর কাজ প্রকাশ্য হস্তে গ্রহণ করলেন না। দেওয়ানী সংক্রান্ত কাজের প্রধান দুটি দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় করা ও দেওয়ানী মামলার বিচার করা। নবাবের উপর এইসব দায়িত্ব পূর্বের মতোই ন্যস্ত থাকল। অথচ রাজস্বের মালিক তখন থেকে হল ইংরেজ কোম্পানী। ফলে নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এবং কোম্পানী পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। এই অদ্ভুত ব্যবস্থাই ইতিহাসে দ্বৈত-শাসন নামে পরিচিত। এরূপ অকার্যকর ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বাংলাদেশের প্রজাবর্গের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

(১০) ক্লাইভের সংস্কার

ক্লাইভ দ্বিতীয়বার যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তার উপর ডাইরেক্টর সভার বিশেষ নির্দেশ ছিল কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ দুর্নীতির অবসান ঘটানো। ক্লাইভ কলকাতায় পৌছেই কোম্পানীর কর্মচারবর্গের দুর্নীতি ও স্বার্থপরতার যে পরিচয় পান, তা সাধারণ ক্ষমতা প্রয়োগে দূরকরা অসম্ভব ছিল। ডাইরেক্টরদের নির্দেশ অনুসারে তিনি তাঁকে সাহায্য করার জন্য সিলেক্ট কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেন এবং সামরিক ও বেসামরিক যাবতীয় ক্ষমতা নিজের হস্তে গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি কোম্পানীর কর্মচারিবর্গের পক্ষে কোন প্রকার পারিতোষিক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করেন। ইংরেজ কর্মচারীদের পক্ষে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করাও নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতন অল্প ছিল বলে তিনি লবণ, সুপারি ও তামাকের একচেটিয়া কারবারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের তাদের পর্যায় অনুসারে এই ব্যবসায়ের লাভের অংশ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কোম্পানীর কলিকাতাস্থ কাউন্সিলের সভ্যগণ প্রায়ই বিভিন্নস্থানের বাণিজ্য কুঠির

প্রধানের কাজ গ্রহণ করে কলকাতার বাইরে চলে যেতেন, কারণ তাতে নানা অবৈধ উপায়ে অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ পাওয়া যেত। ফলে কলকাতা কাউন্সিলে কাজের ব্যাঘাত ঘটত। তিনি দুর্নীতি পরায়ণ কাউন্সিলদের পাঁচজনকে অবসর নিতে বাধ্য করেন এবং অপর তিনজনকে সদস্য পদ থেকে অপসারিত করেন। এইভাবে তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দুর্নীতির অবসান ঘটান। ক্লাইভ কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীকে নতুনভাবে গঠন করে জেনারেল কারন্যাককে কোম্পানীর সেনাবাহিনীর সৈনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন। সেনাবাহিনীর ব্যয়-হ্রাসের উদ্দেশ্যে তিনি মীরজাফরের আমলে প্রচলিত সৈন্যদের ডবল-ভাতা বন্ধ করে দেন। তবে তিনি যুদ্ধে নিযুক্ত থাকার সময় সৈন্যদের ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ভাতা বন্ধ করার ফলে সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে ক্লাইভ কঠোর হস্তে তা দমন করেন।

(১১) ক্লাইভের চরিত্র

কোম্পানীর একজন সামান্য কেরানী হিসেবে জীবনযাত্রা সুরু করে যে ব্যক্তি এই বিশাল দেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পত্তনের জন্য মূলতঃ দায়ী, তাঁর বীরত্ব, কৌশলী বুদ্ধি, এবং প্রকৃতির দৃঢ়তা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। নেতৃত্ব করবার যথার্থ ক্ষমতা যে অল্প কয়জনেরই থাকে, ক্লাইভ নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম। সামরিক প্রতিভার দিক থেকেও তাঁর স্থান উচ্চ বলেই নির্দেশ করা চলে। মুষ্টিমেয় ইংরেজ সৈন্য এবং নিছক ভাড়াটিয়া দেশীয় সৈন্যের সাহায্যে তিনি যেভাবে নবাব এবং ফরাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন তাতে তাঁর সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বেসামরিক কর্মচারীদের মধ্যে থেকে সৈন্য তৈরি করে তার সাথে ভাড়াটিয়া দেশীয় সৈন্য যোগ করে ও সমগ্র সৈন্যবাহিনীতে তিনি সুন্দর নিয়মানুবর্তিতা ও শৃংখলা বজায় রাখেন, আবার শান্তির সময়ে ডবল-ভাতা বন্ধ করে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হয়, তাও তিনি অঙ্কুরেই বিনষ্ট করেন। ইংরেজদের অনুগৃহীত মোহম্মদ আলিকে চাঁদা সাহেব ত্রিচিনোপল্লীতে অবরোধ করলে চাঁদা সাহেবের রাজধানী আরকট আক্রমণ করে তিনি যে প্রত্যুৎ-পন্নমতিত্বের পরিচয় দেন, এই সকলের মধ্যেই তাঁর সামরিক প্রতিভা এবং দৃঢ়তা সুপরিস্ফুট।

দিল্লী অধিকার করা যখন তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ সাধ্য হয়ে পড়ে তখন, নিজের সামর্থ্যের সীমা উপলব্ধি করে তিনি যে, তা থেকে বিরত হন, সম্রাটরূপে বিবেচিত শাহ আলমকে তিনি যেভাবে বশীভূত করেন, প্রকৃত শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়েও ইয়োরোপীয় প্রতিপক্ষ সমূহের ঈর্ষা পরিহারের জন্য যেভাবে তিনি নবাবী ক্ষমতার

আড়ালেই অবস্থান করবার সিদ্ধান্ত করেন, এইসব প্রত্যেকটি কাজের মধ্যেই তাঁর কৌশলী মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। আবার অব্যবস্থিতচিত্ত বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁকে যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তাতেও ক্লাইভের যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ যে বিশ্বাসঘাতক সকলের কাজেই সে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। বিশ্বাসঘাতকতা করা সহজ কিন্তু বিশ্বাসঘাতককে নিয়ে ঠিক মত এগিয়ে যাওয়া সহজ নয়।

এইসব গুণ থাকা সত্ত্বেও রাজনীতিক ও কর্মী হিসেবে ক্লাইভের চরিত্রে যে কলঙ্ক পড়ে, তাও দুরপনেয়। তাঁর শঠতা একাধিক ক্ষেত্রেই শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। উমিচাদকে প্রবঞ্চিত করার জন্য তিনি দুখান দলিল তৈরী করেন এবং তাতে ওয়াটসনের স্বাক্ষর জাল করেন, এটা অত্যন্ত অশোভন এবং নীচ কাজরূপে গণ্য। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা এই কাজকে অত্যধিক দোষাবহরূপে গণ্য করেন না। ষড়যন্ত্র এবং বিশ্বাসঘাতকতার আবহাওয়ার মধ্যে এরূপ কার্য সমর্থনযোগ্য বলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইঙ্গিত প্রদানও করেন। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে তার কয়েকবছর পরেই ইংরেজ আইনানুসারে বিচার করে মহারাজ নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া হয় কিন্তু, ইংরেজ ক্লাইভের উপর ইংরেজী আইন প্রয়োগ করা হয় নি। ব্যক্তিগতভাবে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকলের কাছ থেকেই তিনি যে উপহারাদি গ্রহণ করতেন নানাভাবে তার যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, কিন্তু সুষ্ঠু এবং সঙ্গতঃ কর্মপন্থার দৃষ্টান্ত রেখে যাওয়াই নেতা ও রাজনীতিজ্ঞের কাজ। প্রকৃত রাজনীতিজ্ঞ পথ-প্রদর্শক নিছক পদাঙ্ক অনুসরণকারী নন। কোম্পানীর প্রতিপত্তির জন্য তিনি ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং মিথ্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ করতে পশ্চাৎপদ হন নি। কোম্পানীর নির্দেশ অমান্য করে কোম্পানীর কর্মচারীদের জন্য তিনি যে বাণিজ্য-সংস্থা গঠন করেন তাও অত্যন্ত গর্হিত কর্মপন্থা অনুসরণের পরিচায়ক। অধিকন্তু এদেশে রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের জন্য তাঁর প্রয়াস ছিল, অথচ তার দায়িত্ব গ্রহণের দিকে এবং জনগণের কল্যাণের দিকে তাঁর কোন দৃষ্টি ছিল না, এটা হৃদয় হীনতারই নামান্তর।

Q. 15. *Discuss briefly the administration of Warren Hastings.*

উত্তরঃ (১) ভূমিকা

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর হিসাবে শাসনভার গ্রহণ করেন তখন ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার যাবতীয় ত্রুটি ব্যাপকভাবে দেখা দেয়। বিশেষতঃ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের (বাংলা ১১৭৬ সন) দুর্ভিক্ষের সময়

দ্বৈত-শাসনব্যবস্থার ত্রুটিগুলো স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায়। হেষ্টিংস ডাইরেকটরের সভার নির্দেশে ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে এপ্রিল মাসে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে দেওয়ানী পরিচালনার ভার কোম্পানীর হস্তে ন্যস্ত করেন। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর থেকেই কোম্পানী দেওয়ানী লাভের সুযোগ-সুবিধা সবই ভোগ করতে সমর্থ হ'য়েও দেওয়ানী সম্পর্কে যাবতীয় দায়িত্ব ছিল নবাবের উপর। কিন্তু ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে হেষ্টিংস সরাসরি কোম্পানীর হস্তে দেওয়ানীর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি নবাবের বার্ষিক ভাতা ৩২ লক্ষ মুদ্রা থেকে হ্রাস করে ১৬ লক্ষ টাকা স্থির করেন এবং রেজা খান ও সীতাব রায়কে পদচ্যুত করে দেওয়ানের পদ দুটি খারিজ করেন। শাসনতান্ত্রিক এই পরিবর্তন সাধন করার পরই হেষ্টিংস রাজস্ব বিভাগ পুনর্গঠন করেন।

(২) শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হেষ্টিংসের নীতি ছিল রাজস্ব আদায়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা এবং দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করা। দ্বৈত-শাসনের ফলে শাসন ক্ষেত্রে যে অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল ও অর্থাভাব দেখা দিয়েছিল তা দূর করাই ছিল হেষ্টিংসের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। শাসন ক্ষেত্রের এই বিশৃঙ্খলা দূর করার উদ্দেশ্যে হেষ্টিংস Committee of Circuit অথবা ভ্রাম্যমাণ কমিটি নামে একটি ক্ষুদ্র সভা গঠন করেন। এই কমিটি প্রত্যেক জেলায় উপস্থিত হয়ে জমিদারদের সহিত জমি বন্দোবস্ত করার দায়িত্ব গ্রহণ করে। জমিদারদের এক সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য জমিদারির বন্দোবস্ত দেওয়া হবে বলে স্থির হয়। কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের ভার প্রাপ্ত কর্মচারিগণ পূর্বে সুপার ভাইজার বা পরিদর্শক নামে অভিহিত হতেন। হেষ্টিংস তাদের কালেক্টর নামকরণ করেন। দেওয়ানীর কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। এই সময়ই গভর্নর ও তার কাউন্সিল নিয়ে একটি রেভিনিউ বোর্ড গঠিত হয়। দেওয়ানী সংক্রান্ত কার্যাদির সর্বোচ্চ দায়িত্ব এই বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের রাজস্ব-ব্যবস্থা সদিচ্ছা-প্রসূত হ'লেও তা সাফল্য লাভ করেছিল একথা বলা চলে না। হেষ্টিংস ব্যক্তিগতভাবে পূর্বেকার জমিদারদের সহিত বন্দোবস্তের পক্ষপাতী থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তা করা সম্ভব হয় নি। কার্যক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয় তাদেরই জমিদারি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জমিদারগণ যেমন তাদের জমিদারি থেকে বঞ্চিত হয়, তেমনই কোম্পানী এই অনভিজ্ঞ রাজস্ব আদায়কারীদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। ওয়ারেন হেষ্টিংসের সময় প্রবর্তিত বার্ষিক বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারগণ প্রতি বছরই

নতুন করে বন্দোবস্ত গ্রহণ করতেন কিন্তু তাঁরা নিজ জমিদারি থেকে কোন কালেই বঞ্চিত হতেন না। কিন্তু অভিজ্ঞ জমিদারদের পরিবর্তে অধিক রাজস্বের লোভে যে কোন ব্যক্তির সহিত রাজস্ব বন্দোবস্ত এবং অনভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারিবর্গের হাতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব স্থাপনে হেস্টিংসের রাজস্ব-ব্যবস্থা সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

(৩) রাজস্ব নীতির পরিবর্তন

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসেই ডাইরেক্টর সভার নির্দেশক্রমে রেভিনিউ বোর্ড ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের জমি-বন্দোবস্তের পরিবর্তনের প্রশ্ন আলোচনা করতে বাধ্য হয়। সেই সময় ওয়ারেন হেস্টিংস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকরী করতে হ'লে রাজস্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন হবে মনে করে অস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু রাখাই কাউন্সিল যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করে। এইজন্য বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাকে ছটি ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি ভাগে একটি করে প্রাদেশিক কাউন্সিল স্থাপন করা হয়। প্রত্যেক কাউন্সিলের কার্যে সাহায্য করার জন্য একজন করে দেশীয় দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি জেলায় কালেক্টরের পদ তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে কেবলমাত্র ইংরেজ কর্মচারিবর্গের হস্তে রাজস্ব আদায়ের যে ভার দেওয়া হয়, তা ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ ও দেশীয় কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা হয়। এই কারণে, হেস্টিংসের আমলে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব প্রধানতঃ পরীক্ষামূলকই ছিল সে কথা বলা যেতে পারে। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস আমিনি কমিশন (Amini Commision) নিযুক্ত করে রাজস্ব সংক্রান্ত নানাপ্রকার মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেন এবং ঐসব তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক কাউন্সিল বাতিল করে পুনরায় কালেক্টরদের নিয়োগ করেন। তাছাড়া, পূর্বে তিনি জমিদারদের জমি ইজারা দেওয়ার যে ব্যবস্থা করেছিলেন তা বাতিল করে পুনরায় পুরাতন রীতি অনুযায়ী জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করেন। এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে কয়েকটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রথমতঃ, পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় যে ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং তাদের যে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল তা ইতিমধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এমন কি জমিদারির অধীনস্থ প্রজাবর্গের নিরাপত্তা, তাদের বিচার প্রভৃতি কাজ বা দায়িত্ব এখন আর তাদের ছিল না। প্রকৃতপক্ষে জমিদারগণ পুরোপুরি রাজস্ব আদায়কারীতে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোম্পানীর হাতে শাসনব্যবস্থা ন্যস্ত হওয়ার ফলে জমিদারদের পূর্বেকার মর্যাদা আর ছিল না।

সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দেওয়ার শর্তে জমি নির্দিষ্টকালের জন্য অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদের হাতে কিছুকাল থাকার ফলে পূর্বেকার জমিদারি প্রথার মূল ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ কোম্পানী কর্তৃক অত্যধিক পরিমাণ রাজস্ব নির্ধারণের ফলে জমিদারদের অর্থনৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় বারবার জমিদারি হস্তান্তরিত হয় এবং জমিদারি প্রথার প্রতিপত্তি ও মর্যাদা একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়। চতুর্থতঃ চিরাচরিত জমিদারি ব্যবস্থায় জমিদারগণ পূর্বে বিদ্বান ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানকে পৃষ্টপোষকতা করার যে নীতি অনুসরণ করতেন, তাও একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তখন থেকে রাজস্ব আদায়ই জমিদারদের একমাত্র কর্তব্যে পরিণত হয়।

(৪) বিচার বিভাগীয় সংস্কার

মোগল আমলে প্রচলিত শাসনব্যবস্থায় দেওয়ানকে রাজস্ব আদায় এবং জমি সংক্রান্ত মামলা মোকদ্দমার বিচার এই দুই প্রকার কার্য সম্পাদন করতে হ'ত। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করার ফলে স্বভাবতঃই দেওয়ানী বিচারের দায়িত্বও তাদের উপর ন্যস্ত হয়। সুতরাং ব্রিটিশ শাসনের প্রথম দিকে রাজস্ব ব্যবহার কোনপ্রকার ব্যাপক পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবেই দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ফৌজদারী বিচারের দায়িত্ব ছিল নবাবের উপর। এজন্য ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রে কোম্পানীর কোনপ্রকার পরিবর্তনের ক্ষমতা ছিল না। তথাপি কোম্পানী ফৌজদারী বিচারের ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে পরিবর্তন সাধনে দ্বিধাবোধ করে নি।

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রবর্তন করেই বিচার বিভাগের সংস্কারে হস্তক্ষেপ করেন। Committee of Circuit-এর সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক জেলায় তিনি একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপন করেন। এগুলোর নামকরণ হয় মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত।

জমিদারি ও তালুকদারির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমা ভিন্ন অপরাপর যাবতীয় দেওয়ানী অর্থাৎ ভূমি-সংক্রান্ত মামলার বিচারের ভার এই আদালতের উপর ন্যস্ত হয়। এই আদালতের সভাপতিত্ব করতেন কালেক্টর স্বয়ং। জমিদারির তালুকদারির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মামলার বিচার ক্ষমতা ছিল সদর দেওয়ানী আদালতের হস্তে। গভর্নর ও তাঁর কাউন্সিলের দুজন সদস্য নিয়ে এই আদালত গঠিত হ'ত। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এই সদর দেওয়ানী আদালত স্থাপিত

হয়। এই ব্যবস্থার ফলে পূর্বে জমিদারদের যে সামান্য বিচারের ক্ষমতা ছিল তা বাতিল হয়ে যায়।

মফঃস্বল ফৌজদারী আদালত যাবতীয় ফৌজদারী মামলার বিচারের ক্ষমতা লাভ করে। কেবলমাত্র যে সকল মোকদ্দমায় আসামীকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ত, সেই সকল মোকদ্দমা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য সদর নিজামত আদালতে প্রেরণ করা হ'ত। নাজিম অর্থাৎ নবাব স্বয়ং ছিলেন এই আদালতের সভাপতি। প্রাণদণ্ডাদেশ নবাব কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। ফৌজদারী আদালতে কাজী ও মুফ্‌তি দুজন মৌলবীর সাহায্যে আইনের ব্যাখ্যা করতেন। মফঃস্বল ফৌজদারী আদালতের উপরও কালেক্টরের পরিদর্শন ক্ষমতা ছিল। সফর নিজামত আদালতে আইনের ব্যাখ্যার ভার ছিল প্রধান কাজী, প্রধান মুফ্‌তি ও তিনজন খ্যাতিসম্পন্ন মৌলবীর উপর। সফর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ছিল। এই আদালতের উপরও ইংরেজদের পরিদর্শনের অধিকার ছিল।

(৫) অন্যান্য সংস্কার

হেস্টিংস শাসনকার্যের সুবিধার জন্য আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধন করেন। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিচারালয়ে মামলা সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; দ্বিতীয়তঃ, অন্ততঃ বারো বছরের মধ্যে মোকদ্দমা না করলে মোকদ্দমা তামাদি হয়ে যাওয়ার রীতি প্রবর্তন; তৃতীয়তঃ, দেনাদারকে পাওনাদারের নিজগৃহে নিয়ে নির্যাতন করার অধিকার নাকচ করা; চতুর্থতঃ, অত্যধিক পরিমাণ অর্থ জরিমানা করা নিষিদ্ধ করা; পঞ্চমতঃ, সুদের হার একশ টাকা পর্যন্ত মাসিক শতকরা ৩.১২ এবং একশ টাকার বেশি অর্থের জন্য মাসিক ২.০০ টাকায় নির্দিষ্ট করে দেওয়া প্রভৃতি কতিপয় ক্ষুদ্র অথচ খুব গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার হেস্টিংস কর্তৃক গৃহীত হয়। ষষ্ঠতঃ, দেওয়ানী বিচারে হিন্দু প্রজার ক্ষেত্রে হিন্দু-ধর্মশাস্ত্রের এবং মুসলমান প্রজার ক্ষেত্রে কোরাণের বিধি-নিয়ম প্রয়োগের নীতি হেস্টিংস স্বীকার করে নেন। সপ্তমতঃ বিচার প্রার্থীদের নিকট থেকে পূর্বে কাজী, মুফ্‌তি প্রভৃতি অর্থ গ্রহণ করতেন। হেস্টিংস এই নিয়ম বাতিল করে তাদের নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন।

(৬) উপসংহার

হেস্টিংসের সংস্কার শাসনতন্ত্রের প্রায় প্রতিটি বিভাগকে স্পর্শ করে। উপযুক্তভাবে প্রস্তুত না হয়ে এবং অনেক সময় তথ্যাদির অভাবের জন্য হেস্টিংসের অনেক সংস্কারে

যথেষ্ট ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখা যায়। পরবর্তীকালে সেজন্য অনেক জটিলতারও সৃষ্টি হয়। তাহলেও একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে হেষ্টিংসের বিভিন্ন সংস্কারের মূল সূত্রের উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামো গড়ে ওঠে। শাসন সংস্কারের পথিকৃৎ হিসাবে হেষ্টিংসের নাম ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে অবশ্যই চিরস্মরণীয়।

Q. 16. *Give an account of Hastings policy towards Rohillas. Was the Rohilla war 'statesmanlike defensible'.*

উত্তর : (১) প্রথম রোহিলা যুদ্ধ :

দক্ষিণ ভারত হতে উত্তর ভারতের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের সূচনা থেকেই মারাঠাশক্তি সুযোগ পেলেই রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে স্থানীয় অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করত। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট শাহ্ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করে প্রথমেই মারাঠাগণ রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে। রোহিলা সর্দার নাজিম-উদ্-দৌলার পুত্র জবিতা খান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সুজা-উদ্-দৌলার রাজ্যে অযোধ্যায় আশ্রয় গ্রহণ করে। সুজা-উদ্-দৌলা মারাঠা কর্তৃক রোহিলা আক্রান্ত হওয়ায় অত্যন্ত ভীত হয়ে নিজ রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য সীমান্ত অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করেন। তাছাড়া রোহিলাখণ্ডের সহিত তাঁর খুব সদ্ভাব না থাকার জন্য তিনি রোহিলাখণ্ডের অধিবাসীরা যাতে তাঁর রাজ্যে প্রবেশ না করে সেদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট স্যার রবার্ট বার্কারের প্রচেষ্টায় ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জুন সুজা-উদ্-দৌলা ও রোহিলাদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। সুজা-উদ্-দৌলা রোহিলাখণ্ড থেকে মারাঠাদের বিতাড়িত করতে সমর্থ হলে তদানীন্তন রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমৎ খান তাকে ৪০ লক্ষ টাকা পুরস্কার হিসাবে দান করতে প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই মারাঠাগণ রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করলে হাফিজ রহমৎ খান পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে মারাঠাদের নিরস্ত করেন। সুজা-উদ্-দৌলা হাফিজ রহমৎ খানের এইরূপ আচরণকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেন। রহমৎ খানও নিজের ভুল বুঝতে পেরে সুজা-উদ্-দৌলার সহিত আবার যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত রোহিলা ও অযোধ্যার নবাবের যুগ্মবাহিনী মারাঠাগণকে রোহিলাখণ্ড হতে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়। সেই সময় পেশোয়া প্রথম মাধবরাও নারায়ণের মৃত্যুতে মারাঠা রাজ্যের রাজধানী পুনায় গোলযোগ উপস্থিত হলে মারাঠাগণ উত্তর ভারতের সামরিক অভিযান অসমাপ্ত রেখেই স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মারাঠাদের অনুপস্থিতির সুযোগে নবাব সুজা-উদ্-দৌলা রোহিলা রাজ্য জয় করার সুযোগ পান। রোহিলা রাজ্য জয়

করার আকাঙ্ক্ষা অযোধ্যার নবাব বহুদিন পূর্ব থেকেই পোষণ করছিলেন। উত্তর ভারতে মারাঠাদের অনুপস্থিতির সুযোগে সুজা-উদ্-দৌলা রোহিলাখণ্ড জয় করার জন্য ব্রিটিশ সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের বেনারসের সন্ধির শর্ত অনুযায়ী হেস্টিংস সুজা-উদ্-দৌলাকে সামরিক সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। সুজা-উদ্-দৌলা ইংরেজ সেনাবাহিনীর ব্যয় ভিন্ন আরও ৪০ লক্ষ টাকা কোম্পানীকে দিতে রাজি হন। ওয়ারেন হেস্টিংস কর্নেল চ্যাম্পিয়ানের ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এক ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে সুজা-উদ্-দৌলার সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেন। অযোধ্যার ও ব্রিটিশ বাহিনীর আক্রমণে মিরনপুর কাটরার যুদ্ধে হাফিজ রহমৎ খান পরাজিত ও নিহত হন। রোহিলাখণ্ড সুজা-উদ্-দৌলার রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হয়।

(২) দ্বিতীয় রোহিলা যুদ্ধ ঃ

পরবর্তী রোহিলা সর্দার ফৈজ-উল্লা খান বিচ্ছিন্ন রোহিলাসৈন্যের একাংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করে গাঢ়োয়াল পর্বতের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে অযোধ্যার সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন। এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ফৈজ-উল্লা খান সুজা-উদ্-দৌলা অধিকৃত রোহিলাখণ্ডের অভ্যন্তরে অকস্মাৎ হানা দিয়ে লুঠতরাজ শুরু করেন। ফলে রোহিলাখণ্ডের সর্বত্র অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং রোহিলার অধিবাসীরাও ফৈজ-উল্লা খানের সহিত সহযোগিতা শুরু করে। এইরূপ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সুজা-উদ্-দৌলা লালডাং-এর সন্ধি দ্বারা ফৈজ-উল্লা খানকে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি রামপুর ফিরিয়ে দেন। তবে লালডাং চুক্তিতে স্থির হয় যে, ফৈজ-উল্লা খান অধীনস্থ সৈন্যসংখ্যা কখনও পাঁচ হাজারের বেশি হতে পারবে না এবং এই সৈন্যবাহিনী প্রয়োজনবোধে অযোধ্যার নবাবকে সাহায্য দান করতে বাধ্য থাকবে। ফৈজ-উল্লা খান চুক্তিতে এই দুটি শর্ত মেনে নিতে রাজি হলে উভয় পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

(৩) হেস্টিংসের রোহিলা নীতির সমালোচনা ঃ

রোহিলা যুদ্ধে অযোধ্যার নবাব ওয়াজীর সুজা-উদ্-দৌলাকে ব্রিটিশ সৈন্য সাহায্য দানের যৌক্তিকতা ও নৈতিকতা সম্পর্কে সমসাময়িক কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ঐতিহাসিকদের মধ্যে দুটি পরস্পরবিরোধী মত দেখা দেয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের ইমপিচমেন্ট-এর সর্বপ্রধান অভিযোগই ছিল রোহিলা যুদ্ধের সময় অর্থের বিনিময়ে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে ভাড়াটিয়া সৈন্যের ন্যায় ব্যবহার করা। তারপরে ওয়ারেন

হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগটি বাদ দেওয়া হয়। বার্ক, ফ্রান্সিস্, মিল, মেকলে, লায়েল প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিকের মতেই রোহিলা যুদ্ধে সৈন্য সাহায্য দানের একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল অর্থ লাভ করা। রোহিলাখণ্ডের জনসাধারণ বা শাসকদের সহিত ইংরেজদের কোন বিরোধিতা ছিল না বা তারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার শত্রুতা সাধনের জন্যও কোনপ্রকার চেষ্টা করে নি। চল্লিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে ইংরেজদের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন একটি স্বাধীন জাতির বিরুদ্ধে সৈন্যপ্রেরণ মানবিকতা ও নৈতিকতার বিচারে সমর্থনযোগ্য নয়। সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে এই মত পোষণ করেন কিন্তু ফরেস্ট, স্ট্রেচি প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ডাইরেক্টর সভার সহিত হেস্টিংসের পত্রালাপ, ইম্পিচমেন্টের সময় হেস্টিংসের জবাব প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচনা করে সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁদের মতে রোহিলা যুদ্ধ মূলতঃ ব্রিটিশ অধিকারের নিরাপত্তার যুক্তিতেই সমর্থনযোগ্য। মারাঠাদের সহিত আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধ করার সামর্থ্য বা মনোবৃত্তি রোহিলাদের ছিল না। তাছাড়া রোহিলাখণ্ড মারাঠাদের দ্বারা অধিকৃত হলে শুধুমাত্র ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ বন্ধুরাষ্ট্র অযোধ্যার নয়, বাংলাদেশের নিরাপত্তাও ব্যাহত হ'ত। তাঁদের মতে রোহিলা যুদ্ধের সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ ছিল রোহিলা নীতি প্রসূত উদ্বৃত্ত সুবিধা। ঐতিহাসিক স্ট্রেচির মতে হেস্টিংসের রোহিলা নীতির বিচারে সেই সময় কোম্পানীর অর্থাভাব এবং সমসাময়িক নৈতিকতার কথা বিস্মৃত হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। হেস্টিংসের রোহিলা নীতি সমর্থন করতে গিয়েও একথাও বলা হয় যে, সুজা-উদ্-দৌলার রাজ্যের সহিত যুক্ত হওয়ার পরে রোহিলাখণ্ডে আর কোন গোলযোগ দেখা দেয় নি এবং মারাঠাগণও আর নতুন করে রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করে নি। সুতরাং রোহিলা রাজ্যের উপর অযোধ্যার আধিপত্য স্থাপনের ব্যাপারে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে হেস্টিংস রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। স্বাধীন রোহিলা রাজ্যের বিলুপ্তি এবং অযোধ্যার শক্তি বৃদ্ধির ফলে ব্রিটিশ অধিকৃত বাংলাদেশের পশ্চিম সীমান্তের নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।

(৪) উপসংহার ঃ

কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে হেস্টিংসের রোহিলারাজ্য সম্পর্কে অনুসৃত নীতি সমর্থন করা যায় না। মানবতা বা নৈতিকতার কথা বাদ দিলেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার দিক থেকে হেস্টিংসের রোহিলা নীতি যে ত্রুটিপূর্ণ ছিল সেকথা অনস্বীকার্য। মারাঠারা আর রোহিলাখণ্ড আক্রমণ করেনি সেকথা ঠিক, কিন্তু তার কারণ অযোধ্যার

শক্তির ভীতি নয়, পেশোয়া মাধব রাওয়ের মৃত্যুর ফলে মারাঠাদের মধ্যে আত্মকলহ। বিশেষতঃ সেই সময় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে ভারতে আক্রমণকারীদের প্রবেশের কোন আশঙ্কাও ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে পাঞ্জাবে শক্তিশালী শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত যথেষ্ট সুরক্ষিত ছিল। সুতরাং হেস্টিংসের নীতির ফলে অযোধ্যা রাজ্যে শান্তির সুযোগ বৃদ্ধি পায়, একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। এমন কি কোম্পানীর ডাইরেক্টর বোর্ডের অনুমতি নিয়েও হেস্টিংস যদি সুজা-উদ্-দৌলাকে সৈন্য সাহায্য প্রেরণ করেন তাহলেও অযৌক্তিক নীতি যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে না। উপরন্তু হেস্টিংস তাঁর সীমান্ত নীতি অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার আনুগত্যের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল করে তুলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিপদের সম্ভাবনার সৃষ্টি করেন। সুজা-উদ্-দৌলার শক্তিবৃদ্ধি করে হেস্টিংস ব্রিটিশ শক্তির বিপদের সূচনা যে করেছিলেন, তার পরিচয় সুজা-উদ্-দৌলার ব্রিটিশ প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টার মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। সুজা-উদ্-দৌলা ক্রমেই ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা ছিন্ন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। ফরাসীদের সাহায্যে নিজ সৈন্যবাহিনীকে ইয়োরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের চেষ্টাই তার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এরূপ প্রমাণও পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব থেকেই সুজা-উদ্-দৌলা বহিঃশক্তির সাহায্য নিয়ে ব্রিটিশ প্রাধান্য নাশের চেষ্টা করেন। সুজা-উদ্-দৌলার আকস্মিক মৃত্যু এবং তাঁর পুত্র আসফ-উদ্-দৌলার অকর্মণ্যতার ফলে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা পায়। প্রকৃতপক্ষে কোন নিরপেক্ষ সমালোচকের পক্ষেই ওয়ারেন হেস্টিংসের রোহিলা নীতি সমর্থন করা সম্ভব নয়। "The Rohilla war should be beyond defence by any critic with principles."

Q. 17. ***What led to the Treaty of Benares 1773? Did it substantially modify Clive's political settlement?***

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা ঃ

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন গভর্নর পদে নিযুক্ত হন তখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কতকগুলো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এই সমস্যাগুলোকে সাধারণভাবে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়—আভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সীমান্তের সমস্যা বা পররাষ্ট্রীয় সমস্যা। তবে গুরুত্বের দিক থেকে বিচার করলে সীমান্তের সমস্যাই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল। হেস্টিংস সেজন্য সর্বপ্রথমেই সীমান্ত নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তন আনয়ন করার চেষ্টা করেন। গভর্নরের পদগ্রহণ করেই ওয়ারেন হেস্টিংস উপলব্ধি করেন যে, কোম্পানী ইতিমধ্যে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে

পরিবর্তিত হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় কোম্পানীকে ভারতের অপরাপর রাজনৈতিক শক্তির সহিত সুস্পষ্ট সম্পর্ক স্থাপন করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্ব ভারতের বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপর ইংরেজদের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব স্থাপনের ফলে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের প্রতি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক নীতি নির্ধারণ করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। তাছাড়া রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ওয়ারেন হেস্টিংস উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে প্রতিহত করার ক্ষমতা একমাত্র মারাঠা শক্তিরই আছে, সুতরাং সীমান্ত নীতি নির্ধারণ করার সময় মারাঠাদের সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা খুবই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু ব্রিটিশ অধিকার বিস্তার সম্পর্কে ডাইরেক্টর সভা বারবার কলকাতার কাউন্সিলকে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। সামরিক ও বেসামরিক ব্যয় সংক্ষেপের জন্যও তারা পুনঃপুনঃ কলকাতাস্থ গভর্নর ও কাউন্সিলকে নির্দেশ প্রেরণ করে। কারণ ডাইরেক্টর সভার একমাত্র উদ্দেশ্যই ছিল লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি করা। তাছাড়া ভারতের বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও তাদের কোন প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল না। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস বুঝতে পারেন যে, ভারতে ব্রিটিশ অধিকার স্থায়ী করতে হলে দেশীয় শক্তিগুলোকে যথাসম্ভব ব্রিটিশ সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করে তোলা প্রয়োজন। এজন্য তিনি দক্ষিণ ভারতে ফরাসী গভর্নর ডুপ্লের দেশীয় রাজন্যবর্গের রাজনৈতিক বন্দোবস্তের পদ্ধতি অনুকরণ করে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির সূচনা করেন। তাঁর এই নীতিই পরবর্তীকালে লর্ড ওয়েলেসলি অধিকতর ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারতের প্রধান রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত করেন।

(২) বেনারস চুক্তি ঃ

১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পক্ষ গ্রহণ করে পরাজিত হলে শাহজাদা আলি গৌহর (পরবর্তীকালের বাদশাহ শাহ আলম) রবার্ট ক্লাইভকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি মঞ্জুর করতে বাধ্য হন। দেওয়ানি লাভের বিনিময়ে অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে অধিকৃত করা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুটি ক্লাইভ শাহ-আলমকে দান করেন এবং প্রতি বছর ২৬ লক্ষ টাকা কর দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভের সহিত চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পর থেকে মুঘল বাদশাহ শাল আলম কারা ও এলাহাবাদে শান্তিতে বসবাস করছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মারাঠাগণ ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর দ্রুত শক্তি সঞ্চয় করে পুনরায় দুর্ধর্ষ শক্তি হিসাবে ভারতের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। অপরদিকে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম বা আলি গৌহরের পিতা দ্বিতীয় আলমগীর তাঁর প্রধানমন্ত্রীর হস্তে

ক্রীড়নক স্বরূপ হয়ে পড়ায় শাহ আলম দিল্লী পরিত্যাগ করে চলে আসতে বাধ্য হন। কিছুদিন পরে দ্বিতীয় আলমগীর তাঁর প্রধানমন্ত্রীর হস্তেই প্রাণ হারান। শাহজাদা আলি গৌহর শাহ আলম নাম গ্রহণ করে নিজেকে সম্রাটরূপে ঘোষণা করলেও দিল্লী প্রত্যাবর্তন করতে সাহসী হন নি। কিন্তু মারাঠা শক্তি তাদের সামরিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর উত্তর ভারতের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়। এই উদ্দেশ্যে তারা ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে স্থাপন করার জন্য চেষ্টা করে। পিতৃ-সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য মারাঠাদের সাহায্য গ্রহণ করতে শাহ আলমও প্রস্তুত হন। তবে দিল্লী সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে মারাঠা শক্তির প্রসার সাধন করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মোগল সম্রাট মারাঠাদের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হয়ে পড়ছেন দেখে হেস্টিংস অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং তিনি শাহ আলমের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। এই উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার সহিত বেনারসের চুক্তি সম্পাদন করেন। অযোধ্যা রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি করে মারাঠা ও ইংরেজদের রাজ্যের মধ্যে অযোধ্যাকে মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে রক্ষা করাই ছিল হেস্টিংসের বেনারস চুক্তি ও অযোধ্যা নীতির মূল সূত্র। বেনারস চুক্তির একটি শর্ত অনুসারে কারা ও এলাহাবাদ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে পুনরায় অযোধ্যার নবাবকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এই চুক্তির অপর একটি শর্ত অনুসারে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর জন্য শাহ আলমকে প্রতিশ্রুত ছাব্বিশ লক্ষ টাকা প্রদান করাও কোম্পানীর পক্ষ থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই চুক্তির আর একটি শর্ত অনুযায়ী স্থির হয় যে, প্রয়োজন বোধে অযোধ্যার নবাব কোম্পানীর সামরিক সাহায্য গ্রহণ করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে এই সামরিক বাহিনীর জন্য যাবতীয় ব্যয় তাঁকেই বহন করতে হবে।

(৪) বেনারস চুক্তির সমালোচনা ঃ

ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক কারা ও এলাহাবাদ অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে দান করা কতদূর ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। কিন্তু মারাঠাদের সহিত মিলিত হয়ে শাহ আলম ইংরেজদের একমাত্র শক্তিশালী শত্রু মারাঠাদের শক্তিবৃদ্ধিতে যে সাহায্য করেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এরূপ অবস্থায় কারা ও এলাহাবাদ মারাঠাদের হস্তে চলে গেলে ব্রিটিশের মিত্রশক্তি অযোধ্যার নবাবের নিরাপত্তা এবং বাংলাদেশের ইংরেজদের নিরাপত্তা ক্ষুন্ন হ'ত। তাছাড়া বাৎসরিক কর হিসাবে ছাব্বিশ লক্ষ টাকা দেওয়ার অর্থই ছিল মারাঠাদের আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সর্বোপরি সুজা-উদ্-দৌলার নিকট থেকে প্রাপ্ত পঞ্চাশ লক্ষ

টাকা এবং শাহ আলমকে বাৎসরিক কর না দেওয়ার ফলে সঞ্চিত ছাব্বিশ লক্ষ টাকা সেই সময় কোম্পানীর আর্থিক অনটন অনেকাংশে দূর করে। এই সকল যুক্তির উপর সম্রাটের প্রতি হেস্টিংসের অনুসৃত নীতিকে সমর্থনের চেষ্টা করা হয়।

(৫) হেস্টিংসের নীতির মূল্যায়ন ঃ

বকসারের যুদ্ধে পর্যুদস্ত অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলাকে সিংহাসন চ্যুত করে রবার্ট ক্লাইভ অতি সহজেই অযোধ্যা রাজ্যের উপর ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হতে পারতেন। কিন্তু তিনি দেশীয় নৃপতিদের ইংরেজ কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল করে রাখা এবং প্রকাশ্যে ক্ষমতা গ্রহণ না করা এবং সর্বোপরি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সীমানার বাইরে রাজ্য বিস্তার না করার নীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। বিশেষতঃ তিনি একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের উপর বিশাল এক অঞ্চলের শাসন দায়িত্ব অর্পণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। অপরদিকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এই তিনটি প্রদেশের শাসনভার সুষ্টুভাবেই পরিচালনার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশের আধিপত্য বিস্তারের বিপক্ষে ছিলেন। তাছাড়া রবার্ট ক্লাইভের শাসনকালে দিল্লীর মোগল বাদশাহের উপর মারাঠা শক্তির কোন প্রভাব বিস্তৃত না হওয়ায় তাঁর আমলে মারাঠাদের সহিত ইংরেজদের সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার কোন প্রত্যক্ষ কারণ ছিল না।

কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের গভর্নরের পদে নিযুক্ত হওয়ার প্রাক্কালে ভারতের রাজনীতিতে, বিশেষভাবে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়। অল্পদিনের মধ্যে মারাঠা শক্তি তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে পুনরায় উত্তর ভারতে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে উন্মুখ হয়ে ওঠে। পিতৃ-সিংহাসন পুনরুদ্ধারে উৎসাহী শাহজাদা আলি গৌহর অতি সহজেই মারাঠাদের মিত্রতা স্বীকার করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করেন। মারাঠা-মোগল মৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেস্টিংস সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন এবং উভয় শক্তিকে দুর্বল করে তিনি ব্রিটিশ প্রাধান্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। শাহ আলম ও মারাঠা শক্তিকে দুর্বল করে তোলার জন্যই তিনি অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার শক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন এবং নীতি-বিগর্হিত হলেও তিনি অর্থের বিনিময়ে ইংরেজ সেনাদের দ্বারা সুজা-উদ্-দৌলাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হন। প্রকৃতপক্ষে ওয়ারেন হেস্টিংস রবার্ট ক্লাইভের রাজনৈতিক বন্দোবস্ত পরিবর্তন করে সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ শক্তির প্রাধান্যকে পার্শ্ববর্তী দেশীয় রাজ্যের উপর স্থাপন করার চেষ্টা করেন। দেশীয় রাজাদের সম্পর্ক কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূলে

নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রধান লক্ষ্য। তাঁর প্রচেষ্টায় অযোধ্যা, মারাঠা-ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যবর্তী রাজ্যে পরিণত হয় এবং পরে অযোধ্যা রাজ্যকে রোহিলা খণ্ডের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করার সুযোগ দিয়ে তিনি অযোধ্যা রাজ্যের আয়তন ও শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ করে দেন। তাঁর নীতির ফলেই অযোধ্যা রাজ্য ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। রবার্ট ক্লাইভের আমলে অধীনতামূলক নীতির অঙ্কুরোদগম শুরু হলেও ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে তা পত্র-পুষ্পে বিকশিত হতে শুরু করে।

Q. 18. *Critically examine Warren Hastings' treatment of Chait Singh and of Begums of Oudh.*

উত্তর : (১) ভূমিকা

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার নবাবের সহিত কোম্পানীর চুক্তির শর্ত অনুসারে বেনারস কোম্পানীর প্রভাবাধীনে স্থাপিত হয়। কিন্তু এই চুক্তিতে বেনারসের রাজার উপর কোম্পানীর কেবলমাত্র বাৎসরিক কর ভিন্ন অন্য কোন প্রকার দাবি থাকবে না। এই শর্তটি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়। কিন্তু মারাঠা ও ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থের অনটন দেখা দিলে হেস্টিংস বেনারসের রাজা চৈৎ সিংহের নিকট পাঁচলক্ষ টাকা অর্থ সাহায্য দাবি করেন। প্রথমে রাজা ওয়ারেন হেস্টিংসের দাবি পূরণ করতে আপত্তি করলেও শেষপর্যন্ত ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি কেবলমাত্র একবছরের জন্যই কোম্পানীকে অর্থ সাহায্য দিতে সম্মত হন। কিন্তু পরবর্তী বছরেও হেস্টিংস পুনরায় তাঁর কাছে অর্থ দাবি করেন। রাজা চৈৎ সিংহ অর্থ দানের অক্ষমতা জানালে হেস্টিংস তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং মূল দাবির উপর আরও ২,০০০ পাউণ্ড জরিমানা হিসাবে আদায় করেন। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস পুনরায় চৈৎ সিংহের নিকট অর্থ দাবি করেন। চৈৎ সিংহ হেস্টিংসকে ত্বলক্ষ টাকা উপহার হিসাবে প্রেরণ করে তাঁর অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। কিন্তু হেস্টিংস তুইলক্ষ টাকা আত্মসাৎ করেও রাজাকে নিষ্কৃতি দিলেন না। এই অর্থ আদায়ের পরই হেস্টিংস চৈৎ সিংহকে বাৎসরিক কর ভিন্ন আরও পাঁচলক্ষ টাকা দিতে বলেন। তাছাড়া রাজাকে তুই হাজার অশ্বারোহী সৈন্যও কোম্পানীর ব্যবহারের জন্য দিতে বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে হেস্টিংসের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল রাজা চৈৎ সিংহের কাছ থেকে যত বেশি সম্ভব অর্থ আদায় করা। লর্ড মেকলেও এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, "Hastings was determined to plander Chait Singh and for that end he fasten a quarrel on him." চৈৎ সিংহের আপত্তিতে শেষে এক হাজার অশ্বারোহীতেই কোম্পানীর দাবি

সীমাবদ্ধ থাকে। চৈৎ সিংহ বহু কষ্ট করে পাঁচশ অশ্বারোহী এবং পাঁচশ পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করে কোম্পানীকে সেই সংবাদ জানালেন। কিন্তু কোম্পানীর তরফ থেকে কোন উত্তর পেলেন না। হেষ্টিংস চৈৎ সিংহের অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করার অক্ষমতা ও বিলম্বের অজুহাতে তাঁকে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা জরিমানা করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত কাউন্সিলের অনুমতিক্রমে হেষ্টিংস স্বয়ং বেনারসে উপস্থিত হন এবং রাজা চৈৎ সিংহের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেন। কিন্তু রাজার কৈফিয়ৎ তিনি অগ্রাহ্য করে তাঁকে গ্রেপ্তার করার আদেশ দেন। চৈৎ সিংহ উপযুক্ত বাৎসরিক ভাতার বিনিময়ে বেনারসের জমিদারি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হন। রাজাকে এইরূপ অপমান করায় রামনগর থেকে একদল সশস্ত্র প্রজা হেষ্টিংসের সৈন্যদলকে আক্রমণ করে। হেষ্টিংস প্রাণভয়ে বেনারস থেকে পালিয়ে চুনারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গোলযোগের সুযোগে রাজা চৈৎ সিংহ ইংরেজ সৈন্যদের হাত থেকে পালিয়ে লতিফগড় নামক স্থানে পলায়ন করেন। কিছুদিন পরে রাজার ও ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পতিতা নামক স্থানে এক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে চৈৎ সিংহের সৈন্যবাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ইংরেজ সৈন্যদের যুদ্ধজয়ের পর হেষ্টিংস পুনরায় বেনারসে উপস্থিত হয়ে মহীপ নারায়ণ নামে চৈৎ সিংহের এক আত্মীয়কে বেনারসের জমিদারি প্রদান করেন। চৈৎ সিংহ কোম্পানীকে যে বাৎসরিক কর দিতেন মহীপ নারায়ণ তার দ্বিগুণ কর দিতে স্বীকৃত হন। কলকাতার কাউন্সিল হেষ্টিংসের তৎপরতার প্রশংসা করে চৈৎ সিংহ সংক্রান্ত তাঁর যাবতীয় কার্যের অনুমোদন করে।

(৩) হেস্টিংসের কার্যের সমালোচনা ঃ

চৈৎ সিংহ জমিদার হলেও তাঁর কতকগুলো বিশেষ অধিকার ছিল। কোম্পানীর সহিত কর দান ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার সম্পর্ক তাঁর থাকবে না। এই শর্ত ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের চুক্তিতে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ ছিল। তাছাড়া এই শর্তের কথা বাদ দিলেও অপরাপর জমিদারগণের নিকট যখন কোনপ্রকার অর্থ বা সামরিক সাহায্য দাবি করা হয় নি, সেই সময় একমাত্র চৈৎ সিংহের নিকট পুনঃপুনঃ, অর্থের দাবির কোন যুক্তি হেষ্টিংস প্রদর্শন করতে পারেন নি। হেষ্টিংসের কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল যখন প্রকৃত শাসন-ক্ষমতা হস্তগত করার ব্যবস্থা করেন, তখন চৈৎ সিংহ তাঁদের নিকট একবার উপহার প্রেরণ করেন। সেই সময় থেকেই হেষ্টিংস চৈৎ সিংহকে তাঁর ব্যক্তিগত শত্রু রূপে মনে করতে শুরু করেন। ব্যক্তিগত আক্রোশবশতঃই যে হেষ্টিংস চৈৎ সিংহের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। হেষ্টিংসের

ইম্পিচমেণ্টের সময় এডমণ্ড বার্ক হেষ্টিংসের একখানি চিঠি উল্লেখ করে বলেন যে সেই চিঠিতেই হেষ্টিংসের আক্রোশ ও প্রতিহিংসা পরায়ণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। "So long as I conceive Chait Singh's misconduct and contumacy to have me rather than the company for object ; I looked upon a considerable file as sufficient both for his immediate punishment and binding him to future good beheaviour."

(৪) অযোধ্যার বেগমদের প্রতি হেস্টিংসের আচরণ ঃ

বেনারসের রাজা চৈৎ সিংহের উপর অত্যাচার করেও হেষ্টিংসের পক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় তিনি অযোধ্যার বেগমদের সঞ্চিত অর্থের উপর দৃষ্টি দিলেন। অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার স্ত্রী ও মাতা অযোধ্যার বেগম নামে পরিচিত। সুজা-উদ্-দৌলার মৃত্যুর পর সমসাময়িক প্রথা অনুযায়ী উভয় বেগম তাঁদের নিজেদের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য জায়গীর ভোগ করছিলেন। তাছাড়া বেগমদের নিজস্ব প্রচুর পরিমাণ মণি-মুক্তা এবং অর্থ সঞ্চিত ছিল। অযোধ্যার তদানীন্তন নবাব আসফ-উদ্-দৌলা ক্রমেই যখন কোম্পানীর প্রাপ্য অর্থ মিটাতে সক্ষম না হয়ে অধিকতর ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন তিনি নিজ মাতা ও পিতামহীর অর্থের উপর দৃষ্টি দিতে শুরু করেন। হেষ্টিংসও তাঁকে এই বিষয়ে উৎসাহ ও সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে আসফ-উদ্-দৌলার মাতা, অর্থাৎ সুজা-উদ্-দৌলার বেগম তাঁকে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে কোম্পানীর কাছ থেকে এই প্রতিশ্রুতি আদায় করেন যে, ভবিষ্যতে কোম্পানী অথবা আসফ-উদ্-দৌলা তাঁকে অর্থের জন্য আর বিরক্ত করবে না। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার বেগম চৈৎ সিংহের বিদ্রোহাত্মক আচরণ সমর্থন করেন এই অজুহাতে কোম্পানী বেগমদের রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে। তারপর অযোধ্যার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মিস্টার মিড্‌লটনের পরিবর্তে অধিকতর অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারী ব্রিস্টোকে নিযুক্ত করা হয়। বেগমদের দেওয়ান ও খোজাদের বন্দী করে রেখে নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। হেষ্টিংস আসফ-উদ্-দৌলার মতের বিরুদ্ধেই একদল ব্রিটিশ সৈন্য অযোধ্যায় প্রেরণ করে বেগমদের ভীতি প্রদর্শন করেন। বেগমদের যাবতীয় ধনরত্ন বলপূর্বক আদায় করা হয়। অর্থের জন্য নিরীহ বৃদ্ধা বেগমদের উপর অত্যাচার করতেও হেষ্টিংস দ্বিধাবোধ করেন নি।

ডক্টর ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রয়োজনের তাগিদে ওয়ারেন হেষ্টিংস বেগমদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করতে বাধ্য হন—এরূপ যুক্তির সাহায্যে হেষ্টিংসের অন্যায় কার্য সমর্থন করার

চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, "Urgent necessities of the time justified Hastings in cancelling treaty obligation and putting a certain amount of pressure on the Begums to make them disgeorge." ভিনসেণ্ট আরও মনে করেন, ভারতীয় মানদণ্ডে বিচার করলে বেগমদের প্রতি হেস্টিংসের অত্যাচারের নিষ্ঠুরতার পরিমাণ খুবই সামান্য ছিল এবং ওয়ারেন হেস্টিংসের অজ্ঞাতসারেই সমস্ত বিষয়টি সম্পন্ন হয়। কিন্তু স্মিথের এই মতামত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, কারণ বেগমদের নিকট থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করার সমস্ত পরিকল্পনা তিনিই স্থির করেন এবং অযোধ্যার নবাবকেও তিনি এই ব্যাপারে উৎসাহিত করে তোলেন। তাছাড়া প্রয়োজনের যুক্তির উপর ভিত্তি করে কোন অন্যায় কাজকে সমর্থন করার প্রচেষ্টা শুধু-মাত্র অর্থহীন নয়, হাস্যকরও বটে। তাছাড়া বেনারসের রাজা চৈৎ সিংহের সঙ্গে বেগমদের যোগাযোগ ছিল বলে হেস্টিংস যে অভিযোগ করেন তারও কোন প্রমাণ নেই। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের পক্ষ থেকে কোন প্রকার নথি-পত্র বা সাক্ষ্য-সাবুদ উপস্থাপিত করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং ঐতিহাসিক আলফ্রেড লয়েল অযোধ্যার বেগমদের প্রতি ওয়ারেন হেস্টিংসের ব্যবহারের কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁর "The employment of personal severities under the superintendence of British officers in order to extract money from women and eunuchs is an ignoble kind of undertaking ; to push him (Nawab) and actively assisting measure of coercion against woman and eunuchs was conduct unworthy and undefensible."

Q. 19. ***Give a brief account of the complaints of Rani of Burdwan, Rani Bhavani and Maharaj Nandakumar against Warren Hastings. What were there results ?***

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা ঃ

রেগুলেটিং অ্যাক্ট অনুযায়ী ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত সাম্রাজ্যের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের চারজন সদস্যের মধ্যে ক্লেভারিং মনসন্ ও ফ্রান্সিস ইংলণ্ড থেকে ভারতে আসেন এবং কোম্পানীর কলকাতাস্থ কর্মচারিগণের মধ্য থেকে বারওয়েলকে চতুর্থ সদস্য নিযুক্ত করা হয়। বারওয়েল ব্যতীত অপর তিনজন সদস্য প্রথম থেকেই হেস্টিংসের বিরোধিতা শুরু করেন এবং কাউন্সিলে তাঁরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় প্রকৃত শাসন ক্ষমতা অনায়াসেই তাঁদের

হস্তগত হয়। ফলে হেস্টিংস ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্যে তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি হয়। হেস্টিংস ও তাঁর কাউন্সিলের বিরোধিতা শুরু হলে হেস্টিংসের বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ কাউন্সিলের নিকট উত্থাপিত হয়।

(২) বর্ধমানের রাণীর অভিযোগ ঃ

বর্ধমানের রাজা তিলকচাঁদের মৃত্যুর পর তাঁর রাণী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকা নিযুক্ত হন। কিন্তু কলকাতা কাউন্সিল সেই ব্যবস্থা নাকচ করে দিয়ে ব্রজকিশোর নামে জনৈক ব্যক্তিকে সেইস্থলে নিযুক্ত করেন। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাণী কাউন্সিলের কাছে অভিযোগ করেন যে, ব্রজকিশোর যথেষ্টভাবে বর্ধমানের রাজ সম্পত্তির অপচয় করতে শুরু করেছেন এবং এই ব্যাপারে ইংরেজ রেসিডেন্টও লিপ্ত আছেন। কাউন্সিল হেস্টিংসের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ব্রজকিশোরকে বর্ধমান রাজ সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের হিসাব দাখিল করতে বাধ্য করেন। এই হিসাবে হেস্টিংসকে পনের হাজার টাকা এবং তাঁর দেশীয় সেক্রেটারী কানাইলালবাবুকে পাঁচ হাজার এবং কানাইলালবাবুর সহকারীকে পাঁচশ টাকা ঘুষ দেওয়ার কথা লিখিত ছিল। হেস্টিংস কোম্পানীর সদস্যগণ কর্তৃক এ বিষয়ে তদন্তের তীব্র বিরোধিতা করে তাঁর বিরুদ্ধে কাউন্সিলের সন্দেহ গভীরতর করে তোলেন। কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দ বর্ধমানের রাজ-সম্পত্তি সম্পর্কে তদন্ত করার পর এই সম্পত্তির দায়িত্ব আবার রাণীর উপর ন্যস্ত করেন।

(৩) রাণী ভবানীর অভিযোগ ঃ

কোম্পানীর স্বার্থপরতার জন্যই রাণী ভবানীর মতো মহীয়সী নারীর সহিত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে (১১৭৬ বঙ্গাব্দে) বাংলাদেশে যে মন্বন্তর দেখা দিয়েছিল তার ফলে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং লোকাভাবে কৃষিকার্য বন্ধ হয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ স্থান জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে কৃষিকার্যের অযোগ্য হয়ে পড়ে। রাণী ভবানীর জমিদারি ছিল রাজসাহী জেলায় এবং তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থানে। তাঁর প্রজাবর্গও মন্বন্তরের প্রকোপ থেকে রক্ষা পায় নি। মন্বন্তরের অভিশাপ দূর হওয়ার পূর্বেই ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে আবার ভয়ানক প্লাবন দেখা দেয় এবং প্লাবনে ফসল বিনষ্ট হলে রাণী ভবানী প্রজাবর্গকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে খাজনা আদায় বন্ধ করে দেন। প্রজাবর্গের অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত তিনি অনাদায়ীকৃত খাজনা আদায় করতে অস্বীকৃত হন। ফলে সরকারী খাজনা দিতে বিলম্ব ঘটে। সুতরাং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারিগণ

রাণী ভবানীর প্রাসাদ ঘেরাও করে তাঁর নিকট থেকে জোর করে মোট ২২,৫৮,৬৭৪ টাকা আদায় করে। তারপর ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে রাণী ভবানীর পরিবর্তে দুলাল রায় নামক এক ব্যক্তিকে রাজসাহীর জমিদারি দেওয়া হয়। রাণী ভবানী তখন তাঁর প্রতি ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যায় আচরণের প্রতিকার ও জমিদারি পুনরুদ্ধারের জন্য কলকাতা কাউন্সিলের নিকট আবেদন জানান। এই আবেদন পত্রে তিনি লেখেন, I am a zemindar, so was obliged to keep the ryots from ruin and gave what case to them I could, by giving them time to make up their payments and requested the gentlemen (English officials) would in same manner give me time ··but not crediting me they were pleased to take cutchery from my house·· Then my house was surrounded, and all my property enquired into ; what collection I had made as farmer and zeminder were taken ; what money I borrowed and my monthly allowances were taken and made together Rs. 22,58,674 (£ 226,000) রাণী ভবানী কলকাতা কাউন্সিলের নিকট দরখাস্ত করলে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগে হেস্টিংসের বিরোধিতা সত্ত্বেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল দুলাল রায়কে অপসারিত করে রাণী ভবানীকে তাঁর জমিদারি ফিরিয়ে দেন।

(৩) নন্দকুমারের অভিযোগ

কলকাতা কাউন্সিলের নিকট হেস্টিংসের বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ পেশ করা হয় তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মহারাজ নন্দকুমারের অভিযোগ। হেস্টিংস মীরজাফরের পত্নী মণি বেগমের নিকট থেকে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ স্বরূপ গ্রহণ করেন, এই কথা মহারাজ নন্দকুমার কলকাতা কাউন্সিলের কাছে এক অভিযোগ পত্রে জানালে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই অভিযোগের তদন্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু হেস্টিংস এই অভিযোগের তদন্তে বাধা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের অধিবেশন বাতিল করে দিয়ে কাউন্সিলে তাঁর অনুগত সদস্য জর্জ বারওয়েলের সহিত সভাকক্ষ পরিত্যাগ করেন। হেস্টিংসের এইরূপ আচরণে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে কাউন্সিলের সদস্যদের সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। কিন্তু নন্দকুমারের অভিযোগের অব্যবহিত পরেই কামাল-উদ্-দিন নামক জনৈক ব্যক্তি যোসেফ ফৌক, ফ্রান্সিস্ ফৌক ও নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেস্টিংসের নিকট এক অভিযোগ

পত্র পেশ করে। এই অভিযোগে বলা হয় যে, নন্দকুমার, যোসেফ ও ফ্রান্সিস্ ফৌক কামাল-উদ্-দিনকে বলপূর্বক হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ সম্বলিত একখানি কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। ফলে নন্দকুমার, যোসেফ ও ফ্রান্সিস্ ফৌককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কামাল-উদ্-দিনের অভিযোগের বিচার হওয়ার পূর্বেই ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে মোহনপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারকে জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। তার অভিযোগ পত্রে বলা হয় যে, বলাকী দাস নামে জনৈক মহাজনের নিকট নন্দকুমার কতকগুলো মণি-মুক্তা বিক্রয়ের জন্য গচ্ছিত রাখেন। এই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বলাকী দাসের নিকট থেকে তিন লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণ আদায়ের পূর্বেই বলাকী দাসের মৃত্যু আসন্ন প্রায় হয়ে উঠলে তিনি মহারাজ নন্দকুমারের উপর নিজ পরিবারের দায়িত্ব এবং একটি উইল দ্বারা কোম্পানীর নিকট থেকে তাঁর প্রাপ্য যাবতীয় অর্থ আদায়ের ভার অর্পণ করেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই বলাকী দাসের মৃত্যু হলে নন্দকুমার তাঁর বিপন্ন পরিবারের সুবিধার্থে কোম্পানীর নিকট থেকে প্রাপ্য তিন লক্ষ টাকা আদায় করেন। এই টাকা থেকে নন্দকুমার নিজ মণি-মুক্তার মূল্য বাবদ ৪৮,০২১ টাকা গ্রহণ করেন। এই টাকার সংশ্লিষ্ট কাগজ জাল বলে মোহনপ্রসাদ অভিযোগ করে এবং বিচারে নন্দকুমারকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু সমসাময়িক এবং পরবর্তীকালের বেশি সংখ্যক ঐতিহাসিকের মতে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর বন্ধু কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক স্যার এলিজা ইম্পের সক্রিয় সাহায্যে মহারাজা নন্দকুমারকে অবৈধভাবে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

Q 20. ***Critically examine the execution of Maharaja Nanda Kumar.***

উত্তর : (১) ভূমিকা

বীরভূমের ভদ্রপুর গ্রামের এক ব্রাহ্মণবংশে নন্দকুমারের জন্ম হয়। নবাব আলীবর্দীর আমলেই তিনি সরকারী উচ্চপদে নিযুক্ত হন এবং নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার রাজত্বকালে তিনি হুগলির ফৌজদারের পদ লাভ করেন। কিন্তু ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট থেকে উৎকোচ গ্রহণ করে এবং ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে নির্বিঘ্নে ফরাসী অধিকৃত চন্দননগর জয়ের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য সম্ভবতঃ সিরাজ-উদ্-দৌলা তাঁকে পদচ্যুত করেন। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলার মসনদে উপবেশন করার পর নন্দকুমারের আবার ভাগ্য পরিবর্তন শুরু হয়। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বাদশাহ শাহ আলম

নন্দকুমারকে মহারাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ বছরেই তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিবর্তে বর্ধমানের কালেকটর পদে নিযুক্ত হন এবং তখন থেকেই ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি ঘটতে শুরু করে। পরবর্তী বছরে নন্দকুমার বাংলাদেশের নায়েব সুবার পদলাভ করেন কিন্তু কিছুদিন পরে রেজা খান ঐ পদে নিযুক্ত হলে আবার নন্দকুমারের ভাগ্য বিপর্যয় হয়। রেজা খানের অত্যাচারে বাংলা সুবার জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে নব-নিযুক্ত বাংলাদেশের গভর্নর জেনারেল নন্দকুমারের সহায়তায় তাঁকে পদচ্যুত করেন। রেজা খানের ঘটনকে কেন্দ্র করে সাময়িক-ভাবে ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত নন্দকুমারের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলেও তা বেশি দিন স্থায়ী হয় নি। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনকে কেন্দ্র করেই উভয়ের মধ্যে আবার বিরোধিতা শুরু হয়।

(২) নন্দকুমারের অভিযোগ ঃ

ওয়ারেন হেস্টিংস মীরজাফরের পত্নী মণিবেগমের কাছ থেকে তিনলক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেছেন, ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে একথা নন্দকুমার কলকাতা কাউন্সিলের নিকট এক অভিযোগ পত্রে জানালে কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল এই অভিযোগের তদন্ত করতে প্রস্তুত হন। হেস্টিংস অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে কাউন্সিলের অধিবেশন মুলতুবী রেখে মিস্টার বারওয়েলের সহিত সভাগৃহ ত্যাগ করেন। হেস্টিংসের এরূপ আচরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক মিল কোম্পানীর কৌঁসুলী সেয়ার প্রভৃতি অনেকের মতে হেস্টিংস তদন্তে এইরূপ বাধা দান করে নিজের দোষ প্রমাণিত করেন। কিন্তু উইলসন প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, হেস্টিংস কাউন্সিলের তদন্তের পদ্ধতির বিরোধিতা করেছিলেন মাত্র। অপরদিকে নন্দকুমারের অভিযোগ সম্পর্কেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতবিরোধিতা দেখা যায়। স্যার জেমস স্টিফেন, ফরেস্ট, ট্রটার প্রভৃতি ঐতিহাসিক এই অভিযোগ মিথ্যা বলে মনে করেন। কিন্তু বার্ক, এলিয়ট, বেভারিজ প্রভৃতি সমসাময়িক ও পরবর্তী রাজনীতিবিদ্ ও ঐতিহাসিকদের মতে নন্দকুমারের অভিযোগ কোনক্রমেই ভিত্তিহীন নয়।

(৩) নন্দকুমারের সহিত কাউন্সিলের যোগাযোগ

ওয়ারেন হেস্টিংসের সহিত কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদের বিরোধিতার সুযোগ গ্রহণ করে নন্দকুমার ওয়ারেন হেস্টিংসের বিরুদ্ধে আবার নতুন একটি অভিযোগ আনয়ন করেন। তাঁর এই অভিযোগে বলা হয় যে ওয়ারেন হেস্টিংস উৎকোচের দ্বারা বশীভূত

হয়ে রেজা-খানকে পদচ্যুত করেন এবং অর্থের বিনিময়ে সরকারী উচ্চপদে কয়েক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। কাউন্সিলের সভায় কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস ওয়ারেন হেস্টিংসের উপস্থিতিতে নন্দকুমারের অভিযোগ-পত্র পাঠ করেন এবং নন্দকুমারের কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস কাউন্সিলের সদস্যদের উপস্থিতিতে নন্দকুমারের সহিত তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হ'তে অস্বীকার করেন। এমনকি কাউন্সিলের সদস্যদের তাঁর কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধান বা বিচার করার অধিকার সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তারপর তিনি সভার কাজ অসমাপ্ত রেখেই কাউন্সিলের অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করে সভাগৃহ পরিত্যাগ করেন। তাঁর অনুপস্থিতিতেই কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ নন্দকুমারের অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(৪) নন্দকুমারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কিন্তু নন্দকুমারের অভিযোগের অব্যবহিত পরেই কামাল-উদ্-দিন নামক জনৈক ব্যক্তি জোসেফ ফৌক, ফ্রান্সিস্ ফৌক এবং নন্দকুমারের বিরুদ্ধে হেস্টিংসের কাছে এক অভিযোগ করেন। এই অভিযোগে বলা হয় যে উপরি-উক্ত তিন ব্যক্তি কামাল-উদ্-দিনকে বলপূর্বক হেস্টিংসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগ সম্বলিত একখানি কাগজে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ফ্রান্সিস ফৌক, জোসেফ ফৌক ও নন্দকুমার তিনজনকেই গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু কামাল-উদ্-দিনের অভিযোগের বিচার হওয়ার পূর্বেই ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে মোহন প্রসাদ নামক এক ব্যক্তি নন্দকুমারকে জাল করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। মোহন প্রসাদের অভিযোগে বলা হয় যে বলাকী দাস নামে জনৈক মহাজনের নিকট নন্দকুমার কতগুলো মণি-মুক্তা বিক্রয় করতে দেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও এই সময় বলাকীদাসের কাছ থেকে তিন লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণ আদায়ের পূর্বেই বলাকীদাসের মৃত্যু আসন্নপ্রায় হয়ে উঠলে তিনি নন্দকুমারের উপর নিজ পরিবারের দায়িত্ব এবং একটি উইল দ্বারা কোম্পানীর নিকট থেকে তাঁর যাবতীয় প্রাপ্য আদায়ের ভার অর্পণ করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে বলাকীদাসের মৃত্যু হয়। নন্দকুমার তাঁর বিপন্ন পরিবারের সুবিধার্থে কোম্পানীর নিকট থেকে তাঁর প্রাপ্য তিনলক্ষ টাকা আদায় করেন। এই টাকা থেকে নন্দকুমার তাঁর মণিমুক্তার মূল্য বাবদ ৪৮,০২১ টাকা গ্রহণ করেন। এই টাকার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রই জাল বলে অভিযোগ করা হয় এবং বিচারে নন্দকুমারের প্রাণদণ্ড হয় এবং ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট বিচারকের রায় কার্যকরী করা হয়।

(৫) সমালোচনা

নন্দকুমারের বিচার এমন সন্দেহজনকভাবে সম্পন্ন করা হয় যে, সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফলে প্রাণ হারিয়েছিলেন এই ধারণা জনসাধারণের মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে। ঐতিহাসিক বেভারিজ স্যার আলফ্রেড লায়েল প্রমুখ ঐতিহাসিকদের মতে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে কাউন্সিলের নিকট একটির পর একটি অভিযোগ উত্থাপিত হ'লে সেগুলো বন্ধ করার উদ্দেশ্যে হেষ্টিংস নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যবস্থা করেন। ভবিষ্যতে যাতে কোন ব্যক্তি হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনয়ন করতে সাহস না পায় সেজন্য তাঁর এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল প্রকৃত-পক্ষে নিজের নিরাপত্তার প্রয়োজনেই হেষ্টিংস এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নন্দকুমারের প্রতি হেষ্টিংসের আচরণ এবং হেষ্টিংসের কয়েকটি উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য হেষ্টিংসের দায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। হেষ্টিংসের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে নন্দকুমারের প্রতি তাঁর বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। একটি চিঠিতে হেষ্টিংস লেখেন, "From the year 1759 to the date when I left Bengal in 1785. I was engaged in a continued opposition to the interest and designs of that man (Nanda Kumar) because I judged him to be averse to the interest of my employer." আর একখানি চিঠিতে তিনি লেখেন, "I was never the personal enemy of any man but Nanda Kumar whom from my soul I detested, even when I was compelled to countenance him." সুতরাং হেষ্টিংসের মর্যাদা ও স্বার্থরক্ষার জন্য নন্দকুমারের মৃত্যু একান্ত প্রয়োজন ছিল। কারণ, নন্দকুমার কর্তৃক হেষ্টিংসের উৎকোচ গ্রহণের অভিযোগের অল্পকাল পূর্বে হুগলীর ফৌজদার ও মণিবেগমের ব্যয়ের হিসাব থেকেও হেষ্টিংসের উৎকোচ গ্রহণের কথা কাউন্সিলের দৃষ্টিগোচর হয়। নন্দ-কুমারের মতো মর্যাদাশালী ব্যক্তিকে চরম শাস্তি দিতে পারলে কাউন্সিলের নিকট হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে আর কেউ অভিযোগ করতে সাহসী হবে না এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়েই হেষ্টিংস তাঁকে ফাঁসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের অভিযোগ কাউন্সিলের সম্মুখে উত্থাপিত হওয়ার পর নিজ মর্যাদা ও সততার খাতিরেও হেষ্টিংসের পক্ষে তদন্তে স্বীকৃত হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি প্রথম হতেই তদন্তের বিরোধিতা শুরু করেন। তাছাড়া নন্দকুমারের অভিযোগের অব্যবহিত পরেই ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭শে মার্চ হেষ্টিংস গভর্নর জেনারেলের পদ ত্যাগ করেন। অভিযুক্ত হওয়ার পর অভিযোগের সত্যতা ও অসত্যতা প্রমাণের অপেক্ষা

না রেখেই হেস্টিংসের পদত্যাগ প্রকারান্তরে তদন্ত এড়িয়ে যাওয়ার পন্থা স্বরূপ বিবেচিত হওয়া উচিত। কিন্তু নন্দকুমারের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ আনীত হওয়ার পরই ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মে হেস্টিংস পদত্যাগ নাকচ করে গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় নন্দকুমারের বিচারপর্ব শেষ হওয়ার পূর্বেই তিনি একটি পত্রে মন্তব্য করেন যে, নন্দকুমারকে আপাতঃ দৃষ্টিতে আইনসম্মতভাবেই ফাঁসিকাঠে ঝুলাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে, ".In a fair way to be hanged."

(৬) হেস্টিংসের দায়িত্বের পরোক্ষ প্রমাণ

নন্দকুমারের ফাঁসির জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস যে দায়ী ছিলেন তার কিছু কিছু পরোক্ষ প্রমাণও পাওয়া যায়। হেস্টিংস তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ মিস্টার সুলিভান এর নিকট এক পত্রে লেখেন যে, "(সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি) স্যার এলিজা ইম্পে একদিন তাঁর নিরাপত্তা, ভাগ্য, সম্মান ও মর্যাদা সবকিছুই রক্ষা করে তাঁকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিলেন। আবার অপর দিকে স্যার এলিজা ইম্পে মিস্টার ডানিং-এর নিকট এক পত্রে লেখেন যে আমি একদিন হেস্টিংসকে সাহায্য করেছিলাম; সেজন্য তিনি এখন আমাকে ন্যায় অন্যায় বিচার না করেই সাহায্য করতে বাধ্য।" এই সকল উক্তি থেকে নন্দকুমারের ফাঁসির ব্যাপারে প্রধান বিচারপতি স্যার এলিজা ইম্পের অসদাচরণের পরিচয় পাওয়া যায়। তা ছাড়া নন্দকুমারের বিচারকালে ইম্পে প্রথম থেকেই পক্ষপাতিত্বের পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। হেস্টিংসের অনুচর এলিয়টকে নন্দ কুমারের বিচারে দোভাষী নিয়োগে নন্দকুমার আপত্তি জানালেও এলিজা ইম্পে তাতে কর্ণপাৎ করেন নি। বিচারে নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ হ'লে তাঁর কৌসুলী মিস্টার ফ্যারার নন্দকুমারের প্রাণভিক্ষার জন্য দরখাস্ত করেন, কিন্তু ইম্পে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এমনকি বাংলার নবাব নন্দকুমারের প্রাণরক্ষার জন্য আবেদন করেন কিন্তু হেস্টিংসের বিরোধিতার জন্য সেই আবেদন, গ্রাহ্য হয় নি। হেস্টিংসের ইম্পিমেণ্টের সময় সাক্ষ্য দেওয়ার সময় মিস্টার ফ্যারার নন্দকুমারের বিচারে ইম্পে এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ যে নন্দকুমারের সাক্ষীদের অকারণে নাজেহাল করেন সে কথার উল্লেখ করেন। বস্তুতঃ ইম্পে বিচারকালে, নন্দকুমারের বিরুদ্ধে এমন সব মন্তব্য করেন যে সম্পূর্ণ বিচারের আয়োজন প্রহসনে পরিণত হয় এবং বিচারের সময়ই নন্দকুমার বুঝতে পারেন যে, স্বপক্ষ সমর্থন তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অর্থহীন।

(৭) নন্দকুমারের ফাঁসি আইনতঃ অবৈধ

জালিয়াতির অপরাধের বিচারে নন্দকুমারের দোষ প্রমাণিত হ'লেও আইনতঃ ফাঁসি দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভারতীয়দের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের আইন যে প্রযোজ্য নয়, ইম্পে ও তাঁর সদকর্মিগণ একথা জানা সত্ত্বেও বিচারের সময় তা একবারও উল্লেখ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে হেস্টিংসকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে তাঁরা ধর্মাধিকরণের পবিত্রতা বিনষ্ট করে নন্দকুমারকে ফাঁসি দিতে কুণ্ঠিত হ'লেন না। জাল করার অপরাধে নন্দকুমারকে ফাঁসি দেওয়া যে আইন বিরুদ্ধ ছিল একথা ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণও স্বীকার করেন। সেজন্য নন্দকুমারের ফাঁসিকে বিধানতান্ত্রিক হত্যাকাণ্ড (judicial murder) রূপে গণ্য করা হয়। এই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক পি. ই. রবার্টস মন্তব্য করেন, "It is very doubtful whether the supreme court had any jurisdiction over the natives and there is practically no doubt at all that the English law making forgery a capital crime was not operative in India till many years after Nandakumar's alleged forgery had been committed".

Q. 21. *Form an estimate af the achievements of Warren Hastings.*

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা

ভারতের ইংরেজ শাসকবর্গের মধ্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্য পদ্ধতি ও কার্যকলাপ সম্পর্কে যে রূপ পরস্পর বিরোধী মতামত ব্যক্ত হয়েছে, সম্ভবতঃ অপর কোন ব্যক্তির সম্পর্কে তা হয় নি। কিন্তু হেস্টিংসের কার্যকলাপ ও কৃতিত্বের সমালোচনা করার সময় সর্ব প্রথমেই তাঁর গভর্নর পদ গ্রহণকালে কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ ও সীমান্ত সংক্রান্ত অব্যবস্থার কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তা ছাড়া ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হওয়ার পর কাউন্সিলের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের বিরোধিতার কথা স্মরণ রেখে হেস্টিংসের কৃতিত্ব বিচার করা প্রয়োজন।

(২) হেস্টিংসের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যা

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস যখন বাংলার গভর্নরের পদে নিযুক্ত হন তখন ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রকট হয়ে পড়ে। কোম্পানীর কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি চরমে পৌঁছায় এবং কোম্পানীর কোষাগারও প্রায় শূন্য। তাছাড়া বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী থেকে বারবার অর্থ সাহায্যের জন্য তাগিদ

আসায় কলকাতা কাউন্সিল বিব্রত হয়ে পড়ে। অপরদিকে ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মন্বন্তরের ফলে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থাও চরম পর্যায়ে উপস্থিত হয়। দেশের কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি সকল প্রকার উৎপাদনমূলক কার্য চরম ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে, নিয়মিত রাজস্ব আদায় বন্ধ হয়ে যায় এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হওয়ার ফলে দেশের সর্বত্র দস্যু তস্করের উপদ্রব বৃদ্ধি পায়। আভ্যন্তরীণ অবস্থার পররাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও নানারূপ সমস্যা সঙ্কুল হয়ে ওঠে। দিল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহ আলম তখন মারাঠাদের ক্রীড়নকে পরিণত এবং মারাঠার ইংরেজদের রাজ্যে হানা দিতে উদ্যত হয়। দুর্বল অযোধ্যা রাজ্যের নিরাপত্তার অভাবের জন্য কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার নিরাপত্তাও তখন প্রতি মুহূর্তে ক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা ছিল।

(৩) ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যাবলী

এইরূপ আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রীয় সমস্যাসঙ্কুল শাসনভার গ্রহণ করার ক্ষমতা যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই প্রায় অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে কোম্পানীর শাসনে সংহতি আনয়ন করার এবং বিপজ্জনক সমস্যাগুলোর সমাধানের ক্ষমতা ওয়ারেন হেস্টিংসের ছিল। তিনি গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করার পরই ইংরেজ-অধিকৃত রাজ্য এবং শাসনব্যবস্থার উন্নয়নে প্রথম থেকেই দৃঢ় সঙ্কল্পভাবে আত্মনিয়োগ করেন। প্রথমতঃ, গভর্নরের পদে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরই তিনি রাজস্ব বিভাগে পুনর্গঠন ও শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতে শুরু করেন। তিনি ডাইরেক্টর সভার নির্দেশ অনুযায়ী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়-সংক্রান্ত কার্যাদি কোম্পানীর হস্তে গ্রহণ করে ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈত-শাসনের অবসান ঘটান। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্যাদির তদারকির দায়িত্ব তিনি বোর্ড-অফ্-রেভিনিউ নামক একটি সংস্থার উপর অর্পণ করেন এবং রেজাখান ও সীতাব রায়কে দেওয়ানী কাজ থেকে অপসারিত করেন। পাঁচ বছরের মেয়াদে জমিদারদের সহিত জমিদারির বন্দোবস্ত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলায় পূর্বেকার সুপারভাইজার-এর স্থলে একজন করে কালেক্টর নিযুক্ত করে তার উপর রাজস্ব আদায়ের ভার অর্পণ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে রাজস্ব-সংক্রান্ত বিচার-কার্যও দেওয়ানের উপর ন্যস্ত ছিল। সুতরাং রাজস্ব আদায়ের ভার কোম্পানীর হস্তে গ্রহণের পর দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থারও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করার দরকার দেখা দেয়। হেস্টিংস প্রতি জেলায় একটি করে মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত স্থাপন করেন। এতদিন পর্যন্ত ফৌজদারি বিচারকার্যাদি নবাবের হাতে ছিল বটে, তবে ইংরেজ কোম্পানীর

প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারি বিচারেও ইংরেজগণ হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। বিচার ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হেস্টিংস প্রতি জেলায় একটি করে মফঃস্বল ফৌজদারি আদালত স্থাপন করেন। দেওয়ানি বিচারের আপীলের জন্য কলকাতায় সদর দেওয়ানি আদালত এবং ফৌজদারি বিচারের আপীলের জন্য মুর্শিদাবাদে সদর ফৌজদারি আদালত স্থাপিত হয়। রাজস্ব বিভাগ ও বিচার ব্যবস্থা পুনর্গঠন করে হেস্টিংস শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করার ব্যবস্থা করেন। আইন সংক্রান্ত বিষয়েও তিনি সংস্কার সাধন করে বিচার ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। হেস্টিংসই সর্বপ্রথম উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মোকদ্দমা হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্রানুসারে বিচারের নিয়ম প্রবর্তন করেন। তাছাড়া মহাজন কর্তৃক খাতকের উপর অত্যাচার, নির্দিষ্ট হার অপেক্ষা অধিক সুদ গ্রহণ, বিচার প্রার্থীদের নিকট থেকে কাজী ও মুফ্‌তিদের পারিশ্রমিক গ্রহণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ করেন। তাঁর আমলেই কাজী ও মুফ্‌তিদের বেতন দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয়। তাঁর এই নীতি প্রবর্তিত হওয়ার ফলে বিচার বিভাগের দুর্নীতি অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। তাছাড়া হেস্টিংস মুদ্রানীতির সংস্কারসাধন করেও সমসাময়িককালের মুদ্রানীতির অব্যবস্থা দূর করার চেষ্টা করেন।

(৪) তিব্বতে ও নেপালে দূত প্রেরণ

তিব্বত এবং তিব্বতের মধ্য দিয়ে নেপাল অঞ্চলের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস জর্জ বোগ্‌ল্‌কে তিব্বতের তা সি লামার রাজসভায় দূত হিসাবে প্রেরণ করেন।

(৫) হেস্টিংসের পররাষ্ট্র নীতি

পররাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হেস্টিংসের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর নিরাপত্তা বিধান করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি অযোধ্যার নবাবকে কোম্পানীর অনুগত মিত্রে পরিণত করেন। এইদিক থেকে দেখতে গেলে বলা চলে যে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি হেস্টিংসই সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলার সহিত বেনারসের চুক্তি সম্পাদন করে প্রকৃতপক্ষে অযোধ্যাকে ব্রিটিশ শক্তির উপর নির্ভরশীল রাজ্যে পরিণত করেন। ইতিমধ্যে ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে শাহ্ আলম মারাঠাদের ক্রীড়নকে পরিণত হ'লে হেস্টিংস তাঁর বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা ভাতা বন্ধ করে দেন এবং কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুটি তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ করে অযোধ্যার নবাবের নিকট পঞ্চাশ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করেন। অযোধ্যা রাজ্যের শক্তি

ও নিরাপত্তার মধ্যে ইংরেজ অধিকৃত রাজ্যের নিরাপত্তা নিহিত এই কথা উপলব্ধি করে হেস্টিংস অযোধ্যার নবাবকে রোহিলাখণ্ড জয় করতে সাহায্য করেন। তবে এই সাহায্যদানের জন্য তিনি অযোধ্যার নবাবের নিকট থেকে ৪০ লক্ষ টাকা আদায় করেন।

(৬) ইঙ্গ-মারাঠা ও ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

হেস্টিংসের শাসনকালে বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকার মারাঠা ও মহীশূরের (বর্তমান কর্নাটক) হায়দার আলির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হ'লে হেস্টিংসের চেষ্টায় প্রথম মারাঠা যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ ইংরেজদের অনুকূলেই সমাপ্ত হয়। এই দুই প্রেসিডেন্সীকে সাময়িক অর্থ সাহায্য দান করে হেস্টিংস সেই সব অঞ্চলে ইংরেজদের স্বার্থরক্ষা করেন।

(৭) কোম্পানীর অর্থাভাব দূরীকরণ

কোম্পানীর আর্থিক অনটন দূর করার উদ্দেশ্যে হেস্টিংস অবৈধভাবে অর্থ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। বারানসীর রাজা চৈৎসিংহ ও অযোধ্যার বেগমদের পীড়ন করে অর্থ সংগ্রহেও তিনি সঙ্কোচ বোধ করেন নি। এই দুই অভিযোগেই তাঁকে পরবর্তীকালে ইম্পিচ করা হয়। অর্থের জন্য তিনি বর্ধমানের রাণী এবং রাজসাহীর জমিদার রানী ভবানীর প্রতিও অন্যায় ব্যবহার করেন। মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসির কারণ মূলতঃ রাজনৈতিক হ'লেও অর্থ-সংক্রান্ত বিষয় নিঃসন্দেহে তার সহিত জড়িত ছিল।

(৮) হেস্টিংসের অবদান

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালের দোষ-ত্রুটির সংখ্যা এতই বেশি যে তাঁর চরিত্রের মহৎ ও উজ্জ্বল গুণগুলো প্রায় দৃষ্টির অগোচরেই থেকে যায়। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে তাঁর গুণাবলীর প্রশংসা না করা অনুচিত হবে। ভারতীয় বিচার-ব্যবস্থার গোড়া পত্তন, কোম্পানীর শাসনে সুশৃঙ্খলা আনয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার সাধন এবং কোম্পানীর রাজস্বকে আসন্ন পতনের সম্ভবনা থেকে সংরক্ষণ করে হেস্টিংস অনন্য সাধারণ দক্ষতা ও ক্ষমতার পরিচয় দেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর সাহিত্যানুরাগের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি বাংলা ও ফারসী ভাষা আয়ত্ত করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল এবং তিনি সংস্কৃত শিক্ষায় উৎসাহ দান

করতেন। কলকাতার মাদ্রাসা ও রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপিত হয়।

(৯) উপসংহার

প্রকৃতপক্ষে ভারতে হেস্টিংসের কার্যাবলী তুটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। তদানীন্তন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থলোলুপতা, কোম্পানীর পররাষ্ট্রীয় ও আভ্যন্তরীণ সমস্যার সব কিছুর কথা স্মরণ রাখলে হেস্টিংস ইংরেজ জাতির স্বার্থ কি পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন তা উপলব্ধি করা সহজ হবে। কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার শৃঙ্খলা স্থাপন, বৈদেশিক সম্পর্ক কোম্পানীর স্বার্থের অনুকূলে নিয়ন্ত্রণ, কোম্পানীর অর্থাভাব দূরীকরণ প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যার যথাযথ সমাধান করে হেস্টিংস ইংরেজ জাতিকে ভারতে সাম্রাজ্য ভোগের ব্যবস্থা করে দিতে সমর্থ হন। ইম্পিচমেণ্টের পর তিনি তুঃখ করে বলেন, "I gave you all and you have rewarded me with confiscation, disgrace and a life of impeachment." এই উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম। ব্রিটিশ স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে ভারতবর্ষে হেস্টিংসের আচরণ সমর্থনযোগ্য কিন্তু ভারতবাসীদের স্বার্থ, মর্যাদা, ন্যায়, সততা ও মানবতার দৃষ্টিতে হেস্টিংসের কার্যকলাপের অনেক কিছুই নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। তবে একথা ঠিক যে বহুমুখী প্রতিভা ও অসাধারণ কর্ম ক্ষমতার দ্বারা হেস্টিংস ব্রিটিশ ভারতের শাসন ব্যবস্থাকে যেমন দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করেন তেমনই ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগের ইতিহাসে নিজ পরিচয় রাখতে সমর্থ হন। খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেই হেস্টিংসের কৃতিত্ব বিচার প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক জে. এস. কটন মন্তব্য করেন, "Indians and Anglo-Indians alike venerate Hastings name, the former as their first beneficient administrator, the latter the most able and the most enlightened of their own class. If Clive's sword acquired Indian empire, it was the brain of Hastings that planned the system of civil administration and his genius that saved the empire in the darkest hour." ঐতিহাসিক পি. ই. রবার্টস ওয়ারেন হেস্টিংসকে ভারতের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ শাসক রূপে বর্ণনা করেন।" Hastings was perhaps the greatest Englishman who ever ruled. A man who with same ethical defect possessed in a super-abundant measure, the mobile and the fertile brain, the tireless energy and the lofty fortitude which distinguishes only the super-states man."

Q. 22. *Briefly review the different acts and legislations through which the British Parliament wanted to interfere in the affairs of the East India Company from 1757 to 1853.*

উত্তর : (১) রেগুলেটিং অ্যাক্ট

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গঠনতন্ত্র ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত চার্টার বা সনদ-এর উপর নির্ভরশীল ছিল। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দান করাই ছিল এই চার্টারের উদ্দেশ্য। কিন্তু ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পর কোম্পানী ক্রমে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলে স্বভাবতই পূর্বেকার চার্টারের উপর ভিত্তি করে কোম্পানীর কার্যাদি পরিচালনার অসুবিধা দেখা দিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে যথেষ্ট নয় বিবেচনা করে এবং কোম্পানীর কর্মচারিবর্গের অন্যায় আচরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে রেগুলেটিং অ্যাক্ট নামে একটি আইন ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হয়। ইংলণ্ডের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ এই আইনের প্রণয়নকারী ছিলেন।

রেগুলেটিং অ্যাক্ট ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা এবং শেয়ার হোল্ডারদের সভার গঠনতন্ত্রের সংস্কার সাধন করা হয়। পূর্বেকার নিয়ম অনুযায়ী পূর্বেকার পাঁচশ পাউণ্ডের শেয়ার হোল্ডারদের ভোট দানের ক্ষমতা নাকচ করে অন্ততঃ এক হাজার পাউণ্ডের শেয়ার হোল্ডারগণকে একটি করে ভোট দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তিন, ছয় ও দশ হাজারের শেয়ার হোল্ডারদের যথাক্রমে দুই, তিন ও চারটি করে ভোট দেওয়ার অধিকার দেওয়া হল। তাছাড়া ডাইরেক্টর সভাকে শেয়ারহোল্ডার সভা থেকে কতকটা স্বাধীন করে দেওয়া হল। ২৪ জন ডাইরেক্টরের মধ্যে ছজন প্রতি বছর পদত্যাগ করবেন এবং সেই স্থলে নতুন সদস্য নির্বাচিত হবেন। ভবিষ্যতে গভর্নর জেনারেল এবং কাউন্সিলের সদস্যগণ কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক নিযুক্ত হবেন কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করা প্রয়োজন হবে। ডাইরেক্টর সভা ব্রিটিশ সরকারের নিকট কোম্পানীর শাসন ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পেশ করতে বাধ্য থাকবে।

বাংলাদেশের গভর্নরকে গভর্নর জেনারেল আখ্যা দেওয়া হল। শাসনকার্যে তাঁকে সাহায্য করার জন্য চারজন সদস্যের একটি কাউন্সিল নিযুক্ত করা হল। কাউন্সিলের প্রত্যেক সদস্যকেই সমান অধিকার দেওয়া হল। একমাত্র দুদিকে সমান সংখ্যক

ভোট হলে গভর্নর জেনারেল তাঁর নিজ মতের প্রধান্য দিতে পারতেন। রেগুলেটিং আইন অনুযায়ী কাউন্সিলের প্রথম চারজন সদস্যের নাম উল্লেখ করে দেওয়া হয়। এই চারজন সদস্য ছিলেন ক্লেভারিং, মনসন, বারওয়েল ও ফিলিপ ফ্রান্সিস। এই কাউন্সিল পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হয়। কিন্তু একমাত্র ডাইরেক্টর সভার সুপারিশক্রমে পাঁচ বছরের পূর্বেই প্রয়োজনবোধে এই কাউন্সিল ভেঙ্গে দেওয়া সম্ভব ছিল।

একজন প্রধান বিচারপতি ও অপর তিনজন সাধারণ বিচারপতি নিয়ে ফোর্ট উইলিয়মে সুপ্রীম কোর্ট নামে একটি বিচারালয় স্থাপিত হয়। এই বিচারালয়কে গভর্নর ও কাউন্সিল থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাখা হয়। গভর্নর জেনারেল, কাউন্সিলের সদস্য ও বিচারপতিগণের জন্য উপযুক্ত বেতন ধার্য করা হল এবং তাদের পক্ষে কোন-প্রকার পারিতোষিক গ্রহণ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়।

(২) সমালোচনা

রেগুলেটিং অ্যাক্ট-এর প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, (১) এই অ্যাক্ট গভর্নর জেনারেল কাউন্সিলের ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করে নি। (২) তাছাড়া গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিল মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর কাউন্সিলের উপর কি প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন তাও এই অ্যাক্টে স্পষ্ট করে বলা হয় নি। ফলে বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউন্সিল কলকাতার গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের মতামত না নিয়ে স্বাধীনভাবে চলতে দ্বিধাবোধ করত না। (৩) সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা এবং গভর্নর-জেনারেল ও কাউন্সিলের সঙ্গে সুপ্রীম-কোর্টের সম্পর্কও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা না করায় অল্পকালের মধ্যেই সুপ্রীমকোর্টের সঙ্গে গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলের প্রকাশ্য বিরোধের সৃষ্টি হয়। (৪) সুপ্রীমকোর্টের বিচার ক্ষমতা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ধিত ছিল না বলে জমিদারগণের বিরুদ্ধে যে কোন ব্যক্তির অভিযোগও সুপ্রীম কোর্ট শুনতে আরম্ভ করে। দেশীয় দেওয়ানী বিচারকের বিচার ক্ষমতার উপরও সুপ্রীমকোর্ট হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। তাহারা ইংলণ্ডের বা ভারতীয় আইনের দ্বারা এই বিচারালয়ের কার্য পরিচালিত হবে সুনির্দিষ্টভাবে তার উল্লেখ না থাকায়ও অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। (৫) রেগুলেটিং অ্যাক্ট গভর্নর জেনারেলকে নিজ কাউন্সিলের মতামতের উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ক্ষমতা না দিয়ে শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করে তোলে। সুতরাং রেগুলেটিং অ্যাক্ট ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গঠনতন্ত্র ও কার্য পদ্ধতির উন্নতিসাধন করতে গিয়ে আরও নানা প্রকার জটিলতার সৃষ্টি করে। (৬) সর্বশেষে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতবর্ষে অধিকৃত অঞ্চলের উপর সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন নিয়ে কোম্পানী

বা ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে যে মতানৈক্য দেখা দেয় এই অ্যাক্ট সেই সম্পর্কেও কোন মীমাংসায় উপনীত হতে পারে নি।

(৩) ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট

রেগুলেটিং অ্যাক্ট কোম্পানীর শাসনপদ্ধতির উন্নতি সাধনের পরিবর্তে জটিলতা আরও বৃদ্ধি করে। তাছাড়া এই আইন কার্যকরী হওয়ার কিছুদিন পরে কলকাতার কাউন্সিলের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের সংবাদ ইংলণ্ডে পৌছিলে কোম্পানীর ভারতের অধিকৃত অঞ্চলের নিরাপত্তা ও শাসন সম্পর্কে সেখানে দারুণ সন্দেহ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। কোম্পানীর স্বার্থের সঙ্গে ইংরেজদের অনেকের স্বার্থই জড়িত ছিল। সেজন্য লর্ড নর্থ কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাব করে। ফলে ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে চার্টার অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের দ্বারা সুপ্রীম কোর্ট-এর গভর্নর জেনারল ও তাঁর কাউন্সিলের ক্ষমতা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়।

(৪) পিটের ভারত আইন

১৭৮১ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হওয়ার পরও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতের শাসনব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হয় নি। ফলে হেনরী ডাণ্ডাস ভারতের শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে ইণ্ডিয়া বিল নামে নতুন একটি আইন সংক্রান্ত প্রস্তাব পার্লামেণ্টে পেশ করেন। কিন্তু পিটের বিরোধিতার ফলে ডাণ্ডাসের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হয়। তারপর ফকস্ তাঁর ইণ্ডিয়া বিল পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত করেন। এই বিলে তিনি ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ইংলণ্ডে একটি সংস্থা গঠন করার প্রস্তাব করেন। বিলটি কমন্সসভায় গৃহীত হলেও হাউস অফ লর্ড কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়। ইতিমধ্যে ফকসের মন্ত্রীসভার পতনের পর পিট মন্ত্রীসভা গঠন করেন এবং ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর বিখ্যাত ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট পাস করেন।

এই আইনের শর্ত অনুযায়ী ইংলণ্ডে বোর্ড অফ কণ্ট্রোল নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। এই সভা ব্রিটিশ অর্থ সচিব, একজন সেক্রেটারী অফ স্টেট ও রাজা কর্তৃক মনোনীত প্রিভি কাউন্সিলের চারজন সদস্য নিয়ে গঠিত হল। তাছাড়া কোম্পানীর তিনজন ডাইরেক্টর নিয়ে একটি 'সিক্রেট কমিটি' গঠিত হল। বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ বা মতামত এই সিক্রেট কমিটি মারফৎ ভারতবর্ষে কোম্পানীর প্রতিনিধি-বর্গের নিকট প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বোর্ড অফ কণ্ট্রোল ও সিক্রেট

কমিটির যুগ্ম সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষমতা অন্য কোন সংস্থার থাকবে না বলেও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ভারতের গভর্নর জেনারেল প্রধান সেনাপতি এবং অপর দুজন সদস্য নিয়ে গঠিত মোট তিনজনের একটি কাউন্সিলের সাহায্য নিয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন বলে স্থির করা হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী দুটিকে যুদ্ধ, শান্তি, দেশীয় রাজ্যগুলোর সহিত সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে গভর্নর জেনারেলও তাঁর কাউন্সিলের অধীনে স্থাপন করা হল। রেগুলেটিং অ্যাক্টের ত্রুটির অভিজ্ঞতা থেকে এবার গভর্নর জেনারেলকে কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কাউন্সিলের মতামত অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা দেওয়া হল। তাছাড়া পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের আরও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল। কোম্পানীর কর্মচারিগণ ভারতবর্ষে চাকরীর জীবন শেষ করে ইংলণ্ডে ফিরে যাওয়ার সময় তাদের সঞ্চিত অর্থের হিসাব পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হ'ল। ভারতে চাকরী করার সময় তাদের কৃত অপরাধের জন্য ইংরেজ কর্মচারীদের বিচার করার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে একটি ট্রাইবুন্যাল গঠন করার ব্যবস্থা করা করা হয়। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বৃদ্ধি তাদের নীতি বিরুদ্ধ বলেও এই আইনে ঘোষণা করা হয়।

(৫) সমালোচনা

পিটের আইনও ত্রুটি মুক্ত অথবা সমালোচনার উর্ধ্বে নয় (১) পিটের আইনের ফলে কোম্পানীর ক্ষমতা হ্রাস পায় বটে, কিন্তু বোর্ড-অফ-কণ্ট্রোল যাতে ভারতের শাসন ব্যবস্থা ও ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে তথ্যাদি জানতে পারে সেরূপ কোন ব্যবস্থা তাতে ছিল না। (২) বোর্ড অফ কণ্ট্রোল ও ডাইরেক্টর সভার মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে এই আইন কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব বোধ বহুল পরিমাণে হ্রাস করে। সিক্রেট কমিটির পশ্চাতে থেকে বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের কাজ করার যে নীতি এই আইনের দ্বারা প্রবর্তিত হয় তা নিঃসন্দেহে শাসনকার্যে দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির সহায়ক ছিল না। ভারতে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ব্যাপারে ডাইরেক্টর সভার দায়িত্ব জড়িত ছিল, কারণ এই সভার সদস্যগণ ভারতবর্ষ থেকে অর্থ লাভের আশা করতেন কিন্তু বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সেরূপ কোন আশা ছিল না। (৩) পিট-এর ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট প্রধানতঃ ডাইরেক্টর সভার ও সমসাময়িককালের জনমতের মধ্যে একটি সমন্বয় সাধনের চেষ্টা হিসাবে বিবেচ্য। ফলে এই অ্যাক্টে মধ্যপন্থা অনুসরণের প্রবণতা দেখা যায়। বোর্ড অফ কণ্টোল যেমন ডাইরেক্টর সভার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়েছিল, তেমনই তাকে স্বাধীনভাবে নীতি প্রবর্তন বা কাজ করার কোন ক্ষমতা না দিয়ে ডাইরেক্টর সভার ক্ষমতা রক্ষার চেষ্টাও করা হয়। (৪) কোম্পানী কর্তৃক ভারতে

সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ক্রমেই বিস্তৃত হয়। এই সকল কারণে পিটের ভারত আইন জটিলতা ও অসংহতি পূর্ণ ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

(৬) ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার

১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে রেগুলেটিং আইন অনুসারে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে আরও বিশ বছর বাণিজ্য করার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় কোম্পানীকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার জন্য একচেটিয়া অধিকার দেওয়ার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে এক তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। ভারতীয় বাণিজ্য সকল ইংরেজের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়াই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার তুলে দিলে স্বার্থলোলুপ ইংরেজ বণিকদের পরস্পর প্রতিযোগিতায় ভারতে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটবে এই যুক্তি প্রদর্শন করে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হয়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা আরও বিশ বছরের জন্য ঈস্ট.ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করতে দেওয়া হয়। অবশ্য বছরে তিন হাজার টন পণ্যদ্রব্য সাধারণ বণিকদের ভারতবর্ষ থেকে ক্রয় করার অতি নগণ্য অধিকার এই চার্টারে স্বীকার করা হয়। কোম্পানীর গঠন সম্পর্কে কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এই চার্টারে করা হয় নি।

(৭) ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছাড়াও কয়েকটি শর্তাধীনে অন্যান্য ইংরেজ বণিকগণও ভারতে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। তবে চীন দেশের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার আরও বিশ বছরের জন্য তখনও বজায় থাকে। এই চার্টার সর্বপ্রথম ভারতীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের উৎসাহদান এবং ভারতীয়দের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করে। কলকাতায় একজন বিশপ এবং তিনজন আর্ক-ডেকন অর্থাৎ বিশপের নিম্ন পর্যায়ের যাজক নিযুক্ত করা হয়। কোম্পানীর সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এই চার্টারে করা হয়।

(৮) ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পুনরায় বিশ বছরের জন্য ভারতে শাসন

দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পেলেও চীনদেশে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার এই চার্টারে লোপ করা হয়। তবে এই চার্টারে ভারতীয় শাসনকর্তৃপক্ষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হয়। পূর্বে তাঁরা কেবলমাত্র রেগুলেশন পাস করতে পারত। এই চার্টারে বাংলার গভর্নর জেনারেলকে ভারতের গভর্নর জেনারেল আখ্যা দেওয়া হয়। ইয়োরোপীয় নাগরিকদের ভারতে জমিদারী ক্রয় করার অধিকার দেওয়া হয়। নীল চাষের জন্য এবং অনুন্নত এলাকায় জমি ক্রয় করার অধিকারও তাদের দেওয়া হয়। গভর্নর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা চার থেকে বৃদ্ধি করে পাঁচে পরিণত করা হয়। এই চার্টার অনুযায়ী সৃষ্ট আইনসচিব এই পঞ্চম সদস্যের পদ লাভ করেন। তাছাড়া জাতি ধর্ম, বর্ণ, জন্ম প্রভৃতির জন্য কোন ভারতীয়কে অথবা ব্রিটিশ নাগরিককে কোম্পানীর অধীনে চাকরী দানে আপত্তি করা চলবে না—এই নীতিও ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে চার্টারে সন্নিবিষ্ট হয়।

(৯) ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে শেষ চার্টার লাভ করে। এই চার্টার অনুসারে প্রথম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। বাংলা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ, প্রেসিডেন্সীর জন্য লেফটেন্যান্ট গভর্নরের পদ সৃষ্টি করা হয়। তবে এই চার্টারের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার বহু পূর্বেই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতের শাসনদায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সরকারের উপর ন্যস্ত হয়।

Q. 23. *Give a brief review of the administrative reforms of Lord Cornwallis.*

উত্তরঃ (১) ভূমিকা

১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস পদত্যাগ করলে লর্ড জন ম্যাকফারসন এক বছরের জন্য অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হন। পরে ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে ভারতবর্ষে আসেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যকলাপে সেই সময় ইংলণ্ডের জনসাধারণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয় যে কোম্পানীর দুর্নীতিপূর্ণ অবস্থার দ্বারা প্রভাবিত কোন ব্যক্তিকে আর গভর্নর জেনারেল পদে নিযুক্ত করা সমীচীন হবে না। এই কারণে বোর্ড অফ কণ্ট্রোলের সভাপতি হেনরী ডাণ্ডাস এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিটের অন্তরঙ্গ সুহৃদ লর্ড কর্নওয়ালিসকে গভর্নর

জেনারেল হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং ডাইরেক্টর সভা ও ব্রিটিশ সরকারের সমর্থন ও সহানুভূতি লর্ড কর্নওয়ালিসের পশ্চাতে ছিল।

(২) কর্নওয়ালিসের সুযোগ

পিটের ভারত আইন-এর শর্তানুযায়ী কর্নওয়ালিসকে ভারতে রাজ্য বিস্তার ও যুদ্ধনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হ'ল। ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই যুদ্ধ করা চলবে, তবে এরূপ নির্দেশও তিনি পান। রেগুলেটিং অ্যাক্টের লক্ষ্য করে কর্নওয়ালিসকে প্রয়োজনবোধে কলকাতা কাউন্সিলের মতামত অগ্রাহ্য করার ক্ষমতাও দেওয়া হল। সেই সময় কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার সংস্কার সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়, এজন্য লর্ড কর্নওয়ালিসকে যাবতীয় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়। কর্নওয়ালিস ছিলেন ইংলণ্ডের অভিজাত পরিবারের সন্তান এবং সম্মানিত ও ক্ষমতাশীল ব্যক্তি। নিজ কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা, সর্বোপরি জনসাধারণের উপকার করার ইচ্ছার সহিত তদানীন্তন ভারতীয় শাসনক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারী জন শোর, জেমস্ গ্রান্ট, উইলিয়ম জোনস্, জোনাথান ডানকান প্রভৃতির অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন করে এক সুসংহত শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার সুযোগ কর্নওয়ালিসের সম্মুখে উপস্থিত হয়।

(৩) লর্ড কর্নওয়ালিসের বাণিজ্য সংক্রান্ত সংস্কার

লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কার নীতি কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থার কোনদিকই বাদ দেয় নি। প্রথমতঃ, তিনি কোম্পানীর বাণিজ্য পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যবস্থার সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। পূর্বে ভারতবর্ষ হতে যে সকল পণ্য ইংলণ্ডে রপ্তানি করা হত তা ক্রয় করার জন্য কোম্পানী নিজ কর্মচারীদের সঙ্গেই চুক্তিবদ্ধ হত। অর্থাৎ ইংরেজ কর্মচারিগণই কোম্পানীর প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র সরবরাহের দায়িত্ব গ্রহণ করত। তারা দেশীয় বণিক বা দালালদের সাহায্যে মালপত্র ক্রয় করে কিছু লাভ রেখে কোম্পানীর নিকট বিক্রয় করত। ফলে কোম্পানী মুনাফার একটি বিরাট অংশ থেকে বঞ্চিত হত। কর্নওয়ালিস সরাসরি দেশীয় বণিকদের সহিত প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়ার নিয়ম প্রবর্তন করেন। এই ব্যবস্থার ফলে কোম্পানীর কর্মচারীদের আর্থিক ক্ষতি সাধিত হলেও কোম্পানীর লাভ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, পূর্বে কোম্পানীর যাবতীয় বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্য পরিচালনার জন্য এগারোজন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি বাণিজ্য-সংস্থা ছিল। কর্নওয়ালিস কাজের সুবিধার জন্য এই সদস্যের সংখ্যা কমিয়ে পাঁচজনে পরিণত করেন।

(৪) বিচার বিভাগীয় সংস্কার

কর্নওয়ালিস বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনেও মনোযোগী হন। তাঁর বিচার বিভাগীয় সংস্কারকে সাধারণভাবে ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই দুই ভাগে শ্রেণীভুক্ত করা যায়। প্রথমতঃ, ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদে সদর নিজামত আদালত নামে সর্বোচ্চ ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপন করেন। এই বিচারালয়ে সভাপতিত্ব করতেন বাংলার নবাব। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে কর্নওয়ালিস সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং নবাবের স্থলে গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল এই আদালতের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিলকে দেশীয় আইন-কানুন ও রীতি-নীতি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার জন্য কাজী ও মুফ্‌তি নিযুক্ত করা হল। দ্বিতীয়তঃ, সদর নিজামত আদালতের অধীনে কর্নওয়ালিস চারটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্থাপন করেন। এগুলোর প্রত্যেকটি দুজন করে ইংরেজ বিচারক নিয়ে গঠিত হত। বিচারকদের দেশীয় আইন ব্যাখ্যা করে বুঝাবার জন্য কাজী ও মুফ্‌তি নিযুক্ত করা হত। ভ্রাম্যমাণ বিচারকগণ বছরে দুবার করে বিভিন্ন জেলায় যেতেন এবং স্থানীয় ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। তৃতীয়তঃ, পূর্বে কোন ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর দণ্ডদানের রীতি প্রচলিত ছিল। কর্নওয়ালিস এই সকল নিষ্ঠুর দণ্ডদানের প্রথা রহিত করেন। চতুর্থতঃ, পূর্বে নরহত্যা রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে পরিগণিত হত না। ফলে, হত্যাকারী ভীতি প্রদর্শন করে বা নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনকে উপযুক্ত পরিমাণে অর্থপ্রদান করে মামলা মিটিয়ে নিতে পারত। কর্নওয়ালিস হত্যার অপরাধকে সমাজ বিরোধী বলে ঘোষণা করেন এবং মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর হত্যাকারীর বিচার নির্ভর করবে না, এরূপ আইন প্রবর্তন করেন। সমাজের উপকার করার জন্যই তিনি হত্যাকারীকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার নীতি বিধিবদ্ধ করেন। পঞ্চমতঃ, মুসলিম আইন অনুসারে পূর্বে অমুসলমানদের সাক্ষের উপর নির্ভর করে কোন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া চলত না। আবার কোন কোন অপরাধের বিচারে দুজন অমুসলমান-গামীকে একজন মুসলমান সাক্ষীর সমান বলে গণ্য করা হত। কর্নওয়ালিস বিচার ব্যাপারে এই সকল বৈষম্যমূলক ব্যবহার তুলে দিয়ে আইনের চোখে সকলকে সমান অধিকার দান করেন। ষষ্ঠতঃ, পূর্বে রাজস্ব অর্থাৎ দেওয়ানীর সহিত দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা জড়িত ছিল বলে রাজস্ব ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করার ব্যবস্থা করতে হত। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্নওয়ালিস দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থাকে রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণভাবে

পৃথক করে নিম্নতম স্তর থেকে ঊর্ধ্বতম স্তর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিন্যাস করেন। সেজন্য তিনি কয়েকটি প্রয়োজনীয় পরিবর্তনও সাধন করেন। (১) দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্নে তিনি সদর আমিন ও মুন্‌সেফী বিচারালয়গুলোকে স্থাপন করেন। এই সকল বিচারালয়ে সাধারণ শ্রেণীর দেওয়ানী মামলার বিচারের ব্যবস্থা ছিল। (২) সদর আমিন ও মুন্‌সেফী বিচারালয়ের উপরে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা বিচারালয় স্থাপন করা হয়। জেলা বিচারালয়গুলো এক-একজন ইংরেজ জেলা জজের অধীনে ছিল। (৩) জেলা বিচারালয়ের উপর চারটি প্রাদেশিক বিচারালয় স্থাপন করা হয়। কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা, এই চারস্থানে চারটি প্রাদেশিক বিচারালয় স্থাপিত হয়। এগুলোর পরিচালনার ভারও ছিল ইংরেজ বিচারকদের উপর ন্যস্ত। জেলা-জজের বিচারের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক বিচারালয়ে আপীল করা যেত। (৪) সমগ্র দেওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। গভর্নর জেনারেল ও কাউন্সিল এই বিচারালয়ের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। (৫) পূর্বে জেলা-কালেক্টরগণ দেওয়ানী মামলা-মোকদ্দমার বিচার করতেন। কর্নওয়ালিস তাঁদের বিচার-ক্ষমতা নাকচ করেন এবং তাঁদের শাসনক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তবে সাধারণ ধরনের ফৌজদারী মামলার বিচারকার্য তাঁরাই পরিচালনা করতেন।

(৪) কোম্পানীর কর্মচারীদের সংস্কার

কর্নওয়ালিস কোম্পানীর কর্মচারীদের কার্যনীতি ও কার্যপদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ঐতিহ্য গঠন করতে সাহায্য করেন। তিনি কর্মচারীদের কার্যনীতি ব্যাখ্যা করে কতকগুলো নিয়মকানুন চালু করেন। কর্মচারীরা যাতে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা না করে সেজন্য তিনি তাদের বেতন বৃদ্ধি করে দেন। কর্মচারীদের আনুগত্য, সততা, নিয়মানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণের উপর অত্যধিক জোর দিয়ে তিনি কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করেন।

(৫) পুলিস ব্যবস্থার প্রবর্তন

দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে কর্নওয়ালিস পুলিস ব্যবস্থারও সংস্কার সাধন করেন। গ্রামাঞ্চলকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেক অংশে তিনি একজন করে দারোগা নিযুক্ত করেন। পূর্বে জমিদারগণ নিজ নিজ এলাকায় শান্তি-রক্ষার দায়িত্ব পালন করতেন। এজন্য তাঁরা পুলিস বিভাগ বা শান্তিবাহিনী গঠন করতেন। কিন্তু কর্নওয়ালিসের সংস্কারের ফলে জমিদারগণের পুলিসবাহিনীর মাধ্যমে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব লোপ পায়। জেলায় পুলিস ব্যবস্থা জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে স্থাপিত হয়। কলকাতায় একজন পুলিস সুপারিনটেনডেণ্ট নিযুক্ত করে কলকাতার শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়।

(৬) রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার

কর্নওয়ালিসের আমলে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সংস্কার হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তন। এই ব্যবস্থার ফলে জমিদারগণ রাজস্ব আদায়কারী থেকে জমির মালিকে পরিণত হন। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দেওয়ার শর্তে জমিদারগণ জমি ভোগ দখল করার সুযোগ লাভ করেন। সময়মতো কোম্পানীর খাজনা দিলে জমিদারগণের জমিদারী থেকে অপসারিত হওয়ার কোন আশঙ্কা ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কোম্পানী প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে এবং তাদের প্রতি বছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব অর্থাৎ বাজেট প্রস্তুতিরও সুবিধা হয়। তাছাড়া জমিদারী প্রথা প্রবর্তনের ফলে উদ্ভূত জমিদার শ্রেণীর সাহায্য ও সহানুভূতিতে বিদেশী শাসন দৃঢ়তর হওয়ার সুযোগ লাভ করে।

(৭) সমালোচনা

লর্ড কর্নওয়ালিসের সংস্কার কার্যাদি সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ছিল না। তাঁর এই সংস্কার কার্য নানারূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রথমতঃ, তিনি দেশীয় বণিকদের সাথে কোম্পানীর রপ্তানী বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহের জন্য চুক্তিবদ্ধ করে একদিকে যেমন কোম্পানীর আয় বৃদ্ধি করেন অপর দিকে কোম্পানীর কর্মচারিবৃন্দের ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির পথও রুদ্ধ করেন। বাণিজ্য সংক্রান্ত তাঁর সংস্কার কার্যাদি কোম্পানীর ও দেশীয় বণিকদের প্রভূত উপকার সাধন করে। কিন্তু তাঁর এই নীতির ফলে কোম্পানীর কর্মচারিগণ খুব ক্ষুব্ধ হয় এবং কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধারও সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, বিচারব্যবস্থা সংস্কার করতে গিয়ে তিনি নবাব ও অপরাপর দেশীয় বিচারকদের বিচার ক্ষমতার বিলোপ সাধন করে বিচার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণভাবে ইংরেজদের করায়ত্ত করেন। কিন্তু এই সংস্কারের ফলে মুষ্টিমেয় ইংরেজ কর্মচারীর উপর অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব দেওয়ায় বিচারকার্যে অযথা বিলম্ব হতে শুরু করে। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন, বিচারব্যবস্থাকে পর্যায়ক্রমে ভাগ করে তিনি এই বিভাগকে অধিকতর দৃঢ় ও অধিকতর কার্যকরী করে তোলার ব্যবস্থা করেন। আইনের চোখে হিন্দু ও মুসলমানকে সমপর্যায়ে স্থাপন করে, হত্যা-অপরাধের বিচার সংক্রান্ত আইনের সংস্কার সাধন করে এবং নিষ্ঠুর দণ্ডদান বন্ধ করে তিনি নিঃসন্দেহে বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করেন। তবে বিচারব্যবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য কর্নওয়ালিস হেস্টিংসের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন—এই বিষয়ে তাঁর মৌলিকত্ব খুবই কম। তৃতীয়তঃ, ইংরেজ কর্মচারীদের দক্ষতা, সততা প্রভৃতি বৃদ্ধি এবং তাদের কর্মপদ্ধতির উন্নতি সাধন করতে গিয়ে তিনি কেবলমাত্র তাদের বেতনের উপরই গুরুত্ব আরোপ করেন।

কর্নওয়ালিসের ধারণা ছিল যে, অধিক বেতন দিলেই কর্মচারীদের নৈতিকতা বৃদ্ধি পাবে। অধিক বেতন দেওয়ার ফলে তাদের উৎকোচ গ্রহণের আগ্রহ কতক পরিমাণে হ্রাস পায়, কিন্তু শাসনকার্যে তাদের নীতিবোধ ও দক্ষতা যে খুব বৃদ্ধি পেয়েছিল তা কোনক্রমেই বলা চলে না। চতুর্থতঃ, পুলিস ব্যবস্থার সংস্কার করতে গিয়েও কর্নওয়ালিস ভারতীয়দের অর্থাৎ জমিদারদের ক্ষমতা হ্রাস করে সেই ক্ষমতা ইংরাজদের উপর অর্পণ করেন। ফলে নবগঠিত ইংরেজ শাসন ও স্বল্পসংখ্যক ইংরেজ কর্মচারীর উপর অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপানো হয়। পঞ্চমতঃ কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে নানা দিক থেকে উন্নতিমূলক ছিল, কিন্তু এই বন্দোবস্ত ত্রুটিমুক্ত ছিল না। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে সময়ের কড়াকড়ি অর্থাৎ 'সূর্যাস্ত আইন'—নির্দিষ্ট দিনে সূর্যাস্তের পূর্বে নিয়মিত রাজস্ব জমা দেওয়া, জমিদারের হাতে প্রজাদের সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দেওয়া, সরকারী রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি না করার ব্যবস্থা প্রভৃতি জমিদার, প্রজা ও ব্রিটিশ সরকার প্রত্যেকের পক্ষেই ক্ষতিকারক ছিল। তাছাড়া রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের সময় ছিয়াত্তরের মন্বন্তরজনিত কুব্যবস্থার কথা চিন্তা করা হয় নি। ফলে বহু জমিদার যেমন জমিদারী হারায়, তেমনই জমিদারদের অত্যাচারে বহু প্রজাও সর্বস্বান্ত হয়। সদিচ্ছাপ্রণোদিত হলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। ষষ্ঠতঃ, কর্নওয়ালিসের সংস্কারসমূহের প্রধান ত্রুটি ভারতীয়দের প্রতি তাঁর প্রচ্ছন্ন অবিশ্বাস। শাসনকার্য থেকে ভারতীয়দের বিচ্ছিন্ন রেখে কর্নওয়ালিস শাসক ও শাসিত-দের পরস্পরের প্রীতি ও সহযোগিতার পথ রুদ্ধ করেন। ভারতীয় শাসনব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিষয়ে অনভিজ্ঞ ইংরেজ কর্মচারিবর্গের উপর শাসনকার্যের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করে তিনি একদিকে যেমন তাদের দায়িত্ব ভারাক্রান্ত করেন, অপর দিকে তাদের অত্যধিক ক্ষমতাজনিত ঔদ্ধত্যবৃদ্ধির পথও প্রস্তুত করেন।

(৮) উপসংহার

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসন সংস্কার কর্নওয়ালিস কোড্ বা কর্নওয়ালিস বিধি নামে পরিচিত। ফ্রান্সের নেপোলিয়নের কোড্-এর অনুরূপ এই কোড কর্নওয়ালিস ভারতের শাসনক্ষেত্রে প্রবর্তন করেন। কিন্তু নেপোলিয়ন একটি স্বাধীন দেশে একটি স্বাধীন জাতির জন্য তাঁর শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করেন এবং নতুন শাসনতন্ত্র ফ্রান্সে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনয়ন করে। কিন্তু কর্নওয়ালিস ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ হিসেবে বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থরক্ষাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং বাহ্যতঃ তিনি এই সংস্কার কার্যে কিছু কিছু উদারতার পরিচয় দিলেও তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের

ভিত্তি দৃঢ় করে তোলা। ফলে তাঁর সংস্কার ব্রিটিশের স্বার্থরক্ষার পক্ষেই প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয় এবং ভারতীয়দের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে অবহেলিত হয়। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে হেস্টিংসের স্থাপিত শাসনতান্ত্রিক ভিত্তির উপর কর্নওয়ালিস প্রকৃত শাসনযন্ত্র তৈরি করেন এবং নিজস্ব চিন্তাধারার ত্রুটির জন্য কিছু কিছু ভুলও করেন। সেজন্য বলা হয়, "If the foundation of the civil administration had been laid by Warren Hastings, the structure was raised by Lord Cornwallis. It must remain the verdict of history that Cornwallis merely developed under happier auspices what Warren Hastings had begun, that in that part of this policy which was his own, he embarked from the false premises that reform in India meant making it like the England of his ideals, and he made serious abiding mistakes from best of the motives in the world."

Q. 24. *Critically examine the Permanent Settlement introduced by Lord Cornwallis in 1793.*

উত্তর : (১) ভূমিকা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্ভাবক লর্ড কর্নওয়ালিস ছিলেন না, ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশ্ন বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য স্যার ফিলিপ ফ্রান্সিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পক্ষপাতী ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতি ডাইরেক্টর সভা ও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দৃষ্টি প্রধানতঃ ফিলিপ ফ্রান্সিসের চেষ্টায়ই আকৃষ্ট হয়। পিটের ভারত আইন-এর ৩১ নং ধারায়ও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজস্ব স্থায়ী ভিত্তিতে নির্ধারণের নির্দেশ ছিল। "For settling and establishing upon principles of moderation and justice according to the laws and constitution of India, the permanent rule by which their respective tributes, rents and services shall be in future rendered and paid." লর্ড কর্নওয়ালিস যখন গভর্নর জেনারেল হয়ে ভারতে আসেন তখন ইংরেজ কর্মচারিগণ বাংলার রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হয় নি। এজন্য ১৭৮৭ ও ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে, এই দুই বছরের রাজস্ব বার্ষিক ভিত্তিতেই বন্দোবস্ত করা হয়। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস জেলা কালেক্টরগণকে রাজস্বের পরিমাণ,

কাদেব নিকট জমি বন্দোবস্ত দেওয়া উচিত, জমিদারগণের অত্যাচার থেকে রায়ত অর্থাৎ প্রজাবর্গকে রক্ষা করার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন প্রভৃতি বিষয়ে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দেন।

জেলা কালেক্টরগণ কর্নওয়ালিসের নির্দেশ অনুসারে দীর্ঘ দুবছর ধরে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন। এই সকল তথ্যের উপর নির্ভর করে কর্নওয়ালিস ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে জমিদারদের সঙ্গে দশ বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত করতে প্রস্তুত হন। তবে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে দশ বছরের বন্দোবস্তও দেওয়া সম্ভব হয় নি। যাহোক, এই বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও তিনি দেন যে, কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন লাভ করতে সমর্থ হলে এই দশ বছরের বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হবে। কিন্তু এই সময় লর্ড কর্নওয়ালিস এবং স্যার জন শোরের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন সম্পর্কে বিতর্ক শুরু হয় এবং এই বিতর্কের ফলে তদানীন্তন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অর্থনৈতিক অবস্থা ও রাজস্বনীতির অতি সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায়।

(২) কর্নওয়ালিস-শোর বিতর্ক

প্রথমতঃ, স্যার জন শোর এবং কর্নওয়ালিসের বিতর্কের প্রধান প্রশ্নই ছিল যে, ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা হবে কিনা। শোর-এর মতে কোম্পানী তখন পর্যন্ত রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করে নি, এরূপ অবস্থায় বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করার পূর্বে আরও অভিজ্ঞতা অর্জন করা প্রয়োজন। সুতরাং দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে এই ব্যবস্থায়ই চিরস্থায়ী করা হবে এরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া সমীচীন হবে না। কর্নওয়ালিসের মতে কোম্পানী রাজস্ব সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছে এবং যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে তার ভিত্তিতেই এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করা সম্ভব। দ্বিতীয়তঃ, ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মন্বন্তরের ফলে বাংলাদেশের কৃষিজমির এক-তৃতীয়াংশ জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে পড়ে। কর্নওয়ালিস মনে করেন যে জমিদারগণ চিরস্থায়ীভাবে এইসব জমির অধিকার না পেলে এই সকল জমিকে পুনরায় চাষ-আবাদের যোগ্য করে তোলার ব্যয় বহন করতে সম্মত হবে না। দশ বছর পরে জমিদারী হস্তান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে জমি উন্নয়নের কোন চেষ্টাই জমিদারগণ করবেন না। পক্ষান্তরে শোরের মতে জমিদারগণ ইতিপূর্বে এক বছর, অধিক হলে পাঁচ বছর পর্যন্ত জমির বন্দোবস্ত পেয়েছে, সুতরাং তাদের পক্ষে দশ বছরের জন্য জমির বন্দোবস্ত পাওয়াই জমি উন্নয়নের প্রেরণা স্বরূপ হবে। তৃতীয়তঃ, জন শোর একথাও বলেন যে, দশ বছরের জন্য বন্দোবস্ত দেওয়ার কালেই ভবিষ্যতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হবে, এইরূপ কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া উচিত

হবে না। কারণ ডাইরেক্টর সভা যদি দশ বছরের বন্দোবস্তের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অনুমোদন না করেন তাহলে কোম্পানীর উপর জমিদারদের আর আস্থা থাকবে না। শোরের এই যুক্তির উত্তরে কর্নওয়ালিস ডাইরেক্টর সভা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করেন এবং দশ বছরের বন্দোবস্তই যে পরবর্তীকালে স্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হবে একথাও তিনি দৃঢ়তার সহিত ব্যক্ত করেন। চতুর্থতঃ, শোর আর একটি কারণেও ঠিক সেই সময় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর মতে ১৭৮৯-৯০ খ্রীস্টাব্দের যে রাজস্ব জমিদারদের কাছ থেকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়, তা ন্যায্য রাজস্ব অপেক্ষা অনেক বেশি ছিল। সেজন্য জমিদারী পুনরায় জরিপ না করে রাজস্বের পরিমাণ স্থির করা অন্যায়মূলক হবে। শোরের আপত্তির কারণের মধ্যে এটিই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া তিনি আরও বলেন যে, ভারতের চিরাচরিত নীতিকে উপেক্ষা করে জমিদারদের যদি জমির মালিক বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে রায়ত ও জমিদারদের পরস্পরের সম্পর্কে হস্তক্ষেপ করার কোন ক্ষমতাই কোম্পানীর আর থাকবে না। ফলে রায়তদের দুর্দশা বৃদ্ধি হতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ডের রাজস্ব ব্যবস্থা ও জমিদারী পরিচালন ব্যবস্থায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লর্ড কর্নওয়ালিস এই দেশের জমিদারগণকেই জমির মালিক বলে মনে করেন এবং প্রজা ও জমিদারগণের পরস্পর সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা কোম্পানীর হস্তে রাখা হবে স্থির করলেন।

(৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন

লর্ড কর্নওয়ালিস ইতিমধ্যে ডাইরেক্টর বোর্ডের নিকট থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রয়োজনীয় নির্দেশ লাভ করেন। সুতরাং এই বিষয়ে তিনি শোরের মতামত অগ্রাহ্য করে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী প্রচলিত বার্ষিক বন্দোবস্ত দশ বছরের জন্য চালু থাকবে এবং ডাইরেক্টর সভা কর্তৃক অনুমোদিত হলে এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী করা হবে এরূপ ঘোষণা করেন। ডাইরেক্টর সভার প্রয়োজনীয় নির্দেশ ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে সেপ্টেম্বর এসে পৌছালে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ প্রচলিত বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বলে ঘোষণা করা হয়।

(৫) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হলে পরবর্তীকালে নানারকম ত্রুটি-বিচ্যুতি যে দেখা দিতে পারে লর্ড কর্নওয়ালিস ও ডাইরেক্টর বোর্ড এই সম্পর্কে একেবারে অবহিত ছিলেন না, সেকথা বলা চলে না। কোম্পানীর ডাইরেক্টর সভার সাথে কর্নওয়ালিসের পত্রালাপ এবং কর্নওয়ালিস-শোর বিতর্ক থেকে সেকথা প্রমাণিত হয়। কিন্তু কোম্পানীর

রাজস্ব-আয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া এবং বার্ষিক বাজেট প্রভৃতি প্রস্তুতির সুবিধার জন্যই প্রধানতঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এই ছিল প্রথম গুণ। দ্বিতীয়তঃ, জমিদারগণ জমির মালিক বলে স্বীকৃত হওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে যে জমির এবং প্রজাবর্গের উন্নতি সাধিত হয় নি, একথা বলা চলে না। বাংলাদেশের এমন বহু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায় যে, জমিদারদের অনেকেই প্রজাদের সুবিধার জন্য পুষ্করিণী খনন, বিদ্যালয় স্থাপন, চিকিৎসালয় নির্মাণ, রাস্তা-ঘাটের বন্দোবস্ত প্রভৃতি করার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময়ও জমিদারগণ প্রজাদিগকে নানাভাবে সাহায্য করতেন। তৃতীয়তঃ, গ্রামাঞ্চলের কুটির শিল্পও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে উন্নতি লাভ করার সুযোগ পায়। চতুর্থতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে জমিদারশ্রেণীর উদ্ভব ঘটে, স্বাভাবিকভাবেই তা ব্রিটিশ সরকারের শক্তিশালী সমর্থক শ্রেণীতে পরিণত হয়। পঞ্চমতঃ, জমিদারী প্রথা প্রচলিত হওয়ার ফলেই বাংলাদেশে তথাকথিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। পরবর্তীকালে এই শ্রেণী বাংলাদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে।

(৪) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটি

কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ অপেক্ষা ত্রুটির পরিমাণ নিঃসন্দেহে অনেক বেশি। ঐতিহাসিক হাণ্টার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ত্রুটিগুলো খুব সুন্দরভাবে আলোচনা করেন। প্রথমতঃ, এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদারদের অধীনস্থ জমি জরিপ না করে, কি পরিমাণ নিষ্কর জমি ছিল এবং কি পরিমাণ জমি পশুচারণ ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হত, সে সকল বিষয়ে কোনপ্রকার খোঁজ-খবর না নিয়েই রাজস্ব নির্ধারিত হয়। ফলে রাজস্বের হার অত্যধিক বেশি ছিল। জমিদারদের নিকট মোটামুটি যে ধারণা পাওয়া যায় তার ভিত্তিতেই রাজস্বের পরিমাণ স্থির করা হয়। জন শোর ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের পরে জমিদারগণের ভূসম্পত্তির সঠিক জরিপ না করে রাজস্ব নির্ধারণের অযৌক্তিকতার কথা উল্লেখ করেন। ফলে অনেক জমিদারীর প্রকৃত সীমানা নির্ধারিত না হওয়ার ফলে অনেকরকম জটিল সমস্যা দেখা দেয়।

দ্বিতীয়তঃ, নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব অনাদায়ের জমিদারী নীলাম করে অনাদায়ীকৃত রাজস্ব আদায় করে নেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার ফলে বহু প্রাচীন জমিদার পরিবার তাদের জমিদারী হারাতে বাধ্য হয়। আরামপ্রিয় জমিদার শ্রেণীর কাছ থেকে নিয়মিতভাবে এবং সময়মত রাজস্ব পাওয়ার আশা অনেক সময়ই সফল হয় নি। তাছাড়া রাজস্বের হার অত্যধিক হওয়ায় সময়মত রাজস্ব দেওয়া জমিদারদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, ফলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের বাইশ বছরের মধ্যে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক জমিদারী নীলাম

হয়ে যায়। যে সকল জমিদার সামন্ত প্রথার অনুকরণে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দেওয়ার শর্তে তালুকদার, ইজারাদার প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারদের কাছে জমি বন্দোবস্ত দিতে সক্ষম হন, কেবলমাত্র সেই সকল জমিদারই তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হন।

তৃতীয়তঃ, লর্ড কর্নওয়ালিস আশা করেন যে, জমিদারগণ যেমন নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেওয়ার শর্তে জমি ভোগ-দখলের স্থায়ী অধিকার কোম্পানীর কাছ থেকে লাভ করেন, ঠিক অনুরূপ শর্তে তাঁরাও নিজ নিজ রায়তদের জমি বন্দোবস্ত করে দেবেন। কিন্তু তাঁর এই আশা পূর্ণ হয় নি। অতি সামান্য কারণে, এমনকি বিনা কারণেও জমিদারগণ রায়তদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি।

চতুর্থতঃ, জমির মালিকানা চিরস্থায়ী হওয়ার ফলে সকলেই যে কোন উপায়ে জমি ক্রয় করার বা অধিকার করার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠলে জমির উপর ক্রমেই চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। জমি সংক্রান্ত মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যাও বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

পঞ্চমতঃ, অতি উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ায় জমিদারগণ রায়তদের কাছ থেকেও উচ্চহারে খাজনা আদায় করতে বাধ্য হন। ফলে রায়তদের আর্থিক দুর্দশা বৃদ্ধি পায়।

ষষ্ঠতঃ, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে জমির যে মূল্য ছিল পরবর্তীকালে তা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করার কোন সুবিধা ছিল না। ফলে সরকার সেই বর্ধিত মূল্যজনিত লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়।

সপ্তমতঃ, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির উন্নয়নে সচেষ্ট হবেন বলে কর্নওয়ালিস আশা করেছিলেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে জমিদারগণ জমির উন্নয়ন সম্পর্কে সচেষ্ট না হলেও জমি হস্তান্তরিত বা হস্তচ্যুত হওয়ার কোন আশঙ্কা না থাকায়, এ বিষয়ে তাঁরা মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অপর দিকে জমির উপর রায়তদের কোন অধিকার না থাকার জন্য জমির উন্নতি সাধন থেকে বিরত থাকে।

অষ্টমতঃ, বেশির ভাগ জমিদারই গ্রাম ত্যাগ করে শহরাঞ্চলে বসবাস করতে শুরু করলে গোমস্তা, নায়েব প্রভৃতির উপর জমিদারীর শাসন দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে সমর্পন করা হয়। গোমস্তা ও নায়েবদের অত্যাচারের ফলে রায়তদের দুরবস্থা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়।

নবমতঃ, তাছাড়া গ্রামের কৃষকদের শ্রমে উৎপন্ন আয় থেকে খাজনা আদায় করে জমিদারগণ শহর অঞ্চলে ব্যয় করার ফলে গ্রামের আর্থিক সমৃদ্ধিও দিন দিন হ্রাস পায়। এ সকল কারণে কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সু-উদ্দেশ্য প্রণোদিত হলেও ত্রুটিপূর্ণ ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

(৬) উপসংহার

লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সমসাময়িক ও পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। সেটন কার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্বন্ধে মন্তব্য করেন, "The Permanent Settlement somewhat secured the interests of the Zemindars, postponed those of the tenants and permanently sacrificed those of the state." প্রকৃতপক্ষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রায়তদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। ঐতিহাসিক ব্যাডেন পাওয়েলের মতে, "The Permanent Settlement disappointed many expectations and produced several results that were not anticipated. A very great blunder as well as gross injustice was committed when a settlement was made with the Zemindars alone and the rights of property every bit as good as their were ignored. Cornwalis committed himself to a policy which in regard to their three interested parties—the Zemindar, the ryot and the ruling power, assured the welfare of the first, somewhat postponed of the secured and sacrificed the interests of the third.

Q. 25. *Give an account of the social reforms in Bengal with special reference to the abolition of Suttee.*

উত্তর : (১) ভূমিকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে দেশে ধর্মের বন্ধন শিথিল হওয়াতে সমাজে নানা দুর্নীতি প্রবেশ করার সুযোগ পায়। কুসংস্কারের প্রাধান্য হওয়াতে অনেক কুপ্রথাও প্রশ্রয় পেতে থাকে। মুসলমান রাজশক্তির পতন হওয়ায় এবং নতুন রাজশক্তি তখনও ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারায় সমাজের অবস্থা অনেকাংশে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে। খ্রীস্টান পাদ্রীরা এই সময় এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে বিশেষ আগ্রহী হয় এবং তারা নানা কুসংস্কার দূরীকরণেও সচেষ্ট হয়। তারাই প্রথম গভর্নমেণ্টকে সামাজিক প্রথা দূরীকরণের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দেয়।

(২) সন্তান বিসর্জন রহিতকরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের উল্লেখযোগ্য ঘটনা গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন বা উৎসর্গের রীতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা। মিস্টার উডনী নামে জনৈক পাদ্রী প্রতি বছর গঙ্গাসাগরে যে সন্তান উৎসর্গ করা হত তার প্রতি লর্ড ওয়েলেসলির দৃষ্টি আকর্ষণ

করেন। ওয়েলেসলি উইলিয়ম কেরীকে এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে বলেন। কেরী তাঁর রিপোর্টে এই নৃশংস প্রথা রহিত করার জন্য অনুরোধ করেন এবং ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে অগাস্ট মাসে আইনের দ্বারা এই প্রথা রহিত করা হয়। ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দেশীয় প্রথায় হস্তক্ষেপ এই প্রথম। এই প্রসঙ্গে জন ক্লার্ক মার্শম্যান মন্তব্য করেন যে, "This was the first instance of any interference by the British Government with religious observances of the natives and the first vindication of the principles of humanity in opposition to the superstitious feeling of the people".

(৩) সতীদাহ প্রথা

ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা সতীদাহ প্রথা নিবারণ। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন রামমোহন রায়। তবে রামমোহনের পূর্বে ব্রিটিশ সরকারের দিক থেকে মাঝে মাঝে এই প্রথা নিবারণের জন্য চেষ্টা দেখা যায়। লর্ড ওয়েলেসলির শাসনকালের শেষভাগেও সতীদাহ প্রথা নিবারণের চেষ্টা হয়। কিন্তু রামমোহনই এই নৃশংস প্রথার বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আন্দোলন শুরু করেন।

সতী, সতীদাহ, সহমরণ এই তিনটি শব্দই একার্থবাচক। কিন্তু এই প্রথা হিন্দুর ধর্মসাধক অবশ্য করণীয় কর্মের মধ্যে কখনও গণ্য করে নি। তবে এই প্রথা দেশ-প্রচলিত একটি রীতি মাত্র। কিন্তু কতকগুলো কারণে এই রীতি একটি সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় হিন্দু সমাজদেহে পরিব্যপ্ত হলেও কখনও সমগ্র হিন্দু সমাজের মধ্যে আদৃত হয় নি। মহাভারতে সতীপ্রথার উল্লেখ থাকলেও মনু ও মনুকল্প স্মৃতিকারগণের কেউ এই প্রথাকে বিধবার একমাত্র অবশ্য কর্তব্য বলে বিধান দেন নি। স্মার্ত পণ্ডিত রঘু-নন্দন সতীদাহ প্রথার উচ্চ মহিমা কীর্তন করতে এই প্রথা বিধবার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে পরিগণিত হয়। তবে রঘুনন্দন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রথার ভূয়সী প্রশংসা করেন। দেশের রাজনৈতিক অরাজকতার জন্য সমাজে যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তা দূর করার উদ্দেশ্যে তিনি নৃশংস প্রথার বহুল প্রচারের জন্য চেষ্টা করেন।

মুসলমান আমলে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নানা রাজবিধি প্রচারিত হয়, কিন্তু সে সকল বিশেষ কার্যকরী হয় নি। সম্রাট আকবর এই প্রথার একান্ত বিরোধী ছিলেন। আইন-ই-আকবরীতে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের আমলেও সহমরণের বিরুদ্ধে রাজবিধি প্রণীত হয়। কিন্তু প্রবল জনমত এই প্রথার সপক্ষে থাকার জন্য সতীদাহের প্রসার রুদ্ধ হয় নি।

(৩) ইংরেজদের প্রচেষ্টা

ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের সূত্রপাত হতেই ইংরেজগণের এই নিদারুণ সামাজিক প্রথার প্রতি সকরুণ দৃষ্টি পতিত হতে দেখা যায়। মিশনারীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। লর্ড ওয়েলেসলি এই প্রথাকে সাধারণ নরহত্যা পর্যায়ভুক্ত করে সরাসরি বন্ধ করে দিতে অভিলাষী হন এবং এই বিষয়ে তদানীন্তন সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ নিজামত আদালতের বিচারকদের মতামত জানতে চান। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারী তাঁর নির্দেশ অনুসারে বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ মিস্টার ডাওডেস্-ওয়েল নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রার মিস্টার গুডকে এই মর্মে পত্র লেখেন। নিজামত আদালতের পণ্ডিত ঘনশ্যাম শর্মা এই সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, কোন স্ত্রীলোকের শিশু-পুত্র বা কন্যা থাকলে এবং কোন প্রতিনিধি তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজি থাকলে, এই স্ত্রীলোকের পক্ষে সতী হতে কোনরূপ বাধা নেই। তবে কোন উৎকট ঔষধ বা মাদক দ্রব্য সেবন প্রয়োগ করে কোন নারীকে সহমৃতা হতে উত্তেজিত করা অশাস্ত্রীয় ও লোকাচার বিরুদ্ধ। যাহোক সেই সময় সতীদাহ বন্ধ কবার ব্যাপারে নিজামত আদালত গভর্নর জেনারেলকে কোন পরামর্শ দিতে পারে নি বরং নিজামত আদালতের বিচারপণ্ডিগণ এই মর্মে অভিমত দেন যে, যদি ব্রিটিশ সরকার সরাসরি এই প্রথা বন্ধ করে দেন, তাহলে ইংরেজদের নানাপ্রকার রাজনৈতিক অসুবিধা ও দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হবে। পরে নিজামত আদালতের পরামর্শ অনুসারে লর্ড মিণ্টো ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে এক সারকুলার বিধিবদ্ধ করেন। এই সারকুলার অনুযায়ী বলপ্রয়োগ দ্বারা ও মাদক দ্রব্য প্রয়োগ করে বিধবাকে সহমরণে যেতে উত্তেজিত বা বাধ্য করা নিষিদ্ধ হয়। গর্ভবতী নারী ও অভিভাবকহীন শিশু সন্তানের জননীকেও সহমৃতা হতে না দেওয়া স্থির হয়। কিন্তু এই নির্দেশ পুরোপুরিভাবে কার্যকরী হয়নি।

মার্কুইস অফ হেস্টিংসের শাসনকালে (১৮১৩-১৮২৩ খ্রীস্টাব্দ) সতীদাহের এক তালিকা সংগৃহীত হয়। তিনি পতির মৃতদেহের সহিত স্ত্রীকে জীবন্ত অবস্থায় সমাধিস্থ করার বিপক্ষে এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। যুগী জাতীয় বিধবাদের মধ্যে প্রচলিত এই ব্যবস্থা হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত নয় বলেও তিনি ঘোষণা করেন এবং এই ব্যবস্থা দমনের জন্য পুলিস ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে এই রেগুলেশন প্রণীত হয়।

(৪) বেসরকারী প্রচেষ্টা

১৮১৯ খ্রীস্টাব্দে দেশের শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দু সম্প্রদায় সতীদাহ নিবারণের জন্য লর্ড হেস্টিংসের নিকট একটি আবেদন পত্র প্রেরণ করে। কিন্তু মুষ্টিমেয় ব্যক্তির এই

আবেদনের কোন ফল হয় নি। সতীদাহ নিবারণে হেস্টিংসের আন্তরিক অভিলাষ থাকলেও ধর্মে হস্তক্ষেপের ধারণায় দেশের লোকের অসন্তোষ বিধান এবং সিপাহিদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার আশঙ্কায় তিনি এ প্রথাকে সমূলে বিনাশ করতে সাহসী হন নি। তাঁর ধারণা হয় যে, বিলাতের জনসাধারণের পূর্ণ-সহানুভূতি না পেলে এই দৃঢ়মূল প্রথাকে উৎপাটিত করার মতো সাহস ভারতের সরকারের পক্ষে লাভ করা কঠিন। সেজন্য ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি বড় বড় শহরে সভা-সমিতি স্থাপন করে এই বিষয়ে ইংরেজ জাতির সহানুভূতিসম্পন্ন দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যবস্থা করেন। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে বেডফোর্ড শহরে, ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে এডিনবরায় এবং ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর প্রচেষ্টায় বহু স্থানে সভার আয়োজন করা হয়। এই সকল সভা একবাক্যে পার্লিয়ামেণ্টকে সতীদাহ প্রথা একেবারে বন্ধ করার জন্য অনুরোধ করে।

(৫) লর্ড আমহার্স্টের প্রচেষ্টা

১৮২৩ থেকে ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত লর্ড আমহার্স্টের শাসনকাল। এই সময় হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে সতীদাহ বিষয়ে রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হয়। লর্ড আমহার্স্টের পূর্বে এ বিষয়ে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল, তাদের এই আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বারানসীর রেসিডেণ্ট মিস্টার হ্যামিলটন উক্ত আইনের ধারা উদ্ধৃত করে ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই অগাস্ট আইনটি ঘোষণা করেন। লর্ড আমহার্স্ট তদানীন্তন ভারতের অবস্থা পর্যালোচনা করে ইংলণ্ডের কোর্ট অফ ডাইরেক্টরস্-কে এই মর্মে পত্র লেখেন যে সতীদাহ প্রচলিত থাকার ফলে দেশের মধ্যে যে অমঙ্গলের সৃষ্টি হয় তা নিবারণ করতে তার অপেক্ষা অমঙ্গলের যদি আশঙ্কা না থাকত তবে তিনি একদিনের জন্যও এই কুপ্রথার প্রশ্রয় দিতেন না।

(৬) বেণ্টিঙ্কের প্রচেষ্টা

লর্ড আমহার্স্টের পর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক ভারতের গভর্নর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮২৮ থেকে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদ অলঙ্কৃত করেন। সরকারী কাগজ-পত্র পরীক্ষা করে তিনি বুঝতে পারেন যে, একমাত্র সিপাহি বিদ্রোহের আশঙ্কায় পূর্ববর্তী গভর্নরগণ এই প্রথা একেবারে বন্ধ করে দিতে সাহসী হন নি। তিনি বিভিন্ন প্রদেশের প্রধান প্রধান সৈনিক কর্মচারীদের মতামত সংগ্রহ করে জানতে পারেন যে, এই সম্পর্কে পূর্বসূরীদের আশঙ্কা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাছাড়া এই সময় নিজামত আদালতের বিচারপতিগণ এই প্রথা রহিত করার জন্য দৃঢ়ভাবে গভর্নমেণ্টকে লিখে পাঠান। ঐ আদালতের পাঁচজন বিচারপতির মধ্যে সতীদাহ প্রথার আংশিক সমর্থক একজন বিচারপতির অবসর গ্রহণের ফলে বেণ্টিঙ্কের পথ আরও সুগম হয়। দেশের

সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণের এই সহযোগিতা সতীদাহ নিবারণ আন্দোলনকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত মিস্টার জে. পেগস্-এর 'The Suttee's Cry to Britain' পুস্তকখানিও দেশের জনমত গঠনে বিশেষ কার্যকরী হয়। এই সময় দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় সতীদাহ নিবারণকল্পে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ। রামমোহন রায় ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ লেখেন। কিন্তু রামমোহনের পূর্বেই সহমরণ যে শাস্ত্র সম্মত নয় এই মত এ দেশের এক রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ মৃতুঞ্জয় তর্কালঙ্কার ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতির অনুরোধে ব্যক্ত করেন।

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুলাই ইণ্ডিয়া গেজেট নামক পত্রিকায় ইংরেজ সরকারের সহমরণ প্রথা রহিত করার সংবাদ প্রকাশিত হয়। রামমোহন রায়, কালীনাথ রায় চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করলে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাধাকান্তদেবের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা সহমরণ প্রথা সমর্থন করেন। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক এই প্রথা আইন বিরুদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, নিমাই চাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, গোকুলনাথ মল্লিক, ভবানীচরণ মিত্র ও রামগোপাল মল্লিক বেন্টিঙ্কের নিকট উপস্থিত হয়ে সতীদাহ প্রথার সপক্ষে এক দরখাস্ত করেন। সতীদাহ প্রথা আইন জারি হলে রক্ষণশীল হিন্দুরা ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী স্বধর্ম রক্ষার নিমিত্ত ধর্মসভা স্থাপন করেন। এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ নিবারণের আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা। প্রাণপণ চেষ্টা করেও ধর্মসভা সতীদাহ নিবারণ আইন রোধ করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ এই যে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি রক্ষণশীল দলেরই একটি শক্তিশালী অংশ এই ঘৃণ্য নির্মম প্রথার বিরুদ্ধে ছিল। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী টাউন হলে এক সভা আহ্বান করে রামমোহন রায় বেন্টিঙ্ককে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। রক্ষণশীল দল বেন্টিঙ্কের বিধিবদ্ধ আইন রদ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের কাছেও আবেদন করে কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টাও সফল হয় নি।

Q. 26. *Trace the development of British sovereignty in Bengal.*

উত্তর : (১) ব্রিটিশ সার্বভৌমত্বের সূত্রপাত

ঐতিহাসিক ইলবার্টের মতে "British authority in India may be traced to

a two fold source. It is derived partly from the British crown, partly from the Great Mughal and other native rulers of India." প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের নবাবের কাছ থেকে ধীরে ধীরে সার্বভৌম ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের নিকট হস্তান্তরিত হয়। একটি দুর্বল ও ক্ষয়িষ্ণু শক্তির সহিত বর্ধিষ্ণু ও বলশালী শক্তির সংঘর্ষের অনিবার্য ফল হিসাবেই এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে দুটি প্রচণ্ড আঘাতের ফলে বাংলাদেশের মুসলিম শক্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমতঃ, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী রবার্ট ক্লাইভ কর্তৃক কলকাতা পুনরুদ্ধার এবং ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর যুদ্ধপ্রান্তরে বাংলাদেশের নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী জমিদারের পদমর্যাদা ভোগ করত। কিন্তু নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সহিত রবার্ট ক্লাইভের ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ফেব্রুয়ারীর চুক্তির ফলেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সার্বভৌম শক্তিতে পরিণত হওয়ার প্রথম সোপান তৈরি হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানী মুদ্রা নির্মাণ ও দুর্গ-প্রাকার স্থাপনের অধিকার লাভ করে। তখনও আইনতঃ মোগল সম্রাটই বাংলাদেশের সার্বভৌম শক্তির অধিকারী, তবে সেই শক্তিতে ফাটল দেখা দিতে শুরু করে।

(২) মীরজাফর ও ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব

মীরজাফরের আমলে আনুষ্ঠানিকভাবে মোগল সম্রাটের সার্বভৌম অধিকার অস্বীকার করা না হলেও কার্যতঃ ইংরেজ শক্তিই বাংলা দেশের সর্বেসর্বা হয়ে উঠে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্যেই মীরজাফর ফরমান লাভ করতে সমর্থ হন। নবাব মীরজাফর ইংরেজদের স্বার্থের সঙ্গে নিজের স্বার্থ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করেন এবং প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে, ইংরেজদের শত্রু নবাবেরও শত্রু, ইংরেজদের মিত্র নবাবেরও মিত্র। ইংরেজদের সমস্ত আর্থিক দাবিও তিনি পূরণ করতে সম্মত হন। পরবর্তীকালে নবাবের এই প্রতিশ্রুতিই উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের প্রধান কারণরূপে দেখা দেয়। কোম্পানীর নিকট নবাবের ঋণের কথা ইংরেজরা কখনও বিস্মৃত হয় নি এবং নবাবের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাঁর উপর নানারূপ দাবি করতে শুরু করে। সিংহাসনে আরোহণের পর মীরজাফরও নানারকম আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যার সম্মুখীন হন, ইংরেজদের সাহায্যলাভ ব্যতীত তার পক্ষে এইসব সমস্যা সমাধান করা সম্ভব ছিল না। ইংরেজরাও এই সুযোগে নবাবের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে স্থাপন করতে সমর্থ হয়।

(৩) মীরকাশিম ও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী

মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে এবং মীরকাশিমকে সিংহাসনে স্থাপন করে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের সম্মান আরও বৃদ্ধি করার সুযোগ পায়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্যই ছিল দেশের প্রকৃত শাসকের সঙ্গে দেশের প্রকৃত সামরিক শক্তির অধিকারীর দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের জন্যই মীরকাশিম সিংহাসন লাভ করেন আবার এই দ্বন্দ্বের ফলেই তিনি সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হন। মীরকাশিমের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকাল ইংরেজদের শক্তি ও অধিকার বৃদ্ধির পথ সুগম করে তোলে।

(৪) দেওয়ানী লাভ

মীরকাশিমের পতনের পর ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে মীরজাফর পুনরায় বাংলাদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু মীরজাফর প্রাক্-পলাশী বা উত্তর পলাশী যুগের তাঁর পাত্র-মিত্র-বন্ধুদের দ্বারা সিংহাসনের উপর অধিকার স্থাপন করতে সমর্থ হন নি। প্রকৃতপক্ষে কলকাতা কাউন্সিলের অনুগ্রহে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নবাব নজব-উদ্-দৌলার রাজত্বকালে কলকাতা কাউন্সিল নবাবের প্রধান-মন্ত্রী স্থির করার এবং রাজস্ব বিভাগ পরিচালনা করার অধিকার লাভ কে। কিন্তু তখন পর্যন্ত কোম্পানী বাংলাদেশের সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে নি কিন্তু কোম্পানীর হাতের পুতুল মোগল সম্রাট ও বাংলার নবাবের পাশাপাশি একটি নতুন শক্তি গড়ে ওঠে এবং এই শক্তি রাজ্যের সামরিক বাহিনী গঠনের, রাজস্ব আদায়ের এবং নবাবের প্রধান প্রধান কর্মচারী নিয়োগের সমস্ত দায়িত্ব বহন করত। কিন্তু অন্যান্য বিদেশী শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয়ে এবং ইংলণ্ডের সরকারের হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের উপর সার্বভৌমত্বের দাবি প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে সাহসী হয়নি। যদিও বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমগ্র অঞ্চলের উপরও তাদের দেওয়ানী স্বীকৃতি লাভ করে তথাপি আইনতঃ ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের পরই নবাব মীরকাশিম কর্তৃক কোম্পানীর নিকট প্রদত্ত কলকাতা, ২৪ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানের উপর ইংরেজদের সার্বভৌম ক্ষমতা স্থাপিত হয়। তবে ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের রেগুলেটিং আইন কেবলমাত্র কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের উপরই কোম্পানীর সার্বভৌম অধিকারের কথা স্বীকার করে। এই অ্যাক্টে ব্রিটিশদের প্রজা ও ভারতীয় শাসকদের অধীনস্থ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্যও নির্ণয় করা হয়। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে রেজা খানকে নায়েব-দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করার সময় পুনরায় মোগল সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হয়। ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের পিটের ভারত আইন বিধিবদ্ধ করার সময় এবং ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীকে নতুন সনদ মঞ্জুর করার সময়ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে যায়। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সময়ই ব্রিটিশ শক্তি সর্বপ্রথম সার্বভৌম অধিকার প্রকাশ্যে দাবি করে।

(৫) ওয়ারেন হেস্টিংস

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের সময় রবার্ট ক্লাইভ মোগল বাদশাহের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন এবং কারা ও এলাহাবাদ এই দুটি জেলার অধিকার ছাড়াও বার্ষিক ২৬লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হন। কিন্তু ওয়ারেন মোগল বাদশাহকে এইসব সুযোগ ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করেন। প্রকৃতপক্ষে ওয়ারেন হেস্টিংসের এই কাজ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সমতুল্য। তাছাড়া তিনি ক্লাইভ কর্তৃক মোগল বাদশাহকে প্রদত্ত কারা ও এলাহাবাদের শাসন দায়িত্ব অযোধ্যার নবাবের হস্তে অর্পণ করেন।

এই সময় কোর্ট অফ ডাইরেকটরস্ হেস্টিংসকে নির্দেশ দেয় "to stand forth as

Diwan" হেস্টিংস তার অর্থ করেন, "to assume openly the management of the Diwani without any foriegn intervention প্রকৃতপক্ষে হেস্টিংস কোর্ট অফ ডাইরেকটরস্-এর নির্দেশ নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা করে ইংরেজদের সার্বভৌম শক্তি স্থাপন করার চেষ্টা করেন। কারণ হেস্টিংস উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে মোগল সম্রাটের সার্বভৌম অধিকার শুধু নামে মাত্র, বাস্তবে তা একেবারেই অর্থহীন। ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে হেস্টিংস তাঁর প্রতিনিধি মিস্টার ব্রাউনকে দিল্লীর বাদশাহের দরবারে পাঠান, কিন্তু বাদশাহের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করা এবং কারা ও এলাহাবাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্পর্কে কোনরূপ আলোচনা করতে তাঁকে নিষেধ করেন। বাদশাহের প্রতি হেস্টিংস বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করলেও, তাঁর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে সম্মত ছিলেন না।

(৬) কর্নওয়ালিস

হেস্টিংসের নীতিও কর্নওয়ালিস অনুসরণ করেন। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলার নবাবও ক্ষমতাশূন্য হয়ে পড়েন। গোলাম কাদের-এর বিরুদ্ধে বাদশাহ শাহ আলম কর্নওয়ালিসের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেন। ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে মোগলবাদশাহের প্রতিনিধি সিন্ধিয়া বাংলার চৌথ দাবি করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কর্নওয়ালিস তার প্রতি কর্ণপাৎ করতেও অসম্মত হন। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলার নতুন নবাব দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে ফরমান আদায়ের জন্য আবেদন করার প্রয়োজনও অনুভব করেন নি।

(৭) বাংলার নবাবের অবস্থা

.৭৬৫ থেকে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলার নবাব ধীরে ধীরে ক্ষমতা শূন্য হয়ে পড়েন এবং বাংলাদেশে মুসলিম সার্বভৌমত্বের পরিবর্তে ব্রিটিশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দেওয়ানী লাভের সময় হেস্টিংস মোগল প্রথা অনুযায়ী একজন নাজিম নিযুক্ত করতে রাজি হন, কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কর্নওয়ালিশ যখন তাঁর কার্যভার ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন নাজিমের প্রয়োজন তখন শেষ এবং বাংলাদেশের উপর তখন ব্রিটিশের একাধিপত্য সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে নবাবের সব দায়িত্ব ও অধিকার ইংরেজদের করায়ত্ত হওয়ার ফলে নবাবের পদ অর্থহীন হয়ে পড়ে। হেস্টিংস শাসনের সুবিধার জন্য নিজামত ও দেওয়ানী ইংরেজদের দ্বারা যুগ্মভাবে পরিচালনার পক্ষপাতী ছিলেন। কাউন্সিলের গরিষ্ঠ সংখ্যক সদস্য তাঁর নীতির বিরোধিতা করলেও সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ হেস্টিংসকেই সমর্থন করেন। রাধাচরণের মামলার সময় প্রধান বিচারপতি ইলিজা ইম্পে নবাবকে empty title এবং অপর একজন বিচারক 'Phantom, this man of straw' বলে অভিহিত করেন। মীরকাশিমের পতনের পর অর্থ, প্রতিরক্ষা এবং বেসামরিক শাসনের সব দায়িত্বই কোম্পানী গ্রহণ করলে নবাবের নিজামত ক্ষমতার অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়। ফলে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নবাব ক্ষমতাহীন নামেমাত্র শাসকে পরিণত হন এবং ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় ও বহির্ভারতীয় সকলেই উপাধি সর্বস্ব নবাবের ক্ষমতাহীনতার কথা বুঝতে সমর্থ হয়।

History of Bengal

PART II

(1757-1857)

Q. 1. Critically examine the contribution of the Christian Missionaries in the field of spread of education in Bengal.

উত্তর। (১) **মিশনারীরা শিক্ষাবিস্তারে ব্রতী হওয়ার কারণ**—আধুনিক ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে মিশনারীদের একটা বিশিষ্ট অবদান আছে একথা অনস্বীকার্য। মিশনারীরা মুখ্যতঃ ধর্ম প্রচার করতেই এদেশে এসেছিলেন, কিন্তু ধর্ম প্রচার করতে এসে কেন তাঁরা শিক্ষা প্রচারে ব্রতী হলেন তাও জানা দরকার। তাঁদের ধারণা ছিল ভারতীয়দের কুসংস্কার দূর করতে পারলেই তারা খ্রীষ্টান হবে। তাই আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন। আবার ধর্মান্তরিতদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে তাদের শিক্ষার প্রয়োজন। তাই স্কুল খুলতে হ'ল। দেশীয় খ্রীষ্টানদের জন্য ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করে বাইবেল ছাপানো প্রয়োজন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজন, তাই মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হ'ল। ভারতীয় ভাষা শিখতে হলে ভাষার ব্যাকরণ জানা দরকার। আঞ্চলিক ভাষায় ব্যাকরণ তখনও রচিত হয়নি—দেখা যায় বাংলা ব্যাকরণ ও তামিল ব্যাকরণ মিশনারীরাই প্রথম লিখেছেন। দেশীয় খ্রীষ্টানগণ যাতে কাজকর্ম পায় সেইজন্য কারিগরী শিক্ষাও মিশনারী শিক্ষার একটা অঙ্গ ছিল। ফলে কোথাও ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়ে শিক্ষাবিস্তার শুরু হল, কোথাও শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে ধর্মপ্রচারের চেষ্টা চলতে লাগলো—ধর্মপ্রচার ও শিক্ষাবিস্তার মিশনারী প্রচেষ্টায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে।

(২) **ব্রিটিশ কোম্পানীর মনোভাব**—অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এদেশে রাজনৈতিক প্রভাব ও অধিকার বিস্তারের পূর্ব পর্যন্ত মিশনারীদের সম্পর্কে ইস্ট ইণ্ডিয়া কর্তৃপক্ষের কোন বিরূপ মনোভাব ছিল না। বাংলাদেশে কোম্পানী মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তারকার্যে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেনি, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে মিশনারীরা কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ থেকে নানাভাবে সাহায্য পায়। পলাশীযুদ্ধে জয়লাভ ও দেওয়ানী লাভের পর রাজনৈতিক কারণে কোম্পানীর নীতির পরিবর্তন হয়। দেশের শাসন-পরিচালনার স্বার্থে কোম্পানী মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তার ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করে। মিশনারীদের ধর্ম প্রচার প্রচেষ্টায় ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি হতে পারে, এই সম্ভাবনার কথা বিবেচনা করে কোম্পানী তাদের এলাকায় মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের বিরোধিতা শুরু করে।

(৩) **শ্রীরামপুর মিশন**—ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধিতার ফলে মিশনারীরা দিনেমার বাণিজ্য কেন্দ্র শ্রীরামপুরকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতে তাঁদের প্রচার কার্য চালাতে থাকেন। বিদেশে ধর্ম প্রচারের জন্য লণ্ডনে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সোসাইটি বাংলাদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য উইলিয়ম

কেরীকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রেরণ করেন। নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে কেরী মালদহের মদনাবতীতে নীলের কারখানায় কাজ নেন। এখানে তিনি বাইবেল প্রচারে ব্রতী হন। ১৭৯৯ খ্রীঃ সোসাইটি আর-এক দল মিশনারী বাংলাদেশে পাঠান। তাঁদের ছাড়পত্র না থাকায় কলকাতায় নামতে দেওয়া হয় না। তাঁরা দিনেমার অধিকৃত শ্রীরামপুরে অবতরণ করেন। শ্রীরামপুর কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাদরে গ্রহণ করেন। এই দলে ছিলেন মার্শম্যান এবং ওয়ার্ড। তাঁদের অনুরোধে কেরী শ্রীরামপুরে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। কেরী ছিলেন সংগঠক ও প্রচার-বিশারদ, ওয়ার্ড ছিলেন দক্ষ মুদ্রণশিল্পী ও মার্শম্যান সুদক্ষ স্কুল-শিক্ষক। উনবিশ শতাব্দীর উষালগ্নে (১০ই জানুয়ারী, ১৮০০ খ্রীঃ) এই 'ত্রয়ী' শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা "শ্রীরামপুর ত্রয়ী" নামে খ্যাত। এঁদের মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তার ও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি হয়। আমাদের মনে রাখতে হবে ১৮০০ খ্রীঃ আমাদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি স্মরণীয় বছর।

উনবিংশ শতকের বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের বিশেষ করে গদ্যের জন্মের ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়মের দান অপরিসীম। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮০০ খ্রীঃ।

(৪) **উইলিয়ম কেরী**—উনবিংশ শতকের প্রথমে শিক্ষা, ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ধর্ম, সমাজ-সংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনের জোয়ার আসে, যার ফলে বাংলা তথা ভারতে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রীরামপুর মিশনের বিশিষ্ট অবদান আছে। এর প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের প্রাণপুরুষ উইলিয়ম কেরীর প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। ইংলণ্ডের নর্দাম্পটনের একটি ছোট গ্রাম পলাশ পিউরির এক সাধারণ তাঁতি পরিবারে ১৭৬১ খ্রীঃ ১৭ই আগষ্ট কেরী জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলায় লেখাপড়ায় কেরীর ছিল অসীম আগ্রহ। আর্থিক দুরাবস্থার জন্য কেরী ১২ বছর বয়সে পাঠশালা ছাড়তে বাধ্য হন। এই সময়ের মধ্যে ভাষা শেখার প্রতি বিশেষ আগ্রহ দেখা দেয়। নিজের চেষ্টায় খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি গ্রীক, লাতিন, ধর্মশাস্ত্র পাঠ শেষ করেন। ১৭৮৬ খ্রীঃ তিনি মূলটানে একটি পাঠশালায় চাকরি গ্রহণ করেন। সংসার চালাবার জন্য তাকে জুতো সেলাই করতে হত। এই সঙ্গে তিনি লেখাপড়া ধর্মচর্চা চালিয়ে যেতে থাকেন। ভাষা শিক্ষার অস্বাভাবিক প্রয়াসে তিনি ডাচ, ইটালিয়ান, ফ্রেঞ্চ ভাষা শেখেন। ১৭৮৯ খ্রীঃ তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে শিষ্টারের ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেন। ধর্মযাজকের বৃত্তি গ্রহণ করেই তিনি বিদেশে ধর্ম প্রচারে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। "An Enquiry" নামে একটি পুস্তিকায় তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। ১৭৯২ খ্রীঃ ২রা অক্টোবর "Enquiry" নিয়ে এক আলোচনা সভায় বিদেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ব্যাপটিষ্ট মিশনারী সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় বাংলাদেশে প্রখ্যাত চিকিৎসক ও ধর্ম-

প্রচারক রেভারেণ্ড জন টমাসের সাথে কেরীর পরিচয় হয়। আদি যুগের বাংলা গদ্যের অন্যতম স্রষ্টা রামরাম বসু ছিলেন টমাসের বাংলা ভাষার শিক্ষক। টমাস কেরীকে বাংলা-দেশে আসতে রাজী করান। এই সময়ে মিশনারীদের পক্ষে বাংলাদেশে যাওয়া খুব অসুবিধাজনক কাজ ছিল। কোম্পানীর ছাড়পত্র ছাড়া কোম্পানীর রাজত্বে মিশনারীদের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কেরী কোম্পানীর অনুমতি পত্র যোগাড়ে ব্যর্থ হয়ে স্থির করেন বিনা ছাড়পত্রেই বাংলাদেশে যাবেন। সব বাধা বিঘ্ন অগ্রাহ্য করে কেরী সপরিবারে টমাসের সঙ্গে ১৭৯৩ খ্রীঃ ১৩ই জুন এক দিনেমার জাহাজে নতুন দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

দীর্ঘ যাত্রা পথ অতিক্রম করে পাঁচ মাস বাদে ১১ই নভেম্বর কেরী ও টমাস কলকাতা পৌছান। জাহাজে কেরী টমাসের কাছে বাংলা ভাষা শিখে সাথে সাথে বাইবেলের বাংলা অনুবাদ শুরু করেন। কলকাতা পৌছে জাহাজ ঘাটেই টমাসের বাংলা শিক্ষক রাম রাম বসুর সাথে কেরীর পরিচয় হয়। বাংলা গদ্যের দুই আদি রূপকারের এই মিলন বাংলা গদ্য সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কেরী রাম রাম বসুকে ২০ টাকা মাহিনায় তাঁর মুন্সি নিযুক্ত করেন। বাংলা গদ্যের সূচনার যুগে কেরীর জীবনে নানা প্রতিকূল অবস্থায় নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করতে রাম রাম বসুই কেরীকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন।

বাংলাদেশে পৌছবার পর নয়মাস সময় কেরীকে নানা দুঃখকষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। স্থায়ীভাবে থাকার কোন বাসস্থান নেই। আর্থিক অনটন, কর্ম-সংস্থানের সন্ধানে তিনি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকেন। অবশেষে টমাসের চেষ্টায় উডনীর নীল কারখানায় ম্যানেজারের চাকরি পান। নীলকুঠির চাকরি নিয়ে কেরী ১৭৯৪ খ্রীঃ মালদহের মদনাবতীতে আসেন। এখানে তিনি ১৭৯৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ছিলেন। মদনাবতীতে এসেই তিনি স্থানীয় অধিবাসীদের ছেলেমেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে এসে বাংলা ভাষায় বেশ রপ্ত হয়ে ওঠেন। নিজের কাজ চালাবার জন্য তিনি একটি শব্দকোষ ও ব্যাকরণ রচনা করেন। এদেশে এসে প্রাথমিক অসুবিধার মধ্যেও বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ও ধর্মপ্রচারের কাজে তিনি অবহেলা করেন নি। কেরীর প্রথম থেকেই ইচ্ছা ছিল বাংলা বাইবেল ছেপে বের করবেন। মদনাবতীতে থাকাকালীন বাইবেলের অনুবাদ শেষ হয়ে যায়। কিন্তু ছাপতে গিয়ে দেখেন ছয়শত পাতার দশ হাজার বাইবেল ছাপাতে ৪৩,৭৫০ টাকা দরকার। এত টাকায় বাইবেল ছাপা কেরীর পক্ষে অসম্ভব। তাই বাইবেল ছাপা কিছুদিনের জন্য স্থগিত রইল। মদনাবতীর নীলকুঠির মালিক উডনী কলকাতায় নীলামে একটি কাঠের মুদ্রাযন্ত্র কিনে কেরীকে উপহার দেন। কেরী মুদ্রাযন্ত্রটি মদনাবতীতে নিয়ে আসেন। ১৭৯৯ খ্রীঃ মদনাবতীর নীলের কারখানা উঠে যায়। কেরী নিজেই মদনাবতীর কাছে খিদিরপুরে একটি নীলের কারখানা কিনে সেখানে বসবাস করতে থাকেন।

(৫) **ত্রয়ীর মিলন**—এদিকে ইংলণ্ড থেকে ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি একটি প্রচারক দল ভারতে পাঠান। এই দলে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন মার্শম্যান ও ওয়ার্ড। কোম্পানী মিশনারী দলটিকে কলকাতায় নামতে দিল না। তাঁরা দিনেমার-অধিকৃত শ্রীরামপুরে এসে নামেন। কেরী ওয়ার্ডের অনুরোধে মুদ্রাযন্ত্রটি নিয়ে শ্রীরামপুরে চলে এলেন। কেরীর নেতৃত্বে (১০ই জানুয়ারী ১৮০০ খ্রীঃ) শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠিত হল।

কেরীর জীবনে এই বছরের (১৮০০ খ্রীঃ) আর একটি ঘটনা হল বাংলা বাইবেলের মুদ্রণকার্য শুরু। আগস্ট মাসে বাইবেলের The Gospel According Matthew অংশ "মঙ্গল সমাচার মতীয়ের রচিত", শ্রীরামপুর মিশন থেকে এইটি প্রথম প্রকাশিত বই। বাংলা গদ্যে লিখিত এইটিই প্রথম বই। 'পরের বছর ১৮০১ খ্রীঃ (মতান্তরে ১৮০০ খ্রীঃ) লর্ড ওয়েলেসলী ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এদেশীয় ভাষা ও রাজনীতিতে রপ্ত করতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। কেরী এই কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কেরীর নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপকরা শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের সূচনা করেন নি, বাংলা গদ্যকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছেন। কেরীর পরবর্তী ইতিহাস শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা কেরীর বহুমুখী কার্যকলাপ ও অন্যান্য সাধারণ প্রতিভার সঙ্গে পরিচিত হব।

(৬) **শ্রীরামপুর মিশনের বহুমুখী কার্য**—শ্রীরামপুর মিশন খ্রীষ্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত একটি প্রতিষ্ঠান। মিশনারী পরিচালিত সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য স্বাভাবিকভাবে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার। শ্রীরামপুর মিশন ধর্মপ্রচারের কাজে ব্রতী হয়ে, ভাষা, সাহিত্য, পুস্তক প্রকাশ বিশেষভাবে শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তা আমরা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করব। শ্রীরামপুর মিশনের কার্যের বিচার ও মূল্যায়নে ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে তাঁরা কি করেছেন, তা নিতান্তই গৌণ। মিশনের মূল্যায়ন হবে বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রে তাঁদের কাজ কতটা অবদান জুগিয়েছে তার মধ্য দিয়ে। শ্রীরামপুর মিশন বহুবিধ কার্যে লিপ্ত থাকলেও শিক্ষাবিস্তার ও ভাষা-সাহিত্য প্রকাশনার দিকটাই আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয়।

(৭) **প্রাথমিক শিক্ষা** মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা এদেশের লোক প্রথমে সুনজরে দেখেনি। মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তারের জন্য বিদ্যালয় স্থাপনকে দেশীয় লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য বলেই মনে করেছে। তাই প্রথম প্রথম প্রায় ক্ষেত্রেই শিক্ষা-বিস্তারের কাজে স্থানীয় অধিবাসীরা বাধার সৃষ্টি করেছে। ধর্মান্তকরণের ক্ষেত্রে মিশনারীরা কতটা সফল হয়েছিল তার সঠিক বিবরণ আমাদের জানা নেই কিন্তু শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের সাফল্যের তুলনা নেই।

কেরীর প্রথম থেকেই বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল। মালদহের মদনাবতীতে থাকাকালীন কেরী ১৭৯৪ খ্রীঃ স্থানীয় ছেলেদের জন্য একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীরামপুর মিশন প্রতিষ্ঠার পরেই ১৮০০ খ্রীঃ মার্শম্যান ইউরোপীয় ছেলেমেয়েদের জন্য দুটি আবাসিক বিদ্যালয় (Boarding School) খোলেন। এবছরই জুন মাসে মার্শম্যান শ্রীরামপুরে স্থানীয় বালকদের জন্য একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০৪ খ্রীঃ কাটোয়ায় একটি, দিনাজপুরে একটি, যশোহরে চারটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। নানাবিধ অসুবিধা থাকলেও দেশের লোকের মাঝে শিক্ষার আগ্রহও ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। তাই দেখি ১৮১২ খ্রীঃ মধ্যে মিশন আটটি স্কুল চালাচ্ছে।

শ্রীরামপুর মিশন পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবহেলা করেন নি। তাঁরা বুঝেছিলেন শিক্ষা যাই দেওয়া হোক না কেন তা দেওয়া হবে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষার সাহায্যে। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও কলেজ স্থাপনের বিষয়ে মার্শম্যান ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। মিশনের শিক্ষা বিষয়ক সব পরিকল্পনাই ছিল মার্শম্যানের। এদেশে কিভাবে জনশিক্ষার ব্যবস্থা হবে সে সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা মার্শম্যান ১৮১৩ খ্রীঃ বিলাতে ব্যাপটিস্ট সোসাইটিতে পাঠান।

মার্শম্যান রচিত পরিকল্পনা হতে জানা যায়, শ্রীরামপুর মিশন তৎপূর্বেই বিভিন্ন অঞ্চলে কুড়িটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাবিস্তার কল্পে তিনটি জিনিস বিশেষভাবে আবশ্যক—(১) পুস্তক, (২) তত্ত্বাবধান এবং (৩) অর্থ। পুস্তক সম্পর্কে মার্শম্যান লেখেন—"বিদ্যালয়ে শুধু বাইবেল পড়াইলে চলিবে না। ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থাদি হইতে ভালো ভালো বিষয়ের সংকলন পুস্তকও এখানকার পাঠ্যতালিকাভুক্ত হওয়া চাই। পাদ্রীগণ নিজেরাই স্কুলগুলির তত্ত্বাবধান করিবেন। কলিকাতাস্থ বেনেভোল্যান্ট ইনস্টিটিউশনের শিক্ষিত ছাত্রগণ এখানকার শিক্ষকতা কার্যে স্বল্প বেতনে নিযুক্ত হইবেন। চল্লিশজন ছাত্রের একটি স্কুলের ব্যয়, শিক্ষকের বেতন, বাড়ী ভাড়া ইত্যাদি বাবদে দশ টাকার বেশি পড়িবে না। এরূপে প্রতি মাসে হাজার টাকা ব্যয়ে চারি হাজার ছাত্রের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে পারে। সে যুগের আর্থিক মানদণ্ডে ইহা নিশ্চয়ই সম্ভব হইত। কেরী-মার্শম্যান, ওয়ার্ডের জীবনীকার বলেন, এদেশীয়দের শিক্ষা সম্বন্ধে এতাদৃশ কার্যকর পরিকল্পনা মার্শম্যানের পূর্বে আর কেহ কখনও রচনা করেন নাই।"

"মার্শম্যান এই পরিকল্পনা রচনা ও বিলাতে প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন ছিলেন না। তাঁহার যত্নে শ্রীরামপুরে শিক্ষক তৈরির একটি নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইল। চারিদিকে পাঠশালা তৈরি হইতে লাগিল। প্রথম স্কুল হয় নবাবগঞ্জে। স্থানীয় লোকেরাও মিশনারীদের কার্যে বিশেষ সহায়ক হইলেন। স্কুলের জন্য কেহ বিনা ভাড়ায় ঘর দিলেন। কেহ চণ্ডীমণ্ডপ ছাড়িয়া দিলেন। নূতন পদ্ধতিতে শিক্ষাদান হেতু ছেলেরা অল্প সময়ে শিক্ষায় বেশ উন্নতি করিতে লাগিল। বহুদূর হইতে লোকজন আসিয়া তাহাদের অঞ্চলে যাহাতে পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয় তার অনুরোধ জানাইত। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বত্র শিক্ষা দেওয়া হইত।

"বিলাতে শিক্ষা বিষয়ক পরিকল্পনা প্রেরণের পর দুই বৎসর যাবৎ যে ধরনের কার্য

পরিচালিত হয় তা'র নিরিখে জাশুয়া মার্শম্যান ১৮১৬ খ্রীঃ Hints relative to Native School together with the outline of an Institution for their Extention and management নামে শিক্ষা বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তকখানি প্রকাশে ভারতের এবং বিলাতের বিদগ্ধ সমাজেও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে বিশেষ সাড়া পড়ে। বঙ্গদেশের তৎকালীন শিক্ষার ব্যবস্থা, শিক্ষার বাহন, পুস্তকাদি প্রকাশ-ব্যবস্থা, বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের উপায়—পূর্বোক্ত পরিকল্পনায় সে সব বিষয়ের অবতারণা মাত্র হয়। মার্শম্যান Hints-এ তার বিশদ আলোচনা করেন। শিক্ষার বাহন সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোন ভাষাকে শিক্ষার বাহন করা নিছক বাতুলতা মাত্র। জগতের সর্ববিধ জ্ঞান-বিজ্ঞান এই মাতৃভাষার মাধ্যমেই বঙ্গসন্তানদের পরিবেশন করিতে হইবে।" (বাংলার জনশিক্ষা—শ্রীযোগেশ চন্দ্র বাগল)

মার্শম্যান রচিত Hints-এ পরিকল্পনা অনুযায়ী মিশন ১৮১৬ খ্রীঃ থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হয়। এক বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হয় ১০৯টি এবং ছাত্র সংখ্যা হয় ৭,১৬৫ জন। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস মিশনের শিক্ষাবিস্তার কাজে সাহায্যের জন্য ছ'হাজার টাকা সাহায্য দেন। এই টাকায় মিশন রাজস্থানের আজমীরে কয়েকটি হিন্দী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা করে।

(৮) **নারী শিক্ষা**—উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে দেশে নারী শিক্ষার কোন আয়োজনই ছিল না। এডাম তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন "অজ্ঞতার গভীরে ও হতাশার অন্ধকারে মেয়েরা ডুবেছিল"। কোন কোন পরিবারে একান্ত ঘরোয়াভাবে মেয়েদের কিছু শিক্ষা দেওয়া হত। অতি অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় পড়বার সুযোগ তারা খুব কমই পেত।

উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে মেয়েদের শিক্ষার জন্য প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ রেভারেণ্ড মে চুঁচুড়াতে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল খোলেন, স্কুলটি বেশিদিন চলেনি। অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে প্রথম অগ্রসর হয় ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি। কোলকাতার গৌরীবাড়ীতে বাঙালী মেয়েদের জন্য ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি ১৮১৯ খ্রীঃ তাদের প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, লেডিস সোসাইটি ও লেডিস অ্যাসোসিয়েশন এই তিনটি প্রতিষ্ঠান ১৮১৯ খ্রীঃ পর থেকে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তবে প্রচেষ্টা কোলকাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। কোলকাতার স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের পক্ষে পরিবেশ কিছুটা অনুকূল ছিল। শ্রীরামপুর মিশন স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য কলকাতার বাইরে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলকে বেছে নিলেন। ১৮২১ খ্রীঃ ওয়ার্ডের নেতৃত্বে শ্রীরামপুরের চারিদিকে গ্রামগুলিতে মিশন মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপনে উদ্যোগী হয়। ১৮২১ থেকে ১৮২৮ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়ে

শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টায় এলাহাবাদ থেকে আকিয়াব পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় ৩১টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৫১০ জন।

(৯) **পাঠ্য পুস্তক ও শিক্ষক শিক্ষণ**—আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা যখন প্রবর্তিত হয় তখন পাঠ্য পুস্তকের অভাব সবচেয়ে বড় অসুবিধা হয়ে দেখা দিল। শ্রীরামপুর মিশন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভাষাশিক্ষার প্রাথমিক বই, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে বই লেখা, ছাপা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করে। মিশন প্রকাশিত বইগুলি সে যুগে বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে উপযুক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন হয়। উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব মেটাবার জন্য শ্রীরামপুর মিশন একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন করেন। শিক্ষকতা কার্যে যোগদানের পূর্বে প্রত্যেক শিক্ষককে এই নর্মাল স্কুল হতে শিক্ষা গ্রহণ করতে হত। কোন গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে সেই স্কুল থেকে একজন শিক্ষক নির্বাচন করে তাকে নর্মাল স্কুলে শিক্ষা দেবার জন্য পাঠানো হত। শিক্ষাশেষে সে সেই গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার কার্যে যোগ দিত।

(১০) **উচ্চশিক্ষা**—শ্রীরামপুর মিশনের অন্যতম কীর্তি হচ্ছে শিক্ষার জন্য শ্রীরামপুরে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা। ১৮১৮ খ্রীঃ ১৫ই জুলাই শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের পূর্বে ১৮১৭ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। কলেজ প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামপুরের দিনেমার গভর্নর মিশনকে নানাভাবে সাহায্য করেন। প্রথম বছরে কলেজের ছাত্র সংখ্যা হয় ৩৭ জন—তার মধ্যে ১৪ হিন্দু ১৯ জন খ্রীষ্টান, অন্যান্য ৪ জন। কলেজে ভাষা, সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব, আধুনিক বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হয়। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য উপযুক্ত Laboratory ও জ্যোতির্বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য মানমন্দির গড়ে তোলা হয়। ১৮২৭ খ্রীঃ ডেনমার্কের রাজা ষষ্ঠ ফ্রেডারিক কলেজকে ডিগ্রী দেবার সনদ দান করেন। ইউরোপীয় পদ্ধতি অনুসারে ডিগ্রী দেবার অধিকার ভারতে প্রথম শ্রীরামপুর কলেজই লাভ করে। ১৮১৮ খ্রীঃ থেকে মিশনারীদের দ্বারা সুপরিচালিত বেসরকারী কলেজ রূপে বাংলা দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে শ্রীরামপুর কলেজ একটি সুপরিচিত নাম।

(১১) **মুদ্রণ**—শিক্ষা ও সংস্কৃতির সাথে মুদ্রণের একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। বাংলা তথা ভারতের অন্যান্য ভাষায় মুদ্রিত পুস্তকের ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। শ্রীরামপুর মিশনের মুদ্রণের দায়িত্ব ছিল ওয়ার্ডের ওপর। বাংলা ভাষায় প্রথম মুদ্রিত পুস্তক ১৭৭৮ খ্রীঃ হুগলীতে প্রকাশিত হ্যালহেড সাহেবের বাংলা ব্যাকরণ। মুদ্রণের জন্য বাংলা হরফের প্রবর্তন করেন চার্লস উইলকিন্স। তিনি শিক্ষা দেন পঞ্চানন কর্মকারকে। পঞ্চানন এই হরফের উন্নতি সাধন করেন এবং হরফ নির্মাণের স্থায়ী প্রতিষ্ঠান খোলেন শ্রীরামপুরে। উডনীর কাছে কেরী আগেই কাঠের প্রেস পেয়েছিলেন। শ্রীরামপুর এসে পেলেন পঞ্চানন ও ওয়ার্ডের সাহায্য। ১৮০০ খ্রীঃ শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসে মুদ্রণের কাজ শুরু হয়।

(১২) **প্রকাশনা**—আগেই উল্লেখ করা হয়েছে ১৮০০ খ্রীঃ আগষ্ট মাসে শ্রীরামপুর মিশন থেকে কেরী অনূদিত বাইবেলের একটি অংশ "মঙ্গল সমাচার" মতীয়ের রচিত প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত পুস্তক। অবশ্য এই অনুবাদ সুখ পাঠ্য হয় নি। বাংলা গদ্য তখনও কোন 'রূপ' পায়নি। সেক্ষেত্রে খুব ভাল কিছু পাওয়ার আশা করা যায় না। এতে বাংলা গদ্য অনুবাদের ক্ষেত্রে পথিকৃতের সম্মান কেরীর পাপ্য। কেরী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে অধ্যপনাকালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের কাছে ভারতের প্রধান প্রধান ভাষাগুলি শেখেন। কেরী নিজেও অন্যের সাহায্য নিয়ে ৪০টি এশীয় ভাষায় পুরো, কোন ক্ষেত্রে আংশিকভাবে বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করেন। বাইবেলের অনুবাদের সাথে কেরী বাংলা, সংস্কৃত, তেলেগু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন। এই ব্যাকরণগুলির মধ্যে বাংলা ব্যাকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৮ খ্রীঃ বাংলা-ইংরেজী অভিধান প্রকাশ করেন। এই অভিধানটিও সে যুগের একটি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা। বাংলা অনুবাদের ক্ষেত্রে কেরী প্রধানতঃ রাম রাম বসুর সাহায্য গ্রহণ করেন। ১৮০১ খ্রীঃ কেরী সংকলিত 'কথোপকথন' প্রকাশিত হয়। এই বইটি মুখ্যতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের জন্য লিখিত। উদ্দেশ্য ছিল কলেজের ইংরেজী সিবিলিয়নদের গ্রাম্য ও চলিত ভাষার সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কেরী কথোপকথনের সংকলক হলেও বইটি কলেজের পণ্ডিতদের দ্বারা লিখিত। ১৮০১ খ্রীঃ বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালীর অতি প্রিয় মহাকাব্য দুখানি প্রকাশ করে মিশন বাঙ্গলার সাহিত্যে মহা উপকার সাধন করেছিলেন। পরবর্তী সংস্করণে এই মহাকাব্য দুইটি পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালংকারের দ্বারা সংশোধিত হয়ে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে আমরা ঘরে ঘরে যে বাংলা রামায়ণ ও মহাভারত পড়ি, তা জয়গোপাল সংশোধিত শ্রীরামপুর মিশন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণেরই আদর্শ গ্রন্থরূপে গ্রহণ করে নতুনভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ১৮১২ খ্রীঃ কেরীর ইতিহাসমালা প্রকাশিত হয়। এটি ইতিহাস আশ্রিত কাহিনীর একটি সংকলন।

মিশন কর্তৃপক্ষ বহু সংস্কৃত বইয়ের অনুবাদ, সম্পাদনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। শ্রীরামপুর মিশন থেকে কেরী ও মার্শম্যান সম্পাদিত ও অনূদিত বাল্মীকির রামায়ণ চার খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এছাড়া বোপদেবের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, কোলব্রুক সম্পাদিত অমরকোষ, কেরীর সংস্কৃত ব্যাকরণ মিশন থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

(১৩) **সংবাদপত্র প্রকাশনা**—ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র ১৭৮০ খ্রীঃ প্রকাশিত হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'। এটি ইংরেজী সংবাদপত্র। বাংলাভাষার প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরব শ্রীরামপুর মিশনের। শ্রীরামপুর মিশনের "সমাচার দর্পণ" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮১৮ খ্রীঃ মে মাসে। এর আগেই শ্রীরামপুর মিশন থেকে এপ্রিল মাসে দিগদর্শন প্রকাশিত হত। 'দিগদর্শন' ছিল মাসিকপত্র। সংবাদ অপেক্ষা ছাত্রদের জন্য তথ্য পরিবেশনই ছিল দিগদর্শনের লক্ষ্য। হিন্দু কলেজ ও ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির

ছাত্রগণই ছিল প্রধান পাঠক। গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের 'বাঙ্গাল গেজেটি' ১৮১৮ খ্রীঃ মে মাসেই প্রকাশিত হয়। মনে হয় সমাচার দর্পণের কয়েকদিন পূর্বেই এটি প্রকাশিত হয়। তবে 'বাঙ্গাল গেজেটি' স্থায়ী হয়নি। তার নিদর্শনও কেউ দেখেনি।

সমাচার দর্পণ ১৮১৮ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়ে ১৮৪০ খ্রীঃ পর্যন্ত চালু ছিল। সাধারণের মধ্যে সমাচার দর্পণ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ইংরেজীতে 'ফ্রেণ্ড অব্ ইণ্ডিয়া'-ও শ্রীরামপুর মিশনারীদের প্রকাশিত আর একখানি সংবাদপত্র। এটি প্রকাশিত হয় সমাচার দর্পণের সাথে একই মাসে। সমাচার দর্পণের প্রথম সম্পাদক ছিলেন মার্শম্যান। সম্পাদক হলেও মার্শম্যান বিশেষ লিখতেন বলে মনে হয় না। অনুমান করা হয় সমাচার দর্পণের লেখার ভার ছিল বাঙ্গালী পণ্ডিতদের উপর। এদের মধ্যে জয়গোপাল তর্কালঙ্কার অন্যতম। সে যুগের অনেক তথ্যই আমাদের সমাচার দর্পণের পাতা থেকেই সংগ্রহ করতে হত। যুগের বিচারে সমাচার দর্পণকে সেদিনের প্রগতিবাদী পত্রিকা বলা যায়।

(১৪)। **সমাজ সংস্কার**—উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের একটি প্রধান লক্ষণ সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। শ্রীরামপুর মিশন তৎকালের প্রত্যেকটি সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। আমরা জানি সতীদাহ নিবারণের আন্দোলনের নেতা ছিলেন রামমোহন রায়। সতীদাহ নিবারণের আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শ্রীরামপুর মিশন উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই এই বীভৎস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে ও বন্ধের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন আর একটি অমানুষিক প্রথা। কেরীর রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৮০২ খ্রীঃ ওয়েলেসলী এই প্রথা নিষিদ্ধ করেন। ১৮০৩ খ্রীঃ সমাচার দর্পণে বিধবা বিবাহের পক্ষে লেখা হয়। কুষ্ঠরোগীদের প্রতি যে অমানুষিক আচরণ করা হত কেরী তা বন্ধের জন্য সচেষ্ট ছিলেন। অনেক পণ্ডিত মনে করেন মিশনারীরা বহু সামাজিক কুসংস্কার ও ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসের প্রতি তীব্র আক্রমণ চালানোর ফলেই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম সংস্কারের আন্দোলন ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হিন্দু নেতারা সচেতন হন।

(১৫) **শ্রীরামপুর মিশনের কার্যের মুল্যায়ন**—এ দেশের বিভিন্ন স্থানে মিশনারীদের কাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল প্রধানতঃ খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ভারতীয়দের ধর্মান্তরিতকরণ। এর ফলে মিশনারীদের বহুবিধ জনহিতকর ও কল্যাণধর্মী কাজের সঠিক মুল্যায়ন হয় নি। মিশনারীরা নিঃসন্দেহে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতেন ও ভারতীয়দের মধ্যে বাইবেল বিতরণ করতেন কিন্তু শুধু এই একটিমাত্র কাজ দিয়েই যদি তাদের কাজের বিচার করতে বসি তাহলে তা হবে তাঁদের প্রতি চরম অবিচার। শ্রীরামপুর মিশনের পক্ষ থেকে কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড যে বিরাট কর্মকাণ্ডের আয়োজন করেছিলেন তার ফলে কত লোক খৃষ্টান হল সে বিচারের সাথে আমাদের সমাজের ও জনসাধারণের যে অসীম কল্যাণ সাধন তাঁরা করেছিলেন তারও বিচার করতে হবে। যতটুকু জানা যায় শ্রীরামপুর মিশনে খৃষ্টধর্ম প্রসার প্রচেষ্টা খুব বেশী ফলপ্রসূ হয়নি। তবু তাঁরা জনহিতকর

কাজ তো বন্ধ করেননি, তাঁরা স্কুলগুলি তো বন্ধ করে দেননি। এ সম্পর্কে ডঃ নিমাইসাধন বসু বলেছেন :

"Proselytism was undoubtedly a major driving force behind the missionary educational interest and activities in India. Yet this should in no way undermine the value and significance of the contribution of the missionaries to the growth and expansion of education in this country. As Carey had earlier stressed in his enquiry, one of the purposes of the missionary educational efforts was to make the individual a useful member of the society. In the process the missionary teachers helped the children to develop into, 'responsible thinking men'. There is much logic in Dr. E D. Potts' argument that if proselytism was the sole purpose of the missionaries they would have closed down the schools when it become evident that their object was not going to be achieved." (Indian Awakening and Bengal) এই উদ্ধৃতি থেকে ও উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি শ্রীরামপুর ত্রয়ীর বহুমুখী কর্মপ্রয়াস খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ধর্মান্তর করণের চেয়েও এদেশের আপামর জনসাধারণের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হয়েছিল।

মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা অষ্টাদশ শতাব্দীতেই শুরু হয়। শ্রীরামপুর ত্রয়ীর প্রচেষ্টায় আমরা কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। শিক্ষাবিস্তার প্রয়াসের পিছনে ছিল একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা। ১৮১৬ খ্রীঃ শিক্ষাবিস্তারের যে পরিকল্পনা "Hints Relative to Native Schools" নামক পুস্তিকায় প্রকাশিত হয় তাকে যথার্থ ভাবেই বলা যায় "The first organised plan for the establishment of schools ... deviced in India."

আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের প্রথম পর্বে আমরা দেখি বড় বড় শহরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীরামপুর মিশন শহরের বাইরে, গ্রামে ও অনুন্নত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনে ব্রতী হন।

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে Hints-এ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, যে শিক্ষাই তাদের দেওয়া হোক না কেন তা দেওয়া হবে তাদের নিজেদের ভাষায় ("That whatever instruction it may be desirable to communicate to them, must be imparted in their own language".)। বিদেশী ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেবার চেষ্টা হবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ('Completely fallacious')। ইংরেজ সরকার সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এই সুচিন্তিত অভিমতকে অগ্রাহ্য করেছে। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, ইংরেজ নেই তবু এদেশের এক শ্রেণীর অভিভাবকের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজ করে তোলবার জন্য English Medium School-এ ভর্তি করার মাত্রাধিক প্রবণতা

লক্ষ্য করা যায়, তাকে সুস্থ মানসিকতা বলতে পারি না। আজ থেকে দেড়শ বছর আগে মার্শম্যান ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন—"একবার ইংরাজী শিখিলে চাষীর ছেলে লাঙ্গল ছাড়িবে, হাতের কাজও আর করিতে চাহিবে না।" মার্শম্যানের এই উক্তির সার্থকতা কি আমরা পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারি ?

স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। সেই যুগে কোলকাতা কিছুটা সংস্কার মুক্ত হয়েছে, তবুও সেখানে স্ত্রী-শিক্ষার প্রাথমিক প্রচেষ্টা নানারূপ সামাজিক বাধার সম্মুখীন হয়ে পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। শ্রীরামপুরে মিশনারী ত্রয়ীর স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য কোলকাতার বাইরে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল বেছে নিয়েছিলেন। শ্রীরামপুর মিশনের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের যে তালিকা পাই তাতে দেখা যায় মিশনের প্রতিষ্ঠিত ৩১টি বালিকা বিদ্যালয়ের সব কয়টিই কোলকাতার বাইরে। শ্রীরামপুর অঞ্চলে ১৩টি আর বাদবাকী বীরভূম, ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোহর, বেনারস, এলাহাবাদ ও আকিয়াব অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছে। সেই সময়ে আমাদের দেশের গ্রামে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার তা আমাদের কল্পনার বাইরে। শ্রীরামপুর মিশন সেই দুঃসাধ্য কাজেই ব্রতী হয়েছিলেন। উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে তাদের দান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ রাখব। শ্রীরামপুর মিশন কলেজই এশিয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম ডিগ্রী দেবার অধিকার-প্রাপ্ত কলেজ। হিন্দু কলেজের একবছর পর স্থাপিত হয় শ্রীরামপুর কলেজ। যা আজও বেসরকারী কলেজ-রূপে সুনামের সাথে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের জন্য দ্বার মুক্ত রেখে দেশে উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন মেটাচ্ছে।

ভাষা সাহিত্য, পুস্তক ও সংবাদপত্র প্রকাশন এবং মুদ্রণ প্রভৃতি বহু ক্ষেত্রে শ্রীরামপুর মিশন পথিকৃতের গৌরব দাবি করতে পারে। কেরী অনূদিত বাইবেলের অংশ "মঙ্গল সমাচার" বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। বাইবেলের প্রথম অনুবাদ সরস হয় নি। ভাষা ছিল দুর্বোধ্য, বাংলা গদ্য তখনও কোন সুসংবদ্ধ রূপ লাভ করেনি। কেরীর বাইবেলের বাংলাকে বাংলা ভাষার ভ্রূণস্থ-রূপ বলা যায়। এই ভ্রূণটিই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সুতিকাগারে কেরীর সযত্ন পরিচর্যায় ও বাঙ্গালী পণ্ডিতের চেষ্টায় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে একটি সবল শিশুর রূপ পায়। এই সবল শিশুটিই সুন্দর সাহিত্যের রূপ পায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শেষ যুগের পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের হাতে।

বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশ করে কাজ শুরু হলেও শুধু বাইবেল ও খৃষ্টধর্ম বিষয়ক পুস্তক প্রচারের মধ্যে শ্রীরামপুর ত্রয়ী তাঁদের কার্যকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয় বহু বই প্রকাশ করেছেন, অভিধান ছেপেছেন, বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরে ঘরে যে বই নিত্য পড়া হয় সেই বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতের প্রকাশ তাঁরা করেছেন। মিশনারী বলে এখানে তাঁরা কোন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেন নি। চিন্তায় স্বাধীনতা ও যুক্তিবাদী মৌলিক রচনা প্রকাশে সমাচার দর্পণ ও দিগদর্শন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তৎকালীন সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনে সতীদাহ

প্রথা নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের পক্ষে সমাচার দর্পণে প্রকাশিত প্রবন্ধসমূহ প্রগতিশীলতার সাক্ষ্যই বহন করে।

কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড ধর্ম প্রচারের জন্য এদেশে এসেছিলেন। ধর্মপ্রচারের চেষ্টাও তাঁরা করেছেন, ধর্ম প্রচারের মধ্যেই যদি তাঁদের কর্মপ্রয়াস সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে তাঁদের সম্পর্কে এই দীর্ঘ আলোচনার প্রয়োজন হত না। ধর্মপ্রচার করতে এসে তাঁরা এদেশকে ভালবেসেছিলেন, ভালবেসেছিলেন এদেশের মানুষকে। শ্রীরামপুর মিশনের কর্মকাণ্ডের যে প্রধান হোতা সেই উইলিয়ম কেরীর ভাষাতেই বলি, "My heart is weaded to India and though I am of little use, I fell pleasure in doing the little I can." বাংলাদেশের বাঙ্গালীদের মধ্যে থেকে নিজেকে তিনি বাঙ্গালী বলেই মনে করতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এক সভায় তিনি বলেন,— "হিন্দুদের মধ্যে দীর্ঘকাল বাস করিয়া আমি আজ বৃদ্ধ হইয়াছি। বঙ্গীয় ভাষা আজ আমার মাতৃভাষার মতই আয়ত্ব হইয়াছে। আমি নিঃসংশয়েই বলিতে পারি যে এ দেশের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, সংস্কার এবং হৃদয়াবেগের সহিত এমনই পরিচিত হইয়াছি যে সময় সময় নিজেকে এদেশীয় বলিয়া সন্দেহ হয়।" (বাংলার নবজাগরণে উইলিয়ম কেরী ও তাঁর পরিজন—*সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়*) এদেশের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন বলেই তিনি একথা বলতে পেরেছিলেন। নবজাগরণের উষালগ্নে কেরী ও তাঁর সঙ্গীরা যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন তার জন্য শ্রীরামপুর ত্রয়ীকে আমরা চিরদিন শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করব।

Q. 2. Describe the origin and purpose of establishing the Fort William College. Evaluate its contribution to the growth of Indian education

উত্তর। (১) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য :

১৮০০ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। সে সময়ের গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি মনে করেছিলেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মীদের এমন সব জটিল ধরনের শাসনমূলক দায়িত্ব পালন করতে হয় যার জন্য তাঁদের নিছক ইংরাজী শিক্ষা বা নিছক ভারতীয় শিক্ষা থাকলে চলবে না। তাঁদের জন্য দরকার এমন একটা মিশ্র ধরনের শিক্ষা যার ভিত্তি রচিত হবে ইংলণ্ডে, কিন্তু সংগঠনটি সম্পূর্ণ হবে ভারতে। অর্থাৎ ইস্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানীর কর্মীদের মূলশিক্ষা ইংলণ্ডে সম্পন্ন হলেও ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে তাঁদের এদেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এই বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যই লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠিত করেন।

কলেজের সংবিধানে কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে,'ইস্ট ইণ্ডিজের ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত স্থানগুলিতে সরকারের পরিচালনার জন্য যে সব বিভিন্ন পদের সৃষ্টি করা হবে সেগুলির সংশ্লিষ্ট কর্তব্যগুলি যথাযথ পালনে যোগ্যতা অর্জনের জন্য সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং

জ্ঞানের যে সব শাখায় প্রয়োজন বলে মনে করা হবে সেই সব শাখায় জুনিয়র সার্ভেন্টদের উন্নততর শিক্ষা দেবার জন্য বাংলাদেশের ফোর্ট উইলিয়মে এতদ্বারা একটি কলেজ স্থাপিত হল।'

যে সব সিভিলিয়ন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকরি নিয়ে ভারতে আসতেন তাঁদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষাগ্রহণ করা বাধ্যতামূলক ছিল। এই প্রসঙ্গে লর্ড ওয়েলেসলির একটি বিজ্ঞপ্তির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'প্রশাসনের কাজের জন্য কোন কর্মীকেই যোগ্য বলে গণ্য করা হবে না, যদি না তিনি এই দেশের আইনকানুন এবং ভাষার একটি পরীক্ষায় পাস করছেন। এখন থেকে এই আইনকানুন এবং ভাষার জ্ঞান যোগ্যতার অপরিহার্য মান বলে গ্রহণ করা হবে।' অতএব দেখা যাচ্ছে যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে প্রবর্তিত শিক্ষার ব্যবস্থা ভারতে আগত ইংরাজদের কাছে তখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ওয়েলসলি এই কলেজের পৃষ্ঠপোষক ও পরিদর্শক নিযুক্ত হন এবং এই প্রতিষ্ঠানটিকে 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' করে তোলাই ছিল তাঁর স্বপ্ন।

(২) কলেজের শিক্ষাবর্ষ ও পাঠক্রম :

এই কলেজে প্রতি বৎসরে চারটি করে টার্ম বা শিক্ষাকাল ছিল এবং প্রতি বৎসর দুটি করে পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। প্রথমটি, দ্বিতীয় টার্ম বা শিক্ষাকালের শেষে এবং অপরটি চতুর্থ টার্ম বা শিক্ষাকালের শেষে। তিন বৎসর অর্থাৎ ১২টি টার্ম বা শিক্ষা-কাল শেষ করে সাফল্যের সঙ্গে পরীক্ষায় পাস করলে শিক্ষার্থীকে সার্টিফিকেট দেওয়া হত। সার্টিফিকেট পাবার পর যদি কোনও শিক্ষার্থী কোনও বিশেষ বিষয়ে উন্নত সাফল্য দেখাতে পারত তাহলে তাকে সাম্মানিক ডিগ্রী দেওয়া হত। শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেবার জন্য প্রতি বৎসরে বার্ষিক সম্মেলনে সফল শিক্ষার্থীদের পারিতোষিক ও অন্যান্য পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা ছিল।

এই কলেজের পাঠক্রম যথেষ্ট ব্যাপক ও বহুমুখী ছিল। কেবলমাত্র ভারতীয় ভাষা নয়, নবাগত সিভিলিয়নদের শিক্ষার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নানা বিভিন্ন বিষয় পড়ান হত। কলেজের পাঠক্রমের স্থান পায় :

ভাষা—আরবী, ফারসী, সংস্কৃত, হিন্দুস্থানী, বাংলা, তেলেগু, মারাঠী, কানাড়ী, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাসমূহ, গ্রীক, ল্যাটিন ও প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্য।

আইন—হিন্দু ও মুসলমান আইন, নীতিশাস্ত্র ও আইনগ্রন্থ, ব্রিটিশ আইন, গভর্নর জেনারেল কর্তৃক প্রচারিত আইনসমূহ।

ইতিহাস—হিন্দুস্থান ও দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস, ভৌগোলিক বৃত্তান্ত।

আধুনিক বিজ্ঞান—উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান, রসায়ন ও জ্যোতির্বিদ্যা।

অন্যান্য বিষয়—রাজনীতি ও অর্থনীতি।

(৩) বিদেশী ও দেশীয় অধ্যাপক :

বহু খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্‌কে এই কলেজে অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল।

উইলিয়ম কেরী ছিলেন বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক। জি. এচ্ বার্লো, জে. এচ্ হ্যারিংটন (আইন ও সরকারী নিয়মকানুন), এচ্ টি কোলব্রুক (সংস্কৃত ও হিন্দু আইন), লেফট্ন্যান্ট জন বেলী (আরবী ও পারসিক ভাষা ও মুসলমানী আইন), রেভারেণ্ড বুকানন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা), এন্ বি এডমনস্টোন এবং ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন (পারসিক ভাষা এবং সাহিত্য), জে বি. গিলক্রিষ্ট (হিন্দুস্থানী ভাষা ও সাহিত্য)।

কেবল বিদেশী শিক্ষাবিদেরাই এই কলেজে অধ্যাপনা করতেন না। বহু ভারতীয় শিক্ষাবিদ্‌কে পণ্ডিত ও মুন্সীরূপে নিযুক্ত করা হয়েছিল। উইলিয়ম কেরী যখন বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে এই কলেজে যোগ দেন তখন তিনি কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকে তাঁর সহকারী রূপে নিযুক্ত করেন। তিনি ১৮০১ সালে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে মাসিক ২০০ টাকা বেতনে প্রধান পণ্ডিত রূপে এবং রামনাথ বিদ্যাবাচস্পতিকে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে দ্বিতীয় পণ্ডিত রূপে নিযুক্ত করেন। তাঁদের সহকারী পণ্ডিত রূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন শ্রীপতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দচন্দ্র, রাজীবলোচন, কাশীনাথ, পদ্মলোচন চূড়ামণি ও রামরাম বসু। এঁদের প্রত্যেকের বেতন ছিল মাসিক ৪০ টাকা করে। এছাড়া আরবী, ফার্সী বিভাগের জন্য মৌলবীও নিযুক্ত করা হয়। এই ভারতীয় শিক্ষা-বিদ্‌দের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পরবর্তী কালে ভারতীয় শিক্ষার প্রসার ও পুষ্টিসাধনে এই ঘটনার গুরুত্ব অপরিমেয়।

(8) ভারতীয় ভাষায় পুস্তক প্রকাশনা ঃ

ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের একটি বড় অবদান হল ভারতীয় ভাষায় নানা বিষয়ে পুস্তক প্রকাশনা। ইংরাজ কর্মীদের ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য শেখাতে গিয়ে সব চেয়ে বড় প্রতিবন্ধক দেখা গেল উপযুক্ত বইয়ের অভাব। এই অভাব দূর করার জন্য ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেই ভারতীয় ভাষায় নানা বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ করা শুরু হল। এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন উইলিয়ম কেরী। তিনি কলেজে নিযুক্ত পণ্ডিত ও মুন্সীদের দিয়ে বাংলা ভাষায় বই লিখিয়ে সেগুলি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষকে এ ব্যাপার জানালে কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হন। ১৮০১ সালে কলেজের একটি সভায় ভারতীয় ভাষায় ভারতীয়দের বই প্রকাশের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ভারতীয় লেখকদের বই লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য তাঁদের পুরস্কার দেবারও আয়োজন করা হয়। সে সময় বই ছাপা ব্যয়বহুল ছিল বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক বইয়ের অনেকগুলি করে খণ্ড কলেজ লাইব্রেরীর জন্য কিনে নিতেন। এই বইগুলি কলেজের ছাত্রদের জন্য মূলতঃ লিখিত ও প্রকাশিত হলেও কলেজের বাইরেও বইগুলি বহুল প্রচারিত হত এবং সর্বস্তরের পাঠকেরাই বইগুলি সংগ্রহ করতেন। তার ফলে কালক্রমে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি মুখ্য কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ভারতীয় ভাষার চর্চা ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কলেজের প্রকাশিত বইগুলি যে বিশেষ উদ্দীপক রূপে কাজ করেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

(৫) আলোচনা ও বিতর্কের কেন্দ্র ঃ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটি করে বার্ষিক সম্মেলন হত এবং তাতে ভারতীয় ভাষা নিয়ে নানা আলোচনা ও বিতর্ক অনুষ্ঠিত হত। এতে দেশীয় ও বিদেশী পণ্ডিতরা যোগ দিতেন এবং সেখানে ভারতীয় ভাষার উন্নয়ন সম্পর্কে নানা মূল্যবান তথ্য আলোচিত হত। বস্তুতঃ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার কয়েক বৎসরের মধ্যেই কলেজটি ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকেন্দ্রে পরিণত হয়। তার ফল স্বরূপ এই কলেজের পণ্ডিতেরা ভারতীয় ও ইউরোপীয় পণ্ডিতদের রচনাবলীর অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, কথিত ভাষাকে সুনির্দিষ্ট ব্যাকরণসম্মত আকৃতি দেন এবং ইউরোপে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এমন সব ভাষায় অভিধান রচনা করেন।

(৬) ভারতীয় শিক্ষার বিস্তারে অর্থসাহায্য ঃ

এছাড়া কলেজ উইলিয়ম জোন্সের কয়েকটি নতুন পরিকল্পনাকে কার্যকর করার জন্য এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পুনর্গঠনের জন্য অর্থসাহায্য দেন। বস্তুতঃ এই সময় এসিয়াটিক সোসাইটি ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়।

উইলিয়ম কেরী ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। এই কলেজের অধ্যাপক থাকাকালীনই কেরীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্মরণীয় অবদানগুলি আত্মপ্রকাশ করে। এই কলেজের আর্থিক সঙ্গতি ও সাহায্য কেরীর প্রচেষ্টার পিছনে না থাকলে তাঁর পক্ষে হয়ত এসব বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না।

(৭) পাশ্চাত্য ভাবধারার বিকিরণ কেন্দ্র ঃ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ যে সে সময়কার পাশ্চাত্য ভাবধারার একটি শক্তিশালী বিকিরণ কেন্দ্র ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় পণ্ডিতেরা বিদেশী শিক্ষাব্রতী ও মিশনারীদের সঙ্গে একযোগে অনুবাদ ও পুস্তকরচনার কাজ করার ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীভাবে ভাবধারার বিনিময় ঘটত। এইভাবে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায় এবং স্বভাবতঃই তার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। অতি সংরক্ষণশীল সংস্কৃত পণ্ডিতদের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার অনুপ্রবেশ না ঘটলেও সে সময়কার সাধারণ ভারতীয় চিন্তাশীল ও শিক্ষিত সমাজকে এই পাশ্চাত্য ভাবধারা বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত করেছিল এবং স্বদেশের সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনে উৎসাহিত করেছিল। একজন লেখকের মতে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছিল "প্রাচ্য পরিচ্ছদে পাশ্চাত্য শিক্ষার পীঠস্থান।"

কেবল ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারেই যে ফোর্ট উইলিয়ম সাহায্য করেছিল তা নয়, সে সময়কার বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে পরিচিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কেরী,

মার্শম্যান প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদেরা ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেরই আনুকূল্যে প্রাচ্য সাহিত্য নিয়ে চর্চা করার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলেন এবং কেরী যে সব বাংলা ভাষায় অমূল্য গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলির জন্য কলেজের সহায়তা অনেকখানি দায়ী। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি যে অতি বিপুল এবং গভীর ভাবধারায় সমৃদ্ধ ছিল এই তথ্য এই সব প্রাচ্যবিদ্ বিদেশীরাই জগৎসমক্ষে উপস্থাপিত করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি এই সব জ্ঞানান্বেষী বিদেশীদের ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে এবং তার যথাযথ মূল্যায়নে প্রচুর সাহায্য করে।

(৮) সামাজিক ক্ষেত্রে কলেজের প্রভাব ঃ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের বইগুলি যে কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই প্রভাব বিস্তার করেছিল তাই নয়, সে সময়কার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও যথেষ্ট আলোড়ন এনেছিল। সাহিত্য হল দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভাবধারার বাহক। সে সময়কার বাঙালী সমাজে ধর্মীয় রচনা ছাড়া সাহিত্য বলতে বিশেষ কিছু ছিল না। তার ফলে বাঙালী সংস্কৃতিও অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও রক্ষণশীল একটি গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বাংলা সাহিত্যের এই সব প্রাথমিক সৃষ্টি, তার মান বা পরিমাণ যাই হোক না কেন, তা যে বাঙালীর সংস্কৃতিকে সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছিল এবং পরবর্তীকালে দ্রুত ও বহুধারায় বিকাশের পথ সুগম করে দিয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

(৯) বাংলা গদ্যের সূতিকাগার ঃ

"বাংলা গদ্য সাহিত্যের গোড়ার ইতিহাস জানতে হইলে সর্বাগ্রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইতে হয়।" বস্তুতঃ বাংলা গদ্যের বিকাশ ফোর্ট উইলিয়মের পণ্ডিত ও মিশনারীদের প্রচেষ্টা থেকে শুরু হয়েছে বলা চলে। মিশনারীরা বাংলা গদ্যের অনুশীলন করা শুরু করেছিলেন মুখ্যতঃ এদেশের অধিবাসীদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের বাংলা ভাষার চর্চা মূলতঃ শিক্ষামূলকই ছিল এবং ইংরাজ কর্মীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়াই তাঁদের সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের বাংলা-ভাষায় লেখা বইগুলি খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে লিখিত হয় নি এবং তার ফলে বইগুলি সত্যকারের সাহিত্যিক মূল্যসম্পন্ন ছিল এবং সেই জন্য সর্বস্তরের পাঠকদের মধ্যে বহুল প্রচার লাভ করে ছিল। পরবর্তীকালে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ব্যাপক সংস্কার ও দ্রুত উন্নয়নের পশ্চাতে যে এই সাহিত্যকর্মগুলির অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা গদ্যকে একটি মার্জিত ও সুসংবদ্ধ রূপদানই কোর্ট উইলিয়ম কলেজের সবচেয়ে বড় অবদান। অবশ্য এর মূলে ছিল একজন বিশেষ ব্যক্তিরই অসাধারণ প্রতিভা এবং নিরলস আন্তরিক প্রচেষ্টা। তিনি প্রসিদ্ধ মিশনারী প্রচারক উইলিয়ম কেরী। বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রূপে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদান করার পর থেকে তিনি বাংলা ভাষার সংস্কার, উন্নয়ন ও পুষ্টিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন।

সিভিলিয়নদের পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করার উদ্দেশ্যে কেরী সাহেব নিজে বাংলা বই লেখায় উদ্যোগী হন এবং তাঁর অধীনস্থ ও সহকারীদের বাংলাভাষায় বই লিখতে অনুপ্রাণিত করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগদানের আগেই কেরী বাংলায় বাইবেল অনুবাদ করেছিলেন। সেজন্য বাংলাভাষায় তাঁর ভালই জ্ঞান জন্মেছিল। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যোগ দিয়ে তিনি বাংলাসাহিত্যে বই লিখতে সুরু করেন। ইংরেজ সিভিলিয়ন ছাত্রদের বাংলা কথিত ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যে তিনি 'কথোপকথন' নামে একটি বই লেখেন। বইটিতে সে সময়ে প্রচলিত কথিত বাংলা ভাষায় নানা ধরনের সংলাপ ছিল এবং বিভিন্ন স্তরের নারীপুরুষের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে সে সময়কার গ্রামীণ জীবনের একটি অতি জীবন্ত ও উপভোগ্য ছবি তুলে ধরা হয়েছে। বইটির ভাষা যদিও অত্যন্ত অপরিণত ও নিকৃষ্ট ধরনের ছিল তবু এই বইটি যে বাংলা গদ্যের বিবর্তনের পথে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

বাংলা গদ্য প্রাথমিক স্তরে কিরূপ ছিল তারই প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বইটির ভাষা নিতান্তই অমার্জিত ও অশুদ্ধ ছিল। কিন্তু এই বইটির প্রকাশন থেকেই বাংলা গদ্য নিয়ে কেরী এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের ব্যাপক চর্চা সুরু হয়। ১৮১২ সালে কেরীর লেখা 'ইতিহাসমালা' প্রকাশিত হয়। এই বইটির ভাষা আগের চেয়ে অনেক পরিচ্ছন্ন, উন্নত ও মার্জিত হয়ে উঠেছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলা গদ্যের চর্চা সুরু হয় ১৮০০ সাল থেকে এবং বারো বৎসর পরে এই বইটি প্রকাশিত হয়। এই বইটি যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কেরী ও অন্যান্য পণ্ডিতদের বাংলা ভাষা নিয়ে দীর্ঘ বারো বৎসরের চর্চা ও অনুশীলনের পরিণত ফল তা বইটি পড়লেই বোঝা যায়।

(১০) **বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন ও প্রসার**—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যেরও প্রচুর উন্নয়ন ঘটে।

ধর্ম বা ধর্মীয় বস্তু ছাড়া মানুষের অন্যান্য আগ্রহের বিষয়বস্তু নিয়ে বই লেখার প্রচেষ্টা প্রথম এই কলেজের লেখকদের মধ্যেই দেখা যায়। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের লেখা 'রাজাবলি' (১৮০৮) বাংলা সাহিত্যে নতুন পথের সন্ধান দেয়। প্রথম বইখানিকে বাংলা ভাষায় ইতিহাস রচনার প্রথম প্রচেষ্টা বলা চলে। দ্বিতীয় বইখানিও গল্পচ্ছলে বর্ণিত রাজাদের জীবনী। ঐতিহাসিক রচনা রূপে এই বই দুটির মান যথেষ্ট উন্নত না হলেও পাঠকদের মধ্যে রুচিবোধ ও সাহিত্য সম্বন্ধে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বইগুলির ভূমিকা যথেষ্ট মূল্যবান।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে থাকাকালীন কেরী বাংলাভাষায় তাঁর 'ইতিহাসমালা' (১৮১২) নামে বইটি লেখেন। এই বইটি প্রকৃতপক্ষে কোন ঐতিহাসিক বিবরণী নয়। এটি কতকগুলি গল্পের সমষ্টি। বিভিন্ন সংস্কৃত গল্পগ্রন্থ এবং প্রাচীন ইতিহাস থেকে নানা কাহিনী নিয়ে এটি রচিত। এই বইটিকে বাংলা ভাষায় গল্পসাহিত্যের অগ্রদূত বলা চলে।

কেরী সাহেবের পরই তাঁর পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম উল্লেখ করতে হয়। সংস্কৃত ও বাংলা উভয় ভাষাতেই এঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত ঘেঁষা পাণ্ডিত্যপূর্ণ গদ্যে তিনি লিখতেন। তাঁর বইগুলি ছিল উন্নতমানের এবং বিদ্বদ্‌জনের উপযোগী। তিনি চারখানি বই লিখেছিলেন। যথা, বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, রাজাবলি ও প্রবোধচন্দ্রিকা। প্রথম বই দুখানি সংস্কৃতের অনুবাদ। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি তাঁর স্বকীয় রচনা। রাজাবলি বইটি ভারতীয় বাদশাহ ও নবাবদের কাহিনী। প্রবোধচন্দ্রিকা বইখানি মৃত্যুঞ্জয়ের আরও পরিণত রচনা। ভাষা ও রচনাশৈলীর উৎকর্ষের জন্য বইটি সে সময়ের বাংলাগদ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ পাঠ্যগ্রন্থ বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ছাড়াও অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানে বইটি পাঠ্যপুস্তক রূপে পড়ানো হত। বইটি প্রকৃতই সাহিত্যিক গুণাবলীতে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ ছিল।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের লিখিত বইটির নাম 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম'। এটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবনী। চণ্ডীচরণ মুন্সীর লেখা 'তোতা ইতিহাস' হিন্দী বই 'তোতা কাহিনীর' অনুবাদ। বইটি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং লণ্ডনেও বইটির একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়। হরপ্রসাদ রায়ের লেখা 'পুরুষ পরীক্ষা' নামক বইটি বিদ্যাপতির লেখা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। উপরের বই দুখানি আদিরসাত্মক। এছাড়া ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আরও অনেক পণ্ডিত ও মুন্সী বাংলা ভাষায় বই লেখেন।

কলেজের হিন্দুস্থানী বিভাগের অধ্যক্ষ জন গিলক্রিষ্ট কলেজের মুন্সী ও মৌলবীদের দিয়ে ইংরেজী থেকে ঈশপ ও অন্যান্য গল্পের ছয়টি ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। বইটির নাম ছিল ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট (Oriental Fabulist)। বইটি রোমান অক্ষরে মুদ্রিত হয়েছিল। হিন্দুস্থানী বিভাগের মুন্সী তারিণীচরণ মিত্র বইটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণ বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এভাবে নানা বৈচিত্র্য আনেন। গল্পগ্রন্থ, ইতিহাস, অনুবাদ-সাহিত্য ইত্যাদি তখন বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। এঁরাই প্রথম বাংলা সাহিত্যের এই সব বিভিন্ন শাখার প্রবর্তন করেন। বাংলাভাষায় অভিধান ও ব্যাকরণ রচনাও এই প্রথম।

(১১) **পুস্তক মুদ্রণের আয়োজন**—ভারতীয় ভাষায় বই লেখায় উৎসাহ দানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষায় বইগুলি মুদ্রণেও কলেজ যথেষ্ট সাহায্য করেন। কলেজের পণ্ডিত ও মুন্সীদের লেখা গ্রন্থাবলীর মুদ্রণের আয়োজন করার ফলে সে সময়কার মুদ্রণ-শিল্প যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। বস্তুতঃ শ্রীরামপুর মিশন প্রেস, হিন্দুস্থানী প্রেস, পার্সিয়ান প্রেস এবং সংস্কৃত প্রেস প্রভৃতি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বই মুদ্রিত করেই ব্যয়নির্বাহ করত।

(১২) **সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অবদান**—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অবদান কেবলমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ভারতীয় সংস্কৃতির জাগরণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রেও এই কলেজের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে সময়ে

ভারতের নিজস্ব সংস্কৃতি অবক্ষয়ের নিম্নতম স্তরে গিয়ে পৌছেছিল। যেসব প্রতিভাবান ভারতীয় এ সময় জন্ম নিয়েছিলেন তাঁদের সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত কোন মাধ্যম। পুস্তক প্রকাশ ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আয়োজিত আলোচনা সভা এইসব সম্ভাবনাপূর্ণ ভারতীয়দের আত্মবিকাশে বিশেষ সাহায্য করেছিল। সে সময়ে এই কলেজের অর্থসাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে বহু বাঙালী লেখকেরই এই লেখাও প্রকাশ করা সম্ভব হ'ত না।

তাছাড়া ভারতীয় ভাষায় অনেক পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে, ফলে ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ বিখ্যাত প্রাচীন লেখকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পান এবং ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে উৎসাহিত হন।

এভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভাবধারার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিনিময় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এ কথা সত্য যে শাসনকার্যের উপলক্ষ্যে ভারতীয়রা বহু ইংরেজের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানে সম্পর্ক ছিল শাসক-শাসিতের, প্রভু-ভৃত্যের। ফলে সেখানে দু'পক্ষের মধ্যে যে ভাবধারার আদান-প্রদান হ'ত তা ছিল সীমাবদ্ধ ও সঙ্কীর্ণ এবং কখনই তাকে সাংস্কৃতিক বলা চলে না। তাছাড়া এই সব ইংরেজরা নিজেদের উন্নতশ্রেণীর ব্যক্তি বলে মনে করতেন এবং তাঁদের অধীনস্থ ভারতীয়দের তাচ্ছিল্য ও উপেক্ষার চক্ষে দেখতেন। সেদিক দিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের আবহাওয়া সম্পূর্ণ অন্য রকম ছিল। সেখানে মিশনারী শিক্ষকেরা ভারতীয় শিক্ষকদের যে কেবল সমান বলে মনে করতেন তা নয়, তাঁদের পাণ্ডিত্যকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। বহুক্ষেত্রেই মিশনারীরা এই সব ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে শিক্ষাগ্রহণ করতেন এবং তাঁদের শিক্ষকের প্রাপ্য সম্মান প্রদর্শন করতেন। তাছাড়া মিশনারী শিক্ষকেরা সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে চর্চা করার ফলে ভারতের একদা-সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে তাঁদের মধ্যে ভারতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের মনোভাব গড়ে উঠেছিল। এই সব কারণে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সত্যকারের একটি মিলন ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পেরেছিল এবং পরবর্তীকালের ভারতের নব ভাবধারার উন্মেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

Q. 3. Trace the history of non-official experiments in introducing English education in India.

উত্তর। (১) **ভূমিকা**—ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার সূচনা করেন ইউরোপীয় মিশনারীরা। এই শিক্ষার আদি পর্বে শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রেও মিশনারীরা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। পর্তুগীজ মিশনারীরা পর্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলে প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষার গোড়াপত্তন করেন, পরে ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজ মিশনারীরা ভারতের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষাবিস্তার কার্যে এগিয়ে আসেন। এদেশে মিশনারীরা কেন শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহী হয়েছিল তার কারণ খুব স্পষ্ট—ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার এবং

শিক্ষার মান উন্নত না করতে পারলে সোসাইটি প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তক ঐ সব পাঠশালায় চলবে না। এজন্য সোসাইটির সদস্যগণ এক ঘরোয়া বৈঠকে বসে স্থির করলেন দেশীয় পাঠশালাগুলির সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য কোলকাতায় একটি স্কুল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হওয়া দরকার। ১৮১৮ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর কোলকাতা টাউন হলে একটি সভায় সোসাইটির উদ্দেশ্য স্থির হয়—(১) কোলকাতায় দেশীয় পাঠশালাসমূহের উন্নতি সাধন, (২) আদর্শ ইংরেজী ও বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা, (৩) এ সব বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা। ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির অধ্যক্ষ সভার সদস্য ছিলেন ২৪ জন। উইলিয়াম কেরী ও ডেভিড হেয়ার প্রথম থেকেই অধ্যক্ষ সভার সদস্য ছিলেন। রাধাকান্ত দেব সোসাইটির ভারতীয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। সোসাইটি কোলকাতার পঁয়ত্রিশটি পল্লীতে পাঠাশালা ছিল ১৬৬টি ও ছাত্রসংখ্যা ছিল ৩,৪৮৭ জন। ১৮১৯ খ্রীঃ সোসাইটির তত্ত্বাবধানে স্কুলের সংখ্যা ছিল ১৯৪টি ও ছাত্রসংখ্যা হয় ৩,৭৮৭ জন। দেশীয় পাঠশালা সমূহের সংস্কার ও উন্নতি সাধনই স্কুল সোসাইটির প্রধান উদ্দেশ্য ও আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনও সোসাইটির অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সোসাইটি বিভিন্ন স্থানে চারটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল।

(৭) **অরপুলি পাঠশালা ও পটলডাঙ্গা পাঠশালা**—কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত এই দুটি বিদ্যালয় সে সময়ে আদর্শ বিদ্যালয় বলে পরিচিত ছিল। অরপুলি পাঠশালা ছিল ঠনঠনিয়া কালীবাড়ীর কাছে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটে। এই বিদ্যালয়টি সম্পূর্ণভাবে ডেভিড হেয়ারের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হ'ত। পাঠশালাটি ছিল অবৈতনিক। দরিদ্র ছেলেরাই সাধারণতঃ এখানে পড়ত।

পটলডাঙ্গা স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২৩ খ্রীঃ; সোসাইটি ও ডেভিড হেয়ার মিলিতভাবে এই বিদ্যালয়টির ব্যয়ভার বহন করত। এই বিদ্যালয়টি সোসাইটির একটি আদর্শ ইংরেজী স্কুলে পরিণত হয়। সোসাইটির দেশীয় স্কুলগুলির ছেলেরা প্রথমে ভালভাবে বাংলা শিখে ইংরেজী শেখার জন্য এখানে ভর্তি হ'ত। পরে হিন্দু কলেজ বা উভয় বিদ্যালয়ে একই সাথে ভর্তি হতে পারত। পটলডাঙ্গা বিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভাল ছেলেদের সোসাইটির খরচে হিন্দু কলেজে পড়ান হত। পটলডাঙ্গা স্কুলকে অনেক সময় হিন্দু কলেজের 'Preparatory School' বলা হত।

(৮) **বেসরকারী প্রচেষ্টায় অন্যান্য স্কুল**—হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় রামমোহন রায় সিমলায় একটি ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে এই স্কুল হেঁদুয়ায় স্থানান্তরিত করেন এবং নাম দেন 'এ্যাংলো হিন্দু স্কুল'। এই স্কুলটি ও ভবানীপুরের জগমোহন বোসের ইউনিয়ন স্কুল ইংরেজী শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সুনাম অর্জন করে। এ্যাংলো হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা নীতি-ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়। এখানকার ছাত্ররা অগ্রণী হয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় চর্চার জন্য একটি সভা স্থাপন করে।

১৮২৯ খ্রীঃ ১লা মার্চ গৌরমোহন আঢ্য কোলকাতায় ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারী

প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বেতন নেওয়া হ'ত। এই বিদ্যালয়ে ইংরেজী, সাহিত্য, গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় ইংরেজীর মাধ্যমে শেখানো হ'ত। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর হেডমাষ্টার হরম্যান জেওফ্রের সময়ে এই স্কুল জনপ্রিয়তায় হিন্দু কলেজের সমকক্ষ হয়ে ওঠে।

রাধাকান্ত দেবের হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয় তৎকালীন একটি আদর্শ বিদ্যালয়। বেহালায় হরচন্দ্র ঘোষ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৩১ খ্রীঃ শ্যামপুকুরের সারদাপ্রসাদ বসু হিন্দু বেনেভোলান্ট ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু ফ্রি স্কুল নামে তিনটি স্কুলের নাম জানা যায়। প্যারীচাঁদ মিত্র একটির নাম করেছেন। আরেকটি স্থাপন করেন সিমলার রসিকচন্দ্র মল্লিক। অপরটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৩৪ খ্রীঃ গোবিন্দ চন্দ্র বসাক। ১৮৩২ খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ইংরেজী স্কুল হিন্দু লিবার্‌্যাল অ্যাকাডেমি।

গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ভবনে পাকিন্স সাহেব প্রতিষ্ঠা করেন 'নেটিভ ইনফ্যাণ্ট স্কুল'। এখানে তিন বছর থেকে ছয় বছর পর্যন্ত শিশুদের ভর্তি করা হত। এই বিদ্যালয়ে শিশুদের নতুন পদ্ধতিতে ইংরেজী ও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া হত। এইটিই বোধহয় আমাদের দেশের প্রথম নার্শারী স্কুল।

(৯) **হিন্দু কলেজ পাঠশালা বা বাংলা পাঠশালা**—রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ হিন্দু কলেজের পরিচালকগণ বাংলা ভাষার মাধ্যমে ছেলেদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজের অধীনে একটি আদর্শ বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন। ডেভিড হেয়ার এ কাজে এগিয়ে আসেন। এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি কলেজ তা ছিল হেয়ার সাহেবের জমি। এই জমিতে ১৮৩৯ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারী ডেভিড হেয়ার বাংলা পাঠশালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পাঠশালার পরিচালকমণ্ডলী স্থির করেন পাঠশালায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া হবে।

(১০) **তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা**—বাংলা পাঠশালার আদর্শে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিমলার দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার প্রতিষ্ঠা করেন। এই পাঠশালা বসত সকাল ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত। পরে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় ইংরেজী পড়ানোর ব্যবস্থা হয়।

(১১) **কোলকাতার বাইরে শিক্ষার প্রসার**—উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে কোলকাতার বাইরে মফঃস্বল অঞ্চলেও অনেক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয়, ২৪ পরগণার টাকি স্কুলের কথা। টাকির জমিদার কালীনাথ ও বৈকুণ্ঠনাথ রায়চৌধুরী তাঁদের বাসভবনে ১৮৩২ খ্রীঃ ১৪ই জুন এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এখানে ইংরাজী, বাংলা ও ফার্সি তিন ভাষাই শেখাবার ব্যবস্থা হয়। প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যে ছাত্রসংখ্যা হয় পাঁচ'শ। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি পড়াবার জন্য বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ করা হয়।

তারকনাথ সেন সুখচরে বাউন্টিয়াস অ্যাকাডেমি নামে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠা করেন। বড়লাট অকল্যাণ্ড ১৮৩৭ খ্রীঃ ব্যারাকপুরে ত্রিশটি ছাত্র নিয়ে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। লর্ড অকল্যাণ্ডের নির্দেশ অনুসারে এই বিদ্যালয়ের সবচেয়ে ভাল ছাত্রদের হিন্দু কলেজ ও মেডিকেল কলেজে পাঠান হত।

বারাসতে ১৮৩৯ খ্রীঃ একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়টি বহুদিন অবৈতনিক ছিল। পরে ১৮৫০ খ্রীঃ স্কুলটি গভর্ণমেণ্ট স্কুলের সাথে মিশে যায়। সেই জায়গায় একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

হুগলী থেকে একক্রোশ দূরে অমরপুর গ্রামে দানবীর তারকনাথ পালিতের পিতা কালীকিঙ্কর পালিত ১৮৩৭ খ্রীঃ মাঝামাঝি বেনেভোলাণ্ট ইন্‌ষ্টিটিউসন নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৩৫ খ্রীঃ চন্দননগরে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের জমিদার মতিলাল রায় সেখানে একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ত্রিবেণীতে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এছাড়া বাংলার সর্বত্রই বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। নতুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল অবৈতনিক।

(১২) **স্ত্রী-শিক্ষার সূচনা**।—উনবিংশ শতকের প্রথম দশকে দেশে স্ত্রী-শিক্ষার কোন আয়োজনই ছিল না। মেয়েরা সামান্য যেটুকু লেখাপড়া শিখত ঘরোয়াভাবেই শিখত। মেয়েদের জন্য মিশনারীরাই প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে স্কুল স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মেয়েদের শিক্ষা দেবার জন্য ১৮১৮ খ্রীঃ রেভারেণ্ড মে চুঁচুড়ায় একটি স্কুল খোলেন। স্কুলটি বেশী দিন চলেনি। ১৮১৯ খ্রীঃ কেরী সাহেব শ্রীরামপুরে মেয়েদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থায় মেয়েরাই যাতে এগিয়ে আসে, সেজন্য ব্যাপটিস্ট মিশনের অনুরোধে মিসেস পিয়ার্স ও মিসেস লসনের বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীরা বাঙ্গালী মেয়েদের শিক্ষার জন্য ১৮২০ খ্রীঃ ইংরেজ মহিলাদের নিয়ে ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য এর নামের মাধ্যমেই নিহিত রয়েছে "The Female Juvenile Society for the establishment and support of Bengali Female Schools".

সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম জুভেনাইল স্কুল খোলা হয় এবং ক্রমে আরও স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮২৯ খ্রীঃ সোসাইটির পরিচালনায় ২০টি স্কুল হয়। ১৮৩২ খ্রীঃ এই সোসাইটি "The Calcutta Baptist Female School Society." এই নতুন নাম গ্রহণ করে। সমিতির স্থাপিত স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক এবং এখানে ইংরেজী শিক্ষা দেওয়া হত না। ১৮৩৪ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সমিতি সক্রিয় ছিল।

Female Juvenile Society-কে সাহায্যের জন্য লণ্ডনের British and Foreign School Society-র পক্ষ থেকে কুমারী এন কুককে ভারতে পাঠানো হয়। তিনি ১৮২১ খ্রীঃ এদেশে আসেন এবং চার্চ মিশনারী সোসাইটির আর্থিক সহায়তায় এক বছরের মধ্যে ৮টি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই

স্কুলগুলি ছিল অবৈতনিক। ভাল ছাত্রীদের উৎসাহিত করতে শাড়ী, পয়সা ইত্যাদি দেওয়া হত। এছাড়া, পুরস্কারের ব্যবস্থাও ছিল, এসব স্কুলে লেখা, পড়া, বানান, ভূগোল, হাতের কাজ প্রভৃতি শেখানো হত। ১৮২৪ খ্রীঃ মিস কুকের পরিচালনাধীনে ২৪টি স্কুল ছিল। মিঃ উইলসনের সঙ্গে মিস কুকের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় Ladies Society for Native Female Education in Calcutta and its Vicineties" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে। এই স্কুলগুলি পরিচালনার ভার সেই সমিতিকে দেওয়া হয়। ১৮২৪ খ্রীঃ বড়লাটপত্নী লেডী আমহার্স্টের পৃষ্ঠপোষকতায় কোলকাতার কয়েকজন ইউরোপীয় মহিলা Ladies Society for Native Female Education নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। সমিতি জানবাজার ও ইন্টালী অঞ্চলে ৬টি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের ২০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্যে কোলকাতায় 'সেণ্ট্রাল স্কুল' নামে মেয়েদের একটি আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই স্কুলে শিক্ষিকাদের শিক্ষণ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল! এই স্কুলগৃহেই স্কটিশ চার্চ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষণ বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে মিশনারীরাই পথপ্রদর্শক, স্ত্রী-শিক্ষা ক্ষেত্রে মিস কুকের দানও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষাব্রতী বাঙালী সমাজও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। উত্তরপাড়া, বারাসাত, যশোহর, নেবাদিয়া সুখসাগর প্রভৃতি স্থানে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের স্কুল গড়ে ওঠে। ১৮৪৮ খ্রীঃ বেথুন সাহেব বড়লাটের পরিষদের আইন সদস্য হয়ে এদেশে আসেন, এবং কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি নিযুক্ত হন। ১৮৪৯ খ্রীঃ ৭ই মে তাঁর প্রচেষ্টায় ২১ জন ছাত্রী নিয়ে Calcutta Female School বা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এই বিদ্যালয়ের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা থেকেই বাংলার স্ত্রীশিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়। এই স্কুলের বাড়ী করবার জন্য রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় দশ হাজার টাকা ও পাঁচ বিঘা জমি দান করেন। বেথুন সাহেব এই স্কুলের জন্য ১০ হাজার পাউণ্ড দান করেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যুর পর, তাঁর স্মৃতির সম্মানে এই স্কুলের নাম হয় বেথুন নারী বিদ্যালয়। ১৮৮৭ খ্রীঃ এই স্কুল বেথুন কলেজে রূপান্তরিত হয়। বেথুন কলেজই মেয়েদের প্রথম কলেজ। হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েকদিন বাদে রাজা রাধাকান্ত দেব শোভাবাজারে একটি মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়ে কোলকাতার নিকটবর্তী অঞ্চলে স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহী ভারতীয় সমাজহিতৈষীদের প্রচেষ্টায় মেয়েদের আরও স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুলগুলি সরকারী সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেও দেশের লোকের অর্থসাহায্যে কাজ চালিয়ে যেতে থাকে।

(১২) সরকারী উদাসীনতা—স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সরকার প্রথম থেকেই উদাসীন ছিল। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে সরকারী তহবিল থেকে নিয়মিত কোন সাহায্যের ব্যবস্থাই ছিল না। রক্ষণশীল হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই স্ত্রীশিক্ষার

বিরোধী ছিল। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কোন চেষ্টায় তারা সুনজরে দেখত না। এই কারণে দেশের সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা নীতির অজুহাতে সরকার স্ত্রীশিক্ষার জন্য কোন সাহায্যদানে বিরত ছিল। মিশনারীদের ও কিছু সহৃদয় ভারতীয় ও ইংরেজের উদ্যোগে দেশে নারীশিক্ষার সূত্রপাত হয়। সরকার থেকে কোন উৎসাহ বা আর্থিক সাহায্য না পেলেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা মোটামুটি আশাব্যঞ্জক হয়েছিল।

(১৩) **বেসরকারী উচ্চশিক্ষা প্রচেষ্টা**—বেসরকারী প্রচেষ্টা উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে উচ্চ শিক্ষাবিস্তারে চেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৮১৭ খ্রীঃ ২০শে জানুয়ারী হিন্দু বিদ্যালয় (কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৮ খ্রীঃ শ্রীরামপুরে মিশনারীদের চেষ্টায় একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। দিনেমার সরকারের এক সনদবলে এই কলেজের ছাত্রদের কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী দিতে শুরু করেন। এই কলেজই ব্রিটিশ ভারতে প্রথম মিশনারী কলেজ। চার্চ মিশনারী সোসাইটি ১৮২০ খ্রীঃ শিবপুরে বিশপস্ কলেজ নামে দ্বিতীয় মিশনারী কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৩৬ খ্রীঃ দানবীর হাজি মহসীনের দানে হুগলী কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

(১৪) **গোঁড়া মিশনারীদের শিক্ষাপ্রসার নীতি ও আলেকজাণ্ডার ডাফ**—স্কট মিশনারী চার্চের একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, পাদ্রী আলেকজাণ্ডার ডাফ, ১৮৩০ খ্রীঃ ভারতে ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে স্কটল্যাণ্ডের জেনারেল এ্যাসেমব্লির পক্ষ থেকে আলেকজাণ্ডার ডাফকে এদেশে পাঠানো হয়। তিনি ঐ বছর মে মাসে কোলকাতায় পৌছান। ডাফ আসবার পর মিশনারীরা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করেন। তাঁর প্রভাবে মিশনারী শিক্ষা-প্রয়াস নীতিগতভাবে এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। ডাফ এদেশে মিশনারীদের কার্য-পদ্ধতি দেখে মোটেই খুশী হতে পারেন নি। প্রাথমিক স্কুল সমূহে ছাত্রসংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। প্রধানতঃ অনাথ বা সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। উপাসনায় খুব কম লোক উপস্থিত হ'ত। ডাফের মত গোঁড়া পাদ্রীর এতে খুসী হবার কথা নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বাইবেল দ্বারাই ভারতীয়দের মুক্তি সম্ভব। তিনি স্থির করলেন, সমাজের উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচার করতে হবে এবং মিশনারীদের সেই উদ্দেশ্যে পরিচালিত করতে হবে। তাঁর ধারণা ছিল, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলে নিম্নশ্রেণীর মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। তিনি চুঁইয়ে-পড়া নীতিতে (downward filtration theory) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর মনোভাব গোপন রাখেন নি। এই নীতিকে বাস্তবে রূপ নেবার জন্য ১৮৩০ খ্রীঃ তিনি জেনারেল এসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠান স্কটিশচার্চ কলেজ নামে খ্যাত। এখানে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। বাইবেল এখানে ছাত্রদের 'অবশ্যপাঠ্য' তালিকাভুক্ত হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও এখানে সাধারণ শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত ছিল। এই বিদ্যালয়ের সুনাম এত বেশী ছিল যে, হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ এখানকার শিক্ষারীতির

প্রশংসা করতেন। অল্প দিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রসংখ্যা এক হাজার হয়। কিছুদিনের মধ্যেই ডাফের পথ অনুসরণ করে মিশনারী পরিচালিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়-গুলিতে ইংরাজীই শিক্ষার মাধ্যম হয়ে ওঠে।

ডাফ সরকারী ধর্ম-নিরপেক্ষতা নীতি ও শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। ইংল্যাণ্ডে দেখা গিয়েছে, শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপ সেখানকার মিশনারীরা পছন্দ করেন নি। মিশনারীরা দুই জায়গাতেই চেয়েছে শিক্ষার জন্য সরকার থেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হোক, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষার নেতৃত্ব থাকবে মিশনারীদের হাতে। ডাফ এই নীতির গোড়া সমর্থন ছিলেন। ডাফ চাইতেন এদেশে শিক্ষার ভার ছেড়ে দেওয়া হোক মিশনারীদের ওপর। আর সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বাইবেল অবশ্যপাঠ্য হবে। প্রাচ্য বিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখবার প্রতিশ্রুতি দেবার জন্য ডাফ অকল্যাণ্ডকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রস্তাবও মিশনারীরা মোটেই সুনজরে দেখেন নি। হার্ডিঞ্জ ঘোষণা করেছিলেন, সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিতদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। জনসাধারণের ইংরেজী প্রীতির পিছনে স্বার্থবুদ্ধি অনেকটা কার্যকরী ছিল। Bengal Council of Education সরকারী পরীক্ষা ও কলেজের পাঠ্যতালিকা থেকে মিশনারীদের প্রকাশিত পুস্তক বাদ দেওয়ায় ডাফ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানান। তিনি বলেন, লৌকিক শিক্ষার চেয়ে সরকারী চাকরির জন্য খ্রীষ্টান শিক্ষাই অধিকতর প্রয়োজনীয়। তৎকালীন শিক্ষানীতিতে মিশনারীদের সঙ্গে সামান্য মতভেদ থাকলেও মিশনারীদের প্রভাব শিক্ষাক্ষেত্রে সর্বাধিক ছিল। লর্ড বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি ডাফের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। সরকারী নীতি যাই হোক ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সরকারী কর্মচারীদের অতিরিক্ত মিশনারী প্রীতি ও ডাফের মত কিছু গোঁড়া পাদ্রীর হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের বিরুদ্ধে প্রচার ও অযৌক্তিক আক্রমণ উভয় সম্প্রদায়কেই মিশনারী বিরোধী করে তোলে ও ধর্ম-নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সরকারী নীতির প্রতি এদেশবাসী সন্দিহান হয়ে ওঠে। মিশনারীদের সম্পর্কে দেশবাসীর অবিশ্বাস ও সরকারী নীতিতে সন্দেহ আংশিকভাবে সিপাহী বিদ্রোহের ইন্ধন যোগাতে সাহায্য করেছিল। গ্রাণ্ট, মেকলে, ডাফ প্রভৃতি সবাই বিশ্বাস করতেন ভারতীয়দের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ বিনা উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। শিক্ষিত হলেই তারা সব দলে দলে খ্রীষ্টান হবে। এ থেকে এ দেশের মানুষের ধারণা হয়, সরকার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ধর্মান্তরিত করতে মিশনারীদের পরোক্ষ সাহায্য করছে। এই ধারণা সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। এই ধারণার পশ্চাতে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের অতিরিক্ত আগ্রহ ও একদল সরকারী কর্মচারীর মাত্রাধিক্যরূপে মিশনারী প্রীতিই পরোক্ষভাবে দায়ী।

Q. 4. Describe the activities of Derozio and his 'Young Bengal' group. Evaluate their contribution to Bengal's Renaissance

উত্তর। (১) **ডিরোজিও ও যুব বাংলা আন্দোলন**—উনবিংশ শতাব্দীর বিশ ও তিরিশ দশকে বাংলা সমাজজীবনে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন দেখা দেয়। শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই সেই আলোড়নের প্রভাবে একটা বিরাট পরিবর্তন আসন্ন হয়ে ওঠে। খ্রীষ্টান মিশনারী, রামমোহনের মধ্যপন্থী দল, প্রাচীনপন্থী দল—এই বিভিন্ন শক্তিগুলির পারস্পারিক সংঘাত বাংলার পুরাতন সমাজ-সংগঠনকে সব দিকে প্রচণ্ড আঘাত করে। এই বিপুল আলোড়নের ফলে দেখা দেয় একদল চরমপন্থী যুব সংস্কারকের দল। এদের কার্যাবলী বাংলার ইতিহাসে 'যুব বাংলা আন্দোলন' নামে পরিচিত।

এই যুব আন্দোলনের নেতা রূপে দেখা দিয়েছিলেন একজন খ্রীষ্টান যুবক, নাম হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। তিনি জাতিতে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছিলেন এবং তাঁর মাতৃভাষাও ছিল ইংরেজী। কিন্তু তিনি বাংলাদেশকে তাঁর মাতৃভূমি বলে গ্রহণ করেছিলেন এবং এদেশের উন্নয়নের জন্য পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

ডিরোজিও ১৮০৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে ১৮৩১ সালে মারা যান। তিনি ড্রামণ্ডের স্কুলে শিক্ষাগ্রহণ করেন। ড্রামণ্ড একাধারে কবি, পণ্ডিত ও প্রগতিশীল চিন্তার নায়ক ছিলেন। তিনি ফরাসী বিপ্লবের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সেই আধুনিক চিন্তাধারা ও বিপ্লবের বীজ বপন করেছিলেন। ডিরোজিও ড্রামণ্ডের এই প্রগতিশীল ভাবধারার দ্বারা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। ডিরোজিও অতি বাল্যকালেই কবিতা লেখা সুরু করেন এবং কাণ্টের দর্শনের উপর একটি সমালোচনাও প্রকাশ করেন। তিনি ডঃ গ্রাণ্টের ইণ্ডিয়া গেজেটেও নিয়মিত লিখতেন।

১৮২৬ সালে ডিরোজিও হিন্দু কলেজে চাকরী পান এবং সিনিয়র ক্লাসে পড়ান সুরু করেন। এই সময় তিনি হেসপারাস এবং ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট নামক পত্রিকা দুটির সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন।

ডিরোজিও হিন্দু কলেজে থাকাকালীন একজন অতি ছাত্রপ্রিয় শিক্ষক হয়ে ওঠেন। তাঁর স্বাধীন ও জাতীয়তাবোধক চিন্তাধারায় হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে এবং ডিরোজিওকে ঘিরে একটি অভিনব শিক্ষক-ছাত্র-চক্র গড়ে ওঠে।

তিনি তাঁর ছাত্রদের স্বাধীন চিন্তা করতে শিক্ষা দেন এবং অন্যায় শাসন ও দমনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্বুদ্ধ করেন। 'সত্যের জন্য বাঁচা ও মরা, সদ্‌গুণ আহরণ করা এবং সকল রকম দুর্নীতি পরিহার করা'—এই আদর্শ তিনি তাঁর ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর উন্নত আদর্শের দ্বারা ছাত্ররা বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে ডিরোজিওর বহু ছাত্র বাঙালী সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

ডিরোজিওর শিক্ষাদানের পদ্ধতি ছিল অবাধিত বিতর্কের মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করা। সে সময়ে দেশের সামনে সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় যত রকম সমস্যা ছিল, সে সব নিয়েই তাঁদের সমালোচনা-চক্রে বিতর্ক হ'ত এবং তার ফলে ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে একটা অপূর্ব সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুতঃ ডিরোজিওর প্রভাব হিন্দু কলেজের শুষ্ক নীরস শিক্ষা-পরিবেশের মধ্যে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছিল।

ডিরোজিওর ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা পরবর্তীকালে নাম করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি, রসিকমোহন মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখার্জি, রামগোপাল ঘোষ, মাধব চন্দ্র মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, মহেশ চন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃতলাল মিত্র প্রভৃতি।

এঁদের প্রত্যেকেই হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ডিরোজিওর নেতৃত্বে এঁরা হিন্দু সমাজের জীর্ণ, সঙ্কীর্ণ, ক্ষীয়মান সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এঁরা হিন্দু সমাজের দুর্নীতি, রক্ষণশীলতা ও সঙ্কীর্ণতাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন এবং প্রচলিত হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিদর্শনস্বরূপ তাদের অনেকে মদ ও গো-মাংস খেতে সুরু করেন। তাঁরা তাঁদের এই আচরণগুলিকে প্রচলিত ধর্মীয় কুসংস্কার ও সামাজিক সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তির প্রতীক বলে মনে করতেন। তাঁরা প্রকাশ্যেই হিন্দুধর্মের তীব্র সমালোচনা করতেন এবং হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করাই তাঁদের সংকল্প বলে ঘোষণা করেন। এই নব্য তরুণদের কার্যকলাপে হিন্দু সমাজের প্রধানদের মধ্যে বিরাট বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং হিন্দুধর্মকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য একটি সুসংহত রক্ষণশীল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে।

১৮২৮ সালে ডিরোজিও তাঁর ছাত্রদের নিয়ে এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসন গঠন করেন। এই সমিতির সভাপতি ছিলেন ডিরোজিও, উমাচরণ বসু ছিলেন সম্পাদক। এই সমিতিতে নানাবিষয় নিয়ে বিতর্ক সভা বসত। সত্যের স্বরূপ, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা, সদ্‌গুণের অনুশীলন, দেশপ্রেমের মহত্ত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, পৌত্তলিকতার অসারতা, যাজকদের মিথ্যাচার প্রভৃতি উচ্চস্তরের বিষয়গুলি ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্ররা এই সমিতিতে নিয়মিত আলোচনা করতেন।

ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ ক্লাব নামে দুটি সংস্থা আছে। ঐখানে এই বিশ্ববিদ্যালয় দুটির মেধাবী ছাত্ররা বাগ্মিতার অনুশীলন করে থাকেন। তেমনি হিন্দু কলেজের সঙ্গে তারা সংযুক্ত ছিল। এই এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েসনটি এবং এখানে হিন্দু কলেজের ভাল ভাল ছাত্ররা বিতর্কের দক্ষতার অনুশীলন করতেন। এই সব বিতর্ক ও আলোচনার মূল লক্ষ্য ছিল সেই সময়কার হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি ও সঙ্কীর্ণতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা। এই সমিতিতে হিন্দু কলেজের ছাত্ররা ছাড়াও স্যার এডওয়ার্ড রায়ান, কর্ণেল বেনসন, কর্ণেল বিটসন, ডঃ মিলস্‌, ডেভিড হেয়ার প্রভৃতি ইংরেজ সুধীরা নিয়মিত যোগদান করতেন। এ্যাসোসিয়েসনের এই

বৈঠকগুলি সেই সময়ের বাঙ্গালী যুবকদের মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাদের মধ্যে শতাব্দীর অন্ধ বিশ্বাসের প্রাচীর ভেঙ্গে স্বাধীন চিন্তা এবং অনুসন্ধান করার প্রেরণা যুগিয়েছিল।

এই নব্য যুবকদের প্রগতিশীল চিন্তাধারার পিছনে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ভলটেয়ার, হিউম, লক, টম পেইন প্রভৃতি পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের লেখার মাধ্যমে এই যুবকেরা আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। বিশেষ করে পেইনের এজ অফ রিজন এবং রাইটস্ অফ ম্যান, বই দুটি নবীন বঙ্গযুবকদের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল এবং সেই সময়কার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন অন্তঃসারশূন্য সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল। এছাড়া রবার্টসন ও গিবনের ইতিহাস, অ্যাডাম স্মিথ ও জেরেমি বেন্থামের রাজনৈতিক তত্ত্ব, নিউটন ও ডেভির বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, হিউম ও পেইনের ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা, লক, রীড, স্ট্য়ার্ট ব্রাউনের যুক্তিধর্মী দার্শনিক তত্ত্ব প্রভৃতি এই নব্য যুবকদের চিন্তাধারার মধ্যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। এইসব নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে তাদের মনে একটি প্রবল স্বাধীনতাবোধ জেগেছিল এবং একদিকে সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কারের শৃঙ্খল এবং অপরদিকে বিদেশী শাসকদের দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ তাদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

একদিকে যেমন পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতি এই নবীন যুবকদের প্রভাবিত করেছিল তেমনই করেছিল পাশ্চাত্য দেশগুলির মুক্তিযুদ্ধ ও বিপ্লবের বিবরণ। আমেরিকার মুক্তিযুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব ও ১৮৩০ সালের জুলাই বিদ্রোহও তাঁদের মনে ব্যক্তি-স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিল।

নব্য যুবকদের চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এই বিপ্লবের উদ্‌বোদ্ধা ছিলেন ডিরোজিও। তাঁর বক্তৃতা, আলোচনা, উপদেশ প্রতিটি যুবককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যপাঠে তাদের উৎসাহ দিয়ে এবং হিন্দুধর্মের অনুশাসনের বন্ধন চূর্ণ করতে উদ্‌বুদ্ধ করে ডিরোজিও প্রত্যেকটি যুবককে এক নতুন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিপ্লবের যোদ্ধারূপে তৈরী করেন। স্বভাবতঃই এই যুবকদের অনেকেই হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নানা চরম-প্রকৃতির আচরণ করেন এবং তার ফলে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রাচীনপন্থীদের পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সংবাদ প্রভাকরে' তীব্রভাষায় এই যুবকদের আচরণের নিন্দা করা হয়। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিবারণ এবং রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন গোঁড়া হিন্দুদের আরও বিচলিত করে তোলে। তাঁরা রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রতিভূস্বরূপ রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বে 'ধর্মসভা' নামে একটি পাল্টা সমিতি গঠন করেন এবং সেই সমিতিতে এই নবীন যুবকদের উগ্রধর্মী আধুনিকতার বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানানো হয়।

এই সময় আলেকজাণ্ডার ডাফ বাংলাদেশকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের একটি প্রশস্ত ক্ষেত্র বলে মনে করেন এবং তিনি হিন্দু কলেজের নিকটেই খ্রীষ্টধর্মের উপর বক্তৃতাবলীর আয়োজন করেন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা দলে দলে সেই আলোচনায় যোগ দিতে

স্থরু করে। এই ঘটনায় ভীত হয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের কোনও ধর্মীয় সভায় যোগদান করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন।

হিন্দু কলেজে উগ্রপন্থীদের দমনের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রধান শিক্ষককে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে অনুরোধ করেন এবং কলেজের শিক্ষকদের সব রকম ধর্মীয় আলোচনা থেকে নিবৃত্ত থাকার নির্দেশ জারী করেন। কিন্তু ডিরোজিও এই নিষেধ শোনেন না এবং হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে তাঁরা তাঁদের সমালোচনা ও প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। তার ফলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ডিরোজিওকে কলেজের শিক্ষক পদ থেকে অপসারিত করার সিদ্ধান্ত নেন। ডিরোজিও এই খবর পেয়ে ১৮৩১ সালে নিজেই তাঁর পদত্যাগ পত্র পাঠিয়ে দেন।

হিন্দু কলেজ পদত্যাগের পর ডিরোজিও 'ইষ্ট ইণ্ডিয়ান' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সমাজের সব সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই পত্রিকাটির লক্ষ্য বলে বর্ণনা করা হয়। ডিরোজিওর প্রেরণায় তাঁর ছাত্রের দল হিন্দু ফ্রি স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে এই নবীন বিপ্লবীর মৃত্যু হয়।

(২) **ডিরোজিও-পন্থীদের কার্যকলাপ** · ডিরোজিওর আয়ু স্বল্পকালীন হলেও বাংলার নব ভাবধারার জাগরণে তাঁর প্রভাব যেমন গভীর তেমনই সুদূর প্রসারী ছিল। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর তাঁর অনুগামীরা যুব বাংলা গোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়েছিল। ডিরোজিওর স্বাধীন চিন্তাধারার অনুসরণে এই যুবকদের দল হিন্দু সমাজের নানা দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। তাঁদের প্রতিবাদ সময় সময় অত্যন্ত উগ্ররূপ ধারণ করত এবং তার ফলে সেই সময়কার হিন্দু সমাজের কর্ণধাররা যেমন ক্রুদ্ধ তেমনই শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। রাধাকৃষ্ণ দেবের নেতৃত্বে সনাতনপন্থীরা এই নবীন বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে তাঁদের আক্রমণ অব্যাহত রাখেন।

ডিরোজিওর মৃত্যুর পর ডিরোজিওপন্থীরা সমান উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে তাঁদের আন্দোলন চালিয়ে গেলেন। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা একটি পত্রিকা বার করলেন। ১৮৩৮ সালে 'সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিসন অফ জেনারেল নলেজ' নামে ছাত্রদের একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই সমিতিতে মানবজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। এছাড়া ডিরোজিওপন্থীরা একটি ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার এবং পত্রবিনিময়মূলক সমিতি স্থাপন করেন। এই পাঠাগারে সদস্যরা বিভিন্ন বই পড়ে নিজেদের মধ্যে সে সম্বন্ধে আলোচনামূলক পত্র বিনিময় করতেন।

ডিরোজিও-পন্থীরা অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: পার্থিনন, হেসপেরাস, জ্ঞানান্বেষণ ইনকোয়ারার, হিন্দু পায়োনিয়র, কুইল এবং বেঙ্গল স্পেকটেটর। এইসব পত্রিকাগুলিতে হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি এবং অন্ধবিশ্বাসের তীব্র নিন্দা করা হয়।

চল্লিশ শতকে এই 'যুব বাংলা আন্দোলন' রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। এই নব্য

সংস্কারকদের চরম মতবাদ বাংলার নবজাগরণের এক নতুন অধ্যায় সৃষ্ট করেছিল। রামমোহনের প্রগতিশীল মতবাদের সঙ্গে কিন্তু ডিরোজিওপন্থীদের সংঘাত দেখা দিয়েছিল। রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারকে সমর্থন করেছিলেন বটে কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্যকে বর্জন করে নয়। বরং তিনি এ দুয়ের একটা সুসমন্বয়ই চেয়েছিলেন। এইজন্য ডিরোজিওপন্থীরা রামমোহনকে নীতিহীন, সুবিধাবাদী, অর্ধ-উদারনৈতিক বলে সমালোচনা করেছিলেন। ফলে ডিরোজিওপন্থী যুব বাংলার সমর্থকরা একদিকে যেমন প্রাচীনপন্থীদের সঙ্গে সংঘর্ষে এসেছিলেন তেমনই অপরদিকে রামমোহনেরই সমর্থক মধ্যপন্থীদেরও সঙ্গে তাঁদের সমান বিবাদ ঘটেছিল। পরবর্তীকালে বাংলার নবচেতনার উন্মেষণের চরমরূপটি এই ত্রিমুখী শক্তির পারস্পরিক সংঘাত থেকে সৃষ্ট হয়েছিল।

(৩) **যুব বাংলার আন্দোলন ও ডিরোজিওর অবদান**—উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে যে বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল এবং পরবর্তীকালের ইতিহাসে বা রেনাসাঁ যা নবজাগরণ বলে পরিচিত হয়েছিল। সেই পরিবর্তনে ডিরোজিও এবং তাঁর যুব বাংলা আন্দোলনের অবদান যে সবচেয়ে গভীর ও সুদূরপ্রয়াসী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সময় বাংলার, শুধু বাংলার কেন, সারা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি হিন্দুধর্মের গোঁড়ামি, কুসংস্কার ও বর্বরোচিত আচার-প্রথার অবনতির চরম স্তরে নেমে গিয়েছিল। সেখান থেকে তাকে তুলে ধরতে যে প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন ছিল সেই শক্তি ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীদের চরমপন্থী আন্দোলনই জুগিয়েছিল। একথা অবশ্য অনস্বীকার্য যে কেরী ও অন্যান্য মিশনারীরাই প্রথম ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে তার বদ্ধ জলভূমি থেকে পথ কেটে বাইরের জগতে নিয়ে আসেন। কিন্তু সেই ক্ষীণ স্রোতধারাকে বিপুলকায় ও বেগবতী করে তুলতে ডিরোজিও ও তাঁর অনুগামীদের চরম মতবাদই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। একথা সত্য যে সে সময় রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মত শিক্ষাবিদ্ ও সমাজ সংস্কারক ও ভারতের মৃতপ্রায় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে নবজীবন দেবার জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু ডিরোজিও তাঁর অনুগামীদের বৈপ্লবিক শক্তি ও প্রেরণা যদি সেই সঙ্গে যুক্ত না হত তাহলে তাঁদের প্রচেষ্টা কতটা সফল হত সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

দ্বিতীয়তঃ, রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সংস্কারপ্রচেষ্টা ছিল সংগঠনমূলক। তাঁরা সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতিকে যতটা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে ধর্ম ও সমাজকে জঞ্জালমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। এই ধরনের প্রচেষ্টার ফল সাধারণতঃ বিলম্বিত হয়ে থাকে। ডিরোজিও তাঁর অনুগামীদের প্রাচীন শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহই রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করেছিল।

তৃতীয়তঃ, ডিরোজিও একজন যথার্থ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর গভীর উপলব্ধি, ছাত্রদের প্রতি ভালবাসা ও উচ্চ আদর্শ-নিষ্ঠা তাঁর ছাত্রদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তারই ফলে অক্সফোর্ড কেমব্রিজের আদর্শসম্পন্ন ছাত্রদলের মত এদেশেও

জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ একদল ছাত্র তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী যুগে দেশের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির সংস্কারের ক্ষেত্রে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে ডিরোজিওর ছাত্রদেরই সংখ্যা সব চেয়ে বেশী ছিল।

সবশেষে, ডিরোজিওর দেশপ্রেম অত্যন্ত গভীর ছিল। তিনি জাতিতে এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান হলেও ভারতকে তাঁর স্বদেশ বলে গ্রহণ করেছিলেন। দেশের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসা এবং সেই দেশকে অশিক্ষা ও কুসংস্কারের গহ্বর থেকে তুলে আনার আপ্রাণ প্রচেষ্টা বহু বাঙালীকে স্বদেশ প্রেমে উজ্জীবিত করেছিল। পরবর্তীকালে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিপ্লবের পাশাপাশি যে রাজনৈতিক বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছিল তাতেও ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদের অবদান কম ছিল না।

(৪) **ডিরোজিওর পরে নবজাগরণ আন্দোলন**

ডিরোজিও মারা যান ১৮৩১ সালে। ১৮৩৫ সালে মেকলের মিনিট প্রকাশিত হয় এবং দেশে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ইংরাজী শিক্ষাদান সুরু হয়। এ সময় ডিরোজিও-পন্থীদের চরম ও উগ্র প্রতিবাদ স্তিমিত হয়ে আসে। কিন্তু প্রগতিশীল চিন্তাধারার বিকাশ ও সংস্কারমূলক আন্দোলন স্তব্ধ হয় না। পরবর্তী অর্ধ-শতকের মধ্যে বাংলাদেশ এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিভিন্ন মতবাদধারী বহু সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই জনতার মধ্যে থেকে যে মানুষটির মাথা সবচেয়ে উপরে দেখা গিয়েছিল তিনি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

Q 5. Critically examine the controversies over the introduction of English as the medium of instruction.

উত্তর। (১) **ভূমিকা**—উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের নৈতিক দায়িত্বকে তারা কোনদিন স্বীকার করেনি। বিভিন্ন সময়ে শিক্ষাবিস্তারের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অর্থ সাহায্য করেছে, বেনারসে সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে সরকারী উদ্যোগ থাকলেও দেশে শিক্ষাবিস্তারের কোন সুনির্দিষ্ট সরকারী নীতি ছিল না।

১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ আইন পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হয়। জনমতের চাপে আইনের ৪৩ ধারায় ভারতে শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে একটি শর্ত লিপিবদ্ধ করা হল। এই ধারার (clause) দু'টি অংশ ছিল। প্রথম অংশে বলা হল "বৃটিশ ভারতে সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতিবিধান ; পণ্ডিতদের উৎসাহ-দান এবং দ্বিতীয় অংশে বলা হয় এ দেশবাসীদের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনকল্পে কোম্পানী অন্য সব রকম খরচ মিটিয়ে বছরে এক লক্ষ টাকা খরচ করবে।"

১৮১৩ খ্রীঃ সনদ আইনের শিক্ষাধারাকে ভারতে সরকারীভাবে শিক্ষাবিস্তারে প্রথম পদক্ষেপ বলা যায়। এর পূর্বে কোম্পানী শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করলেও শিক্ষা যে সমাজের ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব একথা স্বীকার করে নি।

(২) **শিক্ষাধারা সম্পর্কে কোম্পানীর মনোভাব ও ভারত সরকারের শিক্ষানীতি**—১৮১৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ আইনে শিক্ষাধারা (education clause) গৃহীত হবার ফলে আশা করা হয় সরকারী প্রচেষ্টায় দেশে দ্রুত শিক্ষার প্রসারলাভ ঘটবে এবং সরকার শিক্ষা সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয় নীতি স্থির করে শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করবে। শিক্ষা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব গ্রহণে কোম্পানীর প্রথম থেকেই আপত্তি ছিল। তাই সর্বভারতীয় কোন নীতি দ্বারা শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করবার কোন প্রচেষ্টা উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে হয়নি। শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট এক লক্ষ টাকা ব্যয় সম্পর্কে কর্তৃপক্ষ যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফলে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এক জটিলতারই সৃষ্টি হয়েছিল।

(৩) **শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা নিয়ে জটিলতা**—সনদ আইনের শিক্ষাধারায় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন ও উন্নতি বলতে ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যকে বুঝায় তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। সনদে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও উন্নয়ন করতে বলা হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞান বলতে প্রাচ্য বিজ্ঞান কি পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান তা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়নি। ফলে শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ যদি সুস্পষ্টভাবে তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেন তাহলে কোন জটিলতার সৃষ্টি হত না।

(৪) **শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগ**—১৮১৩ খৃস্টাব্দে সনদ আইনে শিক্ষাধারা গৃহীত হবার পর সরকারী তহবিল থেকে এক লক্ষ টাকা ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৮২৩ খৃস্টাব্দের ৩১শে জুলাই সপরিষদ বড়লাট দশজন সভ্য নিয়ে General Committee of Public Instruction (G.C.P.I.) নামে একটি কমিটি গঠন করেন। এই শিক্ষাসভার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়—ভারতীয়দের জন্য উন্নত ও প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রবর্তন ও তাঁদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধনের জন্য শিক্ষা-সভা গঠন করা হল।

বাংলাদেশের সিভিলিয়ানদের নিয়ে এই সভা গঠিত হয়। সভার সাহায্যের জন্য বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়। সদর দেওয়ানী আদালতের বিচারপতি জন হেরিংটন শিক্ষাসভার প্রথম সভাপতি ও ডঃ হোরেস উইলসন প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। সমগ্র উত্তর ভারতে সভার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত হয়। প্রস্তাবিত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার দায়িত্ব শিক্ষাসভা গ্রহণ করেন। সভার হাতে সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনা ও বরাদ্দীকৃত লক্ষ টাকা ব্যয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সরকারের হাতে না থাকায় স্থির হয় —'শিক্ষাসভা' শুধুমাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করবে।

(৫) **শিক্ষা-সভায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিরোধের সূচনা**—শিক্ষাসভায় প্রাচ্য বিদ্যানুরাগীদের প্রাধান্য থাকায় প্রথমদিকে ইংরেজী শিক্ষার প্রসারের দিকে সভার বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হতে থাকে ও সভায় দুটি দলের সৃষ্টি হয়। ১৮৩১ খৃস্টাব্দে সভার দশজন সদস্যের মধ্যে পাঁচজন ছিলেন প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থক। তাঁদের নেতা ছিলেন প্রিন্সেপ। অপর পাঁচজন সদস্যের মধ্যে অধিকাংশই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা

ও ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরেজী শিক্ষানুরাগী এই নব্য সিভিলিয়ান দলের নেতা ছিলেন 'ট্রেভেলিয়ান'।

(৬) **প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য দ্বন্দ্ব**—প্রাচ্য বিদ্যার সমর্থক দল বলেন, সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন বলতে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কথাই বলা হয়েছে। শিক্ষিত বলতে প্রাচ্যবিদ্যায় পণ্ডিতদের বোঝান হয়েছে। নব্য সিভিলিয়ানগণ বললেন, সাহিত্য বলতে ইংরেজী সাহিত্য ও পণ্ডিত বলতে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের বোঝান হয়েছে। শিক্ষা সভার আনুকূল্যে দেশের আরবী ও সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তার প্রসারকে কমিটির নতুন সিভিলিয়ান সদস্যগণ মোটেই সুনজরে দেখেন নি। এই সময়ে রাজা রামমোহন রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইংরেজী শিক্ষার অনুকূলে জনমত গঠন করতে থাকেন। শিক্ষাসভার মধ্যেও ধীরে ধীরে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাবাদী দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। উভয়দলের নীতিগত পার্থক্য খুব বেশী ছিল বলে মনে হয় না। কমিটির হাতে যে সামান্য অর্থ ছিল, তা দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য কিছু করা সম্ভব বলে বিবেচিত হয় নি। দুই দলই উচ্চ শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী ছিল। 'চুঁইয়ে নামা' শিক্ষানীতি সম্পর্কেও কোনও মতভেদ ছিল না। প্রাচ্যশিক্ষার প্রতিষ্ঠান সমূহে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হ'লেও নীতিগত বিরোধ সামান্য যেটুকু ছিল তা-ও রইল না। এখন সমস্যা হ'ল শিক্ষার বাহন নিয়ে। প্রাচ্যবাদী দল সংস্কৃত ও আরবীর মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা চালু রাখতে চাইল। পাশ্চাত্ত্যবাদী দল এই 'অকেজো ও অপ্রয়োজনীয়' ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের দাবি জানাল। ১৮৩১ খৃস্টাব্দে কমিটিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যবাদী দলের সদস্য সংখ্যা সমান সমান হয়। ফলে বিরোধ অত্যন্ত তীব্র আকার ধারণ করে এবং কাজকর্মে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়। সভাপতির কাস্টিং ভোটে কাজ কোনক্রমে চালু রাখা হয়। কিন্তু কোন পক্ষের একজন সদস্য অনুপস্থিত থাকলে আগের সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে পরের সভায় তা বাতিল হয়ে যেত। এই অস্বাভাবিক অবস্থার যখন কোন রকমই পরিবর্তন হ'ল না, তখন শিক্ষাসভা বাধ্য হয়ে এই বিরোধের মীমাংসার জন্য সরকারের দ্বারস্থ হল।

১৮৩৪ খৃস্টাব্দে লর্ড মেকলে বড়লাটের পরিষদে আইন সদস্যরূপে যোগ দেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁকে শিক্ষাসভার সভাপতি পদে নিযুক্ত করেন। শিক্ষাসভার সভাপতিরূপে মেকলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিরোধে কোন অংশ গ্রহণ করেন নি। ১৮১৩ খৃস্টাব্দে সনদ আইনের শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা নিয়ে দুই দলই সরকারী মধ্যস্থতার প্রার্থনা জানায়। বিষয়টি বড়লাটের নিকট পাঠান হয়। বড়লাট আইন সদস্যরূপে মেকলের অভিমত চেয়ে পাঠান। প্রাচ্যবাদীরা বলেছিলেন—শিক্ষাধারার নির্দেশমত আইনগতভাবে সরকারী অর্থ শুধুমাত্র প্রাচ্যবিদ্যা প্রসারের জন্যই ব্যয় করা যেতে পারে। মেকলে এই শিক্ষাধারার ব্যাখ্যা উপলক্ষ্য করে ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারী তাঁর বিখ্যাত 'মিনিট' বা মন্তব্য পেশ করেন।

(৭) **মেকলের মন্তব্য**—১৮১৩ খৃস্টাব্দে সনদ আইনের শিক্ষা সম্পর্কিত বিখ্যাত

৪৩ ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মেকলে তাঁর মন্তব্যে লিখলেন, 'সাহিত্য' কথাটিতে শুধুমাত্র সংস্কৃত বা আরবী সাহিত্যকে বোঝান হয় নি। ইংরেজী সাহিত্যকেও বোঝান হয়েছে। 'শিক্ষিত ভারতীয়' বলতে শুধু সংস্কৃত পণ্ডিত বা আরবী ফারসীতে পারদর্শী মৌলবীদের বোঝায় না। যারা লকের দর্শন ও মিলটনের কবিতায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন তাঁদেরও বোঝায়। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের কাজে বড়লাট প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য যে শিক্ষাব্যবস্থাকে ভাল মনে করেন তার জন্যই অর্থব্যয় করতে পারেন। প্রাচ্যবাদীগণ বলেছিলেন প্রাচ্যবিদ্যার প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে; কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রতীক এবং জনসাধারণও এইগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। মেকলে বলেন, এগুলি কোন উপকারেই আসছে না, তাই এগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া দরকার।

(৮) **শিক্ষার মাধ্যম ও মেকলে**—শিক্ষার মাধ্যম সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন দলের মতামত বিচার করে তাঁর অভিমত উপস্থাপন করেন। শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে তিনটি মত ছিল—দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও আরবী ভাষা এবং ইংরাজী ভাষা। দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা সম্পর্কে তিনি বলেন—দেশীয় ভাষাসমূহ অত্যন্ত দীন ও ঐশ্বর্যহীন। এ ভাষার শব্দসম্পদ ভাবপ্রকাশে এত অনুপযুক্ত যে পাশ্চাত্য ভাষার জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থসমূহ দেশীয় ভাষাসমূহে অনুবাদ করা সম্ভব নয়। যে ভাষার এত দৈন্য সে ভাষা পাশ্চাত্য শিক্ষার বাহন হতে পারে না। এ সম্পর্কে পরম বিস্ময়কর বিষয় এই যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কোন দলই মাতৃভাষাকে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করেন নি। এরপর রইল সংস্কৃত, আরবী ও ইংরেজী ভাষা। মেকলে বলেন—প্রাচীন প্রাচ্য ভাষা সমূহ ইউরোপীয় ভাষাসমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্টতর ও প্রমাদপূর্ণ। তিনি দম্ভভরে বলেন, "সমস্ত ভারত ও আরবের যে সাহিত্য সম্পদ আছে ইউরোপীয় যে কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের একটি মাত্র সেল্‌ফে সে সম্পদ রয়েছে, সেই সাহিত্য সম্পদের সঙ্গে তার তুলনা করা যায়"—("A single shelf of a good European Library was worth of whole Native literature of India and Arabia.")। ইংরেজীর মত সম্পদশালী ভাষায় শিক্ষা দেবার সুযোগ যেখানে রয়েচে, সেখানে দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয় ভাষা—যে ভাষায় ইংরাজী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থরাজীর সমকক্ষ একখানি গ্রন্থও নেই সে ভাষায় শিক্ষা দেবার কোন অর্থই হয় না।

মেকলে ইংরেজী ভাষার সমর্থনে লিখলেন—ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অফুরন্ত খনি। ইংরেজী ভাষা ইউরোপীয় ভাষাসমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। এক সময় যেমন গ্রীক ও লাতিন ভাষার মাধ্যমে ইউরোপে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল, যেমন পশ্চিম ইউরোপ রাশিয়াকে সভ্য করেছিল, তেমনি ইংরেজী ভাষা ভারতে এক নতুন যুগের সৃষ্টি করবে। দেশীয় লোকেরা ইংরেজী শিখতেই চায়।

তিনি বললেন—ভারতে ইংরেজী শাসকশ্রেণীর ভাষা কিছুদিনের মধ্যেই প্রাচ্য সমুদ্রের তীরবর্তী দেশসমূহের বাণিজ্যের ভাষারূপে গৃহীত হবে। ভারতীয়দের সম্পূর্ণরূপে

ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত করে তোলা সম্ভব এবং সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টায় সেই লক্ষ্যই থাকবে। ইংরেজী শিক্ষার ফলে এদেশে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হবে—যারা বর্ণে ও রক্তেই শুধু ভারতীয় থাকবে, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি ও বুদ্ধিতে হবে ইংরেজ—"a class of persons Indian in blood and colour but English in taste, opinions and intellect।" এদের মধ্য থেকেই শিক্ষা নীচের দিকে নেমে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে।

(৯) বেন্টিংকের সিদ্ধান্ত

লর্ড বেন্টিংক প্রথম থেকেই এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। মেকলের সুপারিশসমূহ তিনি পুরোপুরি গ্রহণ করে ১৮৩৫ খৃস্টাব্দে ৭ই মার্চ কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবই ভারত সরকারের নতুন শিক্ষানীতিরূপে গৃহীত হয়।

(ক) প্রথম প্রস্তাবে বলা হয়—ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করাই সরকারী নীতির উদ্দেশ্য হবে, এবং শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট অর্থ ইংরেজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

(খ) দ্বিতীয় প্রস্তাবে বলা হয়—যতদিন এদেশের লোক প্রাচ্য বিদ্যার প্রতি অনুরক্ত থাকবে, ততদিন প্রাচ্যবিদ্যা প্রতিষ্ঠানগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হবে না। তবে এ সব প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন কোন অর্থ সাহায্য দেওয়া হবে না। এই প্রস্তাবে ভারতীয়দের কিছুটা শান্ত করবার চেষ্টা করা হয়।

(গ) তৃতীয় প্রস্তাবে বলা হয়—শিক্ষাসভা প্রাচ্য ভাষায় বই ছাপাতে যে বিপুল ব্যয়ভার বহন করেছে, তা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

(ঘ) চতুর্থ প্রস্তাবে আছে—এই সংস্কারের ফলে শিক্ষাসভার হাতে যে অর্থ উদ্বৃত্ত হবে, সেই অর্থ শুধুমাত্র ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্যই বিনিয়োগ করা হবে।

লর্ড বেন্টিংক ভারতে গভর্নর জেনারেল হয়ে আসবার পর থেকেই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি ১৮২৯ খৃস্টাব্দে এক চিঠিতে শিক্ষাসভাকে জানান—সরকারী নীতিই হচ্ছে ধীরে ধীরে সর্বক্ষেত্রে ইংরেজী চালু করা। এজন্য ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের সব রকমের প্রচেষ্টাকে সাহায্য করতে হবে। কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস, বেন্টিংকের শিক্ষানীতিকে সমর্থন জানান। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দলের বিরোধের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল, বেন্টিংক বিঘোষিত ভারত সরকারের প্রস্তাবসমূহের মধ্য দিয়ে সেই অচল অবস্থার অবসান হয়ে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রচার ও প্রসারই যে সরকারী শিক্ষানীতির লক্ষ্য, এই প্রস্তাবগুলির মাধ্যমে তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই প্রথম ঘোষণা করা হ'ল। বেন্টিংক যদি মেকলের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ না করতেন, তাহলে হয়ত ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বিলম্বিত হ'ত। সেদিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার ইতিহাসে বেন্টিংকের প্রস্তাবসমূহ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

(১০) **মেকলের সমালোচনা**—ইংরেজী শিক্ষা সম্পর্কে বিখ্যাত মন্তব্যের জন্য মেকলে সমভাবে নিন্দিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। উচ্ছ্বাসবশে অনেকে তাঁকে নতুন যুগের আলোকবর্তিকাবাহী বলে অভিনন্দিত করেছেন। আবার অনেকে ভারতীয় ভাষাসমূহের উন্নতির সম্ভাবনাকে নষ্ট করেছেন বলে তাঁকে নিন্দা করেছেন। ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে মেকলে বহু অবজ্ঞাসূচক উক্তি করেছেন। ভারতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা এবং ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির জন্য তিনি ভারতীয়দের নিকট চিরদিনই নিন্দনীয় থাকবেন। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের অসন্তোষ ও রাজনৈতিক আন্দোলনের জন্য অনেক ইংরেজ ইংরেজী শিক্ষাকে দায়ী করে অন্যায়ভাবে মেকলেকে নিন্দা করেছেন।

একটু ধীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে। অতিনিন্দা বা অতিপ্রশংসা কোনটাই তাঁর প্রাপ্য নয়। নতুন যুগের উন্নতির আলোকবর্তিকাবাহী (Torch bearer in the path of progress) বলে তাকে অভিনন্দিত করলে অতিশয়োক্তিই করা হবে। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষানীতি গ্রহণের দায়িত্ব তাঁর একার নয়, তাই নিন্দা বা প্রশংসাও তাঁর একার প্রাপ্য নয়। মেকলে এদেশে আসবার আগে থেকেই এ দেশের জনসাধারণ ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিল। রাজা রামমোহন রায় বহু পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের দাবি জানিয়েছিলেন। অর্থ ও মান দুয়ের জন্যই যে ইংরেজী শিক্ষার উপযোগিতা রয়েছে, একথা এদেশের লোক বুঝতে পেরেছিল। শিক্ষাসভার প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিরোধ মেকলে এদেশে আসবার পূবেই সৃষ্টি হয়েছিল। লর্ড বেন্টিংক এদেশে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। বোর্ডের কাছে চিঠিতে ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। বোর্ডও তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিল। এ সব বিবেচনা করে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য মেকলেকে কি করে দায়ী করা যায়? তারপর শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ছিল বড়লাটের উপর। বড়লাট পরিষদের আইন সদস্যরূপে তিনি আইনগত পরামর্শ দিয়েছিলেন মাত্র। লর্ড বেন্টিংক যদি তাঁর পরামর্শ গ্রহণ না করতেন, তাহলে তাঁর মতামত সরকারী নীতিরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত হবার প্রশ্ন উঠত না। মেকলে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত জানিয়ে বেন্টিংকের কাজের সহায়তা করেছিলেন মাত্র।

Q. 6. Write a critical note on the Young Bengal.

উত্তর। (১) **ভূমিকা**—আধুনিকতার জন্য রামমোহনের আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ সংস্কার আন্দোলন, সমাজ বিপ্লবের আন্দোলন নয়। তাঁর আত্মীয়সভা এবং ব্রাহ্মসভাও বিপ্লবাত্মক প্রকৃতির ছিল না। প্রাচীন সংস্কৃতিকে এবং মধ্যযুগীয় মূল্যবোধকে যেমন তিনি অবিমিশ্রভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান নি, তেমনি পাশ্চাত্ত্যের দাসসুলভ অনুকরণও তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি মূল্যবোধের সার্থক সংশ্লেষণ। কিন্তু একবার যখন আন্দোলন সুরুই হল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই হাজার প্রশ্নের সৃষ্টি হল। ইতিবাচক—নেতিবাচক, রক্ষণপন্থী—চরমপন্থী—উদারপন্থী নানা

প্রতিক্রিয়াও দেখা দিল। ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, শিক্ষা প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংঘর্ষ ঘটতে লাগল। সনাতনপন্থী গোষ্ঠীর কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। ডিরোজিওর কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু হিন্দু বিদ্যালয়ের বাইরে যুব বাংলার যে প্রভাব পড়েছিল, সে কথাও জানা দরকার।

উগ্রপন্থী যুব-বাংলার মন্ত্রগুরু ছিলেন ডিরোজিও, তিনি বুদ্ধিবৃত্তির স্থবিরতা এবং বন্ধ্যাত্বের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই করেছেন এবং এই আদর্শবাদ তাঁর ছাত্রদের মধ্যেও দিয়ে গেছেন। অবশ্য ডিরোজিও প্রথমাবধিই চরমপন্থী ছিলেন না। রক্ষণশীল অচলায়তনের চাপে এবং **ঘটনার গতিপথে তিনি উগ্রপন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন**। হিন্দু সমাজপতিদের হাতে ডিরোজিওর শাস্তি ভোগের ঘটনাই তাঁর শিষ্যদের অনুপ্রাণিত করেছে দেয়ালে পীঠ দিয়ে লড়াই করতে। যেভাবে হোক প্রতি-আক্রমণ করতে। যুক্তিবাদের নামে প্রতি-আক্রমণের উদ্দেশ্যে এমন সব পন্থা তারা নিলেন, যাকে যথার্থ যুক্তিবাদ বলা যায় না। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ভাষাকেই তাঁরা বেশী দরকারী মনে করলেন। তাঁদের নীতি হল কুসংস্কার এবং সনাতনী ভাবধারার সব কিছুকেই বর্জন করে পাশ্চাত্ত্যবাদকেই পুরোপুরি গ্রহণ করা। পাশ্চাত্ত্যকে গ্রহণ করতে গিয়ে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ খ্রীষ্টধর্মকেও গ্রহণ করলেন। আমাদের দেশ ও সমাজের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু পাশ্চাত্ত্য আচার আচরণেও তাঁরা অভ্যস্ত হলেন।

যুব বাংলা গোষ্ঠীর উপর প্রভাব পড়েছিল ফরাসী বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং শিল্প বিপ্লবের। হিন্দু বিদ্যালয় থেকে ডিরোজিওর বরখাস্ত হওয়ার অল্প পরেই যুব বাংলার অন্যতম নেতা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্থাপিত হয় ইংরেজিতে "The Enquirer" পত্রিকা। বাংলাতেও তাঁরা "জ্ঞানান্বেষণ" কাগজ বার করলেন। আগে আলোচিত এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশন ছাড়াও তাঁরা ১৮৩৩ সনে স্থাপন করলেন "সর্বতত্ত্ব দীপিকা সভা"। ১৮৩৫ সনে "কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্যোগ ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৮ সনের "সাধারণ জ্ঞানান্বেষণ সমিতিও" (Society for the Acquisition of General Knowledge) তাঁদেরই কাজ। ১৮৩৯ সনে তাঁরা স্থাপন করলেন "Mechanical Institute". সহজেই বোঝা যায় যে, শুধু সাহিত্য এবং ধর্ম বিষয়ের আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ না থেকে **এঁদের প্রচেষ্টা ছড়িয়ে পড়েছিল জ্ঞানক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে**। সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার তাঁরা চেয়েছিলেন বলেই পাবলিক লাইব্রেরীর জন্য আপ্রাণ পরিশ্রম করেছিলেন। এবং নিজেদের ইংরেজীয়ানা সত্ত্বেও জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে এঁরাই সর্বপ্রথম মাতৃ ভাষার দাবিকে সোচ্চারে ঘোষণা করেছিলেন। নারী মুক্তি এবং স্ত্রী-শিক্ষায় এঁদের আগ্রহ ছিল খুবই বেশী। বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেছিলেন এঁদেরই একজন সদস্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

রামমোহনের "সম্বাদ কৌমুদীর" প্রত্যুত্তরে বেরিয়েছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদ চন্দ্রিকা"। উগ্র মতবাদের অভিযোগে "এনকোয়ারার" পত্রিকারও কণ্ঠরোধ করা হলে নব্যরা এর জায়গায় বার করলেন "বেঙ্গল স্পেক্টেটর"। প্রত্যুত্তরে প্রসন্ন কুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করলেন ইংরেজিতে "The Reformer"। সরকারী বাধা এবং প্রতিবাদীদের প্রতিরোধ সত্ত্বেও এঁরা এগিয়েছিলেন।

যুব বাংলা ছিল বৃহত্তর বঙ্গ সমাজের বিদ্রোহী সন্তান। এই দলের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ (যাঁকে বাগ্মিতার জন্য বলা হ'ত বাংলার ডেমস্থিনিস), রাজনারায়ণ বসু, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত। এঁরা সকলেই ছিলেন জ্ঞানবিদ্যার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। সমাজ জীবনে কোন না কোন ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই ছিলেন সার্থক পুরুষ। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন ব্রাহ্ম, কেউ হয়েছিলেন খৃস্টান। শেষোক্তদের সামাজিক আচরণই পণ্ডিত মহলে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল।

(২) রাজনৈতিক প্রশ্নে যুববাংলা

শুধু সংবাদপত্রে প্রবন্ধ প্রকাশ করেই যুব-বাংলা দল সন্তুষ্ট থাকেন নি। তারা নানা ধরনের সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করেও জনমত গঠনের চেষ্টা করেছেন। সামাজিক প্রশ্ন ছাড়া রাজনৈতিক প্রশ্ন, বিশেষতঃ বিদেশী শাসনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধেও এঁরা প্রশ্ন তুলেছেন। ১৮৩৪-৩৫ সনে রসিককৃষ্ণ মল্লিক কোম্পানীর ১৮৩৩ সনের সনদের সমালোচনা করে এবং সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা দাবি করে প্রবন্ধ লেখেন এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতাও দেন। ১৮৩৫ সনে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কল্পিত কাহিনী লিখে হিন্দু কলেজের ছাত্র কৈলাসচন্দ্র দত্ত 'রাজদ্রোহী" হিসাবে ব্রিটিশ মহলের বিষ নজরে পড়েন। দশ বছর পরে শশীচন্দ্র দত্তও ঐ ধরনের আর একটি গল্প লেখেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই দলেরই সদস্য দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিদ্রোহের সম্ভাব্য সমর্থকদের সাথে কিছু কিছু গোপন কথাবার্তাও চালিয়েছিলেন।

এই গোষ্ঠীই দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলন করেছিলেন। "বঙ্গীয় ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির" এবং পরবর্তীকালে "ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির" মূল শক্তিও ছিল এই গোষ্ঠী। এদেশের আইন ব্যবস্থার মধ্যে বিদেশীদের বিশেষ সুযোগ সুবিধার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ক্ষেত্রেও এঁরাই ছিলেন অগ্রবর্তী। ভারত থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করে কুলি হিসাবে বিদেশে ইংরেজ মালিকদের খামার ও বাগিচায় চালান দেওয়ার বিরুদ্ধেও এঁরাই সোচ্চার হয়েছিলেন। সংক্ষেপে বলা চলে যে **জাতীয় চেতনার প্রথম বীজ রোপন করেছিলেন এঁরাই। এই গোষ্ঠীর শেষ প্রান্তের সদস্য মাইকেল মধুসূদনের কাহিনী দিয়েই এঁদের চরিত্র সম্যক বোঝা যায়।** এঁরা যেমন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অন্ধ আবেগ নিয়ে যাত্রা সুরু করেছিলেন, মাইকেল তেমনি ইংরেজিতে কাব্য সৃষ্টির স্বপ্ন নিয়েই যাত্রা সুরু করেছিলেন। এঁরাও যেমন ইংরেজ

শাসনের উদারতা সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে মোহমুক্ত হলেন, মাইকেলও তেমনি আত্মবিলাপে জর্জরিত হয়ে দেশ মাতা এবং মাতৃ ভাষার কাছেই আত্মসমর্পণ করলেন।

যুব বাংলা গোষ্ঠীর **সীমাবদ্ধতা ছিল**। এই আন্দোলন ছিল নিতান্তই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবিগোষ্ঠীর আন্দোলন। ডিরোজিও-পন্থীদের সাথে রক্ষণশীলদের যে সংগ্রাম হল, আপাতঃদৃষ্টিতে তাকে ভাষা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি সংঘর্ষ বলে মনে হ'লেও এর মূল চরিত্র ছিল পুরাতন ভূস্বামী স্বার্থ এবং নবোত্থিত মধ্যবিত্ত স্বার্থের সংঘর্ষ। এঁদের সাথে সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার সংযোগ ছিল না। তাই সাধারণ জনতার দরবারে এঁরা পৌঁছাতে পারেননি, গণ-উদ্বেলতাও সৃষ্টি করতে পারেন নি। সুতরাং বৃহত্তর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিদ্রোহী আখ্যায় চিহ্নিত এই আন্দোলনও হ'ল ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যে তীব্র আলোক এই আন্দোলন থেকে বিচ্ছুরিত হল, তাই ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে দিল। এঁদের তৈরী উত্তাপেই রক্ষণশীলতার বরফ গলতে লাগল। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যযুগীয়তার বিরুদ্ধে বর্দ্ধিষ্ণু আধুনিকতার সংগ্রামে এই সময়ের মধ্যে কোন চমকপ্রদ তাৎক্ষণিক ফলশ্রুতি হল না। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষা বিবর্তনের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ক্রমিক ফলশ্রুতি দেখা গেল।

Q. 7. Write a critical note on the Bengal Renaissance.

উত্তর। (১) **ভূমিকা**

ইউরোপীয় নবজাগরণের মতোই উনবিংশ শতকে বাংলাদেশের চিন্তা জগতে এক প্রচণ্ড আলোড়ন দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের জীবনযাত্রা ছিল যেমন সীমাবদ্ধ তেমন সংকীর্ণ। উনবিংশ শতকে ঐ অবস্থার বিরুদ্ধে গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই প্রতিক্রিয়া অবশ্য কেবলমাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর হৃতসর্বস্বতার বিরুদ্ধেই নয়, সমগ্র মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার বিরুদ্ধে।

যুক্তির বদলে অন্ধ বিশ্বাস, সামাজিক রক্ষণশীলতা, বর্ণভেদ এবং বর্ণের ভিত্তিতে নানা অবিচার, অত্যাচার, রক্ষণশীলতার ফলে নারী স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিলোপ, কুসংস্কারের প্রভাবে গঙ্গাবক্ষে শিশু বিসর্জন, সতীমরণ, পর্দা প্রথার চরম বিকাশ, পুরোহিত তন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন, বহুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন দেব-দেবীর গৌরব কীর্তন এবং দেবতাদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদের কাহিনীকে কেন্দ্র করে ভক্তদেরও বিভক্ত রাখবার অপকৌশল, পরলোক এবং পুনর্জন্মের প্রতি অন্ধ বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানের সাহায্যে জাগতিক বন্ধন মোচনের কল্পনা এবং এই অন্ধ বিশ্বাসের সাহায্যে ব্যক্তি চেতনা এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অপচয়—এই সবই ছিল মধ্যযুগীয় চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য।

মধ্যযুগীয়তার সুর ধরেই আমাদের অর্থনীতি তখনও ছিল প্রাচীন কৃষির উপর নির্ভরশীল। হাতে চালানো তাঁত, বর্ণভেদযুক্ত বৃত্তিভেদ, পশ্চাৎপদ এবং অতি প্রাচীন পদ্ধতিতে চালিত কৃষিকে অবলম্বন করে যে গ্রাম-সমাজের অস্তিত্ব ছিল, তাকেই "শাশ্বত" বলে প্রচার করে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের জয়গান করা হয়েছে। উপরতলার শাসক, জমিদার রাজকর্মচারির শাসন যেমন স্বৈরতন্ত্রী ছিল, নীচের তলায় গ্রাম প্রধানের

শাসনও ছিল স্বৈরতন্ত্রী। মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক ব্যভিচার, অন্ধ-আচার অনুষ্ঠানের দাসত্ব এবং কুসংস্কার প্রভৃতি যে সব কারণের ফলে ভারতে এবং বাংলা দেশের সমাজে স্থবিরতা এসেছিল, যে পরিবেশের ফলে সৃজনশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানের এবং শিল্পকলার বদলে প্রাচীন দর্শন, কুসংস্কার মিশ্রিত তথাকথিত "বিজ্ঞান" এবং সাহিত্য বস্তুর চর্বিত চর্বণ চলছিল, সাধারণের মধ্যে বলিষ্ঠ শিক্ষা চেতনার অভাব ঘটেছিল, ঊনবিংশ শতকে সেই অবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক জীবনের অবক্ষয়ের সাথে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং সামাজিক রক্ষণশীলতা যুক্ত হয়ে সমাজের প্রাণশক্তি শুষে নিয়েছিল। শিক্ষা সংস্কৃতির জগতে স্থবিরতাই ধ্বংসের ইঙ্গিত বহন করেছে। **এই জরাজীর্ণ সমাজকেই প্রচণ্ড আঘাত করল একটা নূতন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অর্থাৎ বাণিজ্য ও শিল্পের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ইউরোপীয় ধনতন্ত্র।** ধনতন্ত্র আঘাত করল সামন্ত-তন্ত্রের উপর। এদেশে গড়া হতে লাগল একটা নূতন বিচার ব্যবস্থা ও শাসন ব্যবস্থা। ইংরেজদের স্বার্থেই তৈরি হতে লাগল বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় আভ্যন্তরীণ স্থলপথ ও জলপথ। যে অবস্থাটি মধ্যযুগে ছিল না, সেই অবস্থা এখন সৃষ্ট হল, অর্থাৎ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থার সৃষ্টি হল। মানুষ পরস্পরের কথা জানল। পারস্পরিক সমচেতনা ও আত্মসমীক্ষার সুযোগ দেখা দিল।

নিজেদের বাস্তব জীবনের অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে অনুভূতিকে আরও বাড়িয়ে তুললো ইতিহাস জ্ঞান এবং তৎকালীন ঘটনা স্রোতের প্রভাব। ইংলণ্ডে তখন প্রবাহিত হচ্ছে উদারনৈতিক দর্শনের হাওয়া। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের কাহিনী এবং যুদ্ধে আমেরিকানদের সাফল্যই ভারতীয় উপনিবেশের ভাগ্য সম্বন্ধে সচেতনতা আনতে সাহায্য করে। ফরাসী বিপ্লব থেকে সৃষ্টি হয়েছে স্বাধীনতা ও সাম্যের ধ্যান-ধারণা। পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দর্শন-চেতনা, রাজনৈতিক ভাবাদর্শ এবং বিজ্ঞান চেতনা নিয়ে এল সামগ্রিক চিন্তাধারার পরিবর্তন। এই পরিস্থিতিতে আমাদের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক চেতনার যে পরিবর্তন এল, সেই পরিবর্তনই রূপ পেল নূতন করে ভাষা ও সাহিত্য চর্চায়, যুক্তিশীল মানসিকতায়, সমাজ-সংস্কার চিন্তায় এবং মূল্যবোধের জগতে মৌলিক পরিবর্তনে। এই পরিবর্তনকেই বলা হয়েছে নবজাগরণ। **সুতরাং মধ্যযুগীয়, সামন্ততান্ত্রিক, ঐতিহ্যবাদী ও রক্ষণশীল পশ্চাৎমুখী সমাজ থেকে আধুনিক সমাজে রূপান্তরকেই বলা চলে নবজাগরণ।**

(২) নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য—যুক্তিবাদ

নবজাগরণের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যুক্তিবাদ। যুক্তিবাদের প্রভাবেই ধর্মতত্ত্বকে নূতনভাবে অনুসন্ধান করা হয়। যে সব কুসংস্কারের আবর্জনায় হিন্দু ধর্ম আচ্ছন্ন ছিল, সযত্নে সেই জঞ্জাল সরিয়ে হিন্দু ধর্মের মূল কথাগুলো পুনরুদ্ধার করার চেষ্টাই ধর্ম সংস্কারে রূপ গ্রহণ করে। অন্ধ ধর্ম বিশ্বাস এবং ভবিতব্যবাদ থেকে মানুষকে উদ্ধার করে ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একেশ্বরবাদ প্রচার করে বহু বর্ণে এবং উপবর্ণে

বিভক্ত সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। যুক্তিবাদের প্রভাবেই মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি লাভ করে। আবার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের প্রভাবে নারীর ব্যক্তিসত্তাকেও স্বীকার করা হয়। নারী মুক্তির সপক্ষে এবং কুসংস্কারাচ্ছন্নতার মাঝে সন্তান নিধন, সতীমরণ, বাল্যবিবাহ এবং বহু বিবাহের বিরুদ্ধে মতাদর্শ গড়ে উঠতে শুরু করে।

(৩) বিজ্ঞান চেতনা

যুক্তিবাদের প্রভাবে সৃষ্টি হল **নবজাগরণের দ্বিতীয় বড় বৈশিষ্ট্য—বিজ্ঞান চেতনা**। জীবন চেতনার প্রভাবে জীবন বোধকেও নূতনভাবে বিচার করা হয়। প্রশ্নাতীতভাবে কোন কিছুকে স্বীকার না করে বিজ্ঞান চেতনার কষ্টি পাথরেই সব কিছুর মূল্য যাচাই করা হয়। এমন কি প্রাচীন শিক্ষার মূল্যও বিচার করা হয় বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্যতার মানদণ্ডেই। বিজ্ঞানের পরীক্ষিত তত্ত্ব যদি বিজ্ঞানে অগ্রসর পাশ্চাত্ত্য-ভূমি থেকেও আসে, তবু তাকে গ্রহণ করতে হবে—যদি সেই জ্ঞান আসে পাশ্চাত্ত্য ভাষার মাধ্যমে, তবে তাকেও গ্রহণ করতে বাধা নেই।

অবশ্য পাশ্চাত্ত্যের বিজ্ঞান কিম্বা উন্নত দার্শনিক তত্ত্ব গ্রহণ করলেই এ দেশের প্রাচীন জ্ঞানকে সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে, এমনও কথা নয়। প্রাচ্যের সাংস্কৃতিক সম্পদের যা কিছু এখনও মূল্যবান, সেই সম্পদকে রক্ষা করে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতির যা কিছু মূল্যবান সেইটুকু গ্রহণ করে **উভয় সংস্কৃতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনই ছিল নবজাগরণের মর্মকথা**। তাই প্রাচীন সাহিত্যের নবমূল্যায়ন শুরু হয়। পাশাপাশি সৃষ্টি হতে শুরু করে সাধারণ মানুষের নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য। আগে সাহিত্যের আঙ্গিক ছিল মূলতঃ দৈব প্রধান কিম্বা ভক্তি প্রধান পদ্য। এবার যুক্তির সার্থক বাহন হিসেবে তৈরী হল গদ্য সাহিত্য। আগে সাহিত্যের নায়ক ছিলেন দেবদেবী এবং মানুষ ছিল ভাগ্য বিড়ম্বিত ক্রীড়নক। এবার মানবিকতার প্রভাবে মানুষই হল সাহিত্যের নায়ক এবং আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন মানুষ নিজের ভাগ্যকে নিজে জয় করতে অগ্রসর হল। ব্যক্তি মানুষের মূল্যহীনতার ফলে মানুষের কোন স্বাধিকার কিম্বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মধ্যযুগীয় সমাজে ছিল না। এখন ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত হওয়ায় ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের পরিবেশ তৈরী হল।

(৪) সামাজিক পরিবর্তন

মধ্যযুগের সমাজ ছিল স্থাণুর মত। গতিহীন সমাজে উত্থান-পতন ছিল না। কিন্তু **এখন সমাজে গতি সঞ্চারিত হ'ল**। চিরাচরিত সামাজিক স্তরভেদ ভেঙ্গে সমাজ-জীবনে নূতন উত্থান-পতন সুরু হ'ল। **অষ্টাদশ শতাব্দীতে সামাজিক জীবনে যে নীতিহীনতার** বন্যা এসেছিল, **উনবিংশ শতকে** সেখানে এল এক নূতন **নীতিবোধ—রাজনীতির** ভাষায় যাকে বলা যায় বুর্জোয়া নীতিবোধ। **বস্তুতঃ** মধ্যযুগীয়তার বদলে **সমাজ জীবনে আধুনিক বুর্জোয়া ভাবাদর্শ সঞ্চারিত হওয়ার ফলেই এল বিরাট পরিবর্তন। এই ভাবাদর্শের প্রভাবেই সুরু হল আধুনিক জাতীয়তাবাদ, মানবতাবাদ এবং বিশ্ব-**

মানবতাবাদ। বিশ্বমানবতাবাদের প্রভাবেই দুনিয়ার মানুষের স্বাধীনতা—রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়লো। এভাবেই ছড়ানো হল **ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রথম ধ্যান-ধারণা।**

সমাজ জীবনে যে নূতনত্বের প্রভাবে এই আলোড়ন এল, তারই প্রভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি হওয়াও ছিল স্বাভাবিক। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে আত্মসচেতনতা ও আত্মসমীক্ষার সুযোগ হয়। ভারতীয় সমাজের সজীবতা ও দুর্বলতা সম্বন্ধেও ধারণা জন্মায়। সেই দুর্বলতা দূর করে বলিষ্ঠ সমাজ গড়বার মানসিকতা তৈরী হয়। মধ্যযুগীয় দুর্বলতা দূর করে আধুনিক ভারত তৈরি করার উদ্দেশ্যেই ইংরেজি শিক্ষার দাবি করা হয়। সুতরাং **নবজাগরণের নেতাদের পক্ষে ইংরেজী শিক্ষা দাবি করাকে ইংরেজের দাসত্ব গ্রহণ করা কিম্বা তাঁদের কাছে আত্মসমর্পণ বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক চিন্তা এবং আত্মচেতনার প্রকাশই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।**

(৫) **নবজাগরণের প্রকৃতি**

নবজাগরণের প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্প্রতিকালে কিছু বাক্-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, উনবিংশ শতকের "তথাকথিত" নবজাগরণ এমন কোন মৌলিক সামাজিক আলোড়ন কিম্বা পরিবর্তন করতে পারেনি, যা পেরেছিল ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিবাদ এবং বৈষ্ণব আন্দোলন। একথা সত্য যে **উনবিংশ শতকের আন্দোলনের উদ্যোক্তা এবং নেতা ছিলেন অল্পসংখ্যক মধ্যবিত্ত এবং তাঁরাই এই আন্দোলনের সুফল ভোগ করেছেন।** এই আন্দোলন সমাজের শিকড় স্পর্শ করে সমগ্র সমাজ জীবনকে নাড়া দিতে পারেনি। এই আন্দোলনের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় মৌলিক পরিবর্তনও তেমন কিছু ঘটে নি। সুতরাং একে নবজাগরণ আখ্যা দেওয়া যায় না। কেউ কেউ আবার এই আন্দোলনকে "জাগরণ", "নবজন্ম", "নবযুগ" প্রভৃতি নামেও চিহ্নিত করেন।

উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণ নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি, একথা আংশিক সত্য। ঐ আন্দোলন বাংলার সমাজ জীবনে কোন আমূল পরিবর্তনও আনতে পারে নি। কিন্তু এগুলি সবই আন্দোলনের দুর্বলতার পরিচয়। দুর্বলতাগুলি দিয়ে আন্দোলনের মূল চরিত্র নিরূপণ করা যায় না। মূল ভাবাদর্শের বিচারই বড় কথা।

তাছাড়া আন্দোলনের প্রকৃতি সম্বন্ধে অন্তহীন বিতণ্ডার অবতারণা করবার প্রয়োজনও নেই। ইউরোপীয় নবজাগরণের নিরিখে তুল্য মূল্য বিচার করে আমরা **এই যুগের বৈশিষ্ট্য** হিসাবে উল্লেখ করতে পারি—(১) ধর্মের যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ, (২) সাহিত্যে নূতন ভাবধারা, (৩) মানবতাবাদ এবং স্বাধীনতার স্পৃহা, (৪) অপ্রয়োজনীয় প্রাচীন জ্ঞানের বদলে প্রয়োজনীয় আধুনিক জ্ঞান আহরণ, (৫) মতাদর্শের স্বাধীনতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এমনকি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, (৬) পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার

প্রতি এবং ঐ শিক্ষার সাংস্কৃতিক ও ব্যবহারিক সুফলের প্রতি আস্থা, (৭) সমাজ সংস্কারের আগ্রহ, (৮) জাতীয় চেতনার প্রাথমিক উন্মেষ, (৯) উন্নত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশা এবং আস্থা। এই সবগুলি বৈশিষ্ট্যই শিক্ষা প্রয়াসকে প্রত্যক্ষ কিম্বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে।

কেউ কেউ এমন মন্তব্য করেছেন যে, ইংরেজদের এবং ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শেই নবজাগরণ হয়েছিল। একথাটিও সর্বৈব সত্য নয়। **জাতির আভ্যন্তরীণ জীবনে কোন অন্তর্নিহিত চাঞ্চল্য সৃষ্টি না হলে বাইরে থেকে হাতুড়ির ঘায়েই প্রাণ চাঞ্চল্য আসে না।** বস্তুতঃ মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ যুগ থেকেই বাংলার জীবনে এমন কিছু ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটছিল যার প্রভাবে আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের মত নিজে থেকেই হয়তো সমাজ বিপ্লব ঘটতো, অর্থনৈতিক পরিবর্তন আসতো। অবশ্য তেমনটি হত সময় সাপেক্ষভাবে, ধীর গতিতে। আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি অর্থনীতির প্রভাব সেই পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করে একটি আন্দোলনের রূপ দেয়।

তাই দেখা যায় সুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন নেতারা প্রাচ্যের অতীত গৌরবকে অস্বীকার করেন নি, আবার পাশ্চাত্ত্যের নূতন ভাবধারাকেও বর্জন করেননি। তাঁদের লক্ষ্য ছিল প্রাচ্যের সর্বোত্তম ঐতিহ্যের সাথে পাশ্চাত্ত্যের সর্বোত্তম অবদানের সংমিশ্রণে একটা সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে তোলা। **অপর দিকে এই আন্দোলন ছিল সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীব্যাপী আন্দোলন।** এই দীর্ঘ দিনের আন্দোলনে প্রয়োজন অনুসারে তার রূপের কিছু কিছু পরিবর্তন হ'লেও তার মৌলিক পদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

(৬) উপসংহার

জাতীয় জীবনের এক সঙ্কটময় মুহূর্তে বাংলাদেশের নবজাগরণ সর্বক্ষেত্রে এক গভীর ও সুদূর প্রসারী পরিবর্তনের বাণী বহন করে আনে। তবে এই নবজাগরণ কোন এক ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টায় এসেছিল তা বলা যায় না। কোন একটি ঘটনা বা কোন একটি নির্দিষ্ট ভাবাদর্শ বা কোন এক ব্যক্তিকে নবজাগরণের কারণ বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করলে তা ভুল হবে। অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে নানা ঘটনাপ্রবাহ, বিভিন্ন চিন্তাধারায় এবং দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চরিত্রের কিছু ব্যক্তির চেষ্টায় বাঙ্গালী উনবিংশ শতাব্দীতে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। বহুদিনের জড়তা, চিন্তাহীনতা, অন্ধবিশ্বাস, সংকীর্ণতা, কুসংস্কারের বেড়াজালকে ছিন্ন করে মানবিকতা, যুক্তিবাদ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসার ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদির অনুবাদের মাধ্যমে জাতীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা, ধর্মের ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদের প্রচলন, নতুন চিন্তাধারাকে প্রকাশ করতে গদ্য ভাষার প্রবর্তন, উপন্যাস, গীতি কবিতার শুরু, জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের উদ্বোধন প্রভৃতির মধ্যে নবজাগরণ আত্মপ্রকাশ করল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আরও অনেকের মধ্যে দিয়ে

রেনেসাঁস মূর্ত হয়ে উঠল। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি সকল ক্ষেত্রে বাংলা দেশ বিশ্বচেতনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠল।

Q. 8. Give a brief sketch of the life and works of Raja Rammohan Roy.

উত্তর। (১) **পটভূমি**

মুসলিম শাসনের অবসান ও ইংরেজ শাসনের প্রবর্তন—এই যুগটিকে বলা হয় আমাদের জাতীয় জীবনের সার্বিক অবক্ষয়ের যুগ। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় যে দিকেই দৃষ্টি দিই না কেন, আমাদের সামনে ভেসে ওঠে একটি হতাশার চিত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতের শিক্ষাসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তনের সূচনা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়ে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ও পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে সামাজিক রূপান্তর ও উদার ধর্মমতের প্রবর্তন আমাদের সমাজ জীবনে ও ধর্মক্ষেত্রে এক যুগান্তর আনে।

(২) **আবির্ভাব ও প্রস্তুতি**

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বাংলায় যে নবজাগরণের সূচনা হয়, সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে রাজা রামমোহনের আবির্ভাব। রামমোহনের চিন্তাধারার মধ্যে পাই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের আশ্বাস। উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে তিনি নবজাগরণের অন্যতম চিন্তানায়ক। তিনি ছিলেন আধুনিক ভারতের স্রষ্টা ও প্রথম রূপকার। কৈশোর পার হয়েই তিনি প্রচলিত সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যার জন্য পিতার সঙ্গে মতান্তরের ফলে তাঁকে গৃহত্যাগ করতে হয়। প্রায় চার বছর সারা ভারত তিনি পরিভ্রমণ করেন। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার, রীতিনীতি সম্পর্কে অপরিসীম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পরবর্তী সংগ্রামী জীবনে এই সঞ্চয় ছিল মূল্যবান সম্পদ।

হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমায় রাধানগর গ্রামে এক বিত্তবান অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে ১৭৭২ খৃস্টাব্দ (মতান্তরে ১৭৭৪ খৃস্টাব্দ) রামমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম রামকান্ত রায়, মায়ের নাম তারিণী দেবী। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করেই রামমোহন মৌলবীর নিকট ফার্সী শেখেন। এরপর তিনি পাটনায় যান আরবী ভাষা শিখতে। পাটনায় থাকাকালীন কোরান পাঠ করেন ও সুফীদের দার্শনিক মতবাদের সঙ্গে পরিচিত ও গভীরভাবে আকৃষ্ট হন। গৃহে ফিরে পিতার সঙ্গে মতবিরোধের ফলে গৃহত্যাগ করেন। এই সময় পরিভ্রমণকালে তিনি তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিব্বতে লামাদের বিরাগভাজন হলে তাঁর জীবন বিপন্ন হয়। কয়েকজন তিব্বতী মহিলার সাহায্যে তিনি পালিয়ে প্রাণ বাঁচান। কথিত

আছে এজন্য তিনি চিরদিন এই দয়ার কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মনে রেখেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি নারীমুক্তির একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন। রামমোহনের তিব্বত পরিভ্রমণ কতটা কাহিনী আর কতটা ইতিহাস, সে সম্পর্কে কেহ কেহ সংশয় প্রকাশ করেন। পরিভ্রমণের শেষ পর্বে তিনি বারানসীতে অবস্থান করেন। এখানে তিনি সংস্কৃত পড়েন এবং হিন্দুদের প্রাচীন পবিত্র শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি পাঠ করেন।

জীবিকা উপার্জনের প্রয়োজনে তিনি সম্ভবত ১৭৯৭ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮০২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতায় ছিলেন। পরের বছর পিতার মৃত্যুর পর তিনি মুর্শিদাবাদে যান, এখান থেকে তার প্রথম গ্রন্থ "তুহাফতুঅল-মুওয়াহ্-হিদীন" "একেশ্বরবাদীদের প্রতি উৎসর্গ" প্রকাশিত হয়। পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের প্রতিষ্ঠায় সুদীর্ঘ সংগ্রামের প্রস্তুতিপর্ব সূচিত হয় এই পুস্তক প্রকাশনের মধ্য দিয়ে।

তারপর রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ববিভাগের চাকরি নেন। ১৮০৫ খৃস্টাব্দে তিনি জন ডিগবীর অধীনে নিয়োজিত হন। ডিগবীর সেরেস্তাদার হয়ে তিনি রংপুর যান। ১৮০৯ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রংপুরে ছিলেন। সেখানে থাকাকালীন তিনি হিন্দু, মুসলিম, জৈন জ্ঞানী পণ্ডিতদের সংস্পর্শে আসেন। হরিহরানন্দ তীর্থস্বামীর কাছে তন্ত্র শাস্ত্রে পাঠ নেন। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ কল্পসূত্র পাঠ করেন। ডিগবীর সাথে কাজ করবার সময় তিনি ইংরেজী শেখেন এবং ইংরেজী ভাষায় সুপণ্ডিত হয়ে ওঠেন। মূল বাইবেল পড়ার জন্য তিনি গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শেখেন। এভাবে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান ও খৃস্টান প্রভৃতি সকল ধর্মের সঙ্গে পরিচিত হন। সব ধর্ম গভীরভাবে অনুশীলন করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, সব ধর্মই মূলতঃ একেশ্বরবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এভাবে জীবনের প্রস্তুতিপর্ব শেষ করে এর পরের পর্ব 'নবজাগরণের অগ্রদূত' রূপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

১৮১৪ খৃস্টাব্দে রামমোহন কোম্পানীর চাকরি ত্যাগ করেন। পরের বছর তিনি স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করতে থাকেন।

(৩) ধর্ম সংস্কার

রামমোহন যখন রংপুরে ছিলেন, সেখানে তাঁর বাড়ীতে স্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে ধর্মীয় আলোচনা করতেন। সেই আলোচনায় হিন্দুদের পৌত্তলিকতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার প্রভৃতির বিরুদ্ধে তাঁর মতবাদ স্থানীয় রক্ষণশীল হিন্দুদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে। হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর মতবাদের প্রতিবাদে সেখানে একটি দলও গড়ে ওঠে। কলকাতায় এসে হিন্দুদের আড়ম্বর ও আচার-অনুষ্ঠানসর্বস্ব ধর্মীয় অনুষ্ঠান, পৌত্তলিকতা, বহু দেবদেবীতে বিশ্বাস প্রভৃতির বিরুদ্ধে "একেশ্বরবাদ" প্রচারে ব্রতী হন। হিন্দু সমাজের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর করার উদ্দেশ্যে ধর্মীয় আলোচনার জন্য কলকাতায় ১৮১৫ খৃস্টাব্দে আত্মীয়সভার প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহনের উদার মতাদর্শের অনুরাগী কলকাতার অভিজাত শ্রেণীর একটা অংশ ও প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রভাবশালী কিছু ব্যক্তি প্রতি সপ্তাহে একদিন আত্মীয়সভার আলোচনায় যোগ দিতেন। হিন্দু-

শাস্ত্র থেকে পাঠ ও ধর্মীয় সংগীত গীত হ'ত। সভায় মূর্তি পূজা, জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বহু ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। আত্মীয়সভা পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসভারই পূর্বসূরী।

হিন্দু ধর্মের পৌত্তলিকতা ও যাগযজ্ঞ পরিত্যাগের ফলে রামমোহন হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের প্রচণ্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। নিজের ধর্মমতকে দৃঢ়ভিত্তির ওপর স্থাপনের জন্য ও হিন্দু সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করবার জন্য তিনি হিন্দুধর্মশাস্ত্রসমূহ অনুবাদ শুরু করেন। ১৮১৫ খৃস্টাব্দ থেকে ১৮১৯ খৃস্টাব্দ মধ্যে বেদান্তসূত্র ও ঈশ, কেন, কঠো, মাণ্ডক্য প্রভৃতি উপনিষদের ব্যাখ্যা করে একেশ্বরবাদ যে উপনিষদের তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রমাণ করেন। বেদ-উপনিষদের পাঠ ও আলোচনা তখন সাধারণ পণ্ডিতদের মধ্যে ছিল না। প্রাচীন শাস্ত্রীয় গ্রন্থসমূহের পাঠ ও আলোচনা রামমোহনের জন্যই নতুন করে শুরু হয়েছিল। ১৮২৫ খৃস্টাব্দে তিনি বেদান্ত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল অদ্বৈতবাদের প্রচার। এখানে ছাত্রদের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান দর্শনের সঙ্গে বেদান্তদর্শন শিক্ষা দেওয়া হত। বিদ্যালয়টি বেশী দিন স্থায়ী হয় নি।

রামমোহনের ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টার পরিণতি লাভ করে ব্রাহ্মসভা প্রতিষ্ঠার মধ্যে। তিনি ১৮২৮ খৃস্টাব্দে ২০শে আগস্ট ব্রাহ্মসভা বা ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রাহ্ম সমাজের নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয় ১৮৩০ খৃস্টাব্দে এবং একটি অছি পরিষদের হাতে গৃহটি ন্যস্ত হয়। রামমোহন এই উপলক্ষে যে Trust deed তৈরী করেন, সেখানে তিনি নির্দেশ দেন "The building was to be used as and for a place of public meeting of all sorts of descriptions of people, without distinction for the worship of one Great God, but no image should be admitted or rituals permitted there in." চিরজীবন একেশ্বরবাদের প্রবক্তা হয়েও রামমোহন এক জায়গায় বলেছেন ধর্মীয় সাধনার পথে যাঁরা নীচস্তরে আছেন, তাঁদের পক্ষে নিরাকার পরমব্রহ্মের ধারণা করা সম্ভব নয়, মূর্তিপূজা তাদের জন্য।—"and admitted that image worship was intended for people of lower religious standards i.e. for those who are incapable of elevating their minds to the idea of an invisible Supreme Being".

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য রামমোহন যখন হিন্দুদের বহু দেব দেবী ও মূর্তিপূজার বিরোধিতার জন্য রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত, সেই সময় ১৮২০ খ্রীঃ The Precepts of Jesus : The Guide to Peace and Happiness নামে একখানা পুস্তিকা রচনার জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বিতর্কে জড়িত হয়ে পড়েন। বইটি লিখবার পূর্বে তিনি সযত্নে সমগ্র বাইবেল পড়েন। এজন্য তিনি গ্রীক ও হিব্রু ভাষা শেখেন। খৃস্টের প্রচারিত বাণীতে রামমোহন বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে এই বইখানি লেখেন। বইটিতে খৃষ্টধর্মের উদার ব্যাখ্যা শ্রীরামপুরের মিশনারীদের পছন্দ হয় নি। মিশনারীরা রুষ্ট হয়ে ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া ও সমাচার দর্পণ পত্রিকায় রামমোহন ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ চালিয়ে অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

(৪) সমাজ সংস্কার ও নারীমুক্তি আন্দোলন

রামমোহন শুধু মাত্র একজন ধর্ম সংস্কারকই ছিলেন না, সমাজের বহুবিধ অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাঁর কণ্ঠেই প্রথম ধ্বনিত হয়। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের তিনি একজন পথিকৃৎ। তিনি লক্ষ্য করেন, আমাদের সমাজে নারীরাই সবচেয়ে অবহেলিত। বহু অন্যায় ও অমানুষিক বিধানকে শাস্ত্রীয় নির্দেশ বলে তাঁদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যে যুগে নারী স্বাধীনতার বা নারীমুক্তি আন্দোলনের কথা কেউ কল্পনাও করতে পারতেন না, সে সময় নারীদের প্রতি অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে রামমোহন সোচ্চার হয়ে ওঠেন। উদারশীল হিন্দুদের দাবীতে লর্ড উইলিয়ম বেন্টিক সতীদাহ প্রথা নিবারণে উদ্যোগী হলে তৎকালীন রক্ষণশীল সমাজ প্রতিবাদের ঝড় তোলেন। তখন রামমোহন দৃঢ়ভাবে বেন্টিঙ্কের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। রামমোহনের সক্রিয় সহযোগিতা না পেলে সতীদাহের মত অমানুষিক প্রথা বেন্টিক বন্ধ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। রামমোহন সমাজের বহু বিবাহ ও বাল্য বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু বিধবারা যাতে সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করেন, তিনি সেজন্যও চেষ্টা করেছিলেন। ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরে এসে তিনি বিধবা বিবাহে সচেষ্ট হবেন, এ ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। ইংলণ্ডে মৃত্যু হওয়ায় তাঁর এ ইচ্ছা আর পূর্ণ হয় নি। রামমোহন জাতিভেদ প্রথার কুফলের নিন্দা করেন। তিনি জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে লেখা মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ "বজ্রসূচী"র অনুবাদ প্রকাশ করেন।

(৫) সাংবাদিক রামমোহন

সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রামমোহন অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর আগে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুর মিশনারীরা দিগ্‌দর্শন (মাসিক পত্রিকা) ও সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক) ১৮১৮ খ্রীঃ প্রকাশ করেন। কিন্তু ভারতীয় সাংবাদিকতার আদর্শ কি হওয়া উচিত, সেই দৃষ্টান্ত আমরা পাই রামমোহন প্রতিষ্ঠিত 'সম্বাদ কৌমুদী'তে। উনবিংশ শতাব্দীতে কোন মতবাদ বা ভাবাদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার বিশেষ কার্যকরী মাধ্যম ছিল সংবাদপত্র। রামমোহনের নেতৃত্বে যে সব সংস্কার আন্দোলন প্রবর্তিত হল—সমাজে, ধর্মক্ষেত্রে, শিক্ষায়, অর্থনীতিতে, রাজনীতিতে তাঁকে অনুসরণ করে দেশে যে সংস্কার ও মুক্ত মতাদর্শের জোয়ার এল, সেই মনোভাবের বাহক হিসাবে একটি উদার ও প্রগতিশীল সংবাদপত্রের প্রয়োজন ছিল। বাংলা সাপ্তাহিক 'সম্বাদ কৌমুদী'র সম্পাদকরূপে তিনি সে অভাব পূর্ণ করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর রামমোহনের সম্পাদনায় 'সম্বাদ কৌমুদী' প্রকাশিত হয়। পত্রের মুখ্য লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের কল্যাণ। তাঁর পত্রিকায় ধর্মীয়, নৈতিক ও রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা এবং আভ্যন্তরীণ স্থানীয় ও বৈদেশিক নানাবিধ সংবাদ প্রকাশ করা হ'ত। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে রামমোহন ফরাসী ভাষায় 'মিরাট উল-আখবর' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের আক্রমণের হাত থেকে হিন্দু একেশ্বরবাদ ও বেদান্তকে বাঁচাবার জন্য রামমোহন দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন: বাংলায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও ইংরেজীতে Brahminical Magazine.

ভারতীয় সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ করতে তিনিই এগিয়ে আসেন। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে প্রেস অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে তিনি-ই প্রথমে সুপ্রীম কোর্ট পরে প্রিভি কাউন্সিলে আবেদন করেন। তাঁর আবেদন অগ্রাহ্য হলে সরকারী দমননীতির প্রতিবাদে তিনি মিরাট উল-আখবরের প্রকাশ বন্ধ করে দেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণে সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এটাই প্রথম প্রতিবাদ।

(৬) অন্যান্য সংস্কার আন্দোলন

রামমোহন শাসন ব্যবস্থায় কতকগুলি সংস্কারের দাবি করেন। তিনি চেয়েছিলেন আদালতে ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী ভাষার প্রবর্তন হোক; জুরির সাহায্যে বিচার হোক; শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক হোক এবং ফৌজদারী আইন সমূহ বিধিবদ্ধ হোক। সেনাবাহিনী ভারতীয়করণের দাবিও তিনি করেছিলেন। ভারতবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য রামমোহন অবিশ্রাম কাজ করে গিয়েছেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নুনের ব্যবসার বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের পার্লামেন্টারী কমিটিকে তিনি জানিয়েছিলেন, "কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ। জমিদারের অর্থলিপ্সা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার শিকার তারা"। ভারতের অর্থনীতিতে যে বৃটিশ শাসক পরম্পরায় শোষণ চালাচ্ছে, প্রথম রামমোহনই তার দিকে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

৭) বাংলা গদ্যের লেখক রামমোহন

রামমোহনের বহুমুখী কর্মোদ্যমের মধ্যে সাহিত্যচর্চা অন্যতম ছিল। তিনি তাঁর সমাজসংস্কার ও প্রগতিমূলক চিন্তাধারাকে ভাষায় রূপ দেবার জন্যই সাহিত্যসেবায় ব্রতী হন। তিনি নিজমত প্রতিষ্ঠার আগ্রহে সেই যুগের গদ্যের আড়ষ্ট ও গঠন সৌষ্ঠবের বাধাকে অতিক্রম করে নিজ ব্যক্তিত্বকে পরিস্ফুট করতে বাংলা ভাষাকে উন্নততর রূপ দেন। তাঁর গদ্য শ্রুতিমধুর না হলেও তিনি শক্তিধর লেখক ছিলেন যা তাঁর ভাষার শক্তি ও আকর্ষণীয়তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। তাঁর যুক্তিনিষ্ঠ মনের প্রকাশ তাঁর সুসংবদ্ধ লেখার মধ্যে খুঁজে পাই। "বাংলা সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম লেখক যিনি আধুনিক অনুশীলিত মন লইয়া গদ্য রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহার গদ্য ললিত-মধুর না হইলেও মননদীপ্ত ও ভাবের সমুন্নতিতে মর্যাদাময়।"

(৮) শিক্ষাবিস্তার প্রচেষ্টা

ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের সপক্ষে রামমোহন ছিলেন একজন প্রধান প্রবক্তা। বিজ্ঞানশিক্ষা প্রসারলাভ করলে কুসংস্কার দূর হবে এবং বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার ফলে ভারতবর্ষও ইউরোপের মত প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য ভারতীয়দের সুশিক্ষিত করে তুলতে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলবার পরিকল্পনা তিনি ও ডেভিড হেয়ারই প্রথম চেয়েছিলেন। এই পরিকল্পনা থেকেই সৃষ্টি হয় হিন্দু কলেজের। তৎকালীন হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলদের বাধায় তাঁকে হিন্দু কলেজের

পরিচালক সমিতিতে নেওয়া হয়নি। তবুও এই উদারচেতা পুরুষ দূর থেকে তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ নিতে দেখে সুখী হয়েছিলেন।

হিন্দু ছেলেদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য রামমোহন সুঁড়ি পাড়ায় একটি স্কুল খোলেন। এই স্কুলটিই ১৮২২ খ্রীঃ আনুষ্ঠানিকভাবে 'এ্যাংলো হিন্দু স্কুল' নামে পরিচিত হয়। এই বিদ্যালয়টি ছিল অবৈতনিক। ছাত্রদের মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অন্যতম। স্কুলে পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হ'ত। বেদান্ত দর্শন ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষা দেবার জন্য ১৮২৫ খ্রীঃ বেদান্ত কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা আগে উল্লেখ করেছি।

(৯) রামমোহনের শিক্ষাচিন্তা

রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার নানাদিক সম্পর্কে এখানে উল্লেখ করা হলেও আমরা এখানে প্রধানতঃ শিক্ষানুরাগী রামমোহনের বিশেষভাবে আলোচনা করতে চাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে প্রাচীন সভ্যতার বুকে প্রাণবেগের সঞ্চারের জন্য যাঁরা সচেষ্ট হয়েছিলেন, রামমোহন তাঁদের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর প্রচেষ্টার বিশেষ তাৎপর্য এই যে, তিনি ছিলেন সংস্কৃতের প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ভারতের প্রাচীন ধর্মদর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল। প্রাচীন ভারতের সবকিছুকে যাঁরা অশ্রদ্ধার চোখে দেখতেন, তিনি তাঁদের দলে ছিলেন না। তিনি বুঝেছিলেন, এই প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারাকে পুনরুজ্জীবিত করতে হ'লে, এর বুকে গতির সৃষ্টি করতে হলে, পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারার সঙ্গে তার যোগসাধন করতেই হবে। তাই তিনি একদিকে যেমন বেদান্ত মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন, আবার তেমনি অন্যদিকে এ্যাংলো হিন্দুস্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহন বুঝেছিলেন যে, প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে শত শত বছরের ঘুম থেকে এ জাতকে জাগাতে পারা যাবে না। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে হবে। প্রয়োজন যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক শিক্ষাব্যবস্থার। যার ফলে ভারতবর্ষ বিশ্বসভায় তার যোগ্য স্থান নিতে পারবে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যখন প্রচলিত ধারার অনুসরণে হিন্দু পণ্ডিতদের পরিচালনায় সংস্কৃত কলেজ খুলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তখন রামমেহেন ১৮২৩ খ্রীঃ ১২ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্টকে এক পত্র লিখে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তিনি চেয়েছিলেন গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা ও সামান্য প্রাকৃতিক বিদ্যা পড়ানো হোক। তিনি লর্ড আমহার্স্টকে লিখেছিলেন, "যে জাতির শিক্ষা ভারতবর্ষে চলছে, তাই দেখার জন্যই সরকার একটি সংস্কৃত বিদ্যালয় খুলছেন। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান (লর্ড বেকনের আগে যে জাতীয় স্কুল ইউরোপে ছিল) তরুণ যুবকদের মন ব্যাকরণের সূক্ষ্ম তত্ত্বে আর দার্শনিক শ্রেণীভেদে বোঝাই করে দেবে—সমাজে তা কোন কাজেই আসবে না। দু' হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে যা শেখানো হ'ত, ছেলেরা তাই শিখবে। উপরন্তু দার্শনিকদের অর্থহীন অন্তঃসারশূন্য সূক্ষ্মতা-চর্চা চলবে, সারা ভারতে এখনও তো তা চলছে; ইংরেজ জাতকে যদি চিরকালের মতো অজ্ঞ করে রাখার মতলব থাকত, তাহলে কি অজ্ঞতা-প্রসারী

স্কুলমেনদের শিক্ষাকে সরিয়ে বেকনের দর্শনকে জায়গা দেওয়া হত। বৃটিশ শাসনের যদি দেশব্যাপী অজ্ঞতা-বিস্তারই নীতি হয়, তাহলে সংস্কৃত পদ্ধতির শিক্ষা-ব্যবস্থাই সে কাজের সবচেয়ে উপযোগী। "জনসাধারণের উন্নতি যখন সরকারের উদ্দেশ্য, তখন আরও উন্নত ও প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রচার করা দরকার। যাতে গণিত, প্রাকৃতবিদ্যা, দর্শন, রসায়ন, দেহতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান পঠন-পাঠন চলতে পারবে। যে টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব হয়েছে, তা দিয়ে ইউরোপের শিক্ষিত কয়েকজন গুণী ও ক্ষমতাবান ভদ্রলোককে নিয়োগ করে প্রয়োজনীয় বই ও যন্ত্রপাতি সহযোগে একটি কলেজ গড়ে তোলা যেতে পারে।"

এই ঐতিহাসিক পত্রের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করা যায়—রামমোহন লিখেছিলেন—"The pupils will have to acquire what was known two thousand years ago, with the addition of vain and empty subtletics…" "The Sanskrit system of education," continues the document, "would be the best calculated to keep this country in darkness if such had been the policy of the British legislature : But as the improvement of the native population is the object of the Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction, embracing mathematics, natural philosophy, chemistry and anatomy, with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed, by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe, and providing a college furnished with the necessary books, instruments and other apparatus."

(১০) মূল্যায়ন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে অসীম শক্তিশালী রামমোহনের চিন্তা ও চরিত্র সমাজের অভ্যস্ত জড়ত্বের ওপর বারবার আঘাত হেনে এক নবজীবনের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। ধর্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে অধঃপতিত জাতিকে টেনে তুলবার জন্য রামমোহন সমস্ত প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়ে যে কি অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করেছিলেন আজকের দিনে তা ধারণা করা কঠিন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে হয়, "তিনি কি না করেছিলেন? শিক্ষা বল, রাজনীতি বল, বঙ্গভাষা বল, বঙ্গসাহিত্য বল, ধর্ম বল, সমাজ বল, বঙ্গসমাজের যেকোন বিভাগে উত্তরোত্তর যতই উন্নতি হইতেছে, কেবল তাঁহারই হস্তাক্ষর নতুন নতুন পৃষ্ঠায় উত্তরোত্তর পরিস্ফুটতর হইয়া উঠিতেছে মাত্র।"

তৎকালীন বঙ্গসমাজে রামমোহনের প্রতিভা, সুগভীর দেশপ্রেম উপলব্ধি করবার লোক অতি অল্পই ছিল। সেই অল্পসংখ্যক অনুরাগী সহচর নিয়ে তিনি কুসংস্কার, অর্থহীন প্রথা, প্রাণহীন আচার প্রভৃতির বিরুদ্ধে নির্মম হয়ে সংগ্রামের সূচনা

করেছিলেন। মূর্তিপূজার বা জাতিভেদের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন অপেক্ষা সহমরণ প্রথার কদর্য নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন রক্ষণশীল হিন্দু সমাজকে অত্যন্ত চঞ্চল করে তুলেছিল। রামমোহনের চেষ্টায় সতীদাহ নিবারিত হওয়ায় হিন্দু সমাজের ললাট থেকে একটি দুরপনেয় কলঙ্করেখা মুছে গেল।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার জোয়ার একটি প্রাচীন ধর্ম; সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভেসে যাতে না যায়, যুগোপযোগী উপায় অবলম্বন করে সুপ্রাচীন জাতীয় আদর্শ রক্ষা করে জীবন সংগ্রামে আসতে পারে, সেই মহৎ উদ্দেশ্যের প্রেরণায় রামমোহন অদ্বৈতবাদের ভিত্তির ওপরে সংস্কার সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ করে যেতে পারেন নি। দেশের দুর্ভাগ্য তিনি ইংলণ্ড থেকে দেশে ফিরে আসতে পারেন নি।

রামমোহনের কর্মময় জীবনের পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, জ্ঞানান্বেষণের স্বাধীনতা, বিজ্ঞানের জন্য আগ্রহ, বিস্তৃত মানবিক সমবেদনার মনোভঙ্গি, তাঁর বিশুদ্ধ ও বিশিষ্ট নীতিবোধ, অতীতের জন্য বিচারশীল শ্রদ্ধা প্রভৃতির তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

"এ এক আশ্চর্য ব্যাপার যে, সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার তমসাচ্ছন্ন যুগে যখন দেশবাসী তাঁকে চিনতে পারেনি, সেই যুগে রামমোহন এমন এক উন্নত মানের অর্ঘ্য তাঁর দেশবাসীর জন্য বহন করে আনলেন, যার উদার সহানুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষার মিলন ঘটেছিল। বিভিন্ন সংস্কৃতির যে সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে সভ্যতার এক-একটি বিরাট তরঙ্গের উদ্ভব হয়েছে, সেই সমন্বয়ের জন্য এই মন সদাই উন্মুক্ত ছিল। বিচিত্র দাবি ও কর্মবহুল বর্তমান যুগের চিত্র তাঁর মনশ্চক্ষে স্পষ্ট উদ্ভাসিত হয়েছিল, এবং আপন মানস সম্বন্ধে অবচেতন যুগের কাছে তিনিই সেই চিত্র তুলে ধরেছিলেন।"

Q. 10. "The Despatch of 1854 is a land mark in the history of Indian Education"—Discuss.

উত্তর। (১) উডের ডেসপ্যাচ, ১৮৫৪

১৮১৩ সালের সনদ আইনের পর থেকে ভারতবর্ষের শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার উন্নয়নের জন্য নানাপ্রকারের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছিল এবং শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি নিয়ে অসংখ্য নীতি ও বিচ্ছিন্ন মতবাদ দেখা দিয়েছিল। এর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হ'ল যার ফলে ঐ সব বিভিন্ন শিক্ষানীতির মূল্য ও কার্যকারিতা বিচার করার প্রয়োজন দেখা দিল। সেজন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদ আইন পুনরায় প্রবর্তিত করার সময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার আনুপূর্বিক তথ্যানুসন্ধানের নির্দেশ দেন। এর ফলে ১৮৫৪ সালে একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুদীর্ঘ শিক্ষার দলিল (Educational Despatch) প্রকাশিত হয়। সম্ভবতঃ তদানীন্তন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট চার্লস উডের পরামর্শ মত এই মূল্যবান শিক্ষার দলিল প্রণয়ন করা হয়েছিল বলেই এটি উডের ডেসপ্যাচ (Wood's Despatch) নামে পরিচিত। ভারতের ইতিহাসে শিক্ষাসংক্রান্ত যতগুলি

নির্দেশ বা দলিল ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল এটি যে, সেগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং পরবর্তীকালে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যত পরিবর্তন ও সংস্কার করা হয় সব কিছুর মূলে এই উডের ডেসপ্যাচের কিছু না কিছু প্রভাব ছিল। একথা এখন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে ভারত স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত এবং তার পরেও এদেশে যে শিক্ষাব্যবস্থা চলে আসছে তার ভিত্তি রচনা করেছিল এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ শিক্ষার দলিলখানি।

(২) শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য

এই ডেসপ্যাচের প্রারম্ভেই বলা হয়েছে যে, ভারতে সাধ্যমত শিক্ষাবিস্তার করা হ'ল ইংলণ্ডের একটি পবিত্র কর্তব্য। ভারতে ইংরাজদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হ'ল ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে ভারতবাসীরা যাতে কার্যকর শিক্ষালাভ করে এবং তা থেকে অতুল পার্থিব ও নৈতিক ফললাভ করতে পারে।

ভারতবাসীদের জ্ঞানমূলক যোগ্যতা বাড়ানোই কেবলমাত্র এদেশে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য নয়, তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন করাও একটি বড় লক্ষ্য। তাছাড়া এই শিক্ষা ব্যবস্থা ভারতবাসীদের শ্রম ও পুঁজির বিনিয়োগ করতে শেখাবে এবং তাদের বিরাট সম্পদের উন্নয়ন করে ঐশ্বর্য ও বাণিজ্যের প্রসার করতে সাহায্য করবে। সেই সঙ্গে ইংলণ্ডের উৎপাদনশিল্পের জন্য নানারকম মাল-মশলা সরবরাহেরও ব্যবস্থা হবে এবং ভারতে ইংলণ্ডের উৎপন্ন বস্তুর চাহিদা বাড়বে।

(৩) প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দ্বন্দ্ব

ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাচ্যপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছিল সেই সম্পর্কে মেকলের সিদ্ধান্তটিই উডের ডেসপ্যাচে মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। ডেচপ্যাচে অবশ্য মেকলের মত তীব্র ভাষায় প্রাচ্যশিক্ষার নিন্দা করা হয় নি। বরং বলা হয়েছে যে প্রাচ্য ভাষাশিক্ষার একটি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য আছে। তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমানদের আইন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্যও প্রাচ্য শিক্ষার দরকার। কিন্তু তা সত্ত্বেও ডেসপ্যাচে প্রাচ্য দর্শন ও বিজ্ঞানকে গুরুতরভাবে ত্রুটিপূর্ণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্য জ্ঞানের বিস্তারই সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

(৪) শিক্ষার ভাষামাধ্যম

এই ডেসপ্যাচে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, ভারতে সুষম শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত করতে হলে ইংরাজী ভাষা ও ভারতীয় ভাষার সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই তা হতে পারে। এ থেকে অবশ্য প্রমাণিত হয় যে ভারতীয় ভাষার দাবীকে উডের ডেসপ্যাচে সুস্পষ্টই মেনে নেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের সপক্ষে স্পষ্ট অভিমত ডেসপ্যাচে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় ডেসপ্যাচের এই মূল্যবান নির্দেশটি শিক্ষা-কর্তৃপক্ষ সে সময় সম্পূর্ণ অবহেলা করেছিলেন।

(৫) শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠা

ডেসপ্যাচের একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ হল যে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, উত্তরপ্রদেশ পাঞ্জাব এই পাঁচটি স্থানে একটি পৃথক শিক্ষাবিভাগ স্থাপন কর' হবে এবং জনশিক্ষা আধিকারিক বা ডাইরেক্টর অফ পাবলিক ইনষ্ট্রাকশন (Director of Public Instruction) সংক্ষেপে ডি-পি-আই নামে একজন দায়িত্বশীল কর্মচারী এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হবেন। এই ডি-পি-আই'কে সাহায্য করার জন্য ঐ বিভাগের অধীনে যথেষ্ট সংখ্যক পরিদর্শক থাকবেন। এই শিক্ষাবিভাগকে প্রতি বৎসর সরকারের নিকট বার্ষিক বিবরণী দাখিল করতে হবে।

(৬) বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

ডেসপ্যাচের দ্বিতীয় মূল্যবান প্রস্তাবটি হল ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। কাউন্সিল অফ এডুকেশন ১৮৪৫ সালে সর্বপ্রথম ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন, কিন্তু সেই প্রস্তাব তখন অগ্রাহ্য করা হয়। এই ডেসপ্যাচে বলা হল যে ভারতবর্ষে কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানে যেখানে যেখানে যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেখানে সেখানে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। সরকার মনোনীত একজন আচার্য, একজন উপাচার্য এবং কয়েকজন ফেলো নিয়ে এই সব বিশ্ব-বিদ্যালয়ে একটি করে সেনেট গঠিত হবে। পরীক্ষাগ্রহণ ও উপাধিদানই হবে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রধান কাজ। ডেসপ্যাচে অবশ্য আইন শাস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারিং, সংস্কৃত-চর্চা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিতে বিশেষ বক্তৃতাবলীর বন্দোবস্ত করা এবং প্রয়োজন মত বিশেষ উপাধিদানের কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল। এতে বোঝা যায় যে, নিছক পরীক্ষাগ্রহণ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অধ্যাপনার আয়োজন করার জন্য পরোক্ষ নির্দেশও উক্ত ডেসপ্যাচে ছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয় সেগুলিতে অধ্যাপনার বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় নি। সেগুলি সম্পূর্ণ অনুমোদনধর্মীই ছিল এবং প্রকৃত অধ্যাপনার দায়িত্ব সরকারী কলেজগুলির উপর ন্যস্ত করা হয়েছিল।

(৭) ভারতে সর্বত্র বিদ্যালয় স্থাপন

শিক্ষাবিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনার পর ডেসপ্যাচ ভারতের সর্বত্র শ্রেণীসম্বলিত বিদ্যালয় স্থাপনের নির্দেশ দেন। এই বিদ্যালয়গুলি ক্রমোন্নত-শ্রেণীসম্পন্ন হবে। এই শ্রেণীবিন্যাসের এক প্রান্তে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় এবং অনুমোদিত কলেজগুলি এবং সেগুলিতে বিজ্ঞান, কলাশাস্ত্র প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হবে। এর নীচে থাকবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি এবং সেগুলিতে ভারতীয় ভাষা কিংবা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। সব নীচে থাকবে দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি।

ইতিপূর্বে শিক্ষার খাতে বরাদ্দ টাকার অধিকাংশই কলেজ স্থাপনের জন্যই ব্যয় করা হ'ত। তার ফলে মাধ্যমিক শিক্ষা ভীষণভাবে অবহেলিত হয়েছিল। এর পেছনে ছিল সরকারের নিম্নমুখী পরিস্রুতির নীতিটি। ডেসপ্যাচে মেকলের সেই বিঘোষিত নিম্নমুখী

পরিস্রুতির মতবাদের নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে, প্রচুর সরকারী অর্থ ব্যয় করে এতদিন কলেজীয় শিক্ষার মাধ্যমে যে উচ্চশিক্ষা দিয়ে আসা হয়েছে তাতে সমাজের উচ্চস্তর থেকে আগত মাত্র মুষ্টিমেয় ছাত্র কয়েকজন উপকৃত হয়েছে। এই ডেসপ্যাচে নির্দেশ দেওয়া হল যে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক্ যাতে সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পায়। ডেসপ্যাচে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হোক্ যাতে সমাজের সকল স্তরের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা-গ্রহণের সুযোগ পায়। ডেসপ্যাচে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের কথা বলা হলেও মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সপক্ষেও সুস্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নীচের স্তরে থাকবে দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি। উপযুক্ত অর্থসাহায্যের দ্বারা এগুলিরও উন্নয়নের নির্দেশ ডেসপ্যাচে দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে টমসন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশগুলিতে শিক্ষাকর ধার্য করে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎসাহিত করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন ডেসপ্যাচে টমসনের সেই পরিকল্পনাটিও অনুসরণ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। যোগ্য শিক্ষার্থীদের ছাত্রবৃত্তি প্রদানেরও নির্দেশ ডেসপ্যাচে দেওয়া হয়।

ডেসপ্যাচের উপরের প্রস্তাবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ, নিম্নমুখী পরিস্রুতির মতবাদের বর্জন, দ্বিতীয়তঃ, মাধ্যমিক স্তরে ভারতীয় ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ এবং তৃতীয়তঃ, ভারতের জাতীয় শিক্ষাপরিকল্পনায় দেশীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্বীকৃতি দান।

(৮) গ্রাণ্ট-ইন-এড এর প্রথা প্রবর্তন

বলা বাহুল্য শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনে উপরের পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ ব্যাপারে কিন্তু ডেসপ্যাচে বাস্তবধর্মী কোন নীতি গ্রহণ করা হয় নি। তার পরিবর্তে যে নীতি গ্রহণ করা হল তাতে ভারতীয় জনসাধারণের উপরই শিক্ষার অধিকাংশ দায়িত্ব অর্পণ করে সরকার নিজে আংশিক দায়িত্বমাত্র গ্রহণ করলেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য ডেসপ্যাচ সরকারী গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। সব বিদ্যালয়ই এই গ্রাণ্ট-ইন-এড পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, যেগুলিতে—(১) ধর্মনিরপেক্ষভাবে সুষ্ঠু শিক্ষাদান করা হবে; যদি অবশ্য কোথাও ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয় তা উপেক্ষা করা যেতে পারে; (২) বিদ্যালয় পরিচালনায় উপযুক্ত ব্যবস্থা আছে; (৩) সরকারী পরিদর্শকের প্রদত্ত শর্তাদি মেনে চলবে এবং (৪) ছাত্রদের নিকট থেকে যৎসামান্য বেতন গ্রহণ করবে। দেখা যাচ্ছে যে, ডেসপ্যাচে স্পষ্টভাবে একথা বলা হয়েছিল যদি কোন বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার আয়োজন থাকে তবে সরকারী পরিদর্শকদের সেদিকে দৃষ্টি না দিলেই চলবে। এই নির্দেশের পরিষ্কার অর্থ হল যে মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় ছিল না। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার অন্যান্য বিশদ নিয়মকানুন প্রণয়নের দায়িত্ব

প্রাদেশিক সরকারের উপরই ন্যস্ত করা হয়েছিল। শিক্ষাকর্তৃপক্ষ একথা বিশ্বাস করেছিলেন, যে গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে সরকারী তত্ত্বাবধানে শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে এদেশে গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা ইংলণ্ডে প্রচলিত অনুরূপ প্রথার অনুকরণেই প্রবর্তিত হয়েছিল এবং এর ফলে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, ছাত্রবৃত্তি প্রদান, বিদ্যালয়-ভবন নির্মাণ প্রভৃতির জন্য সরকারী অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই নবপ্রবর্তিত সাহায্যদানের প্রথার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আরম্ভ করে দেশীয় প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলির পক্ষেও অর্থসাহায্য পাওয়া সম্ভব হ'ল। বিভিন্ন খাতে ব্যয়-নির্বাহের সময় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির অর্থভাণ্ডারে যেমন যেমন ঘাটতি দেখা দিত, তেমন তেমনই এই গ্রাণ্ট-ইন-এড ব্যবস্থার দ্বারা সরকারী অর্থ পাওয়া যেত।

একথা বলা বাহুল্য যে সে সময়ের সব দিকের পরিস্থিতি বিবেচনা করলে ভারতে এই গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনকে কোন দিক দিয়েই সমর্থন করা যায় না। গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা সেই সব দেশেই সাফল্য লাভ করতে পারে যে সব দেশে জনগণের মধ্যে শিক্ষা-সচেতনতা যথেষ্ট মাত্রায় দেখা দিয়েছে এবং যে সব দেশের জনগণ শিক্ষার জন্য নিজেরা অর্থ ব্যয় করতে সমর্থ। কিন্তু ভারতের মত শিক্ষায় অনগ্রসর ও দারিদ্র-ক্লিষ্ট দেশে গ্রাণ্ট ইন-এড প্রথা সফল হওয়া নিতান্তই অবাস্তব ব্যাপার ছিল। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ইংরেজ সরকার শিক্ষার দায়িত্ব থেকে নিজের মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যে এ প্রথার প্রবর্তন করেন। তবে এ প্রথা প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে যে উপকার হয়েছিল তাকে নিতান্ত তুচ্ছ করা চলে না।

এই গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথা প্রবর্তনের পেছনে যেমন ইংরেজ সরকারের দায়িত্ব এড়াবার প্রচেষ্টা একটা বড় কারণ ছিল, তেমনই মিশনারীদেরও যথেষ্ট সমর্থন ছিল। বস্তুতঃ ডেসপ্যাচটি যখন ইংলণ্ডে রচিত হয় সেই সময় প্রসিদ্ধ মিশনারী ডঃ ডাফ ইংলণ্ডে ছিলেন এবং গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনের ব্যাপারে নিঃসন্দেহে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ইতিপূর্বে মিশনারীরা সরকারের কাছে কোনও অর্থসাহায্য পেতেন না। কিন্তু গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনের ফলে মিশনারী বিদ্যালয়গুলির ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবে সরকারী অর্থসাহায্য পাওয়া সম্ভব হয়ে উঠল। বস্তুতঃ বেসরকারী বিদ্যালয়ের তুলনায় মিশনারীদের পরিচালিত বিদ্যালয় সংখ্যায় অনেক বেশী থাকার ফলে সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে এই প্রথার প্রবর্তনে উপকৃত হয়েছিল।

গ্রাণ্ট-ইন-এড মোটামুটি তিন শ্রেণীর ছিল—(১) শিক্ষকরা যাতে বেতন পান সেজন্য তার কিছু অংশ সাহায্য রূপে দান ; (২) নির্দিষ্টকালের জন্য নির্দিষ্টহারে সাহায্য দান ; (৩) পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সাহায্যদান।

(৯) শিক্ষক-শিক্ষণ

সার্থক শিক্ষাদানে সমর্থ যথেষ্ট যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের একান্ত অভাব সম্বন্ধে উডের ডেসপ্যাচে উল্লেখ করা হয়। সেই উদ্দেশ্যে শিক্ষাদানের উপযোগী শিক্ষক প্রস্তুত করার জন্য ডেসপ্যাচে শিক্ষক-শিক্ষণের জন্য একটি নতুন পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল। ডেসপ্যাচে

বলা হয় যে বিদ্যালয়ের যে সব সর্দার-পড়ো অধ্যাপনার কাজে কৃতিত্বের সঙ্গে শিক্ষককে সহায়তা করতে পারবে তাদের বেছে নিতে হবে এবং তাদের অর্থসাহায্য দিতে হবে। যোগ্য বলে প্রমাণিত হলে তাদেরই পরে নর্মাল স্কুল বা শিক্ষক-শিক্ষণ বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিক্ষণপ্রাপ্ত সুযোগ্য শিক্ষক-রূপে গড়ে তুলতে হবে। পরে শিক্ষণ শেষে তাদের শিক্ষকরূপে নিয়োগ করতে হবে। ইংলণ্ডেও শিক্ষক-শিক্ষণের এই প্রথা অনুসৃত হত এবং ডেসপ্যাচের প্রস্তাব হল যে সেইমত এখানেও ঐ প্রথাটি অনুসরণ করা হোক। এর জন্য গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার মাধ্যমে সাহায্য দেওয়া হবে।

(১০) বৃত্তিশিক্ষা

ডেসপ্যাচে সাধারণ মানুষের বৃত্তিসংস্থানের জন্য বলা হয়েছে যে, বৃত্তিমূলক শিক্ষারও সত্বর আয়োজন করার প্রয়োজন রয়েছে এবং সুশিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রকেই কর্মপ্রাপ্তির যথেষ্ট সুযোগ দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। এ প্রসঙ্গে উডের ডেসপ্যাচে যেটি লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে এই যে, ভারতবাসীদের কর্মনিযুক্তি সম্বন্ধে নির্দেশ হার্ডিঞ্জের ঘোষণার মত কেবলমাত্র ইংরাজী-শিক্ষিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয় নি।

(১১ নারীশিক্ষা

নারীশিক্ষার দ্রুতবিস্তার সম্বন্ধেও ডেসপ্যাচে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ডেসপ্যাচে বলা হয়েছে যে ভারতে যাতে মেয়েদের জন্য অধিকসংখ্যক শিক্ষায়তন স্থাপিত হয় তার সব রকম ব্যবস্থা করতে হবে এবং গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে নারী শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হবে।

Q 11. Comment critically on the Wood's Despatch.

উত্তর। (১) ভূমিকা

উডের ডেস্‌প্যাচ ভারতের শিক্ষার ইতিহাসে একখানি গুরুত্বপূর্ণ দলিল। ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে এরূপ সামগ্রিকভাবে বিচার করে শিক্ষার সর্বক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রচেষ্টা এর আগে কখনও হয় নি। লর্ড ডালহৌসী বলেছেন, ভারতে শিক্ষার জন্য এরূপ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রাদেশিক সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে করা সম্ভব হয় নি। ঐতিহাসিক জেম্‌স্ বলেছেন, ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এর আগে যা ঘটেছে উডের ডেস্‌প্যাচ তা পরিণতি লাভ করেছে; পরে যা হয়েছে তার উৎসাহও এখানে ("What goes before leads upto it, what follows flows from it")।

(২) সামগ্রিক দৃষ্টি

শিক্ষার সর্বনিম্ন ক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত। ভারতীয় শিক্ষার বিতর্কমূলক ক্ষেত্রে এই দলিলেই মীমাংসার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই ডেস্‌প্যাচেই প্রাথমিক ও লোকশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সেই সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা, শিক্ষণ-শিক্ষা ইত্যাদি সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বেসরকারী

প্রচেষ্টার প্রতি সরকারের বিমাতৃসুলভ মনোভাব ত্যাগ করে সহযোগিতামূলক নীতি অনুসরণের নির্দেশ এই ডেসপ্যাচের উল্লেখযোগ্য অবদান। ডেস্‌প্যাচের নির্দেশ অনুসারে শিক্ষাবিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মাধ্যমিক শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষায় আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করায় গণশিক্ষা প্রসারে প্রত্যক্ষভাবে সরকারী দায়িত্ব স্বীকৃত হয়। গ্রান্টের আন্দোলনের সময় থেকে ভারতের শিক্ষার লক্ষ্য, শিক্ষার বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে যে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত ছিল, উডের ডেস্‌প্যাচে তার সমন্বয় করে সর্বদলের গ্রহণযোগ্য একটি শিক্ষানীতি নির্ধারিত হয়েছে।

(৩) কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা

উডের নির্দেশ যদি যথাযথরূপে পালন করা হত, তাহলে ভারতে শিক্ষার বিস্তার আরও দ্রুততর হত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার উডের অনেক মূল্যবান নির্দেশই বহুদিন পর্যন্ত কার্যকর করা প্রয়োজনবোধ করেনি। মাতৃভাষার মর্যাদা বহুদিন উপেক্ষিত ছিল। ডেস্‌প্যাচে গণশিক্ষার প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করা হলেও উচ্চ-শিক্ষার স্বার্থে বহুদিন পর্যন্ত ভারত সরকার গণশিক্ষার বিষয় চিন্তা করবার অবসর পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নিয়োগ; অনার্স কোর্সের প্রবর্তন, বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা প্রভৃতি নির্দেশসমূহ বহুদিন অবহেলিত ছিল। মাধ্যমিক শিক্ষায় মাতৃভাষাকে বাহনরূপে গ্রহণ করার প্রস্তাব বিংশ শতাব্দীর পূর্বে কার্যকর করা হয়নি। সাহায্যদান নীতি গ্রহণ করবার পর সরকার শিক্ষাক্ষেত্র থেকে সরে দাঁড়াবে, এই ইচ্ছা ব্যক্ত করা হলেও কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীতই হয়েছিল। শিক্ষা-ব্যবস্থা সরকারী নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ অধীন হওয়ার ফলে বহু প্রশাসনিক জটিলতার সৃষ্টি হয়। একটি মাত্র কেন্দ্রীয় দপ্তরের অধীন হওয়ার ফলে শিক্ষা বিভাগের লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে ভারতের শিক্ষাক্ষেত্র থেকে নমনীয়তা লুপ্ত হয়।

(৪) জাতীয় ঐতিহ্য অবহেলিত

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে ডেস্‌প্যাচ রচয়িতারা জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছেন। প্রাচীন ভারতে শিক্ষাকে যে দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হত এবং ভারতীয়দের জীবনে শিক্ষার কি স্থান হবে, সে সম্পর্কে ডেস্‌প্যাচে কোন বিচার করা হয় নি। প্রাচ্যভূমিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জাতীয় চিন্তাধারা ও অগ্রগতির ধারক ও বাহক হতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় কোন বেসরকারী সদস্যই স্থান পায়নি। উচ্চ শিক্ষা-ব্যবস্থায় ভারতীয় মনোভাব প্রতিফলিত হবার প্রয়োজনকে এভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। ভারতীয়দের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে স্থান দিয়ে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করাই কর্তৃপক্ষের উচিত ছিল। প্রাচী ও প্রতীচীর মিলনের পথকে শিক্ষার মাধ্যমে সহজ করবার সুযোগের সদ্ব্যবহার করা বিলাতের কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন মনে করে নি।

(৫) শিক্ষাজগতের ম্যাগনা কার্টা

ঐতিহাসিক জেম্‌স্ এই ডেস্‌প্যাচকে Magna Charta of English Education

in India বলে অভিনন্দিত করেছেন। ভারতের শিক্ষার অগ্রগতিতে উডের ডেস্‌প্যাচের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আধুনিক শিক্ষার যে রূপটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, সেই শিক্ষাধারা ও শিক্ষাধারা পরিচালনার কাঠামো, এই ডেস্‌প্যাচেই আমরা পেয়েছি। কিন্তু ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে ইহাকে 'ম্যাগনাকার্টা' বলা বাড়াবাড়ি। ডেস্‌প্যাচ রচয়িতাদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশংসা করেও আমরা বলতে পারি ডেস্‌প্যাচ এতখানি প্রশংসার যোগ্য নয়। ডেস্‌প্যাচে শিক্ষানীতি সম্পর্কে নির্দেশ আছে। কিন্তু Education Charter বললে জনসাধারণের কতকগুলি অধিকারের সরকারী স্বীকৃতি বোঝায়। উডের ডেস্‌প্যাচে তা আমরা পাই না। ডেস্‌প্যাচে শিক্ষাপ্রসারের সদিচ্ছা আছে, কিন্তু সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হয় নি।

(৬) ঔপনিবেশিক চরিত্র

সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের চরিত্র হচ্ছে—তাঁদের শাসিতদের উপর নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তার করা। একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যখন তার সাম্রাজ্য সম্পর্কে কোন নীতি গ্রহণ করে তার পিছনে একটি উদ্দেশ্যই থাকে। তা হচ্ছে শাসক দেশের স্বার্থ রক্ষা। আপাতঃদৃষ্টিতে যাকে জনকল্যাণমূলক বলে মনে হয় তার পশ্চাতেও সাম্রাজ্য রক্ষা, বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার মনোভাব সক্রিয় থাকে। বৃটিশ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে বাণিজ্য করতে এসে একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে বসে। এ দেশে সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ শক্ত ভিতের উপর স্থাপন করতেও ইংরেজের বাণিজ্যিক স্বার্থেই এদেশের সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। শিক্ষানীতিও তার ব্যতিক্রম নয়। এ দেশ শাসনের জন্য সুলভে এক শ্রেণীর কর্মচারী সৃষ্টি, ইংলণ্ডের কলকারখানার জন্য কাঁচামালের সরবরাহ অব্যাহত রাখা ও ইংলণ্ডের কলকারখানায় তৈরী পণ্যের অবাধ চালান অক্ষুণ্ণ রাখার দিকে লক্ষ্য রেখেই সরকারী নীতি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ইংলণ্ডের ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ যখন ভারতের জন্য শিক্ষানীতি নির্ধারণ করেন, সেখানেও এই মনোভাব দেখা যায়। উডের ডেস্‌প্যাচের মত শিক্ষাসম্পর্কিত একখানা মূল্যবান দলিলে কোম্পানীর যে বণিকসুলভ মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে, তা অতি নিন্দনীয়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চিরদিনই তাদের উপনিবেশকে কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্ররূপে ব্যবহার করে। তাই শিক্ষানীতি নির্ধারণ করতে বসেও উডের ডেসপ্যাচে শিক্ষা-প্রসারের অন্যতম লক্ষ্য রূপে বলা হয়েছে ইংলণ্ডের কারখানাসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ভারতের কাঁচামালের সরবরাহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া ও বৃটেনে উৎপন্ন পণ্যের ভারতের বাজারে অফুরন্ত চাহিদা সৃষ্টি করা। শিল্প বিপ্লবের সুফল থেকে ভারতকে চিরদিনের মত বঞ্চিত করে, ভারতকে শিল্পে অনুন্নত রেখে এই অনগ্রসর দেশটিকে ইংলণ্ডের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষা করার মধ্যে নব্য ঔপনিবেশিক মনোভাবই ডেস্‌প্যাচে প্রকাশ পেয়েছে। ভারতীয়দের পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমুন্নত জাতিতে পরিণত হতে সাহায্য করার কোন সদিচ্ছাই কোম্পানীর ছিল না। ডেস্‌প্যাচে সরকারী শিক্ষার লক্ষ্য রূপে বলা হয়েছে, "শিক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্য, নৈতিক বুদ্ধিসম্পন্ন,

বিশ্বাসী সরকারী কর্মচারী সৃষ্টি হবে।" এই অভিমতের মধ্য দিয়েই সরকারী মনোভাব পরিষ্কার রূপে ফুটে উঠেছে। ডেস্‌প্যাচে মেকলের প্রভাবে প্রাচ্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা অবজ্ঞার ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। কোম্পানীর স্বার্থে এদেশের কিছু লোককে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন ছিল, তা যাতে সম্ভব হয় সেভাবেই উডের ডেস্‌প্যাচে ভারতের শিক্ষানীতি স্থিরীকৃত হয়েছে। মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোকের জন্য ভদ্রলোকের শিক্ষার ব্যবস্থাই ডেস্‌প্যাচে করা হয়েছে।

উডের ডেস্‌প্যাচের ঔপনিবেশিক চরিত্রকে মেনে নিয়েও বলা যায় এর থেকে কিছু সুফল আমরা লাভ করেছি। এতদিন পর্যন্ত বৃটিশ ভারতের কোন সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি ছিল না। এই ডেস্‌প্যাচে সে অভাব পূরণ করে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ভবিষ্যৎ শিক্ষার একটা রূপরেখা ডেস্‌প্যাচে পাই।

(৭) **সমালোচনা**

নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে, দলিলটির দ্বারা ভারতীয়দের শিক্ষাগত স্বার্থ পূর্ণভাবে রক্ষিত হয় নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে তদানীন্তন বিশৃঙ্খলা দূর করে শিক্ষার একটি সুসংহত রূপ ডেসপ্যাচটি দিলেও ভারতীয়দের শিক্ষাঘটিত কয়েকটি অতিগুরুত্বপূর্ণ দিক এতে অবহেলিত হয়েছিল। প্রথমতঃ, মাতৃভাষার প্রয়োজন সম্বন্ধে অনেক ক্ষেত্রে বলা হলেও কোথাও সুস্পষ্টভাবে মাতৃভাষাকে শিক্ষামাধ্যম করতেই হবে এমন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। তার ফলে কোম্পানীর শিক্ষা-নির্দেশকরা স্বভাবতঃই ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে তুলেছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার প্রবর্তনও মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টাকে সাহায্য করার জন্য পরিকল্পিত হয়েছিল বলা চলে। তখনকার ডেসপ্যাচ-প্রণেতারা ভালভাবেই জানতেন যে, শিক্ষাপ্রসারে দেশীয় প্রচেষ্টা নিতান্তই স্বল্প হবে এবং তাঁদের এই অর্থ সাহায্য পরিকল্পনার দ্বারা প্রকৃতপক্ষে মিশনারীরাই উপকৃত হবেন। অথচ মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য যে ধর্মান্তরকরণ এটাও তাঁদের কাছে সম্পূর্ণ বিদিত ছিল। অতএব প্রকৃতপক্ষে ডেস্‌প্যাচের গ্রাণ্ট-ইন-এড প্রথার মাধ্যমে অর্থ সাহায্য দানের পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়াল ভারতে খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের সাহায্য করা। একথা অনস্বীকার্য যে, এই ডেসপ্যাচের ফলে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণভাবে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু তাহলেও এটিকে 'ম্যাগনা কার্টা' বলে বর্ণনা করা যায় না। তার প্রধান যুক্তি হল যে, ভারতের সাধারণ জনসমাজের প্রকৃত স্বার্থ এই দলিলের দ্বারা রক্ষিত হয়নি। বস্তুতঃ দলিলটি মূল গোষ্ঠীবিশেষের সঙ্কীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিকল্পিত ছিল এবং সেজন্য এটি থেকে ভারতীয় জনসমাজ উপকৃত হলেও এটিকে 'ম্যাগ্‌না কার্টা' বা শিক্ষার মহৎ সনদ আখ্যা দেওয়া যায় না।

উডের ডেসপ্যাচ ভারতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ভিত্তিস্থাপন করলেও একথা ভুললে চলবে না যে ভারতে ঔপনিবেশিক শিক্ষা ব্যবস্থার সূচনা এই ডেসপ্যাচই করেছিল। উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃতি বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে যে, এ দেশে ইংরাজদের ভূমিকা ছিল প্রধানতঃ পররাজ্য-অধিকারী, সাম্রাজ্যবাদী শাসকের এবং ভারত ছিল তাদের একটি উপনিবেশ বিশেষ অর্থাৎ শোষণের স্থান।

আর এই সব শাসকদেরই একজন ছিলেন উক্ত ডেসপ্যাচের রচয়িতা। তিনি ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ ব্রিটিশ শিল্পের জন্ম কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং তার শিল্পজাত পণ্যে একটি বাজার রূপেই দেখেছিলেন। আর সেইজন্ম উডের ডেসপ্যাচে ভারতে শিক্ষার নানাব্যবস্থা করা হলেও তা ব্রিটেনের মজ্জাগত সদাগরী সঙ্কীর্ণ মনোভাব প্রসূত ছিল এবং তার মধ্যে ঔদার্য ও সহানুভূতির যথেষ্ট অভাব ছিল। এজন্ম ডেসপ্যাচের ছত্রে ছত্রে এই মনোভাবই প্রকট হয়ে উঠেছে যে, ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্য চালাবার জন্ম বহুসংখ্যক কর্মচারীর দরকার এবং কিছুটা ইংরাজী শিখিয়ে-পড়িয়ে অতি অল্প বেতনে ভারতীয়দের মধ্যে থেকেই সেই কর্মীবৃন্দ সংগ্রহ করতে হবে। এই নীতি ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে যে এক 'বিচিত্র ঐতিহ্যের' সৃষ্টি করেছিল তার কুফল আজও দূর হয়নি এবং বর্তমান যুগের শিক্ষাব্যবস্থার বহু মারাত্মক ত্রুটির জন্ম ডেসপ্যাচের এই সঙ্কীর্ণ ঔপনিবেশিক নীতিকে দায়ী করা চলে। ইংরাজ শাসকেরা এ দেশে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে এমন এক সরকারী ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত করেছিল যে তার ফলেই এদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রেও আমলাতন্ত্রের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, আর অসংখ্য দপ্তর, ফাইল-সমন্বিত 'লাল ফিতার' আধিপত্যের দ্বারা সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে। আগেই বলা হয়েছে যে, উক্ত ডেসপ্যাচের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারী হস্তক্ষেপের ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া ত দূরে থাকুক বরং তো আরও বৃদ্ধি পায় এবং দপ্তরসংক্রান্ত নির্দেশ ও শৃঙ্খলার বোঝা এতই অসহনীয় হয়ে ওঠে যে শিক্ষাক্ষেত্রের কর্মীরাও ক্রমে ক্রমে বিরক্ত হয়ে সকল ত্রুটির জন্য সরকারকে দায়ী করতে থাকেন। তাছাড়া ভারতবর্ষে যে শিক্ষাকে চিরকাল বৃহত্তর ধর্মবোধ ও সর্বজনীন জীবনাদর্শের সঙ্গে সমন্বিত করা হত সেই সুপ্রাচীন এবং গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহ্যকে অগ্রাহ্য করে ডেসপ্যাচে যে শিক্ষা ব্যবস্থার আমদানী করা হয়েছিল সে শিক্ষা নিছক পুঁথি পড়ে পাস করার চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন বা মূল্যবান ছিল না। ভারতীয় ভাষাগুলিকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে মর্যাদা দান ও তার প্রয়োজনীয়তার কথা ডেসপ্যাচে স্বীকৃত হলেও তা বাস্তবে কার্যকর করা হয় নি। প্রকৃতপক্ষে ঐ ভাষাসমূহের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে ডেসপ্যাচে সত্যকার কোন নির্দেশ দেওয়া হয় নি। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারেও ডেসপ্যাচে কোন কার্যকর পরিকল্পনা স্থান পায় নি এবং শুধুমাত্র গ্রান্ট ইন-এডের সাহায্যে অত্যন্ত উদাসীন প্রকৃতির একটা ব্যবস্থা এ ক্ষেত্রে প্রবর্তিত করা হয়েছিল। এ দেশে বে-সরকারী শিক্ষাপ্রচেষ্টা তখন মোটেই উল্লেখযোগ্য ছিল না এবং স্বভাবতই শুধুমাত্র গ্রান্ট-ইন-এডের প্রেরণায় তা ব্যাপকতা লাভ করতে পারে নি। ফলে গ্রান্ট-ইন-এড প্রথার সাহায্যে শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার হয় নি এবং সরকার এই নীতির অন্তরালে নিজের দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টাই করেছিলেন।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূত্রপাত করলেও সে শিক্ষাব্যবস্থা মূলতঃ শাসক-শোষিত সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনসাধারণের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করা হয়েছিল এবং শিক্ষাকে সম্পূর্ণ আমলাতন্ত্রের কুক্ষিগত করা হয়েছিল। আজও সেই ব্যবস্থার চরম কুফল আমরা ভোগ করে চলেছি।

উপরোক্ত সকল সমালোচনা সত্ত্বেও পরিশেষে আমরা এই কথাই বলব যে, ১৮৫৪

সালের উডের ডেসপ্যাচ ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে মোটামুটি একটি সুসংবদ্ধ ও সুসংহত ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। লর্ড ডালহৌসির মতে এরূপ সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কোন প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে রচনা করা সম্ভব হয় নি। অনেকের মতে ১৮৫৪ সালের এই ডেসপ্যাচটিই উনিশ শতকে ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে চরম অবদান। ১৮৫৪ সালের আগে এ দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে যা কিছু সংস্কার ও উন্নয়ন সংঘটিত হয়েছিল তা সবই এই ডেসপ্যাচে এসে সুসমন্বিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালের শিক্ষাক্ষেত্রে সকল সংস্কার ও পরিবর্তনের মূল উৎসও ছিল এই ডেসপ্যাচটি। এই ডেসপ্যাচটিকে অনেকেই ভারতীয় শিক্ষাসৌধের ভিত্তিপ্রস্তর বলে বর্ণনা করে থাকেন। তাঁদের এই বর্ণনা বহুলাংশে সত্য, প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী যুগের ভারতীয় শিক্ষার সংগঠনটি এই ডেসপ্যাচকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠে।

Q. 12. Describe briefly the educational enterprize of Alexander Duff.

উত্তর। (১) আলেকজাণ্ডার ডাফ

১৮৩০ সালে ভারতে প্রথম ইংরাজ স্কুল স্থাপন করেন আলেকজাণ্ডার ডাফ। তিনি সে সময়কার প্রখ্যাত মিশনারীদের মধ্যে একজন ছিলেন। সে সময়ের আরও দু'জন খ্যাতনামা মিশনারী কর্মীর নাম করা যায়। একজন রেভারেণ্ড জে উইলসন। অপর জন রেভারেণ্ড জন এ্যাণ্ডারসন। এই তিন জনই ইংরাজী শিক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়দের শিক্ষাদানের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয়দের ইংরাজী ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তারা স্বভাবতই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে। উইলসনের কর্মক্ষেত্র ছিল বোম্বাইতে এবং সেখানে এখনও তাঁর নাম অনুযায়ী উইলসন হাই স্কুল এবং উইলসন কলেজ আছে। এ্যাণ্ডারসন কাজ করেন মাদ্রাজে, আর ডাফের কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলাদেশে।

আলেকজাণ্ডার ডাফ ১৮৩০ সালের মে মাসে কলকাতায় এসে পৌঁছান। তাঁকে ভারতে ধর্মপ্রচারের কাজে পাঠান 'জেনারেল এ্যাসেম্ব্লি' নামে স্কটল্যাণ্ডের একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। ডাফের উপর তাঁদের নির্দেশ ছিল "উচ্চস্তরের সাহিত্যমূলক এবং ধর্মীয় শিক্ষাদানের জন্য বাংলাদেশে একটি কলেজ স্থাপন করা"।

বাংলাদেশের সে সময়কার সামাজিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে ডাফ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে এদেশের জনগণের মধ্যে যে ধরনের জ্ঞান ও শিক্ষামূলক উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে মিশনারীদের ইতিপূর্বে স্থাপিত কোনও বিদ্যালয়ই সে প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী নয়। সেজন্য তিনি ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্য একটি নতুন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৩০ সালে কলকাতায় জেনারেল এ্যাসেম্ব্লিস ইনষ্টিটিউসন নামে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিদ্যালয়টি ১৮৩৭ সালে স্কটিশ চার্চ স্কুল নামে পরিচিত হয়।

(২) আলেকজাণ্ডার ডাফের শিক্ষানীতি

ডাফ একজন উচ্চশিক্ষিত, দৃঢ়চেতা এবং গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন। যে সব ভারতীয় খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল তাদের মধ্যে অধিকাংশই দরিদ্র ও নিম্নবর্ণের ছিল। ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়ে নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নই তাদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণের বড় উদ্দেশ্য ছিল। এ কারণে তিনি সে সময়কার মিশনারীদের ভারতে অনুসৃত নীতির তীব্র সমালোচনা করেন।

(৩) উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার

ভারত থেকে হিন্দুধর্মকে সম্পূর্ণ বিদায় করে তার জায়গায় খৃষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠা করাকেই ডাফ মিশনারীদের প্রধান উদ্দেশ্য বলে বর্ণনা করেন। তাঁর মতে মিশনারীদের অনুসৃত পথে হিন্দুধর্মকে এদেশ থেকে বিদায় করা যাবে না। তাছাড়া এ কাজ করতে হলে হিন্দুধর্মের নীচের তলা থেকে কাজ আরম্ভ করলে চলবে না। হিন্দুধর্মের উপরের স্তরে যে সব উন্নত ও উচ্চবর্ণের লোকেরা বাস করে তাদের থেকে সুরু করতে হবে। ডাফের মতে যদি ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের হিন্দুদের খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করা যায় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই নিম্নশ্রেণীর লোকেরা দলে দলে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে।

(৪) মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার বিস্তার

এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাব দিলেন যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের পরিবর্তে মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার বিস্তারের প্রতি মিশনারীদের অধিক মনোযোগ দেওয়া উচিত। উচ্চশিক্ষার বিদ্যালয় খুললে স্বভাবতই উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সেখানে যোগ দেবে এবং সেখানে তারা সাহিত্য ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করবে। তার ফলে তারা নিজেরাই হিন্দুধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারবে এবং স্বতঃপ্রণোদিতভাবেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবে।

(৫) ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা দান

ডাফ তাঁর বিদ্যালয়ে যে কেবল ইংরেজী সাহিত্য ও বিজ্ঞান পড়ানোর আয়োজন করেছিলেন তাই নয়, তিনি শিক্ষার মাধ্যম রূপে মাতৃভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর মতে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষা করা একেবারেই সম্ভব নয়। অতএব ভারতীয়দের অবশ্যই ইংরাজী ভাষায় জ্ঞান অর্জন করতে হবে। তাছাড়া দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করে বাইবেল পড়ানোরও সার্থকতা তিনি স্বীকার করেন নি এবং সেজন্য ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই যাতে ভারতীয়রা বাইবেল পড়তে পারে তিনি তারই ব্যবস্থা করেছিলেন।

স্পষ্টতঃই ডাফের এই নীতি তাঁর পূর্বগামী মিশনারীদের নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তাঁর আগে মিশনারীরা বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয়দের শিক্ষা দিতে দেশীয় ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দিতে হবে। সেজন্য তাঁরা নিজেরা দেশীয় ভাষা আয়ত্ত করেন এবং দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। ডাফও প্রথমে বাংলাভাষা আয়ত্ত করার চেষ্টা করেন কিন্তু তেমন সফল হন নি। তখন তিনি বলেন যে বাংলাভাষা অত্যন্ত অপরিণত ও পশ্চাদ্‌পদ ভাষা। অতএব এই ভাষার মাধ্যমে পড়ান ঠিক নয়। ডাফের মত আরও

কিছু মিশনারী এই মতের পোষক ছিলেন। তার ফলে মিশনারী পরিচালিত মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়গুলোতে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পড়ানো সুরু হয়।

(৬) বাইবেল অবশ্যপাঠ্য করণ

ডাফ একজন গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে খৃষ্টধর্মের নীতি এবং অনুশাসন ছাড়া কোনও সত্যকারের শিক্ষা হতে পারে না। তাঁর মতে খৃষ্টধর্ম যে সমস্ত শিক্ষার ভিত্তিই কেবল তাই নয়, একমাত্র খৃষ্টধর্মই শিক্ষাকে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে। সেজন্য তাঁর মতে মিশন পরিচালিত সমস্ত বিদ্যালয়েই বাধ্যতামূলকভাবে এবং প্রত্যক্ষভাবেই বাইবেল পড়ানো হবে। বাইবেল পড়ানো সম্বন্ধে এদেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে যে বিরোধিতা দেখা যায়, যদি নির্ভয়ে এবং খোলাখুলিভাবে বাইবেল পড়ানো যায় তাহলে সে বিরেধিতা শীঘ্রই লোপ পাবে। সে সময়ে খৃষ্টধর্মের প্রচারের বিরুদ্ধে বেশ প্রবল জনমত থাকলেও ডাফ তাঁর নিজের এই নীতিতে এতই বিশ্বাসী ছিলেন যে বাধ্যতামূলকভাবে বাইবেল পড়ানোর এই নীতি গ্রহণ করতে তিনি একটুও ইতস্তত হন নি।

(৭) গ্রাণ্ট-ইন-এড্ প্রথার জন্য আন্দোলন

মিশনারীদের শিক্ষা প্রচেষ্টার প্রতি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উদাসীনতাও ডাফ সমালোচনা করেন। তাঁর মতে এই কাজে কোম্পানীর সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে আসা উচিত। তাছাড়া কোম্পানীর পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোতেও খৃষ্টধর্ম শিক্ষা দেওয়া উচিত। আর তা যদি কোম্পানী করতে না পারে তাহলে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব সম্পূর্ণ মিশনারীদের উপরই ছেড়ে দেওয়া উচিত।

(৮) শিক্ষা ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের অপসরণের দাবি

ইতিপূর্বে মিশনারীরা সরকারী গ্রাণ্ট-ইন-এড্ সাহায্যের জন্য এভাবে প্রবল দাবি জানান নি। বস্তুতঃ ডাফ গ্রাণ্ট-ইন-এড্ প্রথার একজন বড় সমর্থক ছিলেন। ডাফের মতে মিশনারীদের স্কুলের জন্য কোম্পানীর অতি অবশ্যই গ্রাণ্ট-ইন-এড্ দেওয়া উচিত, যেমন, ইংলণ্ডে সরকার চার্চের পরিচালিত বিদ্যালয়গুলোকে দিয়ে থাকে।

গ্রাণ্ট-ইন-এড্ দাবির সঙ্গে সঙ্গে ডাফ এও দাবী জানান যে, শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে কোম্পানীর নিজস্ব প্রচেষ্টা গুটিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব মিশনারীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত। বস্তুতঃ ডাফ শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের অপসরণ নীতির একজন প্রাচীনতম সমর্থক ছিলেন।

(৯) শিক্ষক-শিক্ষণ

ডাফ শিক্ষকদের শিক্ষণদানের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। ১৮৪৫ সালে তিনি শিক্ষকদের শিক্ষণের জন্য একটি নর্মাল স্কুল খোলেন। সেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

(১০) ডাফের শিক্ষানীতির মুল্যায়ন

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে ডাফ শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারীদের ভূমিকার

সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং এটি তাঁর পূর্বগামীদের দৃষ্টভঙ্গী ও অনুসৃত নীতি থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

বলা বাহুল্য ডাফের এই উগ্র প্রকৃতির শিক্ষানীতি স্থানীয় লোকেদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে এবং ডাফকে প্রথম দিকে গুরুতর প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু বেশ কিছু সংখ্যক প্রগতিপন্থী ভারতীয় ডাফের শিক্ষা পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন এবং ডাফকে তাঁর কর্মসূচীর রূপায়নে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। মিশনারীদের মধ্যে কেরী তাঁর নীতির প্রতি আন্তরিক সমর্থন জানান। ভারতীয়দের মধ্যে রাজা রামমোহন রায় তাঁকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন। যখন ডাফের স্কুলের প্রথম ছাত্রদল বাইবেল পড়ানোর বিরুদ্ধে এই বলে বিক্ষোভ জানায় যে বাইবেল পড়লে ধর্মচ্যুত হতে হবে, তখন রাজা রামমোহন রায় তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেন যে তিনি নিজে বাইবেল পড়েছেন এবং তার ফলে তিনি ধর্মচ্যুত হন নি।

ডাফ তাঁর পরিকল্পনা থেকে প্রথমেই কিছু সাফল্য পান। তিনি কয়েকজন উচ্চস্তরের ব্রাহ্মণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে সমর্থ হন। ১৮৩৫ সালে মেকলের মিনিট প্রকাশিত হয়। তাতে ডাফের শিক্ষানীতিই ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়।

১৮৫৪ সালে উডের ডেসপ্যাচটি যখন রচিত হয় তখন ডাফ ইংলণ্ডে ছিলেন। এই বিবরণীতে গ্রান্ট-ইন-এড্ এবং ধর্মীয় শিক্ষাদানের নির্দেশগুলি ডাফেরই প্রচেষ্টাতে অঙ্গীভূত হয়েছিল। তারপর ডাফ ভারতে ফিরে আসেন এবং উডের ডেসপ্যাচের নির্দেশগুলো বাস্তবে রূপায়িত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

ডাফ তাঁর শিক্ষা, আন্তরিকতা ও মানসিক দৃঢ়তার সাহায্যে ভারতে মিশনারী শিক্ষাপ্রচেষ্টার প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আনেন। বলতে গেলে তিনি মিশনারী শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে এক নতুন আন্দোলনের সৃষ্টি করেন। তাঁর এই আন্দোলন কেবলমাত্র মিশনারীদেরই শিক্ষানীতির মধ্যে পরিবর্তন আনেনি, সরকারী শিক্ষানীতিকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করে এবং ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ভারতের শিক্ষার ক্ষেত্রে ডাফের শিক্ষা পরিকল্পনার কয়েকটি সুফলের বর্ণনা করা যায়।

প্রথমতঃ, ডাফের শিক্ষা পরিকল্পনা ভারতে ব্যাপকভাবে ইংরাজী শিক্ষার প্রচারে সাহায্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার স্তরে ইংরাজী সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শিক্ষার আয়োজন করে।

তৃতীয়তঃ, সরকারকে গ্রান্ট-ইন-এড্ প্রথাটি গ্রহণ করতে প্রযোজিত করে।

চতুর্থতঃ, শিক্ষার ক্ষেত্র থেকে রাষ্ট্রের অপসরণের নীতি গ্রহণ করতে কর্তৃপক্ষকে সম্মত করে।

পঞ্চমতঃ, এদেশে শিক্ষক-শিক্ষণের আয়োজন করে:এবং সবশেষে এদেশে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারেও বিশেষভাবে সাহায্য করে।

তবে ডাফের শিক্ষানীতিতে কতকগুলো গুরুতর ত্রুটি ছিল। প্রথমতঃ, মাতৃ ভাষাকে বর্জন করে ইংরেজীভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করা মোটেই সুবিবেচনার কাজ হয় নি। তিনি বাংলাভাষার অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে ভালভাবে পরীক্ষা না করেই সেটিকে অপরিণত ও দুর্বল বলে বাতিল করে দেন। ফলে সীমিত-সংখ্যক উন্নত স্তরের লোকদের মধ্যে তাঁর শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টা কার্যকর হলেও সাধারণ জনসমাজ তাঁর প্রচেষ্টা থেকে উপকৃত হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে নিম্নমুখী পরিস্রুতির তত্ত্বে (Downward Filtration Theory) বিশ্বাসী ছিলেন। অর্থাৎ তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজের উপরের স্তরের ব্যক্তিদের শিক্ষিত করে তুলতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের সংস্পর্শে এসে নীচের স্তরের ব্যক্তিরা শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এ তত্ত্বটি নিতান্তই অবাস্তব। কেননা উপরের স্তরের মানুষরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে নিম্নস্তরের মানুষদের সঙ্গে তাদের একটা মর্যাদাগত ব্যবধান সৃষ্টি হয়ে যায় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে কোন শিক্ষামূলক আদান-প্রদান ঘটা আর সম্ভব হয় না। মেকলেও পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত মিনিট রচনার সময় ডাফের এই তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাঁর মিনিটে প্রদত্ত শিক্ষা পরিকল্পনাটি এই নিম্নমুখী পরিস্রুতির তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই রচনা করেন। পরবর্তীকালে এই ক্ষতিকর নীতি অনুসরণ করার ফলে সাধারণ মানুষের শিক্ষা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় এবং সমস্ত ভারতে নিরক্ষরতা ছড়িয়ে পড়ে।

বাধ্যতামূলকভাবে বাইবেল পঠনের ব্যবস্থা করাটাও ডাফের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক ছিল না। কেননা, যে উদ্দেশ্যে তিনি এই নিয়মটি করেছিলেন তা তো সফল হয় নি বরং এর ফলে ভারতীয় শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা বিক্ষোভের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল। অধিকাংশ ছাত্রই উন্নত ইংরাজী শিক্ষালাভের জন্য মিশনারী স্কুলে যোগ দিত এবং কর্তৃপক্ষের চাপে বাধ্য হয়ে বাইবেল ক্লাসে যোগ দিত। কিন্তু তারা তার জন্য স্বধর্ম পরিত্যাগ করে নি। ডাফ ভেবেছিলেন যে বাইবেল পড়াতে পারলে দলে দলে হিন্দু খ্রীষ্টান হয়ে যাবে। তাঁর সে উদ্দেশ্য একেবারেই সিদ্ধ হয় নি।

Q. 13. Briefly discuss the educational enterprise of David Hare.

উত্তর। (১) ডেভিড হেয়ার ও তাঁর শিক্ষাপ্রচেষ্টা

যে সব ইংরাজ ভারতবাসীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অন্তর থেকে অনুভব করেছিলেন এবং তার জন্য নিঃস্বার্থভাবে শ্রম, অর্থ ও সময় ব্যয় করে ভারতের শিক্ষার উন্নয়নের ক্ষেত্রে অমূল্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই ডেভিড হেয়ারের নাম করতে হয়।

(২) ডেভিড হেয়ারের শিক্ষা পরিকল্পনা

ডেভিড হেয়ার নিজে উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ছিলেন না। তাঁর শিক্ষা সাধারণ স্তরেরই ছিল। কিন্তু তিনি শিক্ষাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন। তিনি ১৮০০ সালে ঘড়ি

ও মণিমুক্তার ব্যবসা করার জন্য ভারতে এসেছিলেন। ১৮১৫ সালে তিনি যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করে ব্যবসা থেকে অবসর নেন। কিন্তু তারপর স্বদেশে ফিরে না গিয়ে তিনি ভারতীয়দের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য বাকী জীবনটা উৎসর্গ করেন।

ডেভিড হেয়ার উপলব্ধি করেছিলেন যে সে সময় ভারতের মত একটা দেশের সত্যকারের উন্নতি করতে হলে তার অধিবাসীদের মধ্যে ইয়োরোপীয় শিক্ষা ও বিজ্ঞানের ব্যাপক বিস্তার করতে হবে। সেজন্য তিনি ভারতে পাশ্চাত্যদেশের অনুসরণে একটি আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

তিনি ডাফের মত বিশ্বাস করতেন যে ইংরাজী ভাষা ও ইংরাজী সাহিত্যের জ্ঞান ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু ডাফের মত শিক্ষার সঙ্গে ধর্মকে এক করার তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। মিশনারীরা শিক্ষাকে ধর্মের উপকরণ রূপে নিয়েছিলেন। হেয়ার শিক্ষাকে শিক্ষার জন্যই গ্রহণ করেন। হেয়ার ছিলেন পূর্ণ ধর্ম-নিরপেক্ষতার সমর্থক। তাঁর মতে ভারতীয়দের জন্য আদর্শ শিক্ষাপরিকল্পনায় মাতৃভাষা ও ইংরাজী দুই-ই পড়ান হবে এবং জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানের যাতে ব্যাপক বিস্তার ঘটে তার আয়োজন করতে হবে।

(৩) ডেভিড হেয়ার ও হিন্দু কলেজ

১৮১৭ সালে প্রসিদ্ধ হিন্দু বিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। অনেকেই ডেভিড হেয়ারকে এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা বলে বর্ণনা করে থাকেন। কিন্তু পরবর্তীকালের বহু গবেষণা থেকে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে নানা বিতর্কমূলক তথ্য পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে তদানীন্তন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইষ্ট (Sir Edward Hyde East) এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে প্রধান ও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। কিন্তু স্যার হাইড ইষ্ট নিজে থেকে এই ধরনের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা কখনও তৈরী করেন নি। এই শিক্ষা-পরিকল্পনাটি নিশ্চয়ই তাঁর নিকট কেউ উপস্থাপিত করেছিল এবং তিনি সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন।

এ প্রসঙ্গে ডেভিড হেয়ার ও রাজা রামমোহন রায়ের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। একটি অভিমত অনুযায়ী ডেভিড হেয়ারই বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে এই পরিকল্পনাটি স্যার হাইড ইষ্টের কাছে পেশ করেন এবং স্যার ইষ্ট সাগ্রহে সেই পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেন এবং অর্থসংগ্রহ, স্থানের আয়োজন, সম্ভ্রান্ত হিন্দুদের সমর্থন সংগ্রহ প্রভৃতির আয়োজন করে হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন। আর একটি মতবাদ অনুযায়ী হেয়ারের এই কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে কোনও ভূমিকা ছিল না। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব স্যার হাইড ইষ্টেরই প্রাপ্য।

হিন্দু কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে ডেভিড হেয়ারের ভূমিকা কতটা সক্রিয় ছিল সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে যে ডেভিড হেয়ার এই কলেজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। কলেজের দ্বিতীয় বর্ষে হেয়ার কলেজের ভিজিটর বা পরিদর্শক নিযুক্ত হন এবং প্রতিদিনই তিনি কলেজে যেতেন। কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে

তিনি ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন এবং মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। স্বীকার করা প্রয়োজন যে হিন্দু কলেজের শিক্ষাধারা ডেভিড হেয়ারের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উদারধর্মী পরিকল্পনার উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কলেজের পাঠক্রমের মাধ্যমে ভারতীয় ছাত্ররা ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হয় এবং পরবর্তীকালে ভারতের নবজাগরণে তারাই বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতে ইংরেজী ভাষা-সাহিত্য-ভিত্তিক এই নব শিক্ষাধারার জনক যে ডেভিড হেয়ার ছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

(৪) স্কুল বুক সোসাইটি

সে সময় স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের একান্তই অভাব ছিল। এই অভাব দূর করার জন্য ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ সালে ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি গঠন করেন। এই সোসাইটির উদ্যোগে স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপযোগী নানা বই প্রকাশিত ও মুদ্রিত হয়। রাধাকান্ত দেব ও বহু শিক্ষিত বাঙালী হেয়ারের এই কাজে সহায়তা করেন। ভারতীয় শিক্ষার্থীদের উপযোগী আধুনিক পাঠ্যপুস্তক রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে এই সমিতিটির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি

১৮১৮ সালে ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল এ দেশে নতুন ধরনের স্কুল স্থাপন করা এবং দরিদ্র ছেলেদের বৃত্তি দেওয়া। হেয়ার এই প্রতিষ্ঠানটির ইউরোপীয় সম্পাদক ছিলেন।

(৬) ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজ

ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজের স্থাপনের ব্যাপারেও হেয়ার সক্রিয় ভূমিকা নেন। তিনি ভারতীয় ছাত্রদের চিকিৎসাবিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য উৎসাহ দেন। হেয়ার ১৮৩৭ সালে এই কলেজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত হন।

(৭) প্রাথমিক শিক্ষা

যদিও উচ্চশিক্ষার বিস্তারই ডেভিড হেয়ারের শিক্ষাপরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তবু এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের জন্যও ডেভিড হেয়ার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। আরপুলিতে হেয়ার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নিজে বহন করতেন।

(৮) স্ত্রীশিক্ষা

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারেও হেয়ারের আগ্রহ কম ছিল না। স্কুল সোসাইটির ইয়োরোপীয় সম্পাদক রূপে তিনি মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপনায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্কুল সোসাইটি ভারতীয় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তারের জন্য ব্যাপক আন্দোলন চালায় এবং ব্রিটিশ ও অন্যান্য বিদেশী প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ কাজে অনুপ্রাণিত করে তোলে। স্কুল সোসাইটির এ সাফল্যের পিছনে ডেভিড হেয়ারের প্রচুর অবদান ছিল।

(৯) ডেভিড হেয়ারের ভারতীয় শিক্ষায় অবদান :

সে সময়ে ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে নবজাগরণ দেখা দেয় এবং যার প্রত্যক্ষ ফলরূপে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম সুরু হয় এবং শেষ পর্যন্ত ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে, সেই নবজাগরণের একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন ডেভিড হেয়ার। ভারতের নব ভাবধারার নায়ক ডিরোজিও ডেভিড হেয়ারকে এ দেশে অশিক্ষা দূরীকরণের ক্ষেত্রে 'প্রভাতী তারা' বলে বর্ণনা করেন।

ডেভিড হেয়ার নিজে উচ্চশিক্ষিত না হলেও তিনি শিক্ষাকে ভালবাসতেন। আবার সেই সঙ্গে তিনি ভারত ও ভারতবাসীদেরও আন্তরিকভাবে ভালবেসেছিলেন। ভারত-বাসীদের মধ্যে যখন নব চেতনার উন্মেষণ সবে সুরু হয়েছিল সে সময়ে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ছিল আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভাণ্ডারের দরজাটি তাদের সামনে খুলে দেওয়া। কিন্তু সে সময়ে ভারতবাসীর এই বর্ধমান জ্ঞানের তৃষ্ণা মিটাবার মত শিক্ষায়তন এদেশে একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। কলকাতায় শেরবার্ন এবং ড্রামণ্ড নামে দু'একটি মাত্র আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার স্কুল ছিল। সরকারী শিক্ষায়তন বলতে হিন্দুদের জন্য ছিল সংস্কৃত কলেজ এবং মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা। ১৮১৩ সালে শিক্ষার জন্য একলক্ষ টাকা বরাদ্দ হলেও সে টাকা ব্যয়িত হত প্রাচ্য শিক্ষার চর্চা ও প্রসারের জন্য।

এই সময় ভারতবাসীদের এই গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন ডেভিড হেয়ার উপলব্ধি করেছিলেন এবং যাতে ভারতবাসী আধুনিক শিক্ষালাভ করতে পারে তার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত জীবনটাই উৎসর্গ করেন। এ কারণে এ দেশে কেবলমাত্র কয়েকটি বিদ্যালয় স্থাপন করার কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করলেই ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে হেয়ারের অবদানের কথা সম্পূর্ণ বলা হবে না। ডেভিড হেয়ারকে ভারতের ইতিহাসে একটি 'নতুন যুগের অগ্রদূত' বলে অভিহিত করা উচিত।

Q. 14. Discuss, in brief, the educational enterprise of Bethune

উত্তর। জে ই. ডি. বেথুন ও তাঁর শিক্ষাপ্রচেষ্টা

সে সময় কয়েকজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ সরকারী কর্মচারীও ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার দৈন্য-দশা দেখে ক্ষুব্ধ হন এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ দেশের শিক্ষার উন্নয়নের উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথমেই জে. ই. ডি বেথুনের (J. E. D. Bethune) নাম করতে হয়।

ভারতের গভর্নর জেনারেলের কার্যকরী সমিতির আইনসংক্রান্ত সদস্যরূপে এবং কাউন্সিল অফ এডুকেশনের সভাপতিরূপে বেথুন ভারতে আসেন। তিনি নিজে উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ভারতে স্ত্রীশিক্ষার অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখে তিনি এখানে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসারের সংকল্প গ্রহণ করেন। সে সময় ইংরাজ সরকার এ দেশে স্ত্রীশিক্ষার মত বিতর্কমূলক

একটি ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কথা চিন্তা করেন নি। বেথুন আরও বুঝেছিলেন যে ধর্মীয় কারণে মিশনারীদের পরিচালিত স্কুল কলেজে এ দেশের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা কখনই তাঁদের মেয়েদের পাঠাবেন না। সেজন্য বেথুন সিদ্ধান্ত করলেন যে তিনি সম্পূর্ণ নিজের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এ দেশের মেয়েদের জন্য এমন একটি স্কুল খুলবেন যেখানে আধুনিক শিক্ষা দেওয়া হবে কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। বেথুনের এই পরিকল্পনার ফলরূপে ১৮৪৯ সালে কলকাতায় বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়।

এই স্কুলটি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে বিপুল সাড়া দেখা দেয়। বস্তুতঃ খৃষ্টধর্মের শিক্ষা দেওয়া হত বলে এদেশের হিন্দু ভদ্রলোকেরা মিশনারীদের পরিচালিত স্কুলে মেয়েদের পাঠাতে রাজী হন নি। বেথুনের স্কুলটিতে খৃস্টধর্ম শিক্ষা দেবার কোনও আয়োজন না থাকায় উচ্চবর্ণের হিন্দুরা বিনা দ্বিধায় সেখানে মেয়েদের পাঠাতে সুরু করলেন। এতেই বোঝা যায় যে, সে সময়ে ভারতীয়রা শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হয়ে ওঠেন এবং মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধেও বহু শতাব্দীর যে রক্ষণশীলতার মনোভাব তাঁদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তাও তাঁরা কাটিয়ে উঠেছিলেন। এদিক দিয়ে .. বেথুনের স্কুলটি ভারতীয়দের মধ্যে নবচেতনার উন্মেষণে বিশেষ সহায়তা করে।

বেথুনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অনেক ভারতীয় এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বেথুন নিজেই তিনজনের নাম বিশেষ করে উল্লেখ করেন। তাঁরা হলেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং মদনমোহন তর্কলঙ্কার। দক্ষিণারঞ্জন স্কুল বাড়ীর জায়গা দেন এবং দশ হাজার টাকা অনুদান দেন। রামগোপাল ঘোষ প্রথম থেকেই বেথুনকে উৎসাহ ও পরামর্শ দেন এবং তাঁর স্কুলের জন্য প্রথম ছাত্রী সংগ্রহ করে দেন। মদনমোহন নিজের দুই মেয়েকে স্কুলে পাঠান এবং বিনা পারিশ্রমিকে স্কুলে এসে বাংলা শিক্ষাদান করে যেতেন।

১৮৫১ সালে বেথুন মারা যান। লর্ড ডালহৌসী সেই সময় স্কুলটির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। পরে কোম্পানী সরাসরি স্কুলটি অধিগ্রহণ করেন। স্কুলটির পরে একটি কলেজ শাখাও খোলা হয়।

বেথুন স্কুলের স্থাপনের পর থেকেই নানা জায়গায় মেয়েদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠিত হতে সুরু হয়। অনেক ভারতীয়ই মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের জন্য এগিয়ে আসেন এবং অর্থ ও পরিশ্রম দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তারে সাহায্য করেন। এদিক দিয়ে বেথুনের অবদান কেবলমাত্র মেয়েদের জন্য একটি স্কুল স্থাপনেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয় তিনি এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনের উদ্বোধক ছিলেন। ভারতে আধুনিক স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে বেথুনের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

Q. 15. Sketch briefly the contributions of Raja Radhakanta Deb to the spread of education in Bengal.

উত্তর। (১) ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন ব্যক্তি সক্রিয়ভাবে এ দেশে শিক্ষার প্রসারে অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে শব্দকল্পদ্রুম প্রণেতা রাধাকান্ত দেবের নাম প্রথমেই করতে হয়। তিনি কিন্তু প্রাচীনপন্থী ছিলেন এবং রামমোহন, ডিরোজিও প্রভৃতি প্রগতিশীল সংস্কারকের প্রচেষ্টার প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেন। তা সত্ত্বেও বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

রাধাকান্ত দেব সে সময়ের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শোভাবাজারের রাজবাড়ীর ছেলে ছিলেন। যে সনাতনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দুদল রামমোহন রায়ের সমাজ-সংস্কারের আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল তিনি সেই দলের নেতা ছিলেন। হিন্দুধর্মের ঐতিহ্য ও প্রচলিত প্রথা-পদ্ধতির উপর তাঁর অগাধ নিষ্ঠা ছিল এবং সেগুলোর যে-কোনও রকম সংস্কারেরই তিনি বিরোধী ছিলেন। এজন্য তিনি রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজ গঠনের তীব্র বিরোধিতা করেন এবং রক্ষণশীল হিন্দুদের নিয়ে একটি গোষ্ঠী গঠন করে রামমোহনকে একরকম একঘরে করে রাখেন।

পরবর্তীকালে যখন ডিরোজিও ও তাঁর ছাত্রদল হিন্দুধর্ম-বিরোধী উগ্র মতবাদ প্রচার সুরু করেন তখনও রাধাকান্ত দেব ও তাঁর গোষ্ঠী ডিরোজিওর বিরোধিতা করেছিলেন এবং তাঁর প্রচেষ্টাতেই ডিরোজিওকে হিন্দুস্কুলের শিক্ষকপদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিল।

বিদ্যাসাগরের সামাজিক ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টাগুলোরও রাধাকান্ত বিপক্ষে ছিলেন। এমন কি সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রচেষ্টারও তিনি বিরোধিতা করেন এবং বিধবাবিবাহের প্রবর্তন ও বহুবিবাহরোধেরও তিনি বিরোধী ছিলেন। এক কথায় তিনি ছিলেন 'রক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুধর্মের সমর্থকগোষ্ঠীর প্রধান নেতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই সময়ে শিক্ষার প্রসার ও প্রবর্তনে রাধাকান্ত দেবের ভূমিকা কম উল্লেখযোগ্য নয়। তিনি হিন্দুধর্মের প্রচলিত প্রথা পদ্ধতির পরিবর্তনের সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যথেষ্ট প্রগতিশীল ছিল। হিন্দু কলেজ স্থাপনে যাঁরা উদ্যোগী ছিলেন রাধাকান্ত দেব তাঁদের অন্যতম। হিন্দু কলেজের প্রথম সাব কমিটির তিনি সদস্য ছিলেন এবং পরবর্তী চৌত্রিশ বৎসর তিনি ঐ শিক্ষায়তনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ঐ কলেজের পরিশাসনের ব্যাপারে রাধাকান্ত দেব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর বদান্যতায় অনেক ছাত্র বিনা বেতনে হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভ করেছিল।

(২) কার্যাবলী

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের প্রধানেরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের চেষ্টাকে সমর্থন করেন—রাধাকান্ত দেবও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। অর্থকরী বিদ্যোপার্জনের

আবশ্যকতাকেও তাঁরা শাস্ত্রসিদ্ধ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু অপরদিকে কোন কোন প্রগতিশীল আন্দোলনকে রক্ষণশীল হিন্দুরা সমর্থন করেন নি। রাধাকান্ত দেব এবং ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রক্ষণশীল হিন্দুরা সহমরণ প্রথার সপক্ষে আন্দোলন উপস্থিত করেন। রামমোহন রায়, কালীনাথ চৌধুরী, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি সহমরণ-প্রথার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু করেন এই আন্দোলন তারই প্রতিক্রিয়া। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী গোপীমোহন দেব, রাধাকান্ত দেব, নিমাইচাঁদ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকৃষ্ণ দেববাহাদুর, গোকুলনাথ মল্লিক, রামগোপাল মল্লিক, ভবানীচন্দ্র মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিরা বেণ্টিঙ্কের নিকট উপস্থিত হয়ে সতীদাহ প্রথার সপক্ষে এক দরখাস্ত দাখিল করেন। সতীদাহ নিবারণ-আইনজারী হলে ১৮৩০খৃষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী রক্ষণশীল হিন্দুরা স্বধর্ম রক্ষার জন্য একটি ধর্মসভা স্থাপন করেন। সহমরণ নিবারণের আইন রদ করাই এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তবে তাদের এই উদ্দেশ্য সফল হয় নি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মসভার সদস্যগণ সফলতা লাভ করেন। ডিরোজিওর শিক্ষায় প্রণোদিত ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করার জন্য তাঁরা ডিরোজিওকে কলেজ ত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

প্রাপ্তবয়স্কেরা এবং যাঁরা স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারেন নি তাঁরা যাতে পরবর্তী জীবনে বিদ্যাচর্চা করতে পারেন সেজন্য গৌড়ীয় সমাজ নামে একটি ক্লাব স্থাপিত হয়। রাধাকান্ত দেবও এই সভার সহিত যুক্ত ছিলেন। হিন্দু কলেজের সঙ্গেও রাধাকান্ত দেব প্রথম থেকেই যুক্ত ছিলেন কিন্তু পরে কলেজের মূলনীতি নিয়ে কলেজের প্রেসিডেণ্ট বেথুন ও রাধাকান্ত দেবের মধ্যে দীর্ঘকাল তুমুল বাদানুবাদ চলে এবং পরিশেষে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন রাধাকান্ত কলেজের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

রাধাকান্ত মদ্যপানেরও বিরোধী ছিলেন। প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গদেশীয় মাদক দ্রব্য নিবারণী সভা স্থাপিত হয়। রাধাকান্ত এই সভার সম্পাদককে এক পত্র লেখেন, "Hailed with joy inauguration of their society, promised to take the deepest interest in its progress, and to give his cordial concurrence to all measures it may adopt for the eradication of the dreadful vice and the reclaiming of those who have succumbed to its influence."

(৩) ধর্মসহিষ্ণুতা

নিজের ধর্মমত সম্পর্কে অত্যন্ত গোঁড়া হলেও রাধাকান্ত অপরের ধর্মমতের বিষয়ে সহনশীল ছিলেন না একথা ঠিক নয়। তবে হিন্দু ধর্মের উপর অপর ধর্মের আক্রমণ রোধ করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেন। রাজা রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজকে তিনি বরদাস্ত করতে পারেন নি। অপর ধর্মের প্রতি রাধাকান্তের মনোভাবের কথা তাঁর জীবনীতে এইভাবে উল্লেখ করা হয়। "Although he is a strict adherent of the esoteric doctrines of Hinduism, he is tolerant to the faith

of others, he believes and has often declared openly, that whatever may be the different outward forms of religion amongst the different nations of the earth, they all worship in effect the one and the same God, that a sincere and strict observance of the doctrine of morality, combined with a firm belief in an All-wise, All-powerful and All-merciful Deity, cannot but led to ultimate happiness."

(৪) শিক্ষাপ্রসারের প্রতি অনুরাগ

ধর্ম বিষয়ে রাধাকান্ত দেবের সঙ্কীর্ণতা ছিল। তিনি রামমোহনের সতীদাহ নিবারণ আন্দোলন এবং বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলনের প্রতিকূলতা করেন। কিন্তু শিক্ষার ব্যাপারে রাধাকান্ত চির উদার ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজে শব ব্যবচ্ছেদের ব্যাপারে কোন আপত্তি তোলেন নি।

রক্ষণশীল মনোভাবসম্পন্ন হলেও রাধাকান্ত দেব ইংরেজী শিক্ষার পরম সমর্থক ছিলেন। হিন্দু কলেজের স্থাপন ও পরিচালনে তাঁর গভীর আগ্রহ থেকে একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। সেই সঙ্গে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের যৌক্তিকতাও রাধাকান্ত দেব উপলব্ধি করেছিলেন এবং ১৮৩১ সালে বাংলা পাঠশালা প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন।

ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে রাধাকান্ত উৎসাহী হলেও এবং মিশনারীদের শিক্ষাপ্রচারের কাজে যথেষ্ট প্রশংসা করলেও মিশনারীদের ধর্মীয় কার্যাবলীর তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রসিদ্ধ মিশনারী উইলিয়ম অ্যাডামকে হিন্দু কলেজের অধ্যাপক করার প্রস্তাব উঠলে তিনি বিরোধিতা করেন। তিনি হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্র ভর্তি করার প্রতিবাদে কলেজের পরিচালক সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের বিরোধিতা করার জন্য এবং ডিরোজিওর চরম মতবাদকে প্রতিহত করার জন্য 'ধর্মসভা' নামে একটি সমিতি গঠন করেন। এই সমিতি ডিরোজিও ও তার অনুগামীদের উগ্র মতবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীন আন্দোলন চালিয়ে যায়।

রাধাকান্ত দেব ইংরাজী ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রসারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। মেডিক্যাল কলেজে যখন শব ব্যবচ্ছেদ ব্যবস্থার প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠে তখন তিনি ঐ ব্যবস্থার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান। উচ্চশিক্ষার জন্য হিন্দু ছাত্রদের বিলাত যাত্রাকেও তিনি সমর্থন করেন এবং এ ব্যাপারে অনেককে অর্থসাহায্যও করেন।

তিনি ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি, ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি, এগ্রিকালচারাল এ্যাণ্ড হর্টিকালচারাল সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। তিনি চব্বিশ পরগণায় কৃষিকার্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা করেন। তিনি বাংলা বানানের উপর একটি বই লেখেন এবং ইংরাজী থেকে কতকগুলি উপকথার অনুবাদ করেন। সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তারের জন্যও তাঁর প্রচেষ্টা বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি তাঁর শব্দকল্পদ্রুম নামে বহু-খণ্ডবিশিষ্ট একটি সংস্কৃত অভিধান প্রকাশ করেন।

১৮৫৩ সালে রাধাকান্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল প্রভৃতির সহযোগে হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ স্থাপন করেন। এইটিই প্রথম জাতীয় কলেজ।

রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রসারেরও বিশেষ সমর্থক ছিলেন। তাঁর বাড়ীর মহিলারা সকলেই লেখাপড়া শিখেছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর সমর্থন জানিয়ে রাধাকান্ত প্রবন্ধ লেখেন এবং স্যার ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের মেয়েদের স্কুল স্থাপনের প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানান। বেথুন স্কুল স্থাপনের সময়েই রাধাকান্ত তাঁর নিজের বাড়ীতে একটি মেয়েদের স্কুল খোলেন। বস্তুতঃ ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম মেয়েদের স্কুল খোলার কৃতিত্ব রাধাকান্ত দেবেরই। তাঁর সহায়তায় গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার তাঁর স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক গ্রন্থ প্রকাশে সহায়ক হন। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ রাধাকান্ত দেব ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনকে এক পত্রে লেখেন, "....আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা, জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখবৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করে বলতে হইবে না।"

(৫) রাজনৈতিক চিন্তা

ধর্ম, ধর্মসংক্রান্ত বিষয় শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকলেও রাধাকান্ত দেব তদানীন্তন রাজনৈতিক চিন্তার সহিত সম্পর্ক শূন্য ছিলেন না। এই সময় বাংলা-দেশের ভূস্বামী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ক্রমে রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধতার দিকে অগ্রসর হতে শুরু করলে ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি স্থাপন করেন। রাধাকান্ত দেব এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হন এই সমিতির প্রথম সম্পাদক।

(৬) উপসংহার

রাধাকান্ত রক্ষণশীল পরিবারের প্রাচীন সংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্যে পালিত হন বলে দেশাচারের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। "He was an example of the conservative Hindu who would accept the utilitarian aspect of Western civilization and retain his faith in the old social customs." প্রাচীনের সহিত নবীনের সংঘর্ষে প্রাচীনের পক্ষপাতী রাধাকান্ত নিজের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন। বস্তুতঃ ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতা সংহত করার জন্য রাধাকান্তের মতো প্রাচীনের স্থিতিশীলতার প্রয়োজন ছিল। শিক্ষা প্রভৃতি অনেক ক্ষেত্রে রাধাকান্ত সমসাময়িক অনেকের তুলনায় দেশের কল্যাণ সাধনে অনেক বেশী তৎপর ছিলেন। শুধুমাত্র পুরাতনপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল বলে তাঁর নিন্দা করলে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মে অনুষ্ঠিত রাধাকান্তের স্মৃতিসভায় রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "To the remarks made on the Raja's retrograde movements and his obstructions to progress, I can only say that it is unfair to compare him with persons who

were his juniors in more than half a century, as unfair indeed, as it would be to disparage the statesmanship of a by-gone politician, such as Mr. Pitt, by saying that he was no reformer, or that he did not propose household suffrage. A man in this respect can only be compared with his own contemporaries Judged by such a standard, the Raja would certainly appear not behind, but of advance of his equals in age."

Q. 16. Give an account of the background of the introduction of English education in India.

উত্তর (১) ভূমিকা

প্রাচীন শিক্ষার বদলে আধুনিক শিক্ষা ভারতে প্রতিষ্ঠিত হল উনবিংশ শতকে। ইংরেজ শাসকদের মর্জিমত হঠাৎ এই শিক্ষা প্রচলিত হয় নি। কতকগুলি সামাজিক অর্থ-নৈতিক উপাদানের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল, তারই ফলে ইংরেজি শিক্ষার সূচনা হয়েছিল অবশ্যম্ভাবী রূপেই।

নবাব সিরাজদ্দৌলার কলকাতা আক্রমণের ফলে সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পলাশীতে ইংরেজদের জয় হওয়ার পরে কলকাতার গুরুত্ব অনেক বাড়ল। বোম্বাই ও মাদ্রাজে কোম্পানীর স্থানীয় কাউন্সিল থাকলেও কলকাতাই হল সুপ্রিম কাউন্সিলের কেন্দ্র। কাগজ কলমে মুর্শিদাবাদে শাসনকেন্দ্র থাকলেও প্রকৃত শাসনকেন্দ্র ছিল কলকাতা। কোম্পানীর বোর্ড অফ রেভিনিউ, বোর্ড অফ ট্রেড এবং সুপ্রিম কোর্টও হল কলকাতায়। সুতরাং কলকাতার চিন্তাই ক্রমে ক্রমে সারা ভারতের বিশেষ করে সারা বাংলার চিন্তা হয় উঠল।

(২) বিদ্যালয় স্থাপন

দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য অনেকেই জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় এসে উপস্থিত হতে শুরু করে এবং চাকুরী পাওয়ার প্রধান শর্তই ইংরেজী ভাষায় জ্ঞান। সুতরাং, ইংরেজি ভাষায় স্কুল খুললে ছাত্রের অভাব হবে না, এই ধারনার ফলে পাদরী ছাড়া অনেক বেসরকারী ইংরেজও অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে অনেক স্কুল স্থাপন করলেন। এদের মধ্যে প্রায় সবগুলিই ছিল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।

অষ্টাদশ শতকের গোড়া থেকে ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ে কলকাতায় যতগুলি স্কুল স্থাপিত হয়েছিল, তার মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যায় ইংরেজ সন্তানদের জন্য চ্যাপলেন বেলারমীর স্কুলের কথা। এই স্কুলে অবশ্য ক্রমে ক্রমে অন্যান্যদেরও নেওয়া হয়। কলকাতায় প্রথম "চ্যারিটি স্কুল" হয় ১৭৩৪ সনে। ১৭৪২ সনে স্কুলটি হল ফ্রি-স্কুল। ১৭৯৫ সনে এটিই হল জানবাজারের চ্যারিটি স্কুল। ১৭৫৮ সনে পাদরী কিয়ারস্যাণ্ডার মিশন চার্চ লেনে স্কুল স্থাপন করেন।

এইসব এবং আরও কিছু স্কুল হল মিশনারীদের উদ্যোগে। কিন্তু ইংরেজদের সাথে সান্নিধ্যের ফলে ততদিনে কলকাতা এবং আশেপাশের একশ্রেণীর মানুষের মধ্যে ইংরেজি শিখবার আগ্রহ বেড়েছে। তাই কিছু কিছু অ-মিশনারী এবং বেসরকারী ইংরেজ পুরুষ ও মহিলা ব্যক্তিগত কিংবা গোষ্ঠীগত চেষ্টায় স্কুল খুললেন। এ দেশের অভিজাত মানুষরাও ছেলেদের "ভবিষ্যৎ" তৈরীর জন্য ঐ সব স্কুলে ভর্তি করতে লাগলেন। ইংরেজী শিখবার আগ্রহ যে বাড়ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সাহেবদের সাথে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী হয়তো অনেকেই বলতেন। অবশ্য প্রথম, প্রকৃত ইংরেজী জ্ঞানসম্পন্ন বাঙ্গালীদের অন্যতম হিসেবে নাম করা যায় পাথুরিয়াঘাটার রামলোচন ঘোষের। খুব তাড়াতাড়ি তাঁর মত আরও কিছু বাঙ্গালী তৈরী হলেন।

বস্তুতঃ যে সব বাঙ্গালী তখন চাকুরি কিম্বা ব্যবসা করতে চাইতেন, তাঁদের শিখতে হত ফারসী, কারণ উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ফারসীই ছিল রাষ্ট্রভাষা। অপর-দিকে ইংরেজীও দরকার হল, কারণ ইংরেজী ভাষাই হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যের এবং ভবিষ্যৎ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ভাষা। প্রাচীন ভাষাও তখনকার শিক্ষিতরা অনেকেই জানতেন। সুতরাং তখনকার কলকাতা সমাজে অনেক বাঙ্গালীই ছিলেন বহুভাষী। এ জন্যই অনেক ইংরেজী স্কুলও তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে গেল।

১৭৬০ সনে স্থাপিত হল হেজ' এর বালিকা বিদ্যালয়। এটিই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। ১৭৬৮ সনে আর একটি স্কুলও গড়লেন আর একজন মহিলা, শ্রীমতী বোল্ট। ১৭৭১ সনে হল মেয়েদের আরও একটি স্কুল—শ্রীমতী ডুরেলের সেমিনারী। তারপর একে একে ১৭৮০ সনে হজ' এর স্কুল, ১৭৮১ সনে বৈঠকখানায় গ্রিফিথ'-এর বোর্ডিং স্কুল, ১৮৮২ সনে কিলপ্যাট্রিকের "আপার এণ্ড লোয়ার অরফ্যান স্কুল", ১৭৮৩ সনে খিদিরপুরের মিলিটারী অরফ্যান স্কুল এবং ১৭৮৪ মনে স্থাপিত হল চিৎপুর বয়েজ বোর্ডিং স্কুল। ঐ বছরই প্রতিষ্ঠিত হল বিখ্যাত সেরবোর্ণ সেমিনারী সেখানকার ছাত্র দ্বারকনাথ ঠাকুর, হরকুমার ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং পরবর্তীকালে রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ অনেক বাঙ্গালী মনীষী। ১৭৮৬ সনে হল আমড়াতলায় মার্টিন বাউলের স্কুল। ১৭৯১ সনে কলুটোলার রামজয় দত্ত স্থাপন করলেন একটি স্কুল। যতদূর জানা যায় রামজয় দত্ত'র এই স্কুলটিই ছিল বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইংরেজী স্কুল। ১৭৯৩ সনে হল ইউনিয়ন স্কুল। ১৭৯৮ সনে স্কুল গড়লেন মিঃ আর্চার। ১৭৯৯ সনে হল ফ্যারেল সেমিনারী। ১৮০০ সনে সৃষ্টি হল মিঃ রীডের:স্কুল এবং ক্যালকাটা একাডেমী।

এই তালিকাটি আরও বড় করার কোন প্রয়োজন নেই তবে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পরে অষ্টাদশ শতকের বাকি ৪০ বছরের মধ্যেই বাস্তব জীবনের প্রভাবে যেভাবে ইংরেজীর পরিবেশ একটু একটু করে তৈরী হচ্ছিল, সেটি ব্যাখ্যা করাই এই তালিকার উদ্দেশ্য। বোম্বাই এবং মাদ্রাজেও হল এ রকম অবস্থা। তারই ফলে তাঞ্জোরের ইংরেজ কর্মচারী সুলিভান এ দেশে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রস্তাব করলেন। ইংরেজী শিক্ষার

পক্ষে বিলেতে হৈচৈ করলেন চার্লস গ্র্যান্ট। ঐ দাবিতে বিলেতের পার্লামেন্টে প্রস্তাবও আনলেন মিঃ উইলবারফোর্স।

(৩) ইংরেজদের প্রচেষ্টা

কিন্তু ভারতে কর্মরত প্রধান প্রধান ইংরেজ কর্মচারীই তখনও প্রাচ্য শিক্ষাকে উৎসাহ দেওয়ার নীতিই অনুসরণ করে চললেন। কলকাতায় মাদ্রাসা এবং বারানসীর সংস্কৃত কলেজ তারাই স্থাপন করেন। অবশ্য এইসব প্রতিষ্ঠানেও ক্রমে ক্রমে ইংরেজী অনুপ্রবেশ করল। ১৭৮৪ সনে স্যার উইলিয়াম জোনস্-এর উদ্যোগে স্থাপিত হল "এশিয়াটিক সোসাইটি"। দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের ভারততত্ত্ব অনুশীলনের সূচনা হল। এ সূত্রে ভারত সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যোগাযোগও হল।

অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কয়েকজন ইংরেজ আমাদের দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এঁদের কাজ কেবল স্কুল প্রতিষ্ঠায় সীমাবদ্ধ না থেকে আমাদের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক জীবনেই প্রভাব বিস্তার করেছিল। এইসব ব্যক্তি সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ আলোচনা দরকার।

(8) ন্যাথানিয়েল ব্রাসে হলহেড

আজ থেকে দু'শ বছর আগে লেখেন "A Grammar of Bengal Language." ১৭৭৮ সনে প্রকাশিত এই গ্রন্থই প্রথম প্রকাশিত বাংলা ব্যাকরণ। হলহেডের জন্ম হয়েছিল ১৭৫১ সনের ২৫শে মে। তাঁর দাদু ছিলেন ব্যাঙ্কার এবং বাবা উইলিয়াম হলহেড ছিলেন ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের পরিচালক সভার সদস্য। অক্সফোর্ডের ক্রাইষ্ট কলেজেই ন্যাথানিয়েল পড়াশুনা করেন। ১৭৭২ সনে কোম্পানীর অধীনে ফারসী অনুবাদকের চাকুরি নিয়ে তিনি ভারতে আসেন। সংস্কৃতে পারদর্শিতার জন্য তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। ভাগবত গীতা, হিতোপদেশ, শকুন্তলা উপাখ্যানের ইংরেজি অনুবাদ তাঁর কৃতিত্বের পরিচয়। বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস' এর অনুরোধে তিনি একখানি নিয়মবিধিও ফারসী থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। বইখানির নাম হয় "Code of Gentu Laws" (১৭৭৬)। কর্মময় জীবনের পরে দেশে ফিরে ইংলণ্ডেই হলহেড মারা যান ১৮৩০ সনে।

(৫) চার্লস্ উইলকিনস্

চার্লস উইলকিনসের জন্ম হয় ১৭৪৪ (দ্বিমতে ১৭৫০) সনে। কুড়ি বছর বয়সে কোম্পানীর কেরানী হয়ে তিনি ভারতে আসেন। ন্যাথানিয়েল হলহেডের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। এত ভাল করে তিনি সংস্কৃত শেখেন যে ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরূপে তাঁকে অভিহিত করা যায়। ১৭৭৮ সন থেকে তিনি মহাভারতের অনুবাদ সুরু করেন এবং ১৭৮৫ সনে গীতার অনুবাদ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের পিছনেও তাঁর উৎসাহ ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বড়কথা তিনিই হলহেডের ব্যাকরণ বই ছাপানোর জন্য বাংলা টাইপ সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। ওই বিখ্যাত গ্রন্থের মুদ্রকও তিনি। তাঁকেই ভারতের ক্যাক্সটন এবং বাংলা মুদ্রণের জনক বলা যায়। ১৮৩৫ সনে ইংলণ্ডে তাঁর মৃত্যু হয়।

শাসন কাজে লিপ্ত থাকবার সময় ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নানা অন্যায়ের অভিযোগে ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলেতের পার্লামেন্ট দরবারে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিলেন। প্রায় নিঃসম্বল অবস্থাতেই তিনি মারা যান। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করতে যেসব ইংরেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, ওয়ারেন হেষ্টিংস ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম অগ্রগণ্য ব্যক্তি। এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পিছনে তাঁর সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। কলকাতা মাদ্রাসা তিনিই স্থাপন করেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত এর ব্যয়ও বহন করেন। তাঁরই উৎসাহে তাঁর অনুগত জোনাথন ডানকান্ বেনারস সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা শিখতে এবং সেই সব ভাষায় সাহিত্য পড়তেও তিনি উৎসাহিত করেন।

১৭৭৪ সনের আগেই ওয়ারেন হেষ্টিংস আরবীতে লেখা "ফতোয়া অল আলমগিরি" বই সংগ্রহ করেন এবং মৌলভী ইয়াহিয়া এবং তাঁর তিন বন্ধুকে দিয়ে ফারসীতে অনুবাদ করান। এজন্য প্রয়োজনীয় ব্যয়ও তিনি নিজেই বহন করেন। ডেভিড এ্যাণ্ডারসন এই বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এই সব পণ্ডিতদেরই তিনি ১৭৭৬ সনে দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত 'হিদায়া' অনুবাদে উৎসাহিত করেন। ১৭৮৩ সনে চার্লস হামিল্টন এই কাজ শেষ করেন। ফ্রান্সিস গ্লাডউইনের "আইন-ই-আকবরীর" প্রকাশেও ছিল হেষ্টিংস'এর পৃষ্ঠপোষকতা।

১৭৭৩ সনে সংস্কৃতে তৈরি নিয়মবিধির ফারসী সংস্করণ হয় ১৭৭৫। হেষ্টিংসই এর ইংরেজী অনুবাদ তৈরি করতে হলহেডকে অনুরোধ করেন। তার ফলশ্রুতি হল ১৭৭৬ সনের "Code of Gentu Laws," প্যারিস থেকে ১৭৭৮ সনে এই বইয়ের ফরাসী সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

ইতিমধ্যে হলহেডের ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি তৈরি হয়েছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য বলে উইলকিন্স্ সেটি ছাপাতে পারছেন না। ১৭৭৮ সনের ৯ই জানুয়ারী ওয়ারেন হেষ্টিংস কাউন্সিল বৈঠকে প্রস্তাব করলেন—ঐ বই ঈপ্সিত মুদ্রিতাকারে প্রতিখানা ৩০ টাকা দামে এক হাজারখানা কোম্পানীই অগ্রিম কিনে নিক এবং সেই টাকা গ্রন্থকার ও মুদ্রককে অগ্রিম দেওয়া হোক। হলহেডের ব্যাকরণ সেই বছরই আগস্ট মাসে প্রকাশিত হয়েছিল।

(৬) স্যার উইলিয়াম জোনস্

স্যার উইলিয়াম জোনস্ ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। এই সংস্কৃতজ্ঞ ভারততত্ত্ববিদ কেবল শিক্ষাতেই উৎসাহী ছিলেন না। সমাজ সংস্কারেও উৎসাহী ছিলেন বলে দাসপ্রথা বিরোধী আন্দোলনের উদ্যোক্তা হয়েছিলেন। সর্বোপরি ভারতে ঐতিহ্য সম্পন্ন সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃই ঐ সংস্কৃতির খনি থেকে মণি অনুসন্ধানের জন্য ১৭৮৪ সনের ১৫ই জানুয়ারীতে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটিরও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন তিনিই।

(৭) গ্রান্টের আন্দোলন

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানী দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সামান্য কিছু করলেও শিক্ষা-

বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন দায়িত্ব আছে, একথা স্বীকার করে নি। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ও সরকারী সাহায্যের অভাবে দেশী বিদ্যালয়গুলো ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিশনারীদের কার্যকলাপে কোম্পানীর তরফ থেকে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় এ দেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেও শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল না। কোম্পানীর মিশনারী বিদ্বেষের ফলে ইংলণ্ডে মিশনারীগণ প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন। চার্লস গ্রাণ্ট নামক কোম্পানীর এক প্রাক্তন কর্মচারী ইংলণ্ডে মিশনারীদের পক্ষ নিয়ে কোম্পানীর মিশনারী বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৭৯২ খ্রীঃ গ্রাণ্ট ভারতীয় সমাজের শোচনীয় নৈতিক অবস্থার বর্ণনা করে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। গ্রাণ্টের পুস্তিকাকে 'Observation' বলা হয়। এই পুস্তিকায় তিনি ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। গ্রাণ্ট প্রস্তাব করেন, ভারতীয়দের উন্নতির জন্য ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে হবে, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে হবে; দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলেও গ্রাণ্টের কোন কোন অভিমতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ১৭৯২ খ্রীঃ তিনি ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের যে প্রস্তাব করেছিলেন, চল্লিশ বছর বাদে লর্ড বেন্টিঙ্ক সরকারীভাবে সেই নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহশীল। ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হলে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভীড় করবে। ইংরেজী ভাষাকে সরকারী কাজকর্মের ভাষারূপে গ্রহণ করবার উপদেশও তিনি দিয়েছিলেন। ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্ব সম্পর্কে জনমত গঠনে যে গ্রাণ্টের মতামত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা অনস্বীকার্য।

১৭৯৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ নতুন করে অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হয়। এই সময়ে দাসপ্রথা উচ্ছেদ-আন্দোলনের প্রখ্যাত উদারনৈতিক নেতা উইলবার ফোর্স শিক্ষা-বিষয়ক একটি ধারা সনদে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কোম্পানী ভারতে শিক্ষার জন্য কোন আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে রাজী ছিলেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল লেখাপড়া শিখিয়ে আমেরিকা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, ভারতীয়দের আর লেখাপড়া শিখিয়ে কাজ নেই। একটা সাম্রাজ্য হারিয়ে অন্য আর একটা সাম্রাজ্য হারাবার ঝুঁকি ব্যবসায়ী কোম্পানী নিতে রাজী ছিল না। তাই কোম্পানীর বিরোধিতায় উইলবারফোর্সের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। পার্লামেণ্টে পরাজয়ের পরও গ্রাণ্টের আন্দোলন বন্ধ হয় নি। কিছুদিন বাদে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়। গ্রাণ্টের আন্দোলন আরও তীব্র হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে এই সব ব্যক্তিদের আন্দোলনের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৮৩৩ ও ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ দানের সময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট একটি নীতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়।

Q 17. What were the fundamental attitudes of Charles Grant towards India ? Why did he advocate English education in India

উত্তর। (১) গ্রাণ্টের চিন্তাধারা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য সামান্য কিছু করলেও শিক্ষা-বিস্তারে প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন দায়িত্ব আছে,একথা স্বীকার করে নি। অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ও সরকারী সাহায্যের অভাবে দেশীয় বিদ্যালয়গুলি ধীরে ধীরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাচ্ছিল। মিশনারীদের কার্যকলাপে কোম্পানীর তরফ থেকে বাধা সৃষ্টি হওয়ায় এদেশে মিশনারীদের প্রচেষ্টাতেও শিক্ষার প্রসার হচ্ছিল না। কোম্পানীর মিশনারী বিদ্বেষের ফলে ইংলণ্ডে মিশনারীগণ প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করেন। চার্লস গ্রাণ্ট নামক কোম্পানীর এক প্রাক্তন কর্মচারী ইংলণ্ডে মিশনারীদের পক্ষ নিয়ে কোম্পানীর মিশনারী বিরোধিতার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৭৯২ খ্রীঃ গ্রাণ্ট ভারতীয় সমাজের শোচনীয় নৈতিক অবস্থার বর্ণনা করে একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। গ্রাণ্টের পুস্তিকাকে 'Observation' বলা হয়। এই পুস্তিকায় তিনি ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। গ্রাণ্ট প্রস্তাব করেন,ভারতীয়দের উন্নতির জন্য ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার করতে হবে, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দিতে হবে, দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্র সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করলেও গ্রাণ্টের কোন কোন অভিমতের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। ১৭৯২ খ্রীঃ তিনি ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা-বিস্তারের যে প্রস্তাব করেছিলেন, চল্লিশ বছর বাদে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সরকারীভাবে সেই নীতি গ্রহণ করেন। তিনি ঠিকই বলেছিলেন, ভারতীয়গণ ইংরেজী শিক্ষাগ্রহণে আগ্রহশীল। ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হলে দলে দলে ভারতীয় ছাত্র ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভীড় করবে। ইংরেজী ভাষাকে সরকারী কাজকর্মের ভাষারূপে গ্রহণ করবার উপদেশও তিনিই দিয়েছিলেন। ভারতে শিক্ষা-বিস্তারে কোম্পানীর দায়িত্ব সম্পর্কে জনমত গঠনে যে গ্রাণ্টের মতামত বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা অনস্বীকার্য।

১৭৯৩ খ্রীঃ কোম্পানীর সনদ নতুন করে অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্টে উপস্থিত করা হয়। এই সময়ে দাসত্বপ্রথা উচ্ছেদ-আন্দোলনের প্রখ্যাত উদারনৈতিক নেতা উইলবার ফোর্স শিক্ষা-বিষয়ক একটি ধারা সনদে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী করেন। কোম্পানী কর্তৃপক্ষ তীব্রভাবে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। কোম্পানী ভারতে শিক্ষার জন্য কোন আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণে রাজী ছিলেন না। তাঁদের যুক্তি ছিল লেখাপড়া শিখিয়ে আমেরিকা হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে, ভারতীয়দের আর লেখাপড়া শিখিয়ে কাজ নেই। একটা সাম্রাজ্য হারিয়ে অন্য আর একটা সাম্রাজ্য হারাবার ঝুঁকি ব্যবসায়ী কোম্পানী নিতে রাজী ছিল না। তাই কোম্পানীর বিরোধিতায় উইলবারফোর্সের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। পার্লামেণ্টে পরাজয়ের পরও গ্রাণ্টের আন্দোলন বন্ধ হয় নি। কিছুদিন

বাদে তিনি পুনরায় পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং কোম্পানীর কোর্ট অফ ডাইরেক্টরদের চেয়্যারম্যান নিযুক্ত হন। গ্রান্টের আন্দোলন আরও তীব্র হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে,এইসব ব্যক্তিদের আন্দোলনের ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ১৮৩৩ ও ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ দানের সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট একটি নীতি গ্রহণ করতে নির্দেশ দেয়।

(২) গ্রান্টের ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্য

চার্লস গ্রান্ট মনে করতেন যে ভারতীয়দের নৈতিকমান উন্নত করার জন্য ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন এবং ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচার একান্ত কর্তব্য। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতবাসীর নিকট চিন্তাধারার একটি নতুন জগৎ উন্মুক্ত হবে—"a key which will open to them a world of new ideas" তিনি আরও মনে করতেন যে মুসলমান শাসকগণ যেভাবে ভারতীয়দের ফারসী শিখতে বাধ্য করেছে, ইংরেজদের উচিত ঠিক সেভাবেই ভারতীয়দের ইংরেজী শিখতে বাধ্য করা। চার্লস গ্রান্ট নিজেই এই সম্পর্কে বলেন যে, "It will be extremely easy for Government to establish, at moderate expense in various parts of provinces, places of gratutious instruction in reading and writing English, multitudes, specially of the young, would flock to them and the easy books used in teaching might at the sametime convey obvious truths on different subjects The Hindus would in time became teachers of English themselves, and the employment of one language in public business, for which every political reasons remains in full force, would in the course of another generation, make it very general in the country. There is nothing wanting to the success of this plan but the hearty patronage of the Government"

(৩) উপসংহার

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরও এই দেশে ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তার সম্পর্কে কোন আগ্রহ প্রকাশ করে নি। সম্ভবতঃ কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল প্রয়োজন উপলব্ধি করে ভারতবাসীরাই এ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করলে স্বাভাবিকভাবেই ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন ভারতে শুরু হবে। কিন্তু চার্লস গ্রান্ট ও তাঁর সহযোগী উইলবারফোর্স ভারতে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের জন্য ইংলণ্ডে আন্দোলন শুরু করেন। আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুটি—(১) ভারতে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য খ্রীস্টান পাদ্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া এবং (২) ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়ে এ দেশের সর্বত্র শিক্ষার বহুল প্রচার করা। চার্লস গ্রান্ট ও উইলবারফোর্সের আন্দোলন ইংলণ্ডে জনমত গঠন করতে সমর্থ হলেও ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে পিটের ভারত

আইন প্রণয়নের সময় ভারতে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার অথবা পাদ্রীদের অবাধ গতিবিধি সম্পর্কে কোন কথাই উল্লেখ করা হয় নি, অথবা এই দুটি বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করারও কোন চেষ্টা করা হয় নি। সম্ভবতঃ ভারতীয়দের মনে যাতে কোন প্রকার সন্দেহের সৃষ্টি না হয় সে উদ্দেশ্যেই ব্রিটিশ শাসকগণ এরূপ নীতি গ্রহণ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সাময়িকভাবে চার্লস গ্রান্টের আন্দোলন সাফল্য লাভ না করলেও পরবর্তীকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নতুন সনদ দেওয়ার সময় এ দুটি দাবিকেই স্বীকার করে এবং কোম্পানীও ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়বরাদ্দ করতে এবং পাদ্রীদের ধর্মপ্রচারের অবাধ স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। সুতরাং চার্লস গ্রান্ট যে আন্দোলন শুরু করেন তা কোন ক্রমেই নিষ্ফল হয় নি।

Q 18. Give an account of Warren Hastings' contribution towards the development of the new literary movement in Bengal.

উত্তর। (১) ভূমিকা

শাসনকার্যে লিপ্ত থাকার সময় ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নানা অন্যায়ের অভিযোগে ওয়ারেন হেস্টিংস ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্টে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য হন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি প্রায় নিঃসম্বলও হয়ে পড়েন। কিন্তু ভারতে অবস্থানকালে তিনিই ইংরেজদের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রাচ্যদেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধনের জন্য সচেষ্ট হন। তিনি সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং বাংলা ও ফার্সীভাষা আয়ত্ত করে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য চেষ্টা করেন. তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্সী ভাষার একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করার চেষ্টা করেন। যদিও তাঁর এই চেষ্টা তখন সাফল্য লাভ করে নি। জনগণের বিখ্যাত জীবনীকার বসওয়েলও হেস্টিংসের সাহিত্যানুরাগের গভীর প্রশংসা করেন। ইংরেজী রচনাশৈলীও তাঁর প্রশংসনীয় ছিল এবং ব্যাবিংটন মেকলের মতে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের চিঠিপত্র রচনার পদ্ধতির গোড়াপত্তনের কৃতিত্ব হেস্টিংসেরই প্রাপ্য।

(২) কলকাতা মাদ্রাসা ও বেনারেস সংস্কৃত কলেজ স্থাপন

কেবলমাত্র শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগী হয়েই ওয়ারেন হেস্টিংস সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি ভারতে শিক্ষাবিস্তারের জন্যও চেষ্টা করতে শুরু করেন। মুসলিম শাসনকালে হিন্দুছাত্রগণ পণ্ডিতদের নিকট পাঠশালা ও টোলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করত এবং মুসলিম ছাত্রদের জন্য ছিল মৌলবীদের দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসা ও মক্তব। কিন্তু ভারতে মোগল শক্তির পতন ও নানাপ্রকার রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা থেকে বঞ্চিত হয় এবং ধীরে ধীরে অনেক প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে যেতে থাকে। ওয়ারেন হেস্টিংস এই অবস্থার অবসানকল্পে ভারতে পুনরায় প্রাচ্যজগতের জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুশীলনের উদ্দেশ্যে শিক্ষা সম্পর্কে একটি নতুন নীতি গ্রহণ করার চেষ্টা করেন। তিনি মুসলিম ছাত্রদের জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফার্সী তখনও বাংলাদেশের

সরকারী ভাষা সুতরাং তিনি অভিজাত মুসলিম সন্তানদের দায়িত্বপূর্ণ এবং লোভনীয় পদে নিযুক্ত করার জন্য উপযুক্তভাবে তৈরী করার উদ্দেশ্যে এই মাদ্রাসা স্থাপন করেন,— "to qualify the sons of Mahemmedan gentlemen for responsible and lucrative of the offices in state." ফলে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টায় ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, অলঙ্কার শাস্ত্র, ব্যাকরণ, আইন শাস্ত্র, প্রাকৃতিক দর্শন, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও গণিত শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আরবী ও ফার্সী ভাষার ও মুসলিম সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। কলকাতা মাদ্রাসার ব্যয়-নির্বাহের সম্পূর্ণ দায়িত্বও ওয়ারেন হেস্টিংস স্বয়ং গ্রহণ করেন। কলকাতা মাদ্রাসা বেনারেস সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের কৃতিত্বের একটি বিরাট অংশই ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রাপ্য। এই সময় বেনারেসে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংসের অনুগতবন্ধু জোনাথান ডানকান। ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহে জোনাথান ডানকান বেনারেস সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেই ওয়ারেন হেস্টিংস সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতীয় ভাষা শিখতে এবং সেইসব ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে উৎসাহিত করেন।

(৩) এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন

১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী ওয়ারেন হেস্টিংসের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় স্যার উইলিয়ম জোনস্ এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন। প্রাচ্যবিদ্যার সংরক্ষণ ও উন্নতিসাধনই ছিল এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতের ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা বশতঃ জোনস্ এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। স্যার উইলিয়ম জোনস ছিলেন সুপ্রীমকোর্টের অন্যতম বিচারক এবং প্রাচ্যভাষাবিদ্। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অন্যান্য ইয়োরোপীয় ভাষার সঙ্গে আরবী, ফার্সী, হিব্রু, চীনভাষা প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করেন। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতে আসেন এবং ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেন এবং ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে তার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ভারতে এসে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম তিনিই অনুবাদ করেন। 'হিন্দু আইন' নামে তিনি মনু-সংহিতারও একটি অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। হিতোপদেশ ও গীতগোবিন্দেরও তিনি অনুবাদ করেন। তিনি ফার্সী ভাষার একখানি ব্যাকরণ এবং মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের উপর একখানি গ্রন্থও রচনা করেন। এই সময় ইয়োরোপীয়দের মধ্যে ফার্সী ভাষায় অনেকের ব্যুৎপত্তি থাকলেও উইলিয়ম জোনসই প্রথম ইয়োরোপীয় যিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য যত্ন-সহকারে শেখার চেষ্টা করেন। তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ইয়োরোপের অনেক পণ্ডিতই সংস্কৃত ভাষা ও

সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হন এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব তখন থেকেই শিক্ষাজগতে প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

(৫) অনেক লেখকদের উৎসাহদান

১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেই ওয়ারেন হেস্টিংস আরবীতে লেখা 'ফতোয়া অল আলমগিরি' গ্রন্থখানি সংগ্রহ করেন এবং মৌলবী ইয়াহিয়া এবং তাঁর তিন বন্ধুকে দিয়ে এই গ্রন্থের ফারসী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয় ব্যয় তিনি নিজেই বহন করেন। পরে ডেভিড অ্যাণ্ডারসন এই গ্রন্থ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস মৌলবী ইয়াহিয়া এবং তাঁর সতীর্থদের সাহায্যে দ্বাদশ শতকের বিখ্যাত হিদায়া অনুবাদে উৎসাহিত করেন। চার্লস হ্যামিলটনও এই কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ফ্রান্সিস গ্লাডউইনের 'আইন-ই-আকবরী'র প্রকাশেও হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতা ও বদান্যতা ছিল।

১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কৃত ভাষায় 'নিয়মবিধি' প্রকাশিত হয় এবং ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে এই নিয়মবিধির ফার্সী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। হেস্টিংসকে এই গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রণয়নের জন্য মিস্টার হ্যালহেডকে অনুরোধ করেন। ফলে ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে Code of Gentu Laws প্রকাশিত হয় এবং ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে প্যারিস থেকে এই বই-এর ফারসী অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

ওয়ারেন হেস্টিংসের সমসাময়িক আর একজন প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ চার্লস উইলকিন্‌স। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী নিয়ে ভারতে আসার পর তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে ন্যাথানিয়েল হ্যালহেডের সঙ্গে। ভাগবত গীতা, হিতোপদেশ, শকুন্তলা উপাখ্যানে এবং Code of Gentu Laws অনুবাদের মাধ্যমে প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করে তিনি তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইতিমধ্যে উইলকিন্‌সও মহাভারতের ও গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপনের ব্যাপারেও তাঁর যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। উইলকিন্‌সের উৎসাহেই ন্যাথানিয়েল হ্যালহেড বাংলাভাষার একখানি ব্যাকরণের পাণ্ডুলিপি রচনা করেন। কিন্তু বাংলা টাইপ তৈরি করে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা অত্যন্ত ব্যয় সাধ্য বলে উইলকিন্‌স খুব অসুবিধায় পড়ে যান। বিষয়টি কর্ণগোচর হওয়ার পর ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দের ৯ই জানুয়ারী ওয়ারেন হেস্টিংস কাউন্সিলে প্রস্তাব করেন যে প্রতিখানি বই-এর জন্য অগ্রিম ত্রিশ টাকা মূল্য দিয়ে কোম্পানীর পক্ষ থেকে এক হাজার বই কিনে নিলে লেখক ও প্রকাশক অতি সহজেই এই বই প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রস্তাব কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ঐ বছরের অগাস্ট মাসে হ্যালহেডের বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসের কাছ থেকে সময়োচিত এবং উপযুক্ত সাহায্য না পেলে ন্যাথানিয়েল হ্যালহেডের ব্যাকরণ বই আদৌ প্রকাশিত হত কিনা তা বলা কঠিন।

(৬) উপসংহার

প্রাচ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আকর্ষণের জন্যই ওয়ারেন হেস্টিংস বিভিন্ন

শ্রেণীর লেখকদের নানাভাবে উৎসাহিত করেন। তবে এই সব লেখকদের অনেকেই ছিলেন অপেশাদার লেখক এবং জীবিকা অর্জনের জন্য বিভিন্ন কার্যে লিপ্ত। তাঁরা কেউ ছিলেন আইনবিদ, কেউ অনুবাদক, কেউ নগণ্য পদের রাজকর্মচারী। ফলে ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত, ফার্সী ও আরবী সাহিত্য ইয়োরোপীয় ভাষায় অনুবাদের একটি নতুন ধারা গড়ে উঠলেও এই ধারার ভিত্তি খুব দৃঢ় ছিল না অথবা তার এই প্রচেষ্টাও উপযুক্তভাবে সফল হয় নি। তবে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে ওয়ারেন হেস্টিংসের উৎসাহ প্রদান ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাচ্যের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যে আগ্রহের সৃষ্টি হয় পরবর্তীকালে তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে নতুন সেতু স্থাপন করতে সমর্থ হয়।

Q. 19. Write notes on William Jones and Colebroke.

উত্তর। (১) জীবনী

বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ স্যার উইলিয়ম জোনস্ ১৭৪৬ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় ইয়োরোপীয় ভাষা বাদেও আরবী, ফার্সী, হিব্রু ও চীনা ভাষা শিক্ষা করেন। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে তিনি ফার্সী ভাষায় রচিত নাদির শাহ জীবনী ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি ব্যারিস্টার হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন এবং ইংলণ্ডের আইন সম্পর্কে একখানি বই রচনা করে সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের অন্যতম বিচারক নিযুক্ত হন এবং স্যার উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতায় আসার পর তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের সহযোগিতায় ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'বেঙ্গল এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন করেন। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। এই সময় তিনি ভারতের বিচার বিভাগের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য হিন্দুদের আইনবিষয়ক মূলগ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে জানার প্রয়োজন অনুভব করেন। সুতরাং তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভালভাবে সংস্কৃত শিখতে শুরু করেন এবং সংস্কৃত ভাষা তিনি এরূপ ভাবে শিখতে সমর্থ হন যে অল্পদিনের মধ্যেই ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্-এর অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে হিন্দু আইন নামে তিনি মনুসংহিতার এবং হিতোপদেশ, গীতগোবিন্দ প্রভৃতি গ্রন্থও অনুবাদ করেন। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে ফার্সীভাষার তিনি একখানি ব্যাকরণ বইও রচনা করেন। ১৭৮২ খৃস্টাব্দে তিনি মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইন নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সেই সময়ে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু উইলিয়ম জোনসই একমাত্র ইংরেজ যিনি সংস্কৃত ভাষা অধিগত করে হিন্দুদের প্রাচীন সাহিত্য ইয়োরোপীয়দের মধ্যে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁর চেষ্টায়ই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব পঠন-পাঠন শুরু হয়।

(২) ভারত সম্পর্কে জোনসের দৃষ্টিভঙ্গী

বিচারক হিসাবে কলকাতার সুপ্রীম কোর্টে যোগদানের পূর্বেই বিভিন্ন ভাষা ও সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি খুব উচ্চধারণা পোষণ করতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন যে, "...a noble amphitheatre which has ever been esteemed the nurse of sciences, the inventress of delightful and useful arts, the scene of glorious actions, fertile in the productions of human genius, abounding in natural wonders and infinitely diversified in the forms of religion and government, in the laws, manners, customs and languages, as well as in the features and complexions of men" প্রকৃতপক্ষে শাসকগোষ্ঠীর উচ্চপদ অলঙ্কৃত করা সত্ত্বেও উইলিয়ম জোনস প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন প্রভৃতির প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হন এবং শাসক সুলভ উন্নাসিকতার দৃষ্টভঙ্গী পরিত্যাগ করে স্বচ্ছ অন্তদৃষ্টি নিয়ে ভারতকে বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেন। এই দৃষ্টভঙ্গীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করার চেষ্টা করেন। কারণ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল প্রাচীন এশিয়ার শিল্পকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্পর্কে যথাযথ অনুসন্ধান করা। এশিয়াটিক সোসাইটির উদ্বোধনী ভাষণে জোনস বলেন যে, You will investigate whatever is rare in the stupendous fabric of nature, will correct the geography of Asia by new observations and discoveries; will trace the annals and even traditions of these nations, which from time to time have peopled or desolated it, and will bring to light their various forms of government, with their institutions, civil and religious, you will examine their improvements and methods of arithmetic and geometry, in trigonometry, mensuration, mechanics, optics, astronomy and general physics, their system of morality, grammar, rhetoric and dialectic; the skill in chiurgery and medicine and their advancement, whatever it may be in anatomy and chemistry. To this you will add researches into their agriculture, manufacture and trade; and whilst you enquire with pleasure into their music, architecture, painting and poetry, will not neglect those inferior arts by which comforts and even elegances of social life, are supplied or improved." প্রাচ্য জগতের প্রতি গভীর আকর্ষণের জন্যই উইলিয়ম জোনস কেবলমাত্র তার জ্ঞান-বিজ্ঞান নয়, তাঁর জীবনের সামান্যতম বিষয়টির প্রতি গভীরভাবে অনুসন্ধান করার জন্য বিদগ্ধ সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

(৩) মূল্যায়ন

জোনসের সংস্কৃত ভাষা চর্চা ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদের নিকট একটি নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেয়। পরবর্তীকালে সংস্কৃত চর্চার ফলে প্রাচীন ভারতের উন্নত জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা বিশ্বের নিকট পরিচিত হয়ে ওঠে। বাংলা দেশ তথা ভারতের নবজাগরণের ক্ষেত্রেও এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধারের অবদান অপরিসীম। কারণ অন্তর্মুখী চিন্তাধারা যে-কোন সংস্কার বা যে-কোন দেশের নবজাগরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সম্পর্কে এম. জিরানাডে মন্তব্য করেন যে, "The true reformer has not to write on a clean slate. His work is more often to complete the half-written sentence." জোনসের আর একটি স্মরণীয় দান প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনের সূত্র আবিষ্কার করা। এশিয়াটিক সোসাইটি এই মিলনের মহাক্ষেত্রে পরিণত হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে এই সংস্থার মূল্য অপরিসীম।

(৪) কোলব্রুক

১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কেরানীর চাকুরী নিয়ে হেনরী টমাস কোলব্রুক ভারতে আসেন এবং কিছুদিনের জন্য সদর দেওয়ানী আদালতের অন্যতম বিচারকের পদ অধিকার করেন। কয়েক বছরের মধ্যে তিনি গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করে এশিয়াটিক সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই সব গ্রন্থের মধ্যে সতীদাহ প্রথা সম্পর্কে তর্ক-বিতর্কের সময় তিনি 'Faithful Hindu Wife' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। সতীসাধ্বী হিন্দুনারীর কর্তব্য সম্পর্কে এই গ্রন্থে আলোচনা করা হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে তিনি 'A Digest of Hindu Law' সম্পর্কে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। হিন্দুদের উত্তরাধিকার সম্পর্কিত আইনের উপর তাঁর রচিত গ্রন্থখানি ১৮১০ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে এবং হিন্দুদের দায়িত্ব ও চুক্তি সম্পর্কিত আইনের গ্রন্থখানি ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বেদ-এর উপর তাঁর পাণ্ডিত্য-পূর্ণ একটি রচনা প্রকাশিত হয়। এই বছরেই তাঁর সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে সংস্কৃত অভিধান অমরকোষের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত নাটক মালতীমাধবের উপর তাঁর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিরাতার্জুনীয়ম কাব্যও এই সময় তিনি সম্পাদনা করেন। তাছাড়াও কলকাতার Asiatic Researches, লণ্ডনের Transactions of the Royal Asiatic Society, Quarterly Journal of Science এবং Transactions of the Geological Society প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় তাঁর অনেক তথ্যপূর্ণ ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। হেনরী কোলব্রুক এশিয়াটিক সোসাইটির দশ বছর পর্যন্ত সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ক্ষেত্রে হেনরী টমাস কোলব্রুকের দান অনস্বীকার্য।

Q. 20. Discuss the background of the foundation of the British Indian Association Briefly discuss its activities.

উত্তর। (১) ভূমিকা

রাজা রামমোহন রায় যে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটান তার ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তীকালে ভারতীয়দের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধতা ও রাজনৈতিক ঐকামত গঠনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দের অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি সমিতি রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মনৈতিক প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে স্থাপিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে ১২ই মার্চ রামগোপাল ঘোষ, তারা চাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতির প্রস্তাবে সংস্কৃত কলেজের একটি সভায় সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ঐ বছরের ১৬ই মে জ্ঞানোপার্জিকা Society for Acquisition of General Knowledge) তার কার্য আরম্ভ করে। তারাচাঁদ চক্রবর্তী এই সভার স্থায়ী সভাপতি এবং প্যারী চাঁদ সরকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা রাজনৈতিক সভা ছিল না কিন্তু এই সভার কার্যকলাপের মধ্যেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার বীজ উপ্ত ছিল। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল জর্জ টমসনের সভাপতিত্বে ফৌজদারী বালাখানায় যে সভা অনুষ্ঠিত হয় তাতে একটি রাজনৈতিক সভার প্রতিষ্ঠার কথা সকলে অনুমোদন করেন। ঐ দিনই জ্ঞানোপার্জিকা সভার চিতাভস্মের উপর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামক রাজনৈতিক সভা স্থাপিত হয়। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে জমিদার সমিতি (Land Holder's Association) নামেও একটি সমিতি স্থাপিত হয়। সরকারকে রাজস্ব দিতে হয় না এরূপ জমি যাতে সরকার খাসদখল করতে না পারে সে চেষ্টা করাই ছিল এই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের অন্যতম সদস্য জর্জ টমসনকে এদেশে আনেন। টমসন রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু অ্যাডাম প্রতিষ্ঠিত বিলেতের ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভার একজন প্রধান সভ্য ছিলেন। টমসন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির সভাপতি ও প্যারী চাঁদ সম্পাদক হন। রামগোপাল ঘোষ, তারা চাঁদ চক্রবর্তী, চন্দ্রশেখর দেব ও কিশোরী চাঁদ মিত্র এই সোসাইটি স্থাপনে বিশেষ সহায়তা করেন। রামগোপাল ঘোষ এই দলের অগ্রণী ছিলেন। তাঁর ন্যায় সুবক্তা সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। এই সোসাইটির মুখপাত্র বেঙ্গল স্পেকটেটর ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে মাসিক পত্ররূপে প্রকাশিত হতে শুরু করে। রামগোপাল ঘোষ এই সংবাদপত্রের প্রকাশক এবং প্যারী চাঁদ মিত্র সম্পাদক রূপে নিযুক্ত হন। কিন্তু ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে বেঙ্গল স্পেকটেটরের প্রচার বন্ধ হয়ে যায় এবং কিছুদিন পরে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির আয়ুষ্কাল শেষ হয়। তবে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি পরবর্তীকালের রাজনৈতিক সংস্থা গড়ে তোলার পথ সুগম করে তোলে।

(২) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন :

১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি

সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। ভূস্বামী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আগ্রহের ফলেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। রাধাকান্ত দেব ছিলেন এই সভার প্রথম সভাপতি এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন প্রথম সম্পাদক। ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারকে অবহিত করার জন্যই এই সভা গঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে ব্রিটিশ ভারতের সরকারের যোগ্যতাবৃদ্ধি, ইংলণ্ড ও ভারতের সাধারণ স্বার্থসাধন এবং ভারতের অধিবাসীদের দুঃখ দুর্দশার দূরীকরণের প্রচেষ্টাও এই সভার কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সভায় একজনও ইউরোপীয় সদস্য ছিল না।

৩ অ্যাসোসিয়েশনের কর্মপন্থা ঃ

দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী ভারতবর্ষীয় সভার সম্পাদকের পদ ত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের কারণ সভার একদল সদস্য মনে করতেন যে, দু বছরের অধিককাল এই দায়িত্বপূর্ণ পদে একই ব্যক্তিকে অধিষ্ঠিত না রেখে অন্যদেরও এই ভারবহনের সুযোগ দেওয়া উচিত। দেবেন্দ্রনাথের সময় সহকারী সম্পাদক ছিলেন দিগম্বর মিত্র। মাদ্রাজেও এই সমিতির একটি শাখা স্থাপিত হয়। এই সময়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট ভারত-শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আবেদন পত্র পেশ করা। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে চার্টার আইন পাস করার পূর্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে অনুসন্ধান করেন সেই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন এই আবেদন পত্র দেয়। এই আবেদন পত্র রচনায় হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ হাত ছিল। এই আবেদন পত্রে ব্রিটিশ উপনিবেশ সমূহের শাসননীতির আদর্শে ভারতবর্ষে ও স্ব-শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন এবং তার প্রথম ধাপস্বরূপ প্রস্তাবিত ব্যবস্থা-পরিষদের অধিকাংশ সদস্য পদে ভারতীয়দের গ্রহণের আবেদন জানান হয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের রাজনৈতিক চেতনা ও চিন্তাধারার ক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গলের অন্যতম নেতা রামগোপাল ঘোষ ও হিন্দু পেট্রিয়টের সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের এই আবেদন পত্রের প্রভাবে ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘোষণায় জানিয়ে দেন যে, ভারতবাসীদের ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না এবং সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হবে। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের আন্দোলন যে ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণায় তার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়।

(১) কার্যাবলী ঃ

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম দিন থেকেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বাংলাদেশের রাজনৈতিক জীবন পরিচালিত করার সুযোগ লাভ করে। তাছাড়া সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে নিজের প্রভাব বিস্তার করতে এবং ব্রিটিশ সরকারের বিরোধী ভূমিকা

গ্রহণের চেষ্টা করার জন্য সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেদের সদস্যরূপে গ্রহণ করে এই সমিতি তার পরিধিকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করে। ভূস্বামী শ্রেণীর বাইরে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নেতৃবর্গ এবং তদানীন্তন কলকাতার শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিরূপে পরিচিত হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এই সমিতির সদস্যপদ লাভ করেন। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত বাস্তবমুখী ছিল এবং ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা 'ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিলের তীব্র সমালোচনা করেন, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা লবণের একচেটিয়া ব্যবসা রহিত করার জন্য আন্দোলন শুরু করেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আরও প্রসারিত করেন এবং বিচার বিভাগের সংস্কারের জন্যও আন্দোলন শুরু করেন।

৫। সিপাহি বিদ্রোহ ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধনামে পরিচিত সিপাহি বিদ্রোহ দেখা দেয়। কিন্তু তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী মন নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, ভারতের প্রধান চিন্তাকেন্দ্র কলকাতায় সিপাহি বিদ্রোহ বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কোন কৌতূহল প্রদর্শন করেন নি। অপর দিকে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খোলাখুলিভাবে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেন। বিদ্রোহ প্রশমিত হওয়ার পর এই সমিতি মিষ্টার উইলসনের আর্থিক প্রস্তাবসমূহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, নীল বিদ্রোহ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করার প্রস্তাব করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের এই সমিতি দুর্ভিক্ষের সময় ত্রাণ তহবিল গঠনের চেষ্টা করে এবং কলকাতার মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলের জন্য একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণের এবং বাংলাদেশের জন্য সপরিষদ গভর্নরের পদ সৃষ্টির জন্যও এই সমিতি দাবি করতে শুরু করে। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয়দের বিবাহ-সম্পর্কিত বিলের বিরুদ্ধে এই সমিতি আবেদন জানায়। ভারতীয়দের সিভিল সার্ভিস এবং আইনজীবীদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কার্যকলাপ দেখে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে এই সমিতি একদিকে শিক্ষিত ভারতীয়দের এবং অপরদিকে ভূস্বামীদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করে। ব্রিটিশ সরকারও এই সমিতির গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করে এবং ভাইসরয়ের পরিষদে ও বাংলাদেশের আইনসভায় এই সমিতির সদস্যগণ নিয়মিতভাবে মনোনীত হওয়ার সুযোগ পেতে থাকেন। এই সমিতির মুখপত্ররূপে স্বীকৃত হিন্দু পেট্রিয়ট বাংলাদেশে প্রকাশিত ভারতীয় সংবাদ পত্রগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সমিতি উদারনৈতিক নরমপন্থীদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই সমিতি ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতি একমাত্র ভারতীয় রাজনৈতিক সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করার সুযোগ পায়। এমন কি এই সমিতির বিরোধীপক্ষও তা একবাক্যে স্বীকার করতে সম্মত হয়। কিন্তু পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে বিভিন্ন জেলা শহরে শিক্ষিতসম্প্রদায়

নতুন নতুন রাজনৈতিক এবং অন্যান্য প্রকার সংস্থা গড়তে শুরু করলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্ব প্রভাব অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয়-সঙ্কোচের নীতি গ্রহণ করায় বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অসন্তোষ দেখা দেয়। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য রাজনারায়ণ বসু এই অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে সমিতির প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য একটি প্রস্তাব আনয়ন করেন। কিন্তু সমিতির পূর্বেকার জীবনীশক্তি হ্রাস পাওয়ায় তার পক্ষে এই সুযোগ কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। এমন কি গিরিশচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুচন্দ্র মুখার্জী, রমেশচন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা এই সমিতিতে যোগ দিলেও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের জনপ্রিয়তা আদৌ বৃদ্ধি পায় নি।

১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দের পর এই সমিতি প্রকৃতপক্ষে দেব, ঠাকুর ও ল পরিবারের ব্যক্তিগত সংস্থায় পরিণত হয়। দিগম্বর মিত্র, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামনাথ ঠাকুর প্রমুখ ব্যক্তিদের আকর্ষণ ত্রিশের দশকে যতই থাকনা কেন পরবর্তীকালে বিভিন্ন সম্মান ও উপাধিতে ভূষিত হওয়ার ফলে তাদের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে পড়ে। তাছাড়া বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা চাঁদাও শিক্ষিত যুবকদের এই সমিতির সদস্যপদ থেকে দূরে রাখতে বাধ্য করে।

।৬ পরিণতি

পরবর্তীকালে শিশির কুমার ঘোষ শহর ও মফঃস্বল অঞ্চলে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া তাঁর ধারণা ছিল যে, সাধারণ লোক এই সংস্থারে যোগ দিলে জমিদার সদস্যদের ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং জনসাধারণই এই সমিতির সর্বেসর্বা হওয়ার সুযোগ পাবে। কেউ কেউ এই সময় বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ হ্রাস করতে পরামর্শ দেন। বিশেষতঃ ঢাকা জেলার অনেকে এই সমিতিতে যোগ দিতে উৎসাহী ছিলেন। বাংলাদেশে তখন কোন বিকল্প সংস্থা না থাকার জন্য অন্যান্য জেলার অনেকেই এই সমিতিতে যোগ দিতে সম্মত হয়। কিন্তু শিশির কুমারের এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। বিশেষতঃ জমিদারদের স্বার্থপরতার জন্যই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠনে কোন পরিবর্তন আনা সম্ভব হল না এবং বাধ্য হয়েই এই সমিতির কার্যকলাপে অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ নতুন নতুন গঠনের দিকে মনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ধীরে ধীরে বিলুপ্তির দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

Q 21. Critically analyse the character of the Wahabi Movement

"Starting originally under a semi-religious impulse, the Wahabi Movement fast gained a political orientation."—Elucidate.

উত্তর। (১) ধর্মীয় পটভূমি

ধর্ম-আচরণের ক্ষেত্রে নৈতিক অবনিতির বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদস্বরূপ ওয়াহাবি

আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পবিত্র ইসলাম ধর্মকে যে কোন বিচ্যুতি সম্পর্কে এই আন্দোলন ছিল বিরোধী ও গোড়া মনোভাবসম্পন্ন। এই আন্দোলনের উদ্যোক্তা আবদুল ওয়াহাবের (১৭০৩-১৭৮৭ খৃষ্টাব্দ) নামানুসারে। তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে আরবের অন্তর্গত নেজদ নামক স্থানে এই আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলনের কতগুলো ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। (১) এই আন্দোলনের প্রকৃতি ছিল উগ্ররূপে বিদেশ বিরোধী। এই আন্দোলন আরবে ছিল তুর্কী বিরোধী এবং ভারতের ক্ষেত্রে ছিল ব্রিটিশ বিরোধী। (২) এই আন্দোলনে প্রাচীন মুসলিম ধর্মগুরুদের আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দাবি করে, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল আচার ব্যবহারের সরলতা এবং পবিত্র জীবন যাপন। (৩) প্রচলিত অনেক ধর্মীয় উপাখ্যান ও উৎসব ওয়াহাবিপন্থীরা বর্জন করে, কারণ তাদের মতে ঐ সব উৎসব ও উপাখ্যানের মধ্যে পৌত্তলিকতার প্রসার ঘটে। (৪) নাস্তিকতা ধ্বংস করে চরম স্বার্থত্যাগের মাধ্যমে তাদের ধর্মনীতিকে প্রচার করাই ছিল ওয়াহাবিপন্থীদের ঐকান্তিক ও গোড়া উদ্দেশ্য। (৫) ইমামের কর্তৃত্বও তারা সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে। (৬) ওয়াহাবি মতাবলম্বীরা জনৈক মাহদীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করত—যিনি শেষ বিচারের দিনে আবির্ভূত হবেন। তাদের মতে সেদিন মঙ্গলের সঙ্গে অমঙ্গলের এক চূড়ান্ত সংঘর্ষ হবে এবং তার পরিণামে শুভ শক্তিরই জয় হবে। (৭) ওয়াহাবিপন্থীরা তাদের মতবাদের প্রচারের সুবিধার জন্য পার্থিব শাসক সম্প্রদায়ের সাহচর্য কামনা করে।

(২) ভারতের আন্দোলন

ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন সৈয়দ আহমেদ (১৭৮৬-১৮৩১ খৃষ্টাব্দ)। তাঁর বাসস্থান ছিল উত্তরপ্রদেশের রায়বেরেলী। একজন ধর্মপ্রচারকরূপে তাঁর জীবন শুরু হয়। ধর্মবিশ্বাসের ফলে ক্রমে ক্রমে যে অনাচার প্রবেশ করে তিনি সেগুলোকেই ভারতের ইসলামধর্মের অবনতির কারণরূপে চিহ্নিত করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে তিনি তীর্থযাত্রা উপলক্ষে মক্কা গমন করেন এবং আরবের ওয়াহাবি পন্থীদের সংস্পর্শে আসেন। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের একজন প্রতিনিধিরূপে অভিহিত করেন। তাঁর ধর্মপরায়ণতা ও ও নিজ উদ্দেশ্যসাধনের একাগ্রতার ফলে শীঘ্রই তাঁর খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মাত্র ছ-সাত বছরের মধ্যে পেশোয়ার সীমান্ত থেকে বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চল পর্যন্ত তার প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি কলকাতা ও পাটনাসহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করেন এবং এই ভ্রমণের মাধ্যমেই তিনি প্রচুর লোকবল ও অর্থসংগ্রহ করেন।

ওয়াহাবিদের ধারণা ছিল যে, মুসলমান সম্প্রদায় রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করতে না পারলে ইসলাম ধর্মের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়। সে জন্য একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ অবক্ষয় নিবারণের জন্য সমাজ ও ধর্মসংক্রান্ত দুর্নীতির মূলোৎপাটন প্রয়োজন ছিল, অপরদিকে তেমনই রাজনৈতিক ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের জন্য পবিত্র ধর্মে অবিশ্বাসী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয়। সৈয়দ আহমেদ ভারতবর্ষকে দারুল-হারব বা বিধর্মীদের দেশ বলে অভিহিত করেন এবং তাকে দার-উল-ইসলাম বা

বিশ্বাসীদের দেশে রূপান্তরিত করার আহ্বান জানান। তাঁর মতে সকল সৎ মুসলমানদের কর্তব্য অ-মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করা, অথবা কোন মুসলিম দেশে গিয়ে বাস করা। তাঁর লক্ষ্য ছিল পাঞ্জাবের শিখরাজ্য এবং বাংলা ও উত্তর ভারতের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। তিনি তাঁর অনুচরবৃন্দসহ সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তিনি শিখদের কাছ থেকে পেশোয়ার জয় করতে সমর্থ হন। কিন্তু ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে তিনি শিখদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হন এবং অবশেষে শের সিং-এর হাতে মৃত্যুবরণ করেন। সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পরও এই আন্দোলন চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সেনাপতি নেভিল চেম্বারলেনের চেষ্টায় এই আন্দোলন ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে দমন করা সম্ভব হয়

(৩) আন্দোলনের অগ্রগতি

সৈয়দ আহমেদের মৃত্যুর পরও এই আন্দোলন অব্যাহত থাকে। পাটনা ছিল ওয়াহাবিদের প্রধান কর্মকেন্দ্র। সৈয়দ আহমেদের বাণী একদিকে কাবুল থেকে ঢাকা এবং অপরদিকে গৌহাটি থেকে হায়দরাবাদ পর্যন্ত প্রচারিত হয়। ওয়াহাবিপন্থীরা তাদের ধর্মীয় চাঁদা আদায়ের একটি নিয়মিত পদ্ধতিও গড়ে তোলে। তারা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক মনোভাব প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জেলাগুলোতে স্থায়ী সংগঠন গড়ে তোলে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর ওয়াহাবিপন্থীরা কিয়ৎ পরিমাণে সাফল্য অর্জন করে। ব্রিটিশ শাসকদেরও তারা কতকগুলো দীর্ঘকাল সীমান্তসংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। বিচারের সময় কয়েকজন বন্দী ওয়াহাবি পাঠানকে কঠোর শাস্তি দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি জনৈক মুসলমানের হাতে প্রাণ দিতে বাধ্য হন। ভারতের তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড মেয়ো আন্দামানে শের আলি নামক একজন ওয়াহাবিপন্থী দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত আসামীর হাতে নিহত হন। উত্তর পশ্চিমসীমান্তের সিতামা ছিল ওয়াহাবিপন্থীদের আর একটি প্রধান কেন্দ্র। ফলে এরূপ আশঙ্কাও করা হয় যে যদি আফগান বা রুশদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধে, তাহলে ওয়াহাবিপন্থীরা ও তাদের সহযোগী জাতিরা ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

(৪) আন্দোলনের প্রকৃতি

প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো পর্যালোচনা করার পর ঐতিহাসিকগণ এই আন্দোলনের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন মত প্রকাশ করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রূপে গণ্য করেন। তাঁদের যুক্তি হল যে, ওয়াহাবিপন্থীরা ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ কল্পে এক সুপরিকল্পিত এবং সুসংগঠিত সংগ্রাম পরিচালনা করে। ভারতের স্বাধীনতা ছিল তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। তা ছাড়া এই আন্দোলন এক সর্বভারতীয় রূপ ধারণ করে। পেশোয়ার থেকে ঢাকা পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে, এমন কি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন স্থানেও এই

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। এই সম্পর্কে অমিত সেন বলেন যে, "Wahabism started from Arabia as a puritan upsurge and has been aptly described as Anabaptist in faith, Red republican in politics". হান্টারও প্রায় অনুরূপ মত পোষণ করেন। ওয়াহাবি আন্দোলন বাংলার মুসলমান সমাজেও বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। নীলকরদের বিরুদ্ধেও ওয়াহাবিগণ আন্দোলন চালায়। বলতে গেলে এই আন্দোলনই বাংলায় প্রথম সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মধ্য হতেই প্রথম রাজনৈতিক আসামী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

কিন্তু এই আন্দোলন সম্পর্কে রমেশচন্দ্র মজুমদার অন্য মত পোষণ করেন। তিনি বলেন যে, "সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গী এবং ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা থাকা সত্ত্বেও ওয়াহাবি আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনরূপে গণ্য করা যায় না। এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণভাবে মুসলিমদের পরিচালিত, মুসলিমদের জন্য এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হিন্দুরা সম্প্রদায়গতভাবেই এই আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখে কোন একটি হিন্দুও এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে নি। ওয়াহাবিপন্থীরা ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জন তাদের লক্ষ্য ছিল না—তাদের উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম আধিপত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা...."।

(৫) সমালোচনা

নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে অন্ততঃ প্রাথমিক পর্বে ধর্মীয় সংস্কারের দিকটি ছিল ওয়াহাবি আন্দোলনের মূল ভিত্তি। ঐতিহাসিক হান্টির মতে, মোগল কর্তৃত্বের পুনরুদ্ধার সৈয়দ আহমেদের লক্ষ্য ছিল না। তার প্রকৃত লক্ষ্য ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রাচীন পদ্ধতিতে ভারতের সীমান্ত অঞ্চল সংগঠিত করা। তিনি মনে করতেন যে তার এই উদ্দেশ্য সফল হলে ঐ মুসলমানগণ একদিন ভারত জয় করবার জন্য উৎসাহিত হবে। কিন্তু ক্রমশঃ এই আন্দোলন একটি অর্থনৈতিক রূপ গ্রহণ করে। বিশেষতঃ বাংলাদেশে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাবে কৃষকদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলিম জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠতে শুরু করে। সকল শ্রেণীর সম্পত্তির অধিকারী ও কায়েমী স্বার্থের অধিকারীদের কাছে ওয়াহাবিরা ছিল মূর্তিমান বিভীষিকা। ডেম্পিয়ারের বিবরণানুসারে ওয়াহাবিরা ছিল ৮০,০০০ মানুষের একটি গোষ্ঠী। যারা সমাজের নিম্ন শ্রেণী থেকে উঠে এসে নিজেদের মধ্যে পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে। সৈয়দ আহমেদের বাণী মুসলিম সমাজের নিম্নশ্রেণী, নিম্নমধ্যবিত্ত, ক্ষুদ্র ভূস্বামী, মোল্লা-মৌলবী, দরিদ্র-শিক্ষক, দিন-মজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, স্বল্প বেতনের সরকারী ও বেসরকারী কর্মচারী, কারিগর প্রভৃতি সকলের মনেই নতুন আশার সঞ্চার করে। সুতরাং কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয়।

(৬) উপসংহার

এই আন্দোলনের প্রকৃতি যে মূলতঃ ব্রিটিশ-বিরোধী বা বিদেশী বিরোধী ছিল তা অস্বীকার করা চলে না। তবে এই আন্দোলনকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম মুক্তি সংগ্রাম বলা বোধ হয় অতিরঞ্জিত হবে। হান্টার কর্তৃক এই আন্দোলনকে বিদ্রোহরূপে বর্ণনা ও ঘাতকের হস্তে বিচারপতি মিস্টার নরমানের মৃত্যু ব্রিটিশ সরকারকে এই আন্দোলনের বিপজ্জনক রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। পরবর্তীকালে স্যার সৈয়দ আহমেদ সরকারের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্য প্রকাশের জন্য ব্যগ্র হয়ে ওয়াহাবিদের আন্দোলন শিখ-বিরোধী, ব্রিটিশ-বিরোধী নয়, এই তত্ত্ব প্রচার করেন। তাঁর মতে ওয়াহাবি আন্দোলন জনসাধারণকে আকর্ষণ করে নি। তিনি আরও বলেন যে, বিধর্মী শাসকগোষ্ঠী ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে মুসলিম-সম্প্রদায় কখনও তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে না। যাহোক, এই আন্দোলনকে ধর্মীয়, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিক্ষোভের সংমিশ্রণ বলা যায়। পি হার্ডির মতে, "ভারতীয় মুসলমানগণ ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে একত্র হয়ে ক্রমশঃ একটি রাজনৈতিক সত্তার দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করে।" একই সময় বাংলার দু-দুমিঞা ও তীতুমীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সাম্প্রদায়িকতার ছদ্মবেশ ধারণ করলেও, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংগ্রামের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে।

Q. 17. Give an exposition of the political ideas of Rammohan Roy ?

Ans. (১) ভূমিকা :

রামমোহনকে ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্র চিন্তা নায়ক বলা যেতে পারে। মধ্যযুগে রাষ্ট্রের সঙ্গে সাধারণ নাগরিকের কোন যোগ ছিল না। রাষ্ট্র চালাতেন বাদশাহ, নবাব ও তাঁর পরামর্শদাতা এবং রাজকর্মচারীবৃন্দ। সাধারণ লোক শুধু সামাজিক গণ্ডীর মধ্যেই তাদের জীবন সীমাবদ্ধ করে রাখত। যখন সাধারণ লোক শাসনব্যবস্থার উপরে প্রভাব বিস্তার করা কিংবা শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের অধিকারের কথা চিন্তা করল তখন থেকেই রাজনৈতিক চেতনার শুরু হল। এই রাজনৈতিক চেতনার প্রথম উন্মেষ হয় রামমোহনের মধ্যে। তাঁর রাষ্ট্র চিন্তা আরোহী (inductive) অবরোহী (deductive) নয়। অর্থাৎ তিনি রাজনৈতিক ঘটনার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর ভিত্তি করেই তাঁর রাষ্ট্রচিন্তা ব্যক্ত করেন। তিনি বেন্থামের চিন্তার দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। বেন্থামের মতো তিনি আইন ও নৈতিকতাকে পৃথকভাবে দেখতেন। তিনি মনে করতেন যে আইন প্রণয়ণ ও প্রশাসনের ক্ষমতা সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম শক্তির উপর ন্যস্ত হওয়া উচিত। সেজন্য তিনি ভারতের শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টের অধীনেই রাখতে চান। তিনি মনে করতেন যে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা যদি ভারতে নিযুক্ত ইংরেজ কর্মচারীদের উপর অর্পিত হয় তাহলে সে আইনের অপপ্রয়োগ হবেই।

(২) শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতি :

ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্টে কিভাবে ভারত সম্পর্কে আইন প্রণয়ণ করবে সে বিষয়ে তিনি কয়েকটি অভিমত প্রকাশ করেন।

প্রথমতঃ, সংবাদপত্রের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। সুপ্রীম কোর্টের কাছে রামমোহন এবং অপর পাঁচজন বিশিষ্ট নাগরিক যে স্মারক লিপি পাঠান তাতে লেখা ছিল, "Every good ruler who is convinced of the imperfection of human nature and reverence the Eternal Governor of the world must be conscious of the great liability of error in managing the affairs of a vast empire ; and therefore he will be anxious to afford every individual the readiest means of bringing his notice whatever may require his interference. To secure this important object, the unrestrained Liberty of Publication is the only effectual means that can be employed."

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন প্রকার কমিটি ও কমিশন গঠনের দ্বারা শাসকশক্তি জনসাধারণের মত জানতে পারেন। এর বিকল্প ব্যবস্থারূপে সরকার পত্রিকা প্রকাশ করতে পারেন।

তৃতীয়তঃ, আইন প্রণয়ণের পূর্বে শাসনকর্তা এদেশীয় বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের

মতামত গ্রহণ করতে পারেন। এইসব ব্যক্তির মতামতসহ খসড়া আইন পার্লিয়ামেন্টের অনুমোদনের জন্য পাঠানো উচিত।

(৩) **প্রশাসনিক সংস্কারের প্রস্তাব ঃ**

প্রশাসন সম্পর্কে রামমোহনের কয়েকটি সুস্পষ্ট অভিমত ছিল। তাঁর মতে, (১) বিচারক আইন প্রণয়ণ করবেন না, বিচারক সম্পূর্ণ স্বাধীন হবেন। তাঁর উপর শাসনকর্তা কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। (২) দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন লিপিবদ্ধ করে সবসাধারণের অবগতির জন্য পুস্তকাকারে প্রকাশ করা উচিত। (৩) ভারতের সকল আদালতে জুরী ব্যবস্থা প্রবর্তন করা উচিত। (৪) দেশীয় লোকদের সরকারী উচ্চকাযে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। অপেক্ষাকৃত কম বেতনে এদেশীয় যোগ্য লোকদের দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা উচিত। (৫) জমির স্বত্ব প্রজাদের দেওয়া হলে বহু সংখ্যক সৈন্য রাখার আর প্রায়াজন থাকবে না এবং তার ফলে সরকারের ব্যয়ভার অনেক কমে যাবে। (৬) জ্ঞানের প্রসার ও সভ্যতার উন্নতি না হলেই অশান্তি ও রাষ্ট্রবিপ্লব দেখা দেয়। সেজন্য শাসনব্যবস্থা স্থায়ী করতে হলে জ্ঞান বিজ্ঞানের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার এবং রাজকর্মচারীগণ যাতে ক্ষমতার অপব্যবহার না করে প্রজাদের অসন্তোষ বৃদ্ধি না করেন, সে বিষয়েও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

(৪) **ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে মনোভাব ঃ**

রামমোহন সামাজিক এবং ধর্মীয় মুক্তি এবং ব্যক্তিগত মানুষের চিন্তায়, মননে ও আচরণে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। তিনি বুঝিয়েছিলেন ইংরেজ শাসন মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের অনুকূল হবে। তাই তিনি ইংরেজ শাসনকে বরণ করে নিয়েছিলেন। মধ্যযুগীয় শাসনে যে জড়তা ও পরবশ্যতা জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল ইংরেজ শাসন সেই অবস্থা থেকে চিন্তার মুক্তি ঘটিয়েছিল। সেই শাসনে জ্ঞানের বিস্তার, যুক্তিবাদ অধিকার বোধ, গণতান্ত্রিক চেতনা প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছিল। সেজন্য তিনি বারবার এই শাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন। সপরিষদ রাজাকে তিনি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "Considering these things and bearing in mind also the solitude for the welfare of this country, uniformly expressed by the Honourable East India Company, under whose immediate control we are placed, and also by the Supreme Councils of the British nation, your dutiful subjects have not viewed the English as a body of conquerors, but rather as deliverers, and look up to your Majesty not as a Ruler, but also as father and protector.

রামমোহন শুধু যে ইংরেজ জাতিকে মুক্তিদাতা ও রক্ষাকর্তা বলে মনে করেছিলেন তা নয়, তিনি চেয়েছিলেন যে ইউরোপীয়রা এদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার লাভ করুক।

তাহলে তাদের সঙ্গে ভারতীয়দের ঘনিষ্টতর সম্পর্ক স্থাপিত হবে। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর তিনি টাউন হলে একটি সভায় যোগদান করেন। সেই সভার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইউরোপীয়দের বিনাবাধায় বাণিজ্য ও বসবাস স্থাপন করার জন্য পার্লিয়ামেন্টের কাছে আবেদন করা। এই আবেদন পত্রে তিনি বলেছিলেন, "....from personal experience, I am impressed with the conviction that the greater will be our improvement in literary, social and political affairs."

(৫) ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা ঃ

যে নীলকর সাহেবদের নিয়ে পরবর্তীকালে প্রচণ্ড গণ-আন্দোলন হয়েছিল সেই নীলকরদের পক্ষেও রামমোহন জোরালো সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, নীলকরেরা দেশের অনেক পতিত জমি চাষ করেছিল এবং কৃষকরা তাদের কাছে বর্ধিত হারে মজুরী পেতো। তিনি বলেছিলেন, "I am positively of opinion that upon the whole the indigo planters have done more essential good to the natives of Bengal than any other class of persons. This is a fact which I will not hesitate to affirm whenever I may be questioned on the subject either in India or in Europe" ইংলণ্ডে থাকার সময় তিনি পার্লিয়ামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাছে একটি প্রতিবেদনে ভারতে ইউরোপীয়দের বসবাস সমর্থন করে নয় প্রকার সুফল লাভের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যথা ঃ (১) তাঁরা দেশের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি বিধান করবেন ; (২) এদেশের লোকদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস দূরীকরণে তাঁরা সাহায্য করবেন ; (৩) সরকারের কাছ থেকে অবস্থার উন্নয়ন আদায় করবেন ; (৪) যে কোন প্রকার অত্যাচার দমনে সাহায্য করবেন ; (৫) দেশের সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার করবেন ; (৬) ভারতের শাসন ব্যবস্থা কিরকম চলছে সে সম্পর্কে ইংলণ্ডের শাসনকর্তাদের অবহিত রাখবেন ; (৭) ভারত আক্রান্ত হলে তাঁরা ভারতের অতিরিক্ত শক্তি যোগাবেন ; (৮) ভারত চিরকাল ইংলণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থেকে উন্নত সরকারের কাছ থেকে নানা প্রকার সুযোগ সুবিধা ভোগ করবেন ; (৯) যদি কোনদিন উভয় দেশের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে তবুও ইয়োরোপীয়রা নিজেদের দেশের সাহায্যে ভারতকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার জন্য চেষ্টা করে যাবেন।

রামমোহন আধুনিক চিন্তা ও কর্মধারার সম্পূর্ণ পক্ষপাতি ছিলেন বলে তিনি ইয়োরোপীয়দের সংস্পর্শ বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন এ যুক্তি দেখানো যেতে পারে। কিন্তু তিনি মধ্যযুগীয় রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি মোগল বাদশাহের কাছ থেকে রাজা উপাধি কি করে গ্রহণ করলেন তা ভাবতে একটু বিস্মিত হতে হয়। লর্ড বেন্টিঙ্ককে একটি পত্রে তাঁর এই রাজা উপাধি স্বীকার করে নেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন, "I therefore take the liberty of laying the subject before your lordship, hoping that you will be pleased to sanction my adoption of such title

accordingly." এই বাদশাহের ভাতা বাড়াবার জন্যও তিনি ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং ভাতা বাড়াতেও সক্ষম হয়েছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জের কাছে দিল্লীর বাদশাহ মোগল সম্রাটদের পূর্ব গরিমা উল্লেখ করে যে পত্র লিখেছিলেন তা ছিল রামমোহনেরই রচনা।

(৬) রামমোহন ও আন্তর্জাতিকতাবাদ :

রামমোহনই সর্বপ্রথম ভারতীয় যিনি ভারতের বাইরে রাজনৈতিক ঘটনাবলীতে প্রবল আগ্রহ দেখিয়েছিলেন এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের মানব মুক্তির সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। দক্ষিণ-আমেরিকা স্পেনের অত্যাচার মুক্ত হলে তিনি আনন্দের অতিশয্যে তাঁর কলকাতার বাড়ীতে এক ভোজ সভার আয়োজন করেন। তিনি বলেছিলেন, "ধর্ম, ভাষা কিংবা স্বার্থের সম্পর্ক না থাকলেও আমি কি আমার সম-মানুষের দুঃখে উদাসীন থাকতে পারি?" স্পেনের অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি উদারপন্থীদের প্রতি সমর্থন জানান। পোর্তুগালের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেও তিনি উদারনৈতিক দলের জয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন। ১৮২২ সালে তিনি তাঁর সাপ্তাহিক মিরাত-উল-আখবার-এ আয়ারল্যাণ্ডের উপর ইংরেজ সরকারের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। অবশ্য রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গী সব ক্ষেত্রেই যে সমর্থন করা যায় তা নয়। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীসের স্বাজাত্যবোধের অভ্যুত্থানকে তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। মুসলমান রাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতির ফলেই তিনি বোধ হয় গ্রীসকে সমর্থন জানাতে পারেন নি। ফরাসী বিপ্লবের জয়ে (১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে) তিনি আনন্দে এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে কিছুকালের জন্য অন্য কিছু ভাবতেন না এবং বলতেন না। ইংলণ্ডগামী জাহাজে তাঁর সহযাত্রী জেমস্ সাথারল্যাণ্ড বলেছেন যে, দু'খানা ফরাসী জাহাজ দেখে তিনি ফরাসীদের অভিনন্দন জানানোর জন্য তাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হন। সাথারল্যাণ্ডের বিবরণ অনুযায়ী, "He was conducted over the vessels and endeavoured to convey by the aid of interpreters how much he was delighted to be under the banner that waved over their decks—an evidence of the glorious triumph of right over might and as he left the vessels he repeated emphatically, Glory, Glory, Glory to France."

(৭) রামমোহনের রাজনৈতিক চিন্তায় ধর্মের স্থান :

রামমোহন সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির চিরসমর্থক ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মকে কখনও বর্জন করতে চাননি। সেজন্য ধর্মবিরোধী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক রবার্ট ওয়েনের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধিতার কারণও এখানেই নিহিত। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল তিনি রবার্ট ওয়েনের পুত্রকে একটি পত্র লেখেন, "It is not necessary either in England or in America to oppose religion in promoting the social, domestic and

political welfare of their inhabitants particularly a system of Religion which inculcates the doctrine of universal love and charity.... It grieve to observe that by opposing religion your most benevolent father has hitherto impeded success."

(৮) **উপসংহার ঃ**

সে যুগে রামমোহনের ন্যায় বিশ্বের অপর কেউ অন্য দেশের কথা এত গভীর ভাবে চিন্তা করেন নি। তাঁর দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল মানুষই এক এবং সকল রাষ্ট্রই এক বিশ্ব-রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত। ভৌগোলিক ব্যবধান ও রাজনৈতিক ব্যবধান তাঁর কাছে অর্থহীন ছিল। তাঁর সম্পর্কে একথা বলাই সঙ্গত হবে যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতবাদে একশ বছর এগিয়ে ছিলেন—অর্থাৎ যে অন্তর্জাতিক চেতনা একশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারায় পাওয়া যায়, রামমোহনের মধ্যেও তার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু রামমোহনের অব্যবহিত পরবর্তীকালে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় তার সঙ্গে রামমোহনের কোন যোগ ছিল না। এই সম্পর্কে ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন যে, "Rammohan's cosmopolitanism or internationalism may be a greater or higher virtue but it is different from nationalism and for this combination of patriotism and national consciousness which marked the New Age, the Bengali's are perhaps indebted to Derozio even more than the abstract ideas of freedom cherished by Rammohan, though they were very liberal and noble."

রামমোহনের সমস্ত বাণী ও রচনার মধ্যে সমাজ ও ধর্মের কুসংস্কার ও যুক্তিহীন আচার বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ রয়েছে, কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও দেশকে ভালবাসা ও তার মুক্তি বিধানের স্বপ্ন দেখা—এধরণের কোন জাতীয় আবেগ তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। ভাবলে একটু বিস্মিত হতে হয় যে, তিনি দক্ষিণ আমেরিকা, স্পেন, ফ্রান্স, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশের স্বাধীনতার কথা এত চিন্তা করেছিলেন কিন্তু তিনি নিজের দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবেন নি কেন। একটি বিদেশী শাসনের তিনি অবিমিশ্র প্রশংসা করেন, কিন্তু সেই শাসনে ভারতবাসীর আত্মাধিকার ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যে সম্ভবপর নয় তা তিনি বিচার করে দেখেন নি। ভারতে ইয়োরোপীয় রাজ্যগুলোর মূলধনের বিনিয়োগ এবং বিদেশী শিল্প প্রসারের ফলে দেশীয় লোকদের দারিদ্র্য দূরীভূত হবে এবং তাদের দুরবস্থার প্রতিকার হবে তাই তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু তার ফলে যে স্থায়ীভাবে দেশের লোকেদের অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধিত হতে পারে না তা তিনি একবারও চিন্তা করে দেখেন নি। রামমোহনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তাধারা বিশেষ পরিণত, প্রগতিশীল ও দূরদর্শী ছিল তথাপি নিজের দেশের স্বাধীনতার কথা তিনি কেন চিন্তা করেন নি তার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। হয়ত নিজের দেশের লোকদের প্রতি তাঁর

কোন আস্থা ছিল না এবং তাদের রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা চালাবার মতো তিনি উপযুক্ত বিবেচনা করেন নি।

Q. 18. Critically examine the intellectual background of the introduction of the permanent settlement

Ans (১) ভূমিকা ঃ

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে কর্ণওয়ালিস যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন তখন তিনি ধসে পড়া প্রাচীন জমিদারদের তাঁর পন্থা অনুকরণে নির্ভরশীল সঙ্গী করতে ভরসা পান নি। সুতরাং তিনি এমন এক নতুন জমিদার শ্রেণী তৈরী করেন যারা জাতীয় ঐতিহ্য ও বিবেকের দ্বারা পরিচালিত নন। যাঁদের নিয়ে তিনি চিরকালের জন্য ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে কৃষির উন্নতির সম্ভাবনা অকেজো করে রাখতে পারবেন এবং যাঁরা সহজেই নিজেদের ব্রিটিশ শাসনের রক্ষাকারা একটি ভূমাধিকারী শ্রেণীতে পরিণত করবেন। আর যাঁদের উপর তিনি এই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবেন যে, তাঁরা দেশকে কৃষিমূলক স্তরে আবদ্ধ রাখবেন এবং স্বদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প থেকে অধিক সংখ্যক মানুষকে সরিয়ে নিয়ে এসে সেই শূন্যস্থান :ইংলণ্ড ও বিদেশ থেকে আমদানি করা শিল্পজাত দ্রব্যে পূর্ণ করে দেবেন। এই উদ্দেশ্য মনে রেখেই কর্ণওয়ালিস ভূমির উপর জমিদারদের সম্পত্তিগত অধিকার দান করেন। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেই কর্ণওয়ালিস এই পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। লর্ড কর্ণওয়ালিস জমিদারী প্রথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং ইংলণ্ডের জমিদারী প্রথার অনুকরণে প্রয়োজন মত পরিবর্তন ও সংস্কার সাধন করে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই সময় ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেন্টেও জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য বজায় ছিল। সুতরাং পার্লিয়ামেন্টের সদস্যগণও ভারতীয়দের জমিদারদের সঙ্গে একাত্মবোধ অনুভব করেন এবং বাৎসরিক বন্দোবস্তের অথবা সাময়িক বন্দোবস্তের পরিবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবীগণ ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্থায়ী করার উদ্দেশ্য নিয়েই ভূমি বিষয়ক সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করা এবং স্থায়িত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়াই ছিল তাদের এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রধান কারণ।

(২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের উদ্দেশ্য ঃ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের মূলতঃ দুটি উদ্দেশ্য ছিল ঃ (১) সরকারী রাজস্বের নিরাপত্তা বিধান করা এবং (২) যাঁদের হাতে প্রচুর টাকা আছে, শহরে গজিয়ে উঠা নতুন ধনিক শ্রেণীকে জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বের অধিকার ক্রয় করতে এই অর্থ নিয়োগ করতে উৎসাহিত করা। ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী এই আশা পোষণ করতেন যে এইভাবে যদি কৃষির ক্ষেত্রে এই পুঁজি চালনা করা যায় তাহলে দুটি উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব ঃ

(১) ভারতবর্ষ একটি কৃষিমূলক দেশ হিসাবে ইংলণ্ডের শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল সরবরাহ করবে এবং এই দেশ ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারে পরিণত হবে। (২) এই ব্যবস্থা জমিদারদের তাদের জমিদারীর উন্নতিসাধনে অনুপ্রাণিত করবে এবং তার ফলে কৃষি সঙ্কটের সমাধান হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল যে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে এমন এক শ্রেণীর জমির মালিক সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যাঁরা নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত থকেবেন এবং যাঁরা কখনই ব্রিটিশ সরকারের পারবর্তন কামনা করবেন না।

ইংরেজ শাসকগণ একথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন যে, তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখাব জন্য এই ধরণের এই নতুন শ্রেণী তৈরি করার মাধ্যমে নতুন সামাজিক ভিত্তি স্থাপন করা প্রয়োজন। এই শ্রেণী যদি লুণ্ঠনের এক অংশ পায় তাহলে তাঁরা ব্রিটিশ শাসক সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। নিঃসন্দেহে বলা চলে যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য বিপ্লবের প্রতিরোধ করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই কথাতো ভারতের গভর্ণর জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক নিজেই ব্যাখ্যা করেন যে, যদি কখনও বিপ্লবের উত্তাল-তরঙ্গে ইংরেজ শাসন টলমল করে ওঠে তখন এই জমিদার শ্রেণীই নিজেদের স্বার্থে এই শাসনকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবেন। "If security was wanting against extensive popular tumult or revolution, I should say that the Permanent Settlement, though a failure in many other respects and in more important essentials, has this great advantage at least of having created a vast body of rich landed proprietors deeply interested in continuance of the British Dominion and having complete command over the mass of the people" পরবর্তীকালের ইতিহাসের ঘটনাগুলো থেকে প্রমাণিত হয় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তাগণ সঠিক-ভাবেই অবস্থা বিশ্লেষণ করতে সমর্থ ছিলেন।

(৩) নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের ব্যবস্থা সম্পাদন ঃ

চিন্তাশীল ইংরেজ শাসকগণ শুধুমাত্র রাজস্বের নিরাপত্তা বিধান ও ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক কতিপয় জমিদার পরিবারের সৃষ্টি করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের স্বার্থের সঙ্গে বেশি সংখ্যক এদেশীয় জনসাধারণকে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে দূর করার উদ্দেশ্যে তাঁর শক্তিশালী বাধার সৃষ্টি করার জন্য ভারতীয় সমাজকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করার চেষ্টা করেন। জমিদারী প্রথার সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের সংযোগের ফলেই নতুন শ্রেণীর উদ্ভবের পথ প্রশস্ত হয়। সুচিন্তিত নীতি নির্ধারণ করেই ব্রিটিশ শাসকগণ এই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। এবং তাঁদের ব্যবস্থার ফলে বাংলাদেশে একটি নতুন সামাজিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কয়েক বছরের মধ্যেই পত্তনীদার, দরপত্তনীদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের আবিভাব ঘটে। বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থায় এই মধ্যস্বত্ব

প্রথা—১৮০৬-১৮০৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি উদ্দেশ্য ছিল বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা করা। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই সামাজিক শক্তি হিসাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব সুস্পষ্ট হয়। বড় জমিদার ও বড় ভূম্যাধিকারীর সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু ছোট জমিদার ও জমির মালিকের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। আর তাদের নিয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পত্তন হয়। এই মধ্যস্বত্বভোগীদের বিকাশে সরকারের পক্ষ থেকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। সরকারী দলিল পত্র থেকেই জানা যায় যে, "....it is most desirable that the facilities should be given for the gradual growth of a middle class connected with land, without dispossessing the peasant proprietors and occupiers. ···The proprietors, tenure holders, and other middle class people who stand between the zeminders and cultivators have built up the social and economic structure of Bengal". এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই পত্তনী প্রথার একটি সামাজিক ফল হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাবৃদ্ধিতে সহায়তা করা। ভারতের মতো একটি দেশে যেখানে প্রসার নেই বললেই চলে সেখানে এই অবস্থাই ছিল স্বাভাবিক পরিণতি। তাছাড়া এই ব্যবস্থায় জমিদার ও অন্যান্য জমিব মালিকরাও খুব লাভবান হয়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ভূমিরাজস্ব যে স্থায়ীভাবে নির্ধারিত করা হয় তার মোট পরিমাণ ছিল ২৮৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, পতিতজমি উদ্ধার করে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, যোগাযোগের উন্নতি ও নতুন বাজারের প্রসারের ফলে কৃষিজাত পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস ইত্যাদির ফলে জমিদারদের আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে ৩১৮ লক্ষ টাকা থেকে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ১,৪৭২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। অন্য দিকে এই সময় ভূমিরাজস্ব ২৮৬ লক্ষ টাকা থেকে মাত্র ৩২৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। জমিদারদের নীট আয় এত বৃদ্ধি পায় যে সাপদশালী আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য জীবিকার লোকেরা, যাঁদের হাতে বিনিময়ের মতো অতিরিক্ত অর্থ ছিল তারা জমিদারী ক্রয় করতে আগ্রহান্বিত হন। এই ভাবে যাঁরা জমির মালিক হয়ে বসলেন তাঁরা তাঁদের জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের এজেন্টদের উপর ন্যস্ত করেন। তাঁরা যে এই সব জমিদারী ক্রয় করেন তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তাঁরা জমিদারীর মাধ্যমে আরও মুনাফা লাভ করবেন এবং একই সঙ্গে বিশেষ সম্মান ও সামাজিক মর্যাদা অর্জন করবেন। সুতরাং এই সম্প্রদায়ের উদ্বৃত্ত অর্থ জমিতে এই অধিকার অর্জনের জন্য ব্যয়িত হয়।

(৪) উপসংহার

ইংরেজ বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের পর নিজেদের স্বার্থ অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করার চেষ্টা করেন। ভারতের অর্থনীতির তখন দুটি প্রধান ভিত্তি ছিল: (১) কৃষি এবং (২) কুটির শিল্প। কিন্তু নিজেদের দেশের শিল্প ও শিল্পপতিদের স্বার্থেই ইংরেজ শাসকগণ ভারতের কুটির শিল্প ধ্বংস করেন। সুতরাং

ভারতের অর্থনৈতিক সম্পদের একমাত্র উৎস ভূমি ও কৃষির সঙ্গে বাংলাদেশের সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যুক্ত করে তাঁরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করেন। এমনকি ভারতের চিরচরিত ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থাকে নাকচ করে দিয়ে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে কৃষকদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করার পরিবর্তে মধ্যস্বত্বভোগী একটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করেন। তাঁদের এই ব্যবস্থাকে কার্যকরী করার উপায় হিসাবেই বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয়। চিরাস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে বাংলাদেশের তদানীন্তন শক্তিশালী পরিবারগুলোর সঙ্গে এবং পরবর্তীকালে নবজাগ্রত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথ উন্মুক্ত হয়।

Q. 19. Cive an account of the peasant's movement in Bengal.

Ans (১) **ভূমিকা ঃ**

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর থেকেই বাংলাদেশের কৃষকদের মধ্যে এক প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দেয়। বিদেশী সরকারের কৃষকদের প্রতি উদাসীনতা, জমিদারদের অত্যাচার এবং অতিরিক্ত করভারে পীড়িত কৃষক সমাজ প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য সবসময়ই ব্যস্ত থাকত। কিন্তু সাংগঠনিক দুর্বলতা, যোগাযোগের অভাব এবং শিক্ষার দীনতার জন্য অনেক সময়ই তাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হত না। কিন্তু ধর্মীয় বা অন্য কারণে তাদের মধ্যে যোগাযোগের সুবিধা দেখা দিলে তাদের অর্থনৈতিক অসুবিধা দূর করার জন্য তারা সম্মিলিত ভাবে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করত না। মুসলমান সমাজের ওয়াহাবি আন্দোলন তার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

(২) **ওয়াহাবি বা ফেরাজি আন্দোলন ঃ**

মক্কায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এক ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন আবদুল ওয়াহাব। তাঁরই নামে এই অন্দোলন ওয়াহাবি আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের সূচনা করেন বেরিলির সৈয়দ আহমেদ। ভারতে ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল পাটনা। সরল ভাষায় লিখিত গান ও কবিতার মাধ্যমে পল্লীঅঞ্চলে সে আন্দোলন ব্যাপক প্রসার লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ওয়াহাবি আন্দোলন একটি সুগঠিত সংগ্রামী শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইসলাম অনুপ্রবিষ্ট নানা আচার অনুষ্ঠান ও পুরোহিত তন্ত্রের বিরোধিতা করাই ছিল এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। শিখনায়ক রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে একসময় তারা সংগ্রামে লিপ্ত হলেও পরে তারা ইংরেজ সরকারকে উৎখাত করার জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করে।

বাংলাদেশের ওয়াহাবি আন্দোলন ফেরাজি আন্দোলন নামে পরিচিত। ফেরাজ কথাটির উদ্ভব 'ফর্জ' থেকে যার অর্থ আল্লার আদেশ। ফেরাজিদের বক্তব্য ছিল জমি

ঈশ্বরের দান, সুতরাং যে জমি চাষ করে সেই জমির মালিক। তারা সরকারকে খাজনা দেওয়ার বিরোধী ছিল না কিন্তু জমিদারের মধ্যস্বত্বভোগের অধিকার তারা স্বীকার করত না। ফলে জমিদারদের সঙ্গে ফেরাজিদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ১৮৩১-১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে বারাসাত অঞ্চলে ফেরাজি আন্দোলনের সূচনা হয়, পরে তা পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। নীলকরদের বিরুদ্ধেও ওয়াহাবি আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। বাংলাদেশে ফেরাজি আন্দোলনের নেতা ছিলেন তিতুমীর। চব্বিশ পরগণার হায়দরপুর গ্রামে ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দে তিতুমীরের জন্ম হয়। জমিদারদের সঙ্গে তিতুমীরের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষকদের বারবার সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে স্থানীয় একজন জমিদার নিহত হন এবং তিতুমীরকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে এক দারোগা নিহত হন। তারপর তিতুমীর নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন এবং নারিকেল বেড়িয়ায় নিজ সৈন্যবাহিনীর নিরাপত্তার জন্য তিনি একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করেন। তিতুমীরের বাহিনীর দাপটে চব্বিশ পরগণা ও নদীয়ার বিভিন্ন স্থানে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। তিতুমীর ছাড়াও পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ফেরাজি দলের নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়। পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলায় বিদ্রোহীরা জমি দখলের আন্দোলনে অবতীর্ণ হয়।

এই সময় ভারতের গভর্ণর জেনারেল ছিলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক। তিতুমীরের ক্রমবর্ধমান শক্তির কথা তাঁর কানে পৌঁছালে তিনি তিতুমীরকে দমন করার জন্য কামান ও গোলাগুলি সহ একদল সৈন্য পাঠান। ঐ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয় এবং তিতুমীর নিহত হন। এইভাবে তিতুমীরের বিদ্রোহ শেষ হয়।

সিপাহি বিদ্রোহের সময় ওয়াহাবিরা বিদ্রোহে যোগ দেয় এবং বহু স্থানের বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সারা ভারতে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম পর্যায়ের সংগ্রামে এবং বাংলাদেশের জমিদারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রজাদের সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের সূচনায় ওয়াহাবিদের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

(৩) কোল বিদ্রোহ :

সিংভূম অঞ্চলের উপর ব্রিটিশদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পর পোরাহাটের রাজা নামে পরিচিত স্থানীয় রাজা ব্রিটিশ সরকারকে কর দিতে এবং ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের তাঁর অধিকৃত অঞ্চলে প্রবেশের অধিকার দিতে অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত রাজা কর দিতে স্বীকার করলেও স্থানীয় অধিবাসীদের বিক্ষোভের ফলেই ব্রিটিশ কর্মচারীগণ খুব অসুবিধায় পড়েন। ফলে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ছোটনাগপুরের মুণ্ডাগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং হোস নামে উপজাতির লোকেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তাদের এই বিক্ষোভের প্রধান কারণ ছিল নতুন ধরণের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং ব্রিটিশ ভারতে অনুসৃত বিচার বিভাগীয় রীতিনীতি এই অঞ্চলে চালু করার প্রচেষ্টা। অল্পদিনের মধ্যেই এই বিদ্রোহ রাঁচি, পালামৌ, মানভূম এবং হাজারিবাগে ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল বিদেশীদের বিতাড়িত করে পুনরায় পুরাতন ব্যবস্থা এই

অঞ্চলে প্রবর্তন করা। ফলে বিদ্রোহী কোল কৃষকগণ বিদেশীদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং দুর্দান্ত সাহসিকতার সঙ্গে তারা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলা করে। প্রায় পাঁচ হাজার লোককে হত্যা করে এবং আন্দোলন দমন করা হয়। ব্রিটিশ পক্ষেরও বহু লোক এই সংঘর্ষে আহত ও নিহত হয়। ব্রিটিশদের অত্যাচারে কোল নেতৃবর্গ শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হলেও হোস উপজাতি পরবর্তীকালেও সুযোগ পেলেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে দ্বিধাবোধ করে নি।

(8) গঙ্গানারায়ণের হাঙ্গামা :

১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে মানভূমের ভূমিজদের বিদ্রোহ গঙ্গানারায়ণের হাঙ্গামা নামে পরিচিত। বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ঐ এলাকার বরাভূম অঞ্চলের জমিদারির অন্যতম দাবিদার গঙ্গানারায়ণ। তাঁর বিদ্রোহের প্রধান অংশীদার ছিল স্থানীয় কৃষকগণ। কারণ তারা নতুন ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ও অতিরিক্ত করের চাপে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ছিল। গঙ্গানারায়ণ কৃষকদের বিক্ষোভকে মূলধন করে তাঁর নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যবাহিনী কোল বিদ্রোহের অভিজ্ঞতার কথা তখনও বিস্মৃত হতে পারে নি। সুতরাং তারা গঙ্গানারায়ণ ও তাঁর অনুচরদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করলে গঙ্গানারায়ণ সিংভূমে পলায়ণ করে সেখানকার কৃষকদের নিয়ে আবার উত্থানের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করেন। কিন্তু খরসোয়ানের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে গঙ্গানারায়ণ নিহত হলে মানভূমের ভূমিজদের বিদ্রোহের অবসান ঘটে এবং মানভূমে পুনরায় ইংরেজদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) নীলবিদ্রোহ :

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে নীলচাষ এক অতি লাভবান ব্যবসা হয়ে ওঠে। নীল গাছের চাষ করে সেগুলো থেকে নীল প্রস্তুত করা হত। নীল বিদেশে রপ্তানি করে নীলকুঠির মালিকগণ প্রচুর অর্থ উপার্জন করতেন। নীলচাষের ব্যবসায়ে অতিরিক্ত লাভের লোভ সংবরণ করতে না পেরে ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দ হতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সরাসরি নীলচাষে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ নীলকরদের আমন্ত্রণ জানিয়ে এসে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের অর্থ সাহায্য করে নীলচাষের পরিমাণ বাড়াতে সমর্থ হয়। ক্রমে নীলকর নামে এক শ্রেণীর নীল উৎপাদনকারী সাহেব বাংলাদেশ, বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় কৃষকদের কাজে লাগিয়ে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীল চাষ শুরু করেন। নীলকর সাহেবরা নিজেরা জমি ক্রয় করে যেমন চাষীদের খাটিয়ে নীল উৎপাদন করত তেমনি আবার ভারতীয় চাষীদের দাদন দিয়ে তাদের জমিতে নীলচাষের ব্যবস্থা করত। যে সকল চাষী দাদন অর্থাৎ নীলচাষ করার এবং উৎপন্ন নীল নীলকর সাহেবদের কুঠিতে বিক্রয় করতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করত তারা নীলকর সাহেবদের প্রায় ভূমিদাসে পরিণত হয়। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চুক্তি অনুসারে

নীলগাছ নীলকুঠিতে জমা দিতে না পারলে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে নীলকুঠিতে আটক করা হত এবং তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত।

(৬) নীলকরদের স্বার্থরক্ষায় সরকারী প্রচেষ্টা :

কৃত্রিম উপায়ে নীল উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বাবধি নীলচাষ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে নীলচাষীদের উপর জুলুম এবং অত্যাচারও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সময়কার ইংরেজ সরকারও নীলকর সাহেবদের সমর্থন করতে থাকে। ফলে নীলকুঠির সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা ছিল না। নীলকর সাহেবরা তাদের কুঠিতে বেতনভুক লাঠিয়াল রাখতেন। নীলচাষীরা উৎপন্নশীল বা চুক্তির পরিমাণ মতো নীল জমা না দিলে তাদের ধরে এনে তাদের উপর দৈহিক নিপীড়নের কাজে এই সকল লাঠিয়ালকে ব্যবহার করা হত।

(৭) নীলচাষীদের ভূমিদাসে রূপান্তর :

নীলকর সাহেবরা নীলচাষীদের সঙ্গে ক্রীতদাসের ন্যায় ব্যবহার করত এবং নানা-প্রকার অসদুপায়ে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করতেন। নীল উৎপাদন করতে গিয়ে কৃষকদের কি পরিমাণ খরচ হয়েছে তা বিবেচনা না করেই নীলকর সাহেবরা নীলের দাম স্থির করতেন। ফলে কুঠিয়ালদের লাভের অংশ বৃদ্ধি পেলেও চাষীদের লোকসানের পরিমাণ ক্রমেই বেড়ে যেতে শুরু করে। কিন্তু চাষীদের পক্ষে নীলচাষ বন্ধ করারও কোন উপায় ছিল না। একবার দাদন নিয়ে নীলচাষ শুরু করলে তার হাত থেকে চাষীদের অব্যাহতি পাওয়ার আর কোন পথ ছিল না। স্বার্থলোলুপ নীলকর সাহেবরা জোর করে কৃষকদের জমি দখল করে নীলচাষ শুরু করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। নীলচাষের ব্যাপারে যে অমানুষিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা আলোচনা করতে গিয়ে ব্যারিংটন মেকলে বলেন যে, নীলকর সাহেবরা আইনের মাধ্যমে চাষীদের উপর যেটুকু অবিচার ও অত্যাচার করতে পারতেন তা তো করতেনই, তাছাড়াও আইন-বহির্ভূত-ভাবে আরও অধিক অন্যায় অবিচার করে নীলচাষীদের ভূমিদাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন। "...that great evils exist, that great injustice is frequently committed that, man ryots have been brought partly by the operation of the laws and partly by acts committed in-defiance of law, into a state not far removed from that of predial slavery."

(৮) বিদ্রোহের সূচনা :

নদীয়া জেলার চৌগাছা নামক স্থানের নীলকুঠিতে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে দুই ভাই দেওয়ানের কাজ করতেন। নীলকর সাহেবদের নীলচাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার স্বচক্ষে দেখে তাঁরা এত মর্মাহত হয়ে পড়েন যে, দুই ভাই দেওয়ানের চাকরী ছেড়ে দিয়ে চৌগাছায় নীলচাষীদের সঙ্ঘবদ্ধ করে নীলচাষ বন্ধ করে

দেন। নীলকর সাহেবরা তাঁদের লাঠিয়াল পাঠিয়ে নীলচাষীদের শাস্তি দিতে চেষ্টা করেন। উভয় পক্ষের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তাতে একজন চাষী প্রাণ হারায়। কিন্তু তাতে বিদ্রোহী কৃষকগণ আরও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং তারা অন্যান্য স্থানের নীলচাষীদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়াতে শুরু করে। অল্পদিনের মধ্যেই নীলচাষীদের এই বিদ্রোহ বাংলাদেশের এক বিরাট অংশের উপর বিস্তৃত হয়ে পড়ে। বিদ্রোহী নীল চাষীরা সাহেবদের নিকট থেকে দাদন নিতে অস্বীকার করে। সাহেবদের কুঠি আক্রমণ করা এবং তাঁদের আঘাত করা, নীলচাষ করা জমির নীলগাছ নষ্ট করা, নীলকুঠি লুঠ করা অবাধে চলতে শুরু করে। নীল বিদ্রোহীরা বর্শা, বাঁশের লাঠি, তলোয়ার প্রভৃতি তাদের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। মধ্য বাংলায় এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস এবং উত্তরবঙ্গে এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন ওয়াহাবি দলের রফিক মণ্ডল। তাছাড়া নদীয়া জেলার মেঘনা সর্দার, হুগলীর বৈদ্যনাথ সর্দার ও বিশ্বনাথ সর্দার এবং যশোর-খুলনায় শিশির কুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ এই বিদ্রোহের সময় কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করতে যথেষ্ট সাহায্য করেন। নীল-বিদ্রোহীরা জলে ও স্থলে অত্যাচারী সাহেবদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। অগণিত নীল বিদ্রোহী সেই সময় নীলকর সাহেব ও ইংরেজ সরকারের গুলিতে প্রাণ হারায়। কিন্তু ইংরেজদের এই অত্যাচার ও নিপীড়িনে ভীত না হয়ে বিদ্রোহীরা আরও তীব্রভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। সরকারও এই বিদ্রোহ দমন করতে সকল প্রকার দমনমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে ত্রুটি করেন নি। কিন্তু এই বিদ্রোহ স্বয়ং ভাইসরয় ও গভর্ণর জেনারেল ক্যানিংকেও দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। নদীয়া জেলায় এই বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠলেও অল্পদিনের মধ্যেই যশোর, পাটনা, মালদা, রাজসাহী প্রভৃতি বিভিন্ন জেলায় এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহ এইরূপ ব্যাপক আকার ধারণ করলে ইংরেজ সরকার নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের কার্যকলাপ সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিযুক্ত করেন। এই তদন্ত কমিশন নীলচাষীদের উপর সকলপ্রকার অত্যাচার ও নির্যাতন বন্ধ করার জন্য নির্দেশ দেয়।

(৯) নীল বিদ্রোহের প্রতি সমর্থন :

নীলবিদ্রোহ শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও ঘৃণার সৃষ্টি করে। সেই সময়কার পত্র-পত্রিকা, বক্তৃতা-আলোচনায় নীলবিদ্রোহের প্রতি সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশ করে নীলকর সাহেবদের মুখোশ খুলে দেন। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকর সাহেবদের বর্বরতার কাহিনী সর্বত্র এক আলোড়নের সৃষ্টি করে।

(১০) বিদ্রোহের গুরুত্ব :

নীলবিদ্রোহ বাংলাদেশের কৃষকদের উপর নির্যাতনের ফলে অনুষ্ঠিত হলেও এই

বিদ্রোহ থেকেই বাংলাদেশের তথা ভারতের কৃষকদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় তার মোটামুটি একটা ধারণা পাওয়া যায়। সংগঠিত হলে নিরক্ষর, নিরীহ-কৃষকগণও যে তাদের অভিযোগের প্রতিকারে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জয়যুক্ত হতে পারে কৃষকদের নীলবিদ্রোহ তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে। বস্তুতঃ বাংলার নীল বিদ্রোহই ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহাত্মক আন্দোলন। দমনমূলক আইন প্রয়োগ করে এবং বিদ্রোহীদের প্রতি শাস্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহীদের দমন করতে ব্রিটিশ সরকারের ব্যর্থতা সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি কিরূপ হতে পারে তাও প্রমাণ করে। প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় ভাবে শক্তিশালী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আইন ভঙ্গ করে বিদ্রোহাত্মক আন্দোলনের সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতাই ছিল নীলবিদ্রোহ।

Q. 20. Give a description of East and West trade.

Ans. (১) **রপ্তানি বাণিজ্য ঃ**

ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজ, ফরাসী এবং পোর্তুগীজ বণিকদের অধিকার খর্ব করে কার্যতঃ ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের একচেটিয়া কারবারী হয়ে ওঠে। কোম্পানীর উদ্ভবের গোড়ার দিকে ভারতের রপ্তানির বৃহদংশ ছিল সূতীবস্ত্র এবং মশলা এবং ভারতে যে সকল দ্রব্য আমদানি হত তার মধ্যে প্রধান ছিল ধাতু-পিণ্ড অর্থাৎ স্বর্ণ এবং রৌপ্য। ইংরেজ বণিকদের হাতে ভারতে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্য বিশেষ কিছু ছিল না কেননা পশম কিংবা পশমজাত বস্তুর চাহিদা ভারতে অতি সামান্যই ছিল আর সেযুগে পশমজাত দ্রব্যই ছিল ইংলণ্ডের সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ শিল্পজাত দ্রব্য। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে অল্পদিনের মধ্যেই ইংলণ্ডে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপের সমালোচনা করে একদল লোক প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। তাদের সমালোচনার প্রধান বক্তব্য ছিল যে এই কোম্পানীর কার্যকলাপের ফলেই ইংলণ্ডের স্বর্ণভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে যাবে। এই আন্দোলনের ফলে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় সূতী-বস্ত্রের উপর ইংলণ্ডে অত্যন্ত উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয় এবং এমনকি কয়েক ধরণের সূতীবস্ত্রের আমদানি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের বয়ন শিল্পে 'শিল্প-বিপ্লবের' সূচনা ঘটে। এই বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে অপেক্ষাকৃত কম উৎপাদন-ব্যয়ে সূক্ষ্মতর সূতীবস্ত্রের উৎপাদন করতে সক্ষম হয় এবং তার ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই ইংলণ্ডের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সূতীবস্ত্রের আমদানি ভারতে আমদানি-কৃত মোট বিদেশী পণ্যদ্রব্যের অর্ধাংশের মতো দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের বস্ত্রশিল্পে প্রস্তুত বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় ভারতের হস্তচালিত বস্ত্র শিল্প যখন ধ্বংসের সম্মুখীন হয়, ঠিক সেই

সময়ে ব্রিটিশ বাজারে ভারতীয় কাঁচা তুলার আমদানির পথ সুগম হয়। ব্রিটেনে ভারতের কাঁচা তুলার চাহিদা আরও একটি কারণের জন্য বৃদ্ধি পায়। কারণটি এই যে ব্রিটেন আমেরিকার তুলা সরবরাহের উপর তার একান্ত নির্ভরতা হ্রাস করতে তখন ব্যগ্র হয়ে পড়ে। ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে সামুদ্রিক বন্দরগুলোর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর কাঁচামালের রপ্তানি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে:এবং রেলপথ নির্মিত হওয়ার পর এই যোগাযোগ আরও দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। পূর্বের তুলনায় সামুদ্রিক বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা অনেকাংশে বৃদ্ধি হলে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। তুলা ব্যতীত অন্যান্য যে সকল কাঁচামাল ভারতীয় রপ্তানীবাণিজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল পাট, তৈলবীজ, কাঁচা চামড়া, গম এবং চালের ন্যায় খাদ্য-শস্য এবং ব্রিটেনে জনপ্রিয় পানীয় চা। রপ্তানী উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের উপর রপ্তানি শুল্কও বিলুপ্ত করা হয়। আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিবহন শুল্ক ইত্যাদি ধরণের প্রতিবন্ধকতামূলক শুল্কগুলো পূর্বেই ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অপসারিত করা হয়। অপরদিকে ভারতের কুটিরশিল্পের ধ্বংস সাধনের ফলে ভারতের শ্রমজীবীগণ জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয় এবং নীল, চা, পাট প্রভৃতি রপ্তানিযোগ্য পণ্য দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

(২) আমদানি বাণিজ্য ঃ

আমদানির ক্ষেত্রে শিল্পজাত প্রায় সকল প্রকার সামগ্রীরই স্থান ছিল। গোড়াতে এই সকল শিল্পজাত সামগ্রী আধুনিক শিল্প-বিপ্লবের সূতিকাগৃহ ইংলণ্ড হতে আসত। কিন্তু পরবর্তীকালে অন্যান্য শিল্পায়িত দেশ হতেও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হত এবং বাংলাদেশের সরবরাহকারীগণের তালিকায় জার্মানী, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান স্থান লাভ করে। যদিও ভারতে সূতাবয়ন শিল্প ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গড়ে ওঠে, তথাপি সমগ্র দেশের চাহিদা মেটাবার পক্ষে এই শিল্পের বিকাশ যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া বাস্তব অবস্থার কথা বিবেচনা করে কেবল-মাত্র তত্ত্বগত যুক্তির অনুসরণ করে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে আমদানি দ্রব্যের উপর সমস্ত শুল্ক বিলোপ করা হলে বিদেশী শিল্পজাত দ্রব্যের এদেশে অবাধ আমদানির পথ সুগম হয়ে ওঠে।

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার আইনের ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। ভারতের আমদানি এবং রপ্তানি পণ্যদ্রব্য অবশ্যই ইংলণ্ডের জাহাজে পরিবহন করতে হবে এই নিয়মটিও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পরিত্যক্ত হয়। এই সকল কারণে যদিও তখন অন্যান্য দেশের পক্ষে ভারতের

সহিত ঘনিষ্টতার বাণিজ্যিক সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পথ সহজ ছিল তথাপি ইংরেজ রাজত্বের কালে ইংলণ্ডের সহিতই ভারতের বাণিজ্য সর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাণ পরিচালিত হত। ব্রিটিশ সরকারের নীতি, মূলধনের অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা এবং ইংরেজ বণিকদের পক্ষে ভারতে বাণিজ্যের ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ সুযোগলাভ করার ফলে অন্যান্য জাতিদের পক্ষে বাংলাদেশে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ লাভ করা সম্ভব ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রপ্তানিকৃত মালবহনের জন্য প্রতিবছর ৫০ থেকে ৬০টি জাহাজ বাংলাদেশে আসত। শতাব্দীর শেষদিকে ইয়োরোপ হতে কলকাতায় আগত জাহাজের সংখ্যা বেড়ে ৩০০ হয়। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পর ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বাণিজ্যে অবাধ অংশ গ্রহণের অনুমতি পেলে বাণিজ্যের পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রের পরিবর্তন এই সময় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। তূলাজাত শিল্প দ্রব্য ও চিনি জাতীয় পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি এই সময় দ্রুত হ্রাস পায় এবং তার পরিবর্তে কৃষিজাত কাঁচামাল প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে।

HISTORY OF BENGAL

PART III

(1757-1857)

Q. 1. Give a brief account of Indian Commerce under the East India Company.

উত্তর। (১) ভূমিকা ঃ

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যবিষয়ক শাসনবিভাগীয় স্থানীয় নিয়মাবলী লঙ্ঘন করতে প্ররোচনা দেয়। কোম্পানীর কর্মচারীরা নবাবের কর্মচারীদের প্রকাশ্যে অমান্য করে যেসব বাণিজ্যে তাদের বিন্দুমাত্র অধিকার ছিল না সেইসব বাণিজ্যেও প্রবৃত্ত হয়। অন্তঃশুল্কের ব্যাপারে যেসব সুযোগ-সুবিধা ও অব্যাহতি তাদের কখনও দেওয়া হয় নি, এখন তারা সেই সকল সুবিধাও দাবী করে। এমন ঘটনাও বিরল ছিল না যেখানে কোম্পানীর কর্মচারীরা তাদের উর্ধ্বতন কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ মানতে অস্বীকার করে অবিকল লুঠেরার মত আচরণ করত। ইংরেজদের এইভাবে নবলব্ধ ক্ষমতার সুযোগ গ্রহণ করতে দেখে দেশীয় ব্যবসায়ীরাও ইংরেজদের তাঁবেদার রূপে কাজ করতে এবং করমুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ করতে আরম্ভ করে। বাংলার রাজকোষে রাজস্ব-ক্ষতির পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ২৫ লক্ষ টাকায় দাঁড়ায়। ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাজিত দেশীয় বণিকরা ইংরেজদের এই ঔদ্ধত্য দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। নবাবের কর-সংগ্রাহকদের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের সংঘর্ষ অনেক ক্ষেত্রে শান্তিভঙ্গের কারণ রূপে দেখা দেয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব হন মীরকাশিম। তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের দ্বারা ক্ষমতা অপব্যবহারের এই দৃষ্টান্তগুলো বারবার কলকাতায় কোম্পানীর গভর্নরের গোচরে আনেন কিন্তু দোষী কর্মচারীদের শাস্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি বারবার দেয়া সত্ত্বেও এই অবস্থার কোন সুরাহা হয় নি। ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী ইংরেজ কর্মচারীদের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু নিয়মাবলী প্রবর্তন করে। কোম্পানী এই শর্তে রাজি হয় যে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিযুক্ত কর্মচারীরা বাণিজ্য সামগ্রীর মূল্যের উপর যথারীতি ৯ শতাংশ কর দিবে। কোম্পানীর তৎকালীন গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট এভাবে কোম্পানী ও নবাবের বিরোধিতা দূর করার কাজে উদ্যোগী হলেও তিনি নিজেই কোম্পানীর কর্মচারীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন। কোম্পানীর কর্মচারীরা অভিযোগ করতে থাকে যে গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট তাদের 'আইনসঙ্গত' অধিকার বিসর্জন দিয়েছেন। নতুন নিয়মাবলী এভাবে গোড়াতেই বানচাল হয়ে যায়। মীরকাশিম নিজের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাঁর শাসনবিভাগীয় কর্মচারীদের এই নির্দেশ দেন যে, তাঁরা যেন ইংরেজ বণিক ও নবাবের কর্মচারীর মধ্যে উদ্ভূত সমস্ত

বিবাদ বলপ্রয়োগে দমন করেন। তারপর তিনি ঘোষণা করেন যে দেশী বা বিদেশী সকল শ্রেণীর বণিকরাই দুই বছরের জন্য করমুক্ত বাণিজ্যের সুবিধা সমভাবে ভোগ করবে। এই উপায়ে তিনি ইংরেজ ও দেশীয় বণিকদের মধ্যে প্রতিযোগিতার শর্তাদির সমতা আনয়নের ও গ্রামাঞ্চলে অনবরত সংঘটিত বিবাদসমূহের মূল কারণটি দূর করতে চেষ্টা করেন। ইংরেজ কর্মচারীরা নবাবের এই ঘোষণাকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নেয় নি। তারা যুক্তি দেখায় যে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যকে করমুক্ত করার অধিকার বাংলার নবাবের নেই, আছে শুধু দিল্লীর বাদশাহের। তাদের মধ্যে যারা অধিকতর 'রণং দেহি মনোভাবাপন্ন তারা কোম্পানীকে নবাবের কর্তৃত্ব অস্বীকার করতে ও মীরকাশিমের স্থলে অধিকতর বশংবদ অন্য কোনো শাসককে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্ররোচিত করতে শুরু করে। শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমকে উৎখাত করে। তার কিছুদিন পূর্বে মীরজাফরকে পুনরায় বাংলার নবাব করা হয়। তিনি কোম্পানীর আকাঙ্ক্ষিত সমস্ত বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা দিতে স্বীকৃত হন। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় বাংলার বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ-বণিক ও তাদের দেশীয় প্রতিনিধিদের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এবার তারা সমস্তরকম বাধানিষেধমুক্ত হয়ে দেশীয় বণিক ও কারিগরদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে বিরাট মুনাফা আত্মসাৎ করতে শুরু করে।

(২) কোম্পানীর স্বার্থ বৃদ্ধির চেষ্টা ঃ

কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক কার্যাবলী কোম্পানীর শাসন-সংক্রান্ত কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় শাসনে কোম্পানী ক্রমাগত অধিকতর পরিমাণে লিপ্ত হওয়ার দরন কোম্পানীর কর্মচারীদের শাসন-সংক্রান্ত কার্য দিনে দিনে বাড়তে থাকে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্ আলম্ কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বাংলার দেওয়ানী মঞ্জুর ভারতের এই অঞ্চলে কোম্পানীর মর্যাদাই শুধু বর্দ্ধিত করে নি ; কোম্পানীর নিকট এই সুযোগ ছিল একটি বিরাট অর্থ নৈতিক আশীর্বাদের মতো। নবাবের সহিত ক্রমাগত সংঘর্ষ এতদিন কোম্পানীকে সামরিক সংগঠন বাড়াতে এবং তার ফলে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর আর্থিক বিনিয়োগের পরিমাণ কমাতে বাধ্য করেছিল। দেওয়ানী অধিকার অধিগ্রহণের ফলে কোম্পানীর বাণিজ্যিক উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলার শিল্পজাত রপ্তানি দ্রব্যের দাম দিবার জন্য সোনা আমদানি ক্রমশঃই অনাবশ্যক হয়ে পড়ে ; কোম্পানীর রাজস্ব-উদ্বৃত্ত প্রদেশের রপ্তানিযোগ্য দ্রব্য ক্রয়ের পক্ষে সাধারণতঃ পর্যাপ্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে কোম্পানী চীন ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্যিক পণ্য ক্রয়ের জন্য বাংলা থেকে সোনা রপ্তানি শুরু করে। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী বছরগুলোতে বাংলায় কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য কিছুটা সংযত হয়। কিন্তু ভারতের অন্যান্য যে সকল অংশে কোম্পানীর প্রভাব বিস্তৃত হতে শুরু করে সেখানে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের নতুন নতুন সুযোগ উন্মোচিত হয়।

(৩) কোম্পানীর বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন ঃ

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর বাণিজ্যিক 'বিনিয়োগের' অঙ্ক প্রায় ৬০ লক্ষ টাকায় পৌঁছায়। দশ বছর পরে তা থেকে ১ কোটি টাকায় পরিণত হয়। কোম্পানীর রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় নয় দশমাংশ ছিল তুলজাত বস্ত্র ও কাঁচা রেশম। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে এগারোজন সদস্য নিয়ে গঠিত বাণিজ্য-পর্ষদ বা বোর্ড প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী এ দেশের বাজারে পণ্য ক্রয়ের উপর অধিকতর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই ব্যবস্থাও কোম্পানীর কর্মচারীদের সম্মুখে কোম্পানীকে বঞ্চিত করে ব্যক্তিগত বাণিজ্যে রত হইবার যে সুযোগ খোলা ছিল তাহা সম্পূর্ণ বন্ধ করতে পারে নি। পরে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে কোম্পানীর বাণিজ্যের প্রচলিত ব্যবস্থার ছিদ্রগুলি অনেকাংশে বন্ধ হয়ে যায়। কর্ণওয়ালিস কোম্পানীর পক্ষে দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বেতনভুক্ কমিশন এজেন্ট নিয়োগের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। কালক্রমে ভারতীয় বাণিজ্যে মুনাফা অর্জনের জন্য আরো অধিক সংখ্যায় ব্রিটিশ বণিকদের অনুপ্রবেশ ঘটে। কোম্পানীর সহিত এই বণিকদের প্রতিযোগিতা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বণিকদের 'স্বাধীন ব্যবসায়ী' বলে উল্লেখ করা হ'ত। ইউরোপের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যে তারা অনেক সময় ইংরেজ-ভিন্ন অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের জাহাজ ব্যবহার করত। তাদের কেনাবেচা প্রধানতঃ নীল ও আফিম এই দুটি দ্রব্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

(৪) কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার লাভ ঃ

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রতিযোগিতা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হতে থাকে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে কিছুকালের জন্য ওলন্দাজরা প্রতিযোগিতা প্রত্যাহার করে। যুদ্ধের পরে ওলন্দাজরা যখন বাণিজ্যে পুনরায় ফিরে আসে তখন তারা ব্রিটিশ কোম্পানীকে আর স্থানচ্যুত করতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লব শুরু হবার পরে ফরাসী বণিকেরাও প্রতিযোগিতা থেকে অপসৃত হয়। ওলন্দাজ ও ফরাসীদের শূন্যস্থান পূরণের মত শক্তি দিনেমারদের ছিল না। সুতরাং দেশীয় বাণিজ্যে অন্যান্যদের সামান্য অংশে বজায় থাকলেও, ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে কার্যতঃ একচেটিয়া কারবারী হয়ে ওঠে।

কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিনিধিদের নিকট মাল সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবসায়িক নিয়মাবলীতে আরও কড়াকড়ি শুরু হয়। নির্দিষ্ট পরিমাণে দ্রব্য সরবরাহের জন্য তাঁতি ও অন্যান্য কারিগরদের দাদন দেওয়া এদেশে সাধারণ প্রথা ছিল। এরূপ দাদন গ্রহণকারী কেউ সময়মত মাল সরবরাহ করতে না পারলে অভিযুক্ত হতে পারত এবং তার মজুত মাল বাজেয়াপ্ত করা চলত। মালসরবরাহে সময়সূচী রক্ষার কড়াকড়িতে অনেক কারিগরের পক্ষেই কারিগরি দক্ষতার পূর্বতন

মান বজায় রাখা সম্ভব হ'ল না। পণ্যের গুণ বিচার না করে পরিমাণের উপরই বেশী জোর দেওয়া শুরু হয়। বিশেষভাবে বাংলার তাঁতীরা ক্রমশঃ কোম্পানীর তুলাজাত দ্রব্য ক্রয়ের উপর শোচনীয়ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ বছরগুলোতে তুলাজাত দ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ ছিল বার্ষিক ৬৭-৬৮ লক্ষ টাকা।

ইউরোপে রপ্তানীকৃত তুলাজাত দ্রব্য বাজারস্থ করতে কোম্পানীর বিশেষ অসুবিধা হ'ত না। কিন্তু এর রপ্তানীকৃত কাঁচা রেশম অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের হওয়ায় সর্বদাই লাভে বিক্রয় করা সম্ভব হ'ত না। কোম্পানী সেই কারণে বাংলার কাঁচা রেশমের মান উন্নয়নের জন্য কয়েকজন ইতালির বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করে। কোম্পানী প্রতি বছর বাংলা হ'তে গড়ে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার রেশম খরিদ করত।

(৫) বাণিজ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঃ

আনুমানিক ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কোম্পানীর ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্যকে ইংল্যাণ্ডের উদীয়মান শিল্পস্বার্থের নিকট হ'তে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়। ১৭৬৯ সালেই কোম্পানী বাংলা হ'তে শিল্পোৎপাদিত রেশম সামগ্রীর রপ্তানীর পরিবর্তে কাঁচা রেশমের রপ্তানীর অনুকূলেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের সূতীবস্ত্রের মুদ্রকেরা ভারত থেকে মুদ্রিত সূতীবস্ত্রের আমদানির বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং প্রথম বারেই চার বছরের জন্য এই আমদানী বন্ধ করতে ইংরেজ সরকারকে বাধ্য করে। ম্যাঞ্চেষ্টারের মিলগুলি শেষ পর্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ ঢাকাই মসলিনের মত সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র ভারতীয় দাম অপেক্ষা প্রায় শতকরা ২০ ভাগ সস্তায় তৈরী করতে সমর্থ হয়। ভারতের বাজারে কোম্পানীর মসলিন ক্রয় ৩০ বছরের মধ্যে প্রায় পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হাতে-কাটা সূতা রপ্তানযোগ্য সামগ্রী হিসাবে তার স্থান হারায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের বছরগুলোতে ইংল্যাণ্ডের সূতাকল শিল্পের প্রসারকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর চড়া শুল্ক ধার্য করা হয়। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আভ্যন্তরীণ পরিবহণ কর বৃদ্ধির ফলে দেশীয় শিল্প আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে ব্রিটেনের শিল্পজাত দ্রব্যের ভারতে বিক্রয়ের পথ সুগম হইয়া উঠে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতীয় সূতীবস্ত্রের বিক্রয়ের নীট্ সঙ্কোচনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১·৮০ কোটি টাকা। আভ্যন্তরীণ শুল্ক দেশীয় বস্ত্রশিল্পকে পঙ্গু করে দেয়। অবশ্য সেই সময়ে ইংলণ্ড দ্রুত বিকাশশীল সূতা কর্তন ও বয়নের যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বয়ন-শিল্প এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়ে। তার উপর অতিরিক্ত শুল্কের বোঝা এই শিল্পকে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দিল।

গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পস্বার্থের বিরুদ্ধে সর্বদাই আত্মরক্ষার প্রয়াসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতীয় শিল্পের স্বার্থরক্ষার জন্য বিশেষ কোন আগ্রহ ছিল না। নিজেদের বাণিজ্যিক মুনাফা যে কোন ভাবে বজায় রাখবার জন্য কোম্পানী স্বদেশগামী মালবাহী

জাহাজে তুলাজাত দ্রব্য ছাড়াও অন্যান্য দ্রব্যের প্রবর্তন করতে একাধিকবার চেষ্টা করেছিল। কাঁচা তুলা, চিনি, নীল, শন এবং পাটের মত দ্রব্যাদির উপর এই পর্যায়ে কোম্পানীর নজর পড়তে শুরু করে। নেপোলিয়ান কর্তৃক ইউরোপীয় ভূ-খণ্ড, প্রধানতঃ ইতালি থেকে ইংলণ্ডে কাঁচা রেশমের রপ্তানির অবরোধের ফলে ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে ভারতীয় কাঁচা রেশমের চাহিদা ইংলণ্ডে বৃদ্ধি পায় এবং কয়েক বছর ধরে কাঁচা রেশমের বর্দ্ধিত রপ্তানি তুলাবস্ত্রের ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত রপ্তানির স্থান পূরণ করে। ইংলণ্ডে কিন্তু ভারতের রেশমের উপরও চড়া আমদানি শুল্ক বসানো হয়। কোম্পানীর বর্দ্ধিত রপ্তানি বাণিজ্যের অধিকাংশই ছিল ফরাসী ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশসমূহে ভারতীয় ছাপা রেশম দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফল। সাধারণতঃ ইংলণ্ডের কারিগররাই ভারত থেকে আমদানিকৃত রেশমী দ্রব্যেব উপর ছাপার কাজটি করে দিত।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কোম্পানীর চিনি রপ্তানি এ দেশে আখ চাষের প্রসারে অনুপ্রেরণা দেয়। নেপোলিয়নের যুদ্ধের ফলে কয়েক বছর রপ্তানি কম হলেও ভারতীয় চিনি ইউরোপের বাজার পুনরায় দখল করে। কিন্তু পরবর্তীকালে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের চিনি আবাদকারীদের প্রতিযোগিতা ইয়োরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোতে ভারতীয় চিনির রপ্তানিকে কার্যতঃ বিলুপ্ত করে দেয়।

বস্ত্র রপ্তানি হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রপ্তানি সামগ্রী হিসাবে নীল প্রভৃত গুরুত্ব লাভ করে। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ভেতর কলকাতা বন্দর হতে নীল রপ্তানির পরিমাণ প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পায়। নিম্ন বাংলার ব-দ্বীপ অঞ্চলে ও বিহারে নীল সস্তায় উৎপাদন করা যেত। এই সময়ে ইউরোপে নীলের দাম দ্রুত বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে নীল চাষ হ'তে প্রচুর মুনাফা অর্জন করা সম্ভব হয়। বাংলা ও বিহারের নীলকররা তাদের মুনাফা বৃদ্ধি সুনিশ্চিত করার জন্য নীল-চাষীদিগকে অন্যান্য শস্যের পরিবর্তে নীলচাষকে অগ্রাধিকার দিতে বাধ্য করত। চাষীদের সহিত তারা নীল চাষের বাধ্যতামূলক চুক্তি করত কিন্তু পরিবর্তে নীলচাষীরা উৎসাহব্যঞ্জক কিছু পেত না। ফলে নীলকুঠীর মালিক ও নীলচাষীর ভিতর সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে উঠে।

বিহারে উৎপাদিত আফিমের প্রায় সবটাই চীনে রপ্তানি হ'ত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আফিমের বিক্রয় তিনগুণেরও বেশী বেড়ে যায়। তুলা, রেশম বা চিনি এইসব পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ের তুলনায় নীল ও আফিম এই উভয় বাণিজ্যেই ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

(৬) বিনিয়োগ প্রথার পরিবর্তন ঃ

গোড়ার দিকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের ভারতীয় বাণিজ্যে বাণিয়া বলে অভিহিত ভারতীয় প্রতিভূ ও মধ্যস্থদের সাহায্য গ্রহণ করে। কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং বিদেশী ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা বাজার সম্পর্কিত তথ্যাদির জন্যে এবং অংশতঃ মূলধনের

জন্যেও এইসব দেশীয় প্রতিভূর উপর নির্ভর করত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে বৈদেশিক বাণিজ্যের সংগঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেক প্রাক্তন ইংরেজ ব্যবসায়ী এজেন্সী হাউসরূপে কলিকাতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে এবং তাঁরা দরকার হ'লে অভ্যন্তরীণ কিংবা বৈদেশিক বাণিজ্যে লিপ্ত অন্যান্য ব্যবসায়ীদের নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধজ্ঞান ও আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে লাগল। এইসব এজেন্সী হাউসগুলি তাদের ব্যবসায়ের মূলধন কোম্পানীর কর্মচারীদের নিকট থেকেই সংগ্রহ করত। এই সমস্ত কর্মচারীগণ ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হতে অসমর্থ হয়ে লাভের আশায় তাদের সঞ্চয় এজেন্সী হাউসগুলির নিকট গচ্ছিত রাখত। এজেন্সী হাউসগুলো নীল ও চিনি উৎপাদনকারীদের অর্থপ্রদান, জাহাজ-পরিবহণ বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্ক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালন এবং সরকারী কাজের চুক্তি পাওয়ার জন্যে প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কাজকর্মে লিপ্ত ছিল। তারা ব্যক্তিগতভাবে কিংবা তাদের গ্রাহকদের পক্ষ থেকে সরকারী ঋণপত্রে বিনিয়োগও করত। তারা মাঝে মাঝে ভারতীয় মহাজন ও বণিকদের নিকট হতেও টাকা ধার করত এবং বিশেষ প্রয়োজন হলে কোম্পানীর আর্থিক সাহায্যের উপরও নির্ভর করতে পারত। কতিপয় এজেন্সী হাউস অযোগ্য পাত্রে ঋণ দিবার ফলে অনিবার্যভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু ১৮২০ দশকের শেষের দিকে নীলের দাম নিদারুণভাবে পড়ে যাওয়ায় তাদের সকলের ভিত্তিমূল না ভেঙেপড়া পর্যন্ত এই এজেন্সী হাউসগুলো সাধারণভাবে সমৃদ্ধিশালী ছিল। কোম্পানীর সরকার বিভিন্ন উপায়ে এজেন্সী হাউসগুলোর অবস্থার উন্নতিসাধন করবার জন্যে চেষ্টা করেন; এমন কি নীলচাষীদের প্রতিকূল শর্তে তাদের নিকট নীল বিক্রয় করতেও সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু নীলের দাম ক্রমাগত হ্রাস পাওয়ার ফলে এ সমস্ত কোন উপায়ই এজেন্সী হাউসগুলোর সম্পূর্ণ বিপর্যয় রোধ করতে সমর্থ হল না।

(৭) নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্ভব হয়। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হতে প্রথম জাহাজ কলিকাতা বন্দরে আসে। ১৭৯৭ সালের মধ্যে ভারতের সহিত আমেরিকার বাণিজ্য এত বিরাট আকার ধারণ করে যে, যে সকল ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা বহুদিন হতেই ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের সমালোচক ছিল তাহারা ভারতের বাজারে আমেরিকায় এই অনুপ্রবেশকে কোম্পানীর বাণিজ্যে একচেটিয়া কারবার বন্ধ করবার যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। আমেরিকার বাজারে মাঝারি ধরনের ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের বিরাট চাহিদা ছিল; কিন্তু ১৮১১-১২ সালের ইঙ্গ-মার্কিন যুদ্ধ ভারতের সহিত আমেরিকার বাণিজ্যিক সম্পর্কের বিস্তারে ব্যাঘাতের সৃষ্টি করে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনের পরে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত উদ্যোগের দ্বারা চালিত হয়ে অধিক সংখ্যায় ভারতের বাজারে প্রবেশ করতে থাকে। ব্রিটিশ জাহাজে মালবহনের মাশুলের হার

কমানো হয় এবং ভারতীয় বন্দরে ব্রিটিশ-ভিন্ন অন্য জাতির জাহাজের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হ'তে থাকে। এই সকল কারণে আমেরিকা ও ভারতের মধ্যে প্রত্যক্ষ বাণিজ্য ধীরে ধীরে ক্ষীণতর হ'তে আরম্ভ করে। ভারতের সূতীবস্ত্র হতে আমেরিকার বাজারকে সংরক্ষিত করার জন্য আমেরিকার সরকারও ভারতের তুলাজাত বস্ত্রসমূহের উপর চড়া আমদানি শুল্ক আরোপ করে। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাজারে চাহিদা পূরণ করত মার্কিনী ব্যবসায়ীরা। সেখানেও অধিকতর সস্তা ব্রিটিশ তুলাজাত বস্ত্র বাংলা হ'তে আমদানিকৃত তুলাজাত বস্ত্রের স্থান দখল করতে থাকে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রপ্তানিকৃত মালবহনের জন্যে প্রতি বছর ৫০ হ'তে ৬০টি জাহাজ বাংলায় আসত। শতাব্দীর শেষের দিকে ইয়োরোপ হ'তে কলিকাতায় আগত জাহাজের সংখ্যা বেড়ে ৩০০ হয়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা ভারতীয় বাণিজ্যে অবাধ অংশ গ্রহণের অনুমতি পেলে বাণিজ্যের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু রপ্তানির ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তুলাজাত শিল্পদ্রব্য ও চিনির রপ্তানি দ্রুত কমে যায় এবং খাদ্যদ্রব্য ও শিল্পের জন্যে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ভারতীয় রপ্তানিতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। আমদানির এক বিরাট অংশ ছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের কাপড়, ধাতু এবং খনিজ তৈল।

(৮) উপসংহার ঃ

পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশের জয়ের পরে বাংলার বাসিন্দা ইয়োরোপীয়দের তরফ হতে ইয়োরোপের অর্থ স্থানান্তরের জন্যে এক বিরাট চাহিদার সৃষ্টি হয়। লুণ্ঠন, অবৈধ ঘুষ কিংবা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের মুনাফা হতে প্রাপ্ত অর্থ, ভারতের রপ্তানিকারিগণ দ্বারা প্রচলিত হুণ্ডি বা বিল ক্রয় করে অথবা সোনা এবং মূল্যবান প্রস্তর রপ্তানি করে ইয়োরোপে প্রেরণ করা হ'ত। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের পরে উদ্ভূত অনুকূল বাণিজ্য-উদ্বৃত্ত ছিল এভাবে স্বদেশে অর্থ প্রেরণ করার জন্য চাহিদার একটি অনিবার্য ফল। স্বর্গত ডঃ যোগীশচন্দ্র সিংহের এক হিসাবে দেখানো হয় যে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা হ'তে ৩.৮০ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সম্পদ ইংল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মধ্যে কেবলমাত্র এ দেশের শিল্পী ও কারিগররাই যে কার্যতঃ দেশ হ'তে বিলুপ্ত হয়ে গেল তা নয়। একই সঙ্গে নতুন উদ্যোগ বিকাশের জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থও এ দেশ হ'তে নিঃসৃত হয়ে ইংলণ্ডে গিয়ে জমা হ'তে লাগল আর তারই ফলে সেই দেশের শিল্পে ও বাণিজ্যে এক অভূতপূর্ব প্রসার ও সমৃদ্ধির নানাবিধ লক্ষণ দেখা যেতে লাগল।

Q. 2. Critically analyse the economic drain theory

উত্তর। (১) ভূমিকা ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইংলণ্ডে ও অন্যান্য পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশসমূহে ভারত থেকে যে-সম্পদ স্থানান্তর শুরু হয় তাকেই অনেক অর্থনীতিবিদ ভারতীয় সম্পদের

'নিঃসরণ' বলে অভিহিত করেন। মাঝে মাঝেই এই নিঃসরণের ব্যাপকতা পরিমাপের ও তার ফলাফল নির্ণয়ের প্রয়াস করা হয়। এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য প্রয়াস ছিল দাদাভাই নৌরজীর। তিনি ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'Poverty and Un-British Rule in India' নামক পুস্তকে এই নিঃসরণের মাত্রা অঙ্কে ব্যক্ত করেই ক্ষান্ত হন নি; তিনি আরও প্রমাণ করতে সমর্থ হন যে ভারতীয় জনগণের অসীম দারিদ্র্য এই নিঃসরণেরই প্রত্যক্ষ ফল। এই প্রসঙ্গেই দাদাভাই ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাপের কাজেও প্রথম হস্তক্ষেপ করেছিলেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে, যেমন, অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডা, ইংলণ্ড হতে আগত জনগণ বসতি স্থাপন করে দেশে নতুন মূলধনের অনুপ্রবেশের ব্যবস্থা করে। ভারতবর্ষে কিন্তু বৈদেশিক উদ্যোগ বা বৈদেশিক মূলধনের তেমন কোন বৃহৎ অনুপ্রবেশ ঘটেনি। যদিও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংরেজদের ভারত বসতি স্থাপনের উপর নিয়ন্ত্রণবিধি বহুল পরিমাণে শিথিল করা হয়, ততদিনে ব্রিটিশদের বহির্দেশে বসতি স্থাপনের গতি অন্য পথ গ্রহণ করে। ফলে ভারত প্রধানতঃ নিজের রপ্তানির আয় হতেই তার মূলধন সম্পদ বৃদ্ধি করতে বাধ্য হয়, কিন্তু অর্জিত সম্পদের এক বৃহৎ অংশ উপঢৌকন, লুণ্ঠন, অবৈধ ব্যবসা হোতে অর্জিত মুনাফা এবং পরবর্তীকালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তারের উদ্দেশ্যেই যে ঋণ অনুমোদন করা হয়েছিল তার সুদ হিসাবে ব্রিটেনে চলে যেতে শুরু করে। ব্রিটেন হতে প্রেরিত উচ্চপদস্থ সরকারী ও সামরিক কর্মচারীরা বিশেষ করে ১৭৮৭-৮৮ সালের পর হতে ভারতীয়দের গড় আয়ের তুলনায় অনেক বেশী বেতনক্রম ভোগ করতেন এবং তাদের সঞ্চয়ের বেশীর ভাগই মাতৃভূমিতে প্রেরণ করতেন। এইসব কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর হতে ভারতে সোনার আমদানি ক্ষীণ হয়ে আসে। ১৭৭০ সালের পরে, 'ক্ল্যাসিক্যাল' অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণ অনুসরণ করে বলা চলে যে, ভারতবর্ষ হয়ে দাঁড়াল একটি স্থায়ী ঋণগ্রস্ত দেশ এবং উদ্বৃত্ত বাণিজ্যের কোনো সুফল ভোগ করার অধিকার তার রইল না।

(২) ভারতে ব্রিটিশ নীতি ঃ

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের আঞ্চলিক রাজস্বের অধিকার হস্তগত করার ফলে এই রাজস্বকে ভারতে এবং অন্যত্র রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যসমূহ ক্রয় করবার কাজে ব্যবহার করতে পারত। এই ভাবে বাণিজ্যের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে এবং শাসনব্যবস্থাই আবার মুনাফা অর্জনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। দেশ হতে সম্পদের নিঃসরণ একাদিক্রমে বহু বছর ধরে দ্রব্য রপ্তানির উদ্বৃত্ত রূপে দেখা দিল, সোনা রপ্তানির পরিমাণ যে বৃদ্ধি পেল তা নয়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তার নবার্জিত রাজনৈতিক ক্ষমতার নজরাণা হিসাবে দুধের সরের মত ভারতীয় উৎপাদনের 'উদ্বৃত্ত'টুকু গ্রহণ করতে শুরু করে। এ ছাড়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লিপ্ত ইংরেজ ব্যবসায়ী, সারাজীবনের জন্য সম্পদ আরহণে উৎসুক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী,

যাঁরা বহুক্ষেত্রেই উৎকোচ গ্রহণের ঊর্ধ্বে ছিলেন না, এই সমস্ত সূত্র হ'তেও ভারত থেকে অর্থ স্থানান্তরের তাগিদ ছিল। অর্থ স্থানান্তরের এই সকল চাহিদা সচরাচর বাণিজ্যিক কোম্পানীগুলোর উপর হুণ্ডি সৃষ্টি করে মিটানো যেত এবং সেজন্য সাধারণতঃ ভারত হ'তে সোনা রপ্তানির প্রয়োজন হ'ত না। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে এই সময়ে ভারতের লেনদেন উদ্বৃত্তে স্থানান্তরিত সম্পদের সামগ্রিক পরিমাণ কত ছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর খাতে এই ধরনের নিঃসরণের পরিমাপ কষা হয়েছে অন্যূন বার্ষিক ৩০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু ব্যক্তিগত খাতে সম্পদ নিঃসরণের পরিমাপ করা আজও সম্ভব হয় নি। দাদাভাই স্বয়ং বিশ্বাস করতেন যে ১৭৮৮-৮৯ সাল হতে ১৮২৮-২৯ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বছর কাল ধরে ভারত হ'তে যে পরিমাণ সম্পদ ব্রিটেনে নিঃসৃত হয় তার পরিমাণ ১৫০ কোটি পাউণ্ডের কম হবে না।

এই পরিমাপ মোটামুটিভাবে উইলিয়াম ডিগবীকৃত পরিমাপের কাছাকাছি ছিল। উইলিয়াম ডিগবীর পরিমাপ অনুসারে ১৭৫৭ সাল হতে ওয়াটারলু যুদ্ধের সময় পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারত হ'তে নিঃসরিত সম্পদের পরিমাণ ৫০ কোটি পাউণ্ড হ'তে ১০০ কোটি পাউণ্ডের মধ্যবর্তী কোনো অঙ্কের সমপরিমাণ ছিল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের ৫০ বৎসর ধরে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রায় ৬৮ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্যও প্রায় ২ কোটি পাউণ্ড মূল্যের ব্রিটিশ মুদ্রা আমদানি করে বলে মনে হয়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে সোনার আমদানি হ্রাস প্রায়। এমন সময়ও ছিল, যেমন ১৭৭৭ হ'তে ১৭৮৭ সাল, যখন প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ পরিমাণ সোনা চীনে কোম্পানীর 'বিনিয়োগের' মূলধন হিসেবে ভারত হতে নির্গত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত মাঝে মাঝেই সোনা নির্গমন চলতে থাকে।

(৪) দাদাভাই নৌরজীর মত :

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হ'তে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, দাদাভাইয়ের হিসেব অনুসারে ভারতে নীট্ সোনা আমদানির পরিমাণ ছিল ২৩.৪৩৫ কোটি পাউণ্ড; কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ভারতের বিপুল রপ্তানি উদ্বৃত্তের তুলনায় সোনা আমদানির পরিমাণ ছিল খুবই কম। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ফলে কয়েক বছর ভারতের রপ্তানি উদ্বৃত্ত বিপুল হওয়ায় সোনার আমদানি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। প্রায় একই সময়ে রেলওয়ে-ঋণের আকারে ব্রিটিশ অর্থও ভারতে আসে। এই সোনা আমদানি ভারতের সোনা ও রূপোর গোপন মজুত বৃদ্ধি করে বলে মনে করার কোনো হেতু নেই। দেশে মোট মুদ্রার প্রচলন বেড়ে হয় ২৬.৬ কোটি পাউণ্ডেরও বেশি। সুতরাং সোনা আমদানিকে ভারতের মূলধন সঞ্চয়ের লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় না। পক্ষান্তরে, দেশকে নিঃস্ব করে অন্যান্য সম্পদের নিঃসরণ অপ্রতিহত গতিতেই চলতে থাকে এবং ভারতের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে ইংলণ্ডকে সমৃদ্ধিশালী করা হয়।

দাদাভাইয়ের মতে নিম্নোক্ত কারণসমূহের জন্য ভারত হ'তে অর্থনৈতিক সম্পদ নিঃসরণের সৃষ্টি হয়। (ক) পরিবারের ভরণপোষণ সন্তানদের জন্য ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের ইংলণ্ডে অর্থ প্রেরণ—এই ব্যবস্থাকে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যেতে পারে। (খ) কোম্পানীর কর্মচারীদের সঞ্চয় স্বদেশে প্রেরণ, যেহেতু অধিকাংশ কর্মচারীরাই স্বদেশে বিনিয়োগ করতে পছন্দ করতেন। (গ) ব্রিটিশ কর্মচারীদের ভোগের জন্য ব্রিটিশ দ্রব্যাদি ক্রয় করতে অর্থ প্রেরণ এবং ভারতে তাদের ব্রিটিশ দ্রব্যাদি ক্রয়। (ঘ) সরকারী ব্যবহারের জন্য ব্রিটেনে তৈরি দ্রব্যাদি ক্রয় এবং (ঙ) ব্রিটেনে গৃহীত ভারতীয় ঋণের উপর সুদ প্রদান রেলওয়ে ঋণের উপর ও উৎপাদনশীল কাজের জন্য গৃহীত ঋণের উপর সুদ প্রদান বাদ দিয়ে সাধারণতঃ চলতি খাতে উদ্বৃত্তের পাশাপাশি মূলধনী খাতে কিছু পরিমাণ নীট্ আমদানি দেখা যেত। ১৮০১ সালের পরে ভারতবর্ষ তার বাণিজ্য উদ্বৃত্তের পাওনা হিসেবে ছাড়াও আভ্যন্তরীণ বিনিময়ের সুবিধাজনক মাধ্যমরূপে ব্যবহারের জন্য রৌপ্যপিণ্ড আমদানি করত। পরবর্তী বছরগুলোতে রেলপথ, সেচকার্য এবং অন্যান্য উন্নয়নমূলক মূলধনী প্রকল্পের জন্য যে মূলধন আমদানি করা হ'ত তা কেবলমাত্র মূলধনী দ্রব্য আমদানির রূপই পরিগ্রহ করেনি। তার ফলে কিছু পরিমাণ রৌপ্য আমদানিও ঘটে। যখনই চলতি খাতের উদ্বৃত্ত ভারতবর্ষ হ'তে একতরফা সম্পদ হস্তান্তরের সমষ্টিগত পরিমাণ অর্থাৎ নিঃসরণ অপেক্ষা কম হ'ত তখন এ ধরনের মূলধন আমদানী বহির্বাণিজ্যে লেন-দেন উদ্বৃত্তের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করত। কিন্তু দাদাভাই তাঁর বিশ্লেষণ এখানেই শেষ করেন নি। তিনি দেখান যে ভারতে যে মূলধন আমদানি হয় ভারত হ'তে সম্পদ নিঃসরণই তার উৎসস্বরূপ ছিল। ভারতবর্ষ হ'তে যে সম্পদ একতরফা রপ্তানি রূপে নিঃসরিত হ'ত তাই আবার আমদানিকৃত মূলধনের আকারে দেখা দিত। এই অনুপ্রবেশের দ্বারা ইংলণ্ড হ'তে ভারতে সম্পদের কোনও প্রকৃত হস্তান্তর ঘটে নি। প্রকৃতপক্ষে মূলধনের আমদানি পরবর্তী বছরগুলোতে তথাকথিত 'হোমচার্জ' খাতের ভার বৃদ্ধি করে এবং তার পরিণতিস্বরূপ পরোক্ষভাবে ভারত হ'তে অতিরিক্ত সম্পদ নিঃসরণের পথ আরও সুগম করে তোলে।

এই বিভিন্ন ধরনের অর্থ প্রেরণ ছিল ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি উদ্বৃত্তের মূল কারণ। ১৮১৪ সাল হ'তে ১৮৬৫ সালের মধ্যে দাদাভাইয়ের হিসাব অনুসারে মোট রপ্তানি উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৩৫ কোটি পাউণ্ড।

(৫) ব্রিটিশ নীতির বৈশিষ্ট্য ঃ

ভারতের এই ক্রমাগত উদ্বৃত্ত রপ্তানি ছিল ব্রিটেনের সহিত বাণিজ্যে রত অষ্ট্রেলিয়া বা কানাডার মত উপনিবেশসমূহের আমদানি উদ্বৃত্তের স্পষ্টতই বিপরীত। উদাহরণ-স্বরূপ অষ্ট্রেলিয়া ১৮৫৬ সাল হ'তে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ৩০.৯ কোটি পাউণ্ড মূল্যের দ্রব্য ও স্বর্ণপিণ্ড আমদানি এবং ২৬.৮ কোটি পাউণ্ড মূল্যের সামগ্রী রপ্তানি করে।

সেই একই সময়ে কানাডার রপ্তানি ও আমদানি ছিল যথাক্রমে ১২ কোটি পাউণ্ড এবং ১৪৮ কোটি পাউণ্ড। এই সমস্ত উপনিবেশগুলোতে বহুল পরিমাণে ব্রিটিশ পুঁজির আমদানি দেশের কর্মসংস্থান ও আয়সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আর ভারতের সামান্য পুঁজির মজুতও একতরফা রপ্তানির আকারে নিঃসৃত হয়ে ভারতের কৃষি ও শিল্পকে দুর্বলতর করে তোলে। ১৮৫৬ সাল হতে ১৮৬৭ সালের মধ্যে স্বর্ণরৌপ্যাদি ধাতু অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৫৬ কোটি পাউণ্ড এবং আমদানির পরিমাণ ছিল ৪১৯ কোটি পাউণ্ড। এই আমদানির মধ্যে ব্রিটেন হতে ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত রেলপথের যন্ত্রপাতির মূল্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই শেষোক্ত ঋণের পরিমাণ ছিল ৭২ কোটি পাউণ্ড। দাদাভাই অবশ্যই স্বীকার করতেন যে ব্রিটিশ পুঁজি ভারতীয় রেলপথ নির্মাণকার্যে সহায়তা করে, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত রেলপথের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে কর বৃদ্ধির উপর নির্ভর করতে হত, ততদিন রেলপথ দেশের উপকারের জন্য করা হয়েছে তা বলা শক্ত ছিল। এ প্রসঙ্গে এল. এইচ. জেঙ্কস্ দেখান যে ভারতে রেলপথ নির্মাণ তৎসংশ্লিষ্ট নানাবিধ উদ্ভাবনের পথ খুলে দিতে সক্ষম হয় নি এবং সম্ভবতঃ তা যে পরিমাণ নিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি করে, অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বিনষ্ট করেছিল। ভারত যত বৈদেশিক ঋণই গ্রহণ করুক না কেন, সেই ঋণের পরিশোধকে কেন্দ্র করে বৈদেশিক ঋণের এক দূষিত আবর্তের সৃষ্টি হয়। অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশের তুলনায় ভারতের উন্নতিসাধনে বৈদেশিক ঋণের ভূমিকা ছিল খুবই নগণ্য।

(৬) সমালোচনা :

দাদাভাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে পূর্ববর্ণিত বৈদেশিক নিঃসরণের পরিপূরক হিসেবে ছিল আভ্যন্তরীণ নিঃসরণ—যেমন করের মাধ্যমে দারিদ্র্য-নিপীড়িত গ্রামীণ জনগণের নিকট হতে সমৃদ্ধতর নগরকেন্দ্রে ক্রয়ক্ষমতার হস্তান্তর। শহরাঞ্চলে প্রাচুর্যপূর্ণ ভোগব্যয়ের জন্য কিছু অংশ বাদ দিয়ে এই হস্তান্তরিত অর্থের বাকী সবটাই বৈদেশিক নিঃসরণ হিসাবে একতরফা রপ্তানির রূপ গ্রহণ করে বলে ধরা যায়। দাদাভাই দেখান যে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত হতে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ রাজশক্তির নিকট হস্তান্তরের পর হতে সরকারী ব্যয় ১৮৫৬ সালের ৩·২ কোটি পাউণ্ড হতে ১৮৭০—৭১ সালে ৪৯ কোটি পাউণ্ড পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। এই বর্দ্ধিত ব্যয়ের একটি মোটা অংশ লবণের উপর কর বাড়িয়ে মেটানো হত। লবণের উপর এই কর ছিল চরম দুর্নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি কর। দাদাভাই তার একটি গণনায় দেখান যে ভারত সরকারের সংগৃহীত করের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগই দেশের দরিদ্র জনসাধারণের আয় হতে আহৃত হত। আবার সরকারী ব্যয়ের ক্ষেত্রে যেখানে জনগণের মঙ্গলসাধক কার্যাবলীর জন্য কেবলমাত্র শতকরা ১৫ ভাগ ব্যয় করা হত সেখানে প্রতিরক্ষা ব্যয় এবং আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য মোট সরকারী ব্যয়ের প্রায় ৬০ শতাংশ ব্যয় করা হত।

দাদাভাই ভারত সরকারের চলিত জাতীয় ঋণ নীতির তীব্র সমালোচক ছিলেন। জাতীয় ঋণের অধিকাংশ স্পষ্টতই 'রাজনৈতিক' ধরনের ছিল, কেননা তার উদ্ভব হয় ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশ অধিকারের জন্য ব্রিটেনের যুদ্ধ চালানোর ফলে। এ ধরনের রাজনৈতিক ঋণের পরিমাণ মোটামুটিভাবে ১০ কোটি পাউণ্ড বলে হিসেব করা হয়। ইণ্ডিয়া অফিসের সমস্ত খরচ ভারতীয় বাজেট থেকে আদায় করার রীতিটি ছিল ভারতের প্রতি অবিচারের আর একটি নিদর্শন। পক্ষান্তরে অন্যান্য ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোর ঔপনিবেশিক দপ্তরের খরচপত্র ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের দায় হিসেবে ধরা হত।

জাতীয় ঋণ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুদ প্রদানের ব্যয়ও বেড়ে যায়। এই ব্যয়ভার বহনের জন্য চরম অধোগতিসম্পন্ন কর বসানো হয়েছিল। দাদাভাইয়ের হিসাব অনুসারে ভারতের গড় কর-আপাতন জাতীয় আয়ের শতকরা ১৪.৩ ভাগ ছিল, অথচ ইংলণ্ডের মত অনেক বেশি সমৃদ্ধিশালী দেশেও এই আপাতনের পরিমাণ ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ৬.৯২ ভাগ মাত্র। এই কর ব্যবস্থা আরও নিগ্রহমূলক ছিল এই কারণে যে করদাতারা সরকারী সেবামূলক ও কল্যাণমূলক কার্যের আকারে প্রতিদান বলতে প্রায় কিছুই পেতেন না।

দাদাভাইয়ের বিবেচনায় কেবলমাত্র দ্রব্যাদি বা পুঁজির আকারেই নিঃসরণ ঘটে নি। তার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমদক্ষতার অদৃশ্য নিঃসরণও ঘটে, কারণ বাধাহীন বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় একের পর এক শিল্প ধ্বংস হতে শুরু করে এবং জনগণ আদিম কৃষিব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে উঠতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ সংযোগ ভারত হতে ইংলণ্ডে এক তরফা সম্পদ প্রবাহ ছাড়া ভারতকে আর কিছুই দেয়নি এই ছিল দাদাভাইয়ের বক্তব্যের সারাংশ। যদি কেউ যুক্তি দেখান যে ব্রিটিশরা ভারতীয় কৃষির নতুন সুযোগ-সুবিধা উন্মোচনের জন্য অনেক কিছু করেছে, দাদাভাই তার উত্তরে খোলাখুলি বলেন যে কৃষিজ রপ্তানিই ভারত হতে সম্পদ নির্গমনের প্রধান পথ ছিল। রেলপথ নির্মাণকে ব্রিটিশ শাসনের আরেক কৃতিত্ব বলে প্রায়ই দাবি করা হত। কিন্তু রেলপথের বিস্তার যে ভারতীয় জনগণের বিরাট কিছু উপকার করেছে তা স্বীকার করতে দাদাভাই প্রস্তুত ছিলেন না। বরঞ্চ ব্রিটিশ সরকারের রেলপথ বিস্তারের নীতি দেশের বৈদেশিক দায়-দায়িত্ব বাড়িয়ে দেয় এবং সেই সূত্রে নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্যে অনেকাংশে দায়ী। প্রকৃতপক্ষে ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতের অধিকাংশ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিই সম্পদের নিঃসরণকে ভারতীয় অর্থনীতির দীর্ঘকালীন উন্নয়নের পক্ষে প্রাণঘাতীস্বরূপ বলে বিবেচনা করেন। তার ফলে কেবলমাত্র যে জাগতিক সম্পদই ইংলণ্ডে হস্তান্তরিত হত তাই নয়। উপরন্তু এ ধরনের সম্পদ হস্তান্তরের ফলে অর্থনীতিতে যে অভিঘাতের সৃষ্টি হত তাও বাণিজ্যিক ও শিল্পোদ্যোগের বৃদ্ধি প্রতিহত করে, সঞ্চয় ও বিয়োগের প্রবণতা নষ্ট করে এবং অলস মজুত বৃদ্ধির প্রবণতাকে উৎসাহিত করে। তার অন্তর্নিহিত অর্থ হ'ল এই যে, উৎপাদনের চিরাচরিত পদ্ধতি ভারতে আরও দীর্ঘকাল ধরে টিকে থাকবার সুযোগ

পায়। শিল্পোন্নয়নের নবযুগের দিকে ইংলণ্ড যে যাত্রা শুরু করে ভারত হতে সম্পদ হস্তান্তর দ্বারা বজায় রাখা না হলে তার গতি অবশ্যই শ্লথতর হত। ভারতীয় সম্পদের হস্তান্তরের আকারে ভারতীয় অর্থনীতির 'রক্তক্ষরণের' মাধ্যমেই ইংলণ্ডে দ্রুততর শিল্পোন্নয়ন সম্ভব হয়। অথচ এই আত্মত্যাগের জন্য ভারত কখনই যথাযোগ্য প্রতিদান পায় নি।

Q 3 Briefly review the revenue administration of the East India Company with special reference to the permanent settlement.

উত্তর। (১) ভূমিকা :

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশদের হাতে বাংলার নবাবের পরাজয়ের পর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের ও তাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রচলিত অন্তঃশুল্ক না দিয়ে বাণিজ্য করার রীতি ব্যাপক হওয়ার ফলে নবাবের সমগ্র আভ্যন্তরীণ রাজস্বব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বিদেশী বণিকেরা তখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণ নিজেদের প্রয়োজনমত নির্ধারণ করে এবং দক্ষ কারিগরদের, বিশেষ করে তাঁতীদের উপর এক ধরনের বাধ্যতামূলক বিক্রয়ের ব্যবস্থা আরোপ করে দেশীয় শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থার ভাঙ্গনে তারা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। অনিশ্চিত ও অত্যধিক ভূমিরাজস্ব আদায়ের ফলে কৃষিজীবিশ্রেণীর মানুষেরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কোম্পানীর কর্মচারীদের অসদাচরণের একটি সীমা নির্ধারণের জন্য ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে তৎকালীন বাংলার নবাব মীরকাশিম ও ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধির মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গেই এই চুক্তি কার্যতঃ বানচাল হয়ে যায়। অনন্যোপায় নবাব তখন উচ্ছ্বাস ও আবেগের বশে দেশীয় ও বিদেশী উভয়বিধ বণিকদের ক্ষেত্রেই সমস্ত অন্তঃশুল্ক বিলুপ্ত করে দেন। তার প্রতিক্রিয়ায় মীরকাশিম ও কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে কতকগুলো সংঘর্ষ ঘটে এবং বক্সারের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে নবাব পরাজিত হন। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কোম্পানী মীরকাশিমকে অপসারিত করে পুনরায় মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসান।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের কর্মচারীদের অবৈধ আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বন্ধ করবার জন্য পুনরায় নির্দেশ জারি করে। সেই বছরই কোম্পানী দিল্লীর মোগল-সম্রাটের নিকট হতে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা কর প্রদানের শর্তে বাংলার 'দেওয়ান' বা রাজস্ব-সংগ্রাহক হওয়ার ফরমান লাভ করে। স্বয়ং লর্ড ক্লাইভের হিসাব অনুযায়ী, বাণিজ্যিক মুনাফা বাদ দিয়েও কোম্পানীর মোট রাজস্বের পরিমাণ তখন বার্ষিক ২.৫ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। সমস্ত ব্যয়ভার মিটিয়ে এবং কর দিয়েও ইংলণ্ডে পাঠানোর মত উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ১.২২ কোটি সিক্কা টাকা।

লর্ড ক্লাইভ লবণ, সুপারি ও তামাকের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের একচেটিয়া অধিকার বজায় রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য দ্রব্যের ক্ষেত্রে

তিনি এ ধরনের অবৈধ ব্যক্তিগত বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন করেন।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার তৎকালীন নবাব মীরকাশিম বাংলার তিনটি জেলার, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম-এর রাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানীকে দিলে কোম্পানী রাজস্ব-সংগ্রহের ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। ১৭৫৯ সালে কোম্পানী ২৪ পরগণার জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কোম্পানী এই তালুক সরাসরিভাবে শাসন করত। কিন্তু ১৭৬০ সালের অধিকার হস্তান্তরের দলিলে একটি অপ্রত্যক্ষ শাসনব্যবস্থার সূচনা করা হয়। পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের পথ প্রশস্ত করে। যদিও অধিকার প্রদানের দলিলে বংশানুক্রমিক রাজস্ব-আদায়কারীদের অর্থাৎ জমিদারদের অধিকার পুরোপুরি বজায় রাখার ব্যবস্থা ছিল তবুও এই অধিকারগুলোকে উপেক্ষা করা হয়। কোম্পানী জমিদারীকে নিলামের মাধ্যমে সর্বোচ্চ দামে বিলি করতে থাকায় একশ্রেণীর ফাট্কাবাজ ও অবৈধভাবে চড়া খাজনা আদায়কারীর পথ সুগম হয় আর অনেক সুপ্রাচীন জমিদার বংশের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।

(২ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ঃ

মোগল সম্রাটের নিকট হতে প্রাপ্ত দেওয়ানী অধিকার লাভ করার পর কোম্পানীর নিকট সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে রাজস্ব আদায়ের পন্থা উদ্ভাবনের এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়। জমি থেকে কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা যাবে তাহা স্থির করার জন্য উন্মুক্ত নিলামের সাহায্যে এক থেকে তিন বছরের জন্য এক নাগাড়ে জমি ইজারা দেওয়ার প্রথা অবলম্বন করা হয়। কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল যে রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্জনের জন্য নিলামে উপস্থিত ফাট্কাবাজ ব্যক্তিরা অত্যধিক চড়া দামে নিলাম ডাকত, কিন্তু তার ফলে পরবর্তীকালে বকেয়া রাজস্ব আদায় করতে কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পেতে হত। যারা নিলাম ডাকত, তাদের পক্ষে বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দেওয়া সম্ভব হত না। আবার কোম্পানীর নিকট তাদের দায় পূরণ করতে এই সমস্ত ক্ষণস্থায়ী ইজারাদারেরা কৃষকদের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা একবারও না ভেবে প্রজাদের সব সম্ভাব্য উপায়ে শোষণ করত। কোম্পানীর কর্মচারীদের এক অংশের মধ্যে এই অনুভূতি অবশ্যই ছিল যে মোগল অধীনে যারা পুরুষ-পরম্পরাক্রমে রাজস্ব-সংগ্রাহক নিযুক্ত ছিলেন এবং অসামরিক আইনকানুনের স্থানীয় প্রশাসকরূপে গণ্য হতেন, ভবিষ্যতেও রাজস্ব আদায়ের যে কোনো ব্যবস্থায় তাদেরই অগ্রাধিকার দিতে হবে। এই চিন্তাধারা অনুসরণ করে ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেষ্টিংসের সরকার অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদারগণের সহিত পাঁচ-সালা রাজস্ব-ইজারার বন্দোবস্ত করেন। কিন্তু যেহেতু সমগ্র অঞ্চলটি হতে সর্বাধিক রাজস্ব আদায় কি পরিমাণ হতে পারে সেই প্রশ্নের মীমাংসা তখনও হয়নি, সেহেতু পাঁচসালা জমিদারী প্রথার পাশাপাশি খোলাখুলি নিলামের ব্যবস্থাও চলছিল। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ বাংলা ১১৭৬ সাল বাংলার মহামন্বন্তরের পরের বছরগুলোতে

শস্যের দাম অভূতপূর্বভাবে বেড়ে যাওয়ায় অনেক জমিদারী বেশ চড়া দামে হস্তান্তরিত হল। পরে অধিক ফলনের জন্য শস্যের দাম পড়ে গেলে পূর্বনির্ধারিত রাজস্বের দায় অত্যধিক বলে পরিগণিত হল। এই অবস্থায় অস্থায়ী ইজারাদারেরা আত্মরক্ষার তাগিদেই চাষীদের উপর নিষ্পেষণ চালাতে শুরু করে। ফলে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার কর্ষিত অঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশ চাষের আওতার বাহিরে চলে যায়। অনাবাদী অবস্থায় পড়ে থাকা জমির হিসেব দেখে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে পড়েন।

দেওয়ানী অধিকার অধিগ্রহণের পর গোড়ার বছরগুলোতে কোম্পানী যে মোগল বাদশাহের প্রতিনিধিরূপে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনায় বাহ্যিক আড়ম্বর বজায় সচেষ্ট ছিল। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে কোম্পানীর কর্তৃত্ব আরও সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল শাসনের কিছু কিছু চিহ্ন অবশ্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। ঐ বছর ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মোগল সম্রাটকে অস্বীকার করে খোলাখুলিভাবে তাঁরা সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ঘোষণা করে।

৩। নতুন রাজস্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন :

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব প্রশাসনের সর্বোচ্চ দায়িত্ব নায়েব দেওয়ান নামে এক উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্মচারীর উপর ন্যস্ত হয়। তার কার্যকলাপ নবাবের দরবারে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাজ-প্রতিনিধির তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হতো। এই রাজ-প্রতিনিধি কলকাতায় কার্যরত সিলেক্ট কমিটির নিয়ন্ত্রণ ও নিয়মাধীন ছিল। দেশের ভাগ্যবিধাতা নয় প্রভুদের সন্তুষ্ট করতে নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খান তার অধীনস্থ কর্মচারীদের প্রদেশের রাজস্ব-সংগ্রাহকদের নিকট হতে আরো বেশী ভূমিরাজস্ব আদায় করতে নির্দেশ দেন। ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধি করার প্রথাগত নিয়মবিধিকে নানাভাবে উপেক্ষা করাই তখন রীতিতে পরিগণিত হয়। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব-প্রশাসনের মূলকেন্দ্রগুলোতে রাজস্ব-তত্ত্বাবধায়করূপে কোম্পানীর নিম্নপদস্থ ইয়োরোপীয় কর্মচারীদের মনোনয়ন করা স্থির হয়। তারা দেশীয় আমিলদের বা জমিদারগণের নিকট হতে রাজস্ব সংগ্রহকারী কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করত এবং যাতে ন্যায্য রাজস্ব নির্ধারণ করা যায় সেই উদ্দেশ্যে তাদের ভারপ্রাপ্ত অঞ্চলের চাষের অবস্থার খতিয়ান তৈরি করত। কিন্তু কিছুটা তাদের অনভিজ্ঞতার জন্য, কিছুটা কোম্পানীর নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের ভিতর প্রচলিত দুর্নীতির জন্য এবং কিছুটা দেশীয় রাজস্ব-কর্মচারীদের অসহযোগিতার জন্য, এই ব্যবস্থা অভীষ্ট ফল উৎপাদনে ব্যর্থ হয়। ইংরেজ রাজস্ব তত্ত্বাবধায়কদের অনেকেই কোম্পানীর স্বার্থে রাজস্ব সংগ্রহের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করার পরিবর্তে দেশীয় বণিকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে মুনাফা অর্জন করতে অধিক সচেষ্ট ছিল।

(৪) রাজস্ব পর্ষদের গঠন :

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় রাজস্ব পর্ষদসমূহ গঠিত হয় এবং ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় রাজস্ব নিয়ন্ত্রক কমিটি স্থাপিত হয়। শেষোক্ত প্রদেশের

রাজস্বপ্রশাসনের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার পূর্বতন সিলেক্ট কমিটির নিকট হতে গ্রহণ করে। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে নায়েব দেওয়ানের পদটি অবলুপ্ত হয়। কোম্পানী তার সর্বোচ্চ পরিচালকমণ্ডলীর বা কোর্ট অব ডিরেক্টরস এর নির্দেশক্রমে রাজস্ব প্রশাসনের সম্পূর্ণ ভার অধিগ্রহণ করা স্থির করে। রাজস্ব তত্ত্বাবধায়কদের প্রধান রাজস্ব-আদায়কারীরূপে অভিহিত করা হয় এবং রাজস্ব-কোষাগার মুর্শিদাবাদ হতে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়। দুই বছর পরে প্রধান রাজস্ব-আদায়কারীর পদ অবলুপ্ত হয় এবং রাজস্বপ্রশাসনের তত্ত্বাবধানের জন্য কলকাতা,-মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, দিনাজপুর এবং ঢাকায় পাঁচটি প্রাদেশিক পর্ষদ স্থাপিত হয়। প্রতিটি পর্ষদ পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হত এবং প্রতিটি পর্ষদের সহিত দেওয়ান নামে অভিহিত একজন দেশীয় কর্মচারী সংযোজিত থাকতেন। প্রাদেশিক পর্ষদসমূহের কার্যাবলী কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ামের পর্ষদের সকল সদস্য নিয়ে গঠিত একটি রাজস্ব বোর্ডের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রাদেশিক পর্ষদ ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয় এবং প্রধান রাজস্ব-আদায়কারীদের নিয়ে সংগঠিত পুরাতন প্রশাসন ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তিত হয়। এবার কোম্পানীর পাঁচজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা গঠিত রাজস্ব কমিটি রাজস্ব-বোর্ডের স্থান গ্রহণ করে। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দ হতে সংস্থা রাজস্বের পর্ষদ নামে অভিহিত হতে থাকে। যাহোক এ ধরনের নানা পরিবর্তনেও রাজস্ব সংগ্রহের ব্যবস্থা কোম্পানীর পরিচালকদের মনোমত করা গেল না। রাজস্বের বকেয়া পাওনা বেড়ে চলতে লাগল। দায়দায়িত্ব মিটাতে ব্যর্থ হওয়ার অনেক তথাকথিত জমিদারকে কারাগারে আটক করা হ'ত কিন্তু বকেয়া রাজস্ব উদ্ধারের কোন পথ তাতে পাওয়া গেল না। 'সারবান্ ও চরিত্রবান্ মানুষ' না হওয়াতে, তাদের অনেকেই টাকা দিয়ে স্বাধীনতা ক্রয় করতে ইচ্ছুক বা সমর্থ ছিলেন না।

নবাব মীরকাশিম দখলদারী ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি চূড়ান্ত যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য যত অধিক পরিমাণে সম্ভব রাজস্ব আদায়ে আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁর সময় হতেই বাংলার জমিদারদের উপর রাজস্বের চাপ বাড়ানো শুরু হয়। রাজস্বহারের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগত রীতিসমূহ উপেক্ষার এই নীতিকেই ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে কোম্পানী এবং তার প্রতিনিধিবৃন্দ অনুসরণ করতে থাকে। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার ভয়ঙ্কর মন্বন্তরে বর্দ্ধিত রাজস্ব চাহিদার চাপ এত সর্বনাশা হয় যে অনেক জমিদার ও কৃষক জমি জমা পরিত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং অনেক জমি বিনা চাষে পড়ে থাকে। এই সময় রাজস্বের চাপ বৃদ্ধি করার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ছিল 'নাজাই' ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা অনুসারে কোনো দুর্ভিক্ষ কিংবা অন্যবিধ প্রাকৃতিক দুর্বিপাকের পর যারা বেঁচে থাকত তাদের অন্যান্য গ্রামবাসীদের মৃত্যু বা গ্রাম পরিত্যাগের ফলে রাজস্বের যে ক্ষতি হত তা পূরণ করতে হ'ত। ব্রিটিশ আমলে জমিদারী জনসমক্ষে নিলাম দেয়া হত বলে অনেক অসৎ ব্যক্তি জোর করে অবৈধভাবে চাষীদের নিকট হতে চড়া খাজনা আদায় করে স্বল্পকালের জন্য হলেও মুনাফা অর্জনের আশায় জমিদার হ'তে চেষ্টা করে। জনসমক্ষে নিলাম সহযোগে জমিদারী বিলি করার ব্যবস্থায় এত দোষত্রুটি ছিল যে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী রাজস্ব বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে

জমিদারগণকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিয়ে রাজস্বের পাঁচ-সালা বন্দোবস্তের ব্যবস্থা প্রবর্তন করার আবশ্যকতা উপলব্ধি করে ; কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত যে কোন বহিরাগত ব্যক্তি জমির রাজস্ব উৎপাদনের ক্ষমতা সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণা না থাকা সত্ত্বেও জমিদারীর জন্য নিলামে দর ডাকতে পারত ততক্ষণ রাজস্ব বকেয়া পুরোপুরি পরিহার করা যায়নি তবু কিছু জমিদারী স্পষ্টতঃই লাভজনক ছিল এবং এই সব অপেক্ষাকৃত লাভজনক সম্পত্তি অনেক ক্ষেত্রেই ঐতিহ্যগত জমিদারদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের দ্বারা ভারতীয় প্রতিনিধিদের বেনামে অধিকৃত হয়।

(৫) পুরাতন ব্যবস্থার পরিবর্তন :

১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে পাঁচ-সালা বন্দোবস্ত পরিত্যক্ত হয় এবং পরবর্তী ১২ বৎসর ধরে বার্ষিক বন্দোবস্তই রাজস্ব-আদায়ের রীতি হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্ত বন্দোবস্তে জমিদারগণকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং অব্যবহিত পূর্বের তিন বছরে কোষাগারে যে নীট্ রাজস্ব পাওয়া গিয়েছে তার ভিত্তিতে রাজস্বের একটি আদর্শ পরিমাপ নির্ণয় করা হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের পরে ফসলের চড়া দাম কৃষিচুক্তির শর্তাদিতে একটি উচ্চমুখী প্রবণতার সৃষ্টি করে। সুতরাং রাজস্বের মান নির্ধারণের এই পদ্ধতিও অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ ছিল এবং ভূমিজীবীদের উপর কঠিন চাপের সৃষ্টি করে।

(৬) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন ঃ

১৭৭২ সালের পরবর্তী নানা সময়ে ওয়ারেণ হেস্টিংস এই অভিমত ব্যক্ত করেন, কোম্পানীর রাজস্ব-প্রশাসনে যে বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয় জমিদারদের সহিত অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বন্দোবস্তই তা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। তিনি বেশ দীর্ঘস্থায়া 'এক জীবন বা দুই জীবন ব্যাপী বন্দোবস্তের সমর্থক ছিলেন। সরকারী ক্ষমতার দ্বন্দ্বে হেস্টিংসের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফিলিপ ফ্রান্সিসও জমিদারী বন্দোবস্ত চিরকালের জন্যে অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর প্রধান যুক্তি ছিল যে "সরকার কখনোই রায়তের স্তর পর্যন্ত নামতে পারে না।" তারা উভয়েই এই মত পোষণ করতেন যে ঐতিহ্যগত জমিদাররা স্থানীয় জন-সমষ্টির স্বাভাবিক নেতা এবং নিজ নিজ অঞ্চলে বসবাসকারী জমিদাররা যে পরিমাণে রায়তদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করেন কোনো বহিরাগত ব্যক্তি সেই পরিমাণে তাদের স্বার্থ রক্ষা করতে আগ্রহী হবে না।

পাঁচ-সালা ও আরো স্বল্পস্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কোম্পানীর কর্মচারীদের অধিকাংশই এই মতের আধা-সমর্থক হয়ে দাঁড়ান। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী এবং ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দের পিটের ভারতীয় আইনের সাহায্যে কোম্পানীর উপর বেশ কিছু নিয়ন্ত্রণের অধিকারী ব্রিটিশ সরকার এবার ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার প্রবণতা রোধ করতে সচেষ্ট হন। জমিদারশ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করলেই কোম্পানীর রাজস্ব আদায়ের পথ সুগম হবে এই বিশ্বাস যেন তাদের মনে দৃঢ়মূল। ১৭৮৬

খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস এই ধরনের নীতি কার্যকর করার সুস্পষ্ট নির্দেশ সহ ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন। কর্ণওয়ালিস নিজেও বিশ্বাস করতেন যে ভূমি-রাজস্বের ব্যাপারে জমিদারগণের সহিত বরাবরের মত বন্দোবস্তের দ্বারাই ভারতে কোম্পানীর দুর্বল প্রশাসন ব্যবস্থাকে অন্যান্য আরও প্রয়োজনীয় কাজের উদ্দেশ্যে যথা বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যাপারে ব্যবহার করা যেতে পারে।

কর্ণওয়ালিসের প্রধান লক্ষ্য ছিল যাতে কোম্পানীর জন্য একটি প্রতিশ্রুত আয় নিশ্চিত করা যায়। ভবিষ্যতে জমি হতে বাড়তি আয়ের উপর সরকারের দাবি ছেড়ে দেওয়া হয় এই সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে কৃষি আরো সমৃদ্ধিশালী হলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে প্রসার হবে তার উপর কর স্থাপন করে এই ক্ষতিপূরণ করা যাবে। তিনি যে প্রাচীন জমিদারশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন এমন নয়। বরঞ্চ তিনি চেয়েছিলেন যে জমি দেশের আরো উদ্যমী বাণিজ্যিক শ্রেণীর হাতে চলে যাক যাতে এই উদ্যমী লোকেরা পতিত জমি চাষের কাজে ব্যবহার করার জন্য পূর্ণাঙ্গ প্রচেষ্টা চালাতে পারেন। ইংলণ্ডে অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা কৃষির উন্নতির জন্য সেই সময় যে উদ্যম দেখান কর্ণওয়ালিস আশা করেন যে ঠিক সেভাবে এই দেশেও উদ্যমী ব্যবসায়ীরা একটি কৃষিবিপ্লবের সূচনা করবেন। জমিদারদের বিরুদ্ধে রায়তের অধিকার সম্পর্কে কর্ণওয়ালিস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে তিনি তাদের জমিদারদের শুভবুদ্ধির উপর ছেড়ে দিতে পারেন, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত অকর্ষিত জমি চাষে ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে ততক্ষণ জমিদাররা কখনো রায়তদের জমি কেড়ে নেবেন না অথবা তাদের নিকট হতে অবৈধভাবে চড়া খাজনা আদায় করতে পারবেন না। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে জমিদাররা নিজের রায়তের লিখিত চুক্তির দলিল অর্থাৎ পাট্টা দেবেন। দলিলের কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হ'লে যে কোন পক্ষ তা সহজেই আদালতের গোচরে আনতে পারবে, কারণ কর্ণওয়ালিসের আমলে দেশের বিভিন্ন অংশে যথেষ্ট দ্রুতগতিতে বিচারব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়। নিজের অভিজাত পশ্চাৎপট ও অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর দরুন কর্ণওয়ালিস বুঝতে পারেন নি যে রায়তের মামলা দায়ের করার ক্ষমতা কত সামান্য এবং যথাসময়ে মামলার নিষ্পত্তি করার সামর্থও ব্রিটিশ পদ্ধতি অনুযায়ী স্থাপিত আদালতের কত কম।

স্যার জন শোর তখন কর্ণওয়ালিসের পরামর্শদাতা সভার সদস্য। ভারতীয় রাজস্বসংক্রান্ত বিষয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের অপেক্ষা শোরের অভিজ্ঞতা ছিল অনেক বেশী। তিনি খাজনাস্তর, কৃষি-আয় ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদির সর্বাত্মক অনুসন্ধান না করে রাজস্ব বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করা যে বিপজ্জনক সে সম্বন্ধে সর্তকবাণী উচ্চারণ করেন। কিন্তু তাঁর উপদেশ তখন যথাযোগ্য সমাদর লাভ করে নি। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের সরকার, পরিচালকমণ্ডলীর অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তীকালে পরিমাপের চলিত হার চিরস্থায়ী হতে পারে, এই শর্তে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারগণের সহিত দশ-সালা বন্দোবস্ত করেন। এই অনুমোদন ১৭৯২ সালে পাওয়া যায়। কোম্পানীর

পরিচালকমণ্ডলী গভর্নর জেনারেলকে ১৭৮৯-৯০ সালের প্রকৃত রাজস্ব-সংগ্রাহক জমিদারগণের উপর চিরস্থায়ী দাবি হিসাবে রূপান্তরিত করতে নির্দেশ দেয়।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ২২শে মার্চ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা করা হল। জমিদারদের উপর রাজস্ব-চাহিদা তারা যত খাজনা আদায় করবে বলে ধরা হ'ত তার নয়-দশমাংশ বলে স্থির হয়। যেহেতু পূর্বোক্ত রাজস্ব-আদায়ের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায় নি সেহেতু, অনেকে এই ব্যবস্থার সমালোচনা করলেও, একথা সুস্পষ্টভাবে বলা শক্ত যে ১৭৯৩ সালের রাজস্ব নির্ধারণ জমিদারদের উপর খুব দুর্বহ ভার রূপে দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এই ব্যবস্থার দ্বারা ঘনবসতিপূর্ণ এলাকার জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। জনবসতি যে সকল অঞ্চলে বিরল ছিল, সেখানে জমিদারগণ তাদের জমির উপর বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে কম করে রাজস্ব নির্ধারণের ফলে উপকৃত হন। যথাসময়ে রাজস্ব প্রদানে অক্ষম ব্যক্তিদের সহিত যে কঠোর আচরণ করা হ'ত তা হতেই এই ব্যবস্থার স্বরূপ বোঝা যায়। জমিদারগণ যথাসময়ে তাদের রাজস্বের কিস্তিসমূহ কোম্পানীর কোষাগারে প্রদান করতে দায়বদ্ধ ছিলেন। এই দায় পালনে যে কোন ব্যর্থতার সরাসরি ফল হিসাবে তাদের বকেয়া পাওনা উদ্ধারে যতটুকু জমি বিক্রীর দরকার তাদের জমিদারীর ততটুকু অংশ নিলামে চড়ানো হ'ত। জমিদার যাতে রায়তের নিকট হতে তার পাওনা আদায় করতে পারেন সেহেতু ১৭৯৯ সালের সপ্তম আইন দ্বারা তাকে ক্ষমতা দেওয়া হল যে তিনিও তার প্রজাদের খাজনা না দেওয়ার জন্য হাজতে আটক রাখতে পারেন এবং বকেয়া খাজনা উদ্ধারের জন্য তাদের ব্যক্তিগত অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করতে পারেন। ১৮১২ খ্রীস্টাব্দের ৫ম আইন পূর্বে অর্পিত মালক্রোক করার সীমাহীন ক্ষমতার যথেচ্ছাচার কিছু পরিমাণে রোধ করতে চেষ্টা করে কিন্তু জমিদারদের ক্ষমতার বিরুদ্ধে রায়তদের আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু ব্যবস্থা করা হয় তা সম্পূর্ণ অপ্রতুল ছিল।

(৭) সমালোচনা ঃ

যেহেতু রায়তের অর্থাৎ প্রকৃত চাষীর নিকট নিজ স্বত্বের কোন নথিপত্র ছিল না, খাজনা বৃদ্ধি বা উৎখাতের ক্ষেত্রে কোন প্রমাণের সাহায্য নেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। নথিপত্রের মোগল আমলের ব্যবস্থা কিছুকালের জন্য ভেঙ্গে পড়ে আর কর্ণওয়ালিসের ধারণা যে জমিদারগণ প্রত্যেক চাষীকে জমি ভোগদখলের শর্তাদি স্পষ্ট উল্লেখ করে লিখিত পাট্টা দেবেন তাও কখনও কার্যে পরিণত হয় নি। জমিদারদের রাজস্বসংগ্রহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারিতায় পর্যবসিত হয়। কোন কোন জমিদারেরা খাজনা সংগ্রহের অধিকার অধস্তন প্রতিনিধিদের উপর অর্পণ করতেন আর সেই অধস্তন স্বত্বাধিকারীরা আবার নিজস্ব খাজনা নির্ধারণ করে রায়তের উপর চাপিয়ে দিতেন। রাজস্ব প্রদানে অক্ষম হলে জমি বিক্রয়ের ব্যবস্থা থাকাতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অধীনেও জমিদারী ক্রমাগতই হস্তান্তরিত হ'ত। কোন কোন সময় বাণিজ্যিক স্বার্থসম্পন্ন শহরের বাসিন্দারাও টাকার জোরে জমিদারী নিলামে কিনে নিত

পূর্বের মালিকগণ তখন সেই নূতন জমিদারের অধীনে পত্তনীদার হিসাবে কাজ করে রাজস্ব সংগ্রহ করত।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে চাষের জন্য জমির চাহিদা একাধিক কারণে বেড়ে যায়। দেশের অপেক্ষাকৃত শান্ত অবস্থা এবং বড় বড় রাজবংশের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ হতে অব্যাহতির ফলে দেশের জনসংখ্যা কিছুটা দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি প্রায়। এদিকে যন্ত্রজাত দ্রব্যাদির প্রতিযোগিতায় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদির বিলোপ ঘটাতে অনেক কারুশিল্পী যে কোন শর্তে জমি পাওয়ার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় কম খাজনা প্রদানকারী প্রজাদের উৎখাত একটি দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হ'ল। প্রজাদের দেয় খাজনা বেড়ে যাওয়াতে জমিদারী তালুকের মূল্যও প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৮১৩ ১৪ সালে নিলামে বিক্রীত তালুকের মূল্য ছিল গড়ে ১৭৯০-৯৩ সালে বিক্রীত তালুকের মূল্যের প্রায় ২০ গুণ বেশি।

Q. 4. Give a critical note on the Permanent Settlement with special reference to Mr R. C. Datt's view

উত্তর: (১) ভূমিকা:

১৭৭৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ও তাঁর পর্ষদের আরেকজন সদস্য "যে সমস্ত বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক শর্তাদি প্রদান করতে রাজি থাকবে" তাদের সহিত ভূমিরাজস্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রস্তাব করেন। এই ধরনের বন্দোবস্ত কার্যকর করতে জমিদারশ্রেণীকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করার পিছনে জমিদারের অধিকার বা ভাগ্য সম্পর্কে চিন্তাই মূল কারণ ছিল এমন কথা মনে করার কোন কারণ নেই। "স্থাবর সম্পত্তি যখন আকাঙ্ক্ষিত বস্তু হয়ে ওঠে তখন জমি বিক্রয়ের অধিকার হতে উদ্ভূত নিরাপত্তা" কিভাবে কার্যকর করা যায় তাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমর্থকদের মূল বিচার্য বিষয়। জমিদারীর অধিকারকে যখন তখন কেনা-বেচা করা চলবে এই নিশ্চয়তাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তাদের এই ধরনের ব্যবস্থার কথা ভাবতে অনুপ্রাণিত করে। তার সহিত যুক্ত ছিল আরও একটি বাস্তবধর্মী বিবেচনা। যতক্ষণ পর্যন্ত রাজস্ব বন্দোবস্ত একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে করা হবে ততক্ষণ কোম্পানীর প্রশাসন-সংক্রান্ত কার্যকলাপের এক বৃহৎ অংশ বন্দোবস্তের শর্তাদি নির্ধারণের জন্যই নিযুক্ত থাকবে। একবার চিরস্থায়ী রাজস্ব-বন্দোবস্ত প্রবর্তন করতে পারলে, সময়মত রাজস্ব দিতে অক্ষম ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন-মাফিক ব্যবস্থা নেওয়া চলবে এবং জমিদারী অধিকার আপনা হতেই জনগণের সবচেয়ে উদ্যোগী অংশের হাতে চলে যেতে পারবে। একদল উদ্যোগী জমিদারের হাতে অপরিবর্তিত ভূমিরাজস্বের চাহিদার সহিত সম্পত্তির চিরস্থায়ী অধিকার প্রদান করলে কেবলমাত্র ভাল ফলই দেখা দিতে পারে এই ছিল প্রত্যাশা। অনেকের মনেই আশা ছিল যে এই ব্যবস্থা

"শিল্পের উন্মেষ এবং উদ্দীপনা, কৃষির প্রগতি ও প্রসার, যোগ্যতার প্রতিষ্ঠা ও সাধারণভাবে সম্পদ ও সম্পত্তির বিকাশ ঘটাবে।" সাধারণভাবে সম্পদের এই বৃদ্ধি যথাকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রাষ্ট্রের রাজস্বের যে লোকসান হবে তার ক্ষতি পূরণ করবে।

রমেশচন্দ্র দত্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবল সমর্থক ছিলেন। তাঁর মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত "এমন একটি ব্যবস্থা যা ভারতে ব্রিটিশ প্রজাদের সমৃদ্ধি ও সুখ ব্রিটিশ সরকারের অন্য যে কোন ব্যবস্থার তুলনায় আরো অনেক বেশী নিশ্চিত করেছে।" এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা প্রয়োজন যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তার অব্যবহিত পূর্বে ১৭৬৫ সাল হতে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত যে কঠোর ও অনিশ্চিত রাজস্ব-বন্দোবস্ত চলছিল তা অপেক্ষা নিঃসন্দেহে ভাল ছিল। অবশ্য উচ্চস্তরের জমিদারগণ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা প্রদত্ত নিশ্চিত অধিকার ও পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কৃষিকার্যের প্রসারের দরুন খাজনার আয় বৃদ্ধি হতে উপকার লাভ করলেও প্রকৃত কৃষকের বিন্দুমাত্রও উপকার হয় নি। যখন থেকে প্রচণ্ড সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হলে কৃষকদের প্রথাগত অধিকারসমূহ চলে যেতে শুরু করে তখন থেকেই অনিশ্চয়তা ও রূঢ় ব্যবহার এই শ্রেণীর মানুষের ভাগ্যলিপি হয়ে ওঠে। চিরস্থায়ী প্রবর্তনের পরও ঠিক সেই অবস্থাই চলতে লাগল। বস্তুত: বংশানুক্রমিক জমিদাররা সম্পত্তি হারাতে শুরু করলে এবং জমিদারীর এক বড় অংশ ব্যবসায়ীশ্রেণীর হস্তগত হলে, কৃষকের উপর আরোপিত গুরুভার কর সম্ভবতঃ বৃদ্ধি পায়। যেহেতু জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব প্রদানে ব্যর্থ হলে কোম্পানীর মার্জনা পেতেন না সেহেতু রায়তের দুরবস্থার সময় রাজস্ব হ্রাস করার প্রয়োজন থাকলেও জমিদার খাজনা হ্রাস মঞ্জুর করার মতো অবস্থায় ছিলেন না। চিরস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থার এই পরিণতি উদ্যোক্তারা কোন ভাবেই পূর্বে ধারণা করতে পারেন নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লর্ড কর্ণওয়ালিসের বিশ্বাস ছিল যে জমিদারশ্রেণী রায়তদের ন্যায্য খাজনায় নিশ্চিত অধিকারের স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হন। কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত জমি অকর্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জমিদারগণের সর্বোত্তম শর্তে কৃষকদিগকে বসতি স্থাপনে প্রলুব্ধ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। সেই সময়ে কেউই বুঝতে পারেন নি যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রধান প্রধান হস্তশিল্পের সর্বাত্মক ধ্বংসের ফলে জমির চাহিদা এত বৃদ্ধি পাবে যে রায়তদের নিশ্চয়তার সুবিধা থেকে বঞ্চিত করলেই জমিদারের স্বার্থ আরো ভালভাবে সংরক্ষিত হবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলোতে কৃষিপণ্যের ও কৃষিজমির খাজনার মূল্য খুব বেড়ে গেলে, পত্তনীদার, ইজারাদার ও অন্যান্য মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে খাজনা সংগ্রহের ব্যবস্থা করা জমিদারের পক্ষে সুবিধাজনক হ'ল। এই শ্রেণীর লোকেরা জমিদারের অধীনে থেকে তাকে একটি নির্দিষ্ট খাজনা প্রদান করে তালুকের অধিকারী হ'ত, এবং রায়তদের উপর অধিকতর হারে খাজনা বসিয়ে নিজেদের ক্ষতিপূরণ করার পূর্ণ অধিকার তাদের ছিল। কোন কোন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অঞ্চলে প্রতিযোগিতার ফলে এই

খাজনা ক্রমাগত এমন বেড়ে যায় যে উপ প্রজাস্বত্বের রীতি চরম আকার ধারণ করে। একসময়ে জমিদারী ও অন্যান্য মধ্যবর্তী স্বত্বে বিনিয়োগ ছিল বাণিজ্যিক ও শিল্প উদ্যোগে বিনিয়োগ অপেক্ষা অধিকতর জনপ্রিয়। এইরূপ মানসিকতার প্রধান কারণ, মধ্যস্বত্বের অধিকার হতে কমবেশী নিশ্চিত আয় পাওয়া যেত। কিন্তু শিল্প বাণিজ্যের আয় ছিল অনিশ্চিত। বাণিজ্যে ও শিল্পে পূর্ব ভারতের ধনিক শ্রেণীর উদ্যোগের অভাবের জন্য চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে অনেক সময়ে দোষ দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ একথা বলাই বেশি সঙ্গত যে বিদেশীরা যখন লাভজনক বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্র থেকে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীকে বিতাড়িত করে তখন জমিতে বিনিয়োগই ভারতীয় মূলধনের একমাত্র নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একই পদ্ধতির মাধ্যমে অভিজাত জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী ভূমিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি করে। এই শ্রেণীর মানুষের আয় মাঝে মাঝে অযথা ভোগব্যয়ে ব্যয়িত হলেও নানাভাবে সমাজের সম্পদ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। এই শ্রেণীর অনেকে শিক্ষা, সঙ্গীত, সূক্ষ্ম কলাবিদ্যা ও রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সে সময়ে দেশের সরকার সহানুভূতিহীন বিদেশীদের হাতে ছিল, তখন ভূ সম্পত্তির অধিকারী সম্ভ্রান্তশ্রেণীর হাতে উদ্বৃত্ত জমা না হয়ে যদি তার পরিবর্তে রাষ্ট্রের হাতে জমা হ'ত তবে এই সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলো খুব সম্ভবতঃ আরও ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত।

ক্ষমতার প্রধান অংশ ভারতীয়দের হাতে হস্তান্তরিত হলে এবং ভারত সরকার জনগণের মানসিকতার প্রতি অধিকতর মনোযোগী হয়ে উঠলে, চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্তের ব্যবস্থা এ যুগের অনুপযোগী বলে প্রতীত হতে শুরু করে। ১৯৩৫ সালের সংবিধান সংস্কারানুসারে গঠিত বাংলার লোকতান্ত্রিক সরকার ১৯৩৮ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল এবং এর প্রয়োজনীয় সংস্কার সম্পর্কে মতামত দেবার জন্য এক ভূমি-রাজস্ব কমিশন স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউড-এর সভাপতিত্বে নিয়োগ করেন। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত তাদের প্রতিবেদন কমিশনের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাতিলের সুপারিশ করেন এবং যাতে জমির প্রকৃত ব্যবহারকারীর সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয় সেইরূপ সুপারিশ করেন। কিন্তু কমিশনের সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ জমিদারী বিলোপ থেকে খুব বেশি লাভের আশা পোষণ করেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ও দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর জন্য এই সংস্কারের আলোচনাকে বেশ কয়েক বছরের জন্য স্থগিত রাখতে হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরে আবার জমিদারী বিলোপের কার্যসূচী গ্রহণ করা হলে কয়েক বছরের মধ্যেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিলোপ ঘটে।

Q. 5. Give a brief account of the society in India in the nineteenth century with special reference to the rise of the middle class.

উত্তর : (১) সমাজ

ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হওয়ার পূর্বে কয়েকশ বছর মুসলমান শাসনের পরও ভারতের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সামাজিক সম্পর্ক নিবিড় কিংবা সামাজিক আদান-প্রদান-ভিত্তিক হয়ে ওঠে নি। মুসলমানরা বহিরাগত জাতি এবং হিন্দুদের স্বাধীনতা-হরণকারী এই ধারণা সামাজিক একতা-বিরোধী মনোভাবের জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল, একথা অনস্বীকার্য। তাছাড়া, মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা হিন্দু সমাজের তথাকথিত নিম্নতম শ্রেণীর ধর্মান্তরিত ব্যক্তি, এই ধারণাও হিন্দু সম্প্রদায়কে মুসলমান সম্প্রদায় থেকে সামাজিক দিক্ দিয়ে পৃথক্ করে রাখে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যবহারিক সম্প্রীতির অভাব ছিল না বটে, কিন্তু উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক আদান-প্রদান ছিল না। হিন্দুদের পক্ষে মুসলমানদের হাতে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ জাতিভ্রষ্ট হওয়ার কারণ ছিল। কিন্তু একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অনেক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে হিন্দু অভ্যাগতদের জন্য হিন্দু-পাচক দ্বারা পরিচালিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। হিন্দু ধর্মগুরু, মুসলমান পীর, লোকগীতি মুসলমান বা হিন্দুধর্ম-সংক্রান্তই হোক, কতক কতক সামাজিক আদব-কায়দা উভয় সম্প্রদায়ের লোকই মেনে চলত।

অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে রচিত সৈয়দ গোলাম হোসেনের সিয়ার উল-মুতাখেরিণ গ্রন্থে উল্লিখিত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সামাজিক আচরণ উনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে অপরিবর্তিত ছিল, বলা যেতে পারে। তার মতে হিন্দুরা অপরাপর জাতি হতে নিজেদের সম্পূর্ণ পৃথক্ মনে করত, তাদের সামাজিক আচার-আচরণ, ধর্মীয় রীতি-নীতি এমন ছিল যে, মুসলমান সম্প্রদায়কে তারা বিদেশী ও ধর্মের দিক দিয়ে পরিত্যাজ্য বলে বিবেচনা করত। তথাপি দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন সম্প্রীতি গড়ে ওঠে যে, তারা নিজেদের একই মা'র সন্তান, পরস্পর ভাই ভাই, যেন একই পরিবারের লোক এরূপ মনে করত। এই দুই জাতি—হিন্দু ও মুসলমান 'দুধের সঙ্গে যেমন চিনি' সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায় এরূপ মিশিয়া গিয়াছিল। "We see that this dissimilarity and alienation have terminated in friendship and union, and that the two nations have come to coalesce together into one whole, like milk and sugar that has received a simmering"

গোলাম হুসেনের মন্তব্যের অতিশয়োক্তি বাদ দিলে একথাই বলা চলে যে, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও পারস্পরিক সৌহার্দ্যের অভাব ছিল না।

হিন্দু সমাজের মধ্যেও জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা, অস্পৃশ্যতা, স্ত্রীজাতির স্বাধীনতাহীনতা, কুসংস্কার প্রভৃতি সমাজের পশ্চাদ্‌পদতার কারণ হিসাবে বিদ্যমান

ছিল। বর্ণ হিন্দুদের অর্থাৎ উচ্চ জাতির হিন্দুদের নিকট নীচ জাতির হিন্দুরা অস্পৃশ্য ছিল। তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক দূরের কথা অস্পৃশ্যদের ছায়া স্পর্শ করাও দূষণীয় ছিল। এই ধরনের জাতিভেদ প্রথা এবং হিন্দু সমাজের আভ্যন্তরীণ বৈষম্য ও স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য বাছ-বিচার বাংলা তথা ভারতবর্ষের সর্বত্র বিদ্যমান ছিল।

ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার পর মুসলমান শাসকদের ক্ষমতার অবসান ঘটলে শাসকসুলভ ঔদ্ধত্যও তাদের হ্রাস পায়। ফলে ধর্মের গোঁড়ামির জন্য পূর্বে হিন্দু সমাজের প্রতি তাদের যে বিরোধিতা ও অবজ্ঞার ভাব ছিল তা ক্রমে দূরীভূত হতে শুরু করে। হিন্দু ও মুসলমান সকলেই সমানভাবে বিদেশী ইংরেজদের পদানত এই ধারণা এবং ইংরেজ শাসনে উভয় সম্প্রদায়ের সমভাবে অভাব-অসুবিধা-ভোগ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই দুই সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক পার্থক্য কোনভাবেই দূরীভূত হয় নি।

হিন্দু-মুসলমান—এই দুই সম্প্রদায় ভিন্ন এক তৃতীয় সম্প্রদায় তখন গড়ে ওঠে। তা হ'ল ইংরেজ সম্প্রদায়। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এবং নিকটবর্তী অঞ্চলে ইংরেজগণ এক নূতন সম্প্রদায় হিসাবে দেখা দেয়। সংখ্যার দিক দিয়ে অপর দুই সম্প্রদায় অপেক্ষা তারা অনেক কম ছিল বটে, কিন্তু তাদের পদমর্যাদা এবং শাসকদের স্বজাতি হিসাবে তাদের অভিমান সংখ্যার দুর্বলতা দূর করতে সমর্থ ছিল। ক্রমে বাঙালীদের সহিত ইংরেজদের সামাজিক সম্পর্ক অনেকটা সৌহার্দ্যমূলক হয়ে ওঠে। সাহেবরা হিন্দুদের পূজা-পার্বণে যোগদান করে গায়ে তেল মেখে এবং হুকায় তামাক খেয়ে বাঙালীত্বের অনেকটা রপ্ত করে। বাঙালীদের সহিত সাহেবদের বন্ধুসুলভ ব্যবহার, বাংলা ভাষায় কথা বলা এই সময়ে ইংরেজদের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। মিশনারী সাহেবদের ভারতে আসায় ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার আইনের বলে যখন আর বাধা রইল না সেই সময় হতে মিশনারীগণ বাঙালীদের সমাজ-জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেন। ভারতীয়দের প্রতি মিশনারীরা অন্যান্য ইয়োরোপীয়দের অপেক্ষা অধিকতর সহানুভূতিশীল ছিল।

বাঙালীদের চরিত্র ও ব্যবহার সম্পর্কে কোন কোন জাত্যাভিমানী ইংরেজ কটূক্তি করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। চার্লস্ গ্রান্টের নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাঙালীদের চরিত্র মসিলিপ্ত করেছেন। বাঙালীরা ইওরোপে সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর সম্প্রদায়ের লোক অপেক্ষাও অধিকতর অনগ্রসর; অসাধুতা, দুর্নীতিপরায়ণতা, স্বার্থপরতা এবং বিবেকহীনতা বাঙালীর মধ্যে অত্যধিক পরিমাণে গ্রান্ট সাহেব লক্ষ্য করেছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস, লর্ড ম্যাকলে, মিঃ ওয়ার্ড প্রভৃতি আরও অনেকেই এই ধরনের মন্তব্য করেছেন বটে, কিন্তু বিশপ হার্বারের মন্তব্য অনুধাবন করলে এই সব মন্তব্য যে পক্ষপাতদোষে দুষ্ট তা বুঝতে বিলম্ব হয় না। হার্বারের মতে ভারতীয়দের দোষ ত্রুটি যাই থাকুক না কেন তাদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করলে তাদের ভাল

না বেসে পারা যায় না। ভারতীয়রা নম্রস্বভাব জাতি, সাধারণ মানব সমাজ অপেক্ষা ভারতীয়দের বুদ্ধিমত্তা অনেক বেশী, তাদের জ্ঞানস্পৃহা গ্রীসের আথেন্সবাসী অপেক্ষা কম নয়। "They (the Indians) are a nation, with whom whatever their faults, I, for one, shall think it impossible to live long without loving them—a race of gentle and temperate habits, with a natural talent and acuteness beyond the ordinary level of mankind and with a thirst of general knowledge which even the renowned and the inquisitive Athenians can hardly have surpassed or equalled."

রাজা রামমোহন রায় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষী দিবার কালে ভারতবাসীর নৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, ভারতীয় কৃষক ও সাধারণ মানুষ যারা শহর নগর হতে দূরে, বিচারালয়, বিদেশীদের সংস্পর্শ হতে দূরে গ্রামাঞ্চলে বাস করে তারা নির্দোষ, সংযমী এবং যে কোন দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা কোন অংশে কম নৈতিক নয়। উত্তর ও পশ্চিম ভারতের লোকদের সাধুতা ও আড়ম্বরহীনতা, নৈতিকতা ও চরিত্রের দৃঢ়তা আরও বেশি। শহরবাসী যাহারা বিচারালয় এবং নানাপ্রকার বিদেশী, বিভিন্ন ধরনের আচার-আচরণ ও সভ্যতার সংস্পর্শে আসে তাদের মধ্যে কুটিলতা, নীতিহীনতা, মিথ্যাবাদিতা ও ধর্মহীনতা স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। গ্রামাঞ্চলের লোকের তুলনায় তারা চরিত্রের দিক দিয়ে অনেক নিম্ন মানের। আবার যারা উকিল-মোক্তারদের মোহরারের কাজ করে এবং যারা চালাকি দ্বারা জীবিকা উপার্জন করে থাকে তাদের সততা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি কোনপ্রকার চারিত্রিক বলের বালাই নেই। কিন্তু সাধারণভাবে এরূপ মন্তব্য করা গেলেও, রামমোহন একথা উল্লেখ করেছিলেন যে, শহরের লোকদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন এমনকি উপরি-উক্ত তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে এমন অনেক আছেন যাঁরা সৎ, সত্যবাদী, চারিত্রিক বলে বলীয়ান এবং নানাপ্রকার সম্মানজনক বৃত্তিতে নিযুক্ত আছেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উনবিংশ শতকের শুরুতে বাঙালী তথা ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে যে সৌহার্দ্যমূলক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় উনবিংশ শতকের পরবর্তী পর্যায়ে এই সৌহার্দ্য ক্রমেই হ্রাস পেয়ে শাসকসুলভ ঔদ্ধত্য ইংরেজদের গ্রাস করে।

(২) মধ্যবিত্ত শ্রেণী ঃ

১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে চার্টার আইনের দ্বারা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যে অংশগ্রহণ হতে বিরত করার ফলে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যিক এবং বিদেশী মূলধনীদের বিভিন্ন শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ উৎসাহিত হয়, ফলে ভারতের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ বহুগুণে বেড়ে যায়। এইসব শিল্প ও বাণিজ্যের কর্মকাণ্ডে ভারতীয়দের

নিজস্ব অংশ ছিল অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু যেটুকু ছিল তার সিংহভাগে ছিল মাড়ওয়াড়ী, মোগল ও পার্শীদের হাতে। এই তিন সম্প্রদায়ের পর ছিল বাঙালীদের স্থান। ব্যবসায়-বাণিজ্যের পসারের সঙ্গে সঙ্গে নায়েব, গোমস্তা, দালাল, হিসাবরক্ষক প্রভৃতির যেমন উদ্ভব ঘটল, তেমনি মামলা-মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার প্রভৃতির ফলে উকিল-মোক্তার, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিধারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সমাজের এক শক্তিশালী অংশে পরিণত হ'ল। সর্বশেষে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজ শাসনের গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ফল ছিল পূর্বেকার শাসকশ্রেণীর সামাজিক মর্যাদা, প্রতিপত্তি ও গুরুত্বের অবসান, বিদ্বান ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের গুরুত্ব হ্রাস এবং ক্রমে নূতন শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন স্থাপিত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে, বিশেষভাবে ইওরোপীয় বণিক সম্প্রদায় ও মিশনারীদের সান্নিধ্যে আসার ফলে ভারতবাসীর সামাজিক আচার আচরণ, মানসিকতা সব কিছুরই পরিবর্তন শুরু হয়। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ হতে শুরু হয়ে উনবিংশ শতক ব্যাপী এই পরিবর্তন অবাধভাবে চলতে থাকে। ভারতীয় সমাজের উপর পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব ক্রমেই গভীরতর ও ব্যাপকতর হতে থাকে।

বাংলাদেশেই এই পরিবর্তন সর্বপ্রথম শুরু হয় এবং ক্রমে ভারতের অপরাপর অংশে বিস্তার লাভ করে। পূর্বের সমাজ বিভাগের স্থলে নতুন সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের উদ্ভব ঘটে। অর্থ, শিক্ষা, বৃত্তি বা পেশাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন জাতির লোক এক নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে। এই সম্প্রদায় মধ্যবিত্তশ্রেণী নামে পরিচিত। পাশ্চাত্য জগতে যেমন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সামন্ততন্ত্রের ও যাজকতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা, অবাধ প্রতিযোগিতা, অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য আনয়ন করে ঠিক অনুরূপ সাফল্য ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজ আনিতে সমর্থ না হলেও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এবং জাতীয়তাবোধের প্রসারের ক্ষেত্রে ভারতীয় মধ্যবিত্তের অবদান ছিল অপরিসীম।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভবের দুইটি প্রধান এবং মূল কারণ ছিল। একটি হল পূর্বের শাসকশ্রেণীর বিলুপ্তির ফলে সামন্তসুলভ মনোভাব ও আচরণের অবসান, অপরটি হল নতুন ভূস্বামী, নতুন ব্যবসায়ী ও বণিক এবং বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব। বলা বাহুল্য, এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ঘটে ইয়োরোপীয়দের বাণিজ্য-শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রথম উৎপত্তি ঘটে, কারণ এই সকল শহর কেবল ব্যবসায়-বাণিজ্য শিল্পোৎপাদনের কেন্দ্র বলেই নয়, এগুলো সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য জগতের নাগরিক জীবনের আস্বাদ পায়, নতুন চিন্তাধারা, শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সুযোগ লাভ করে। এই ব্যাপারে কলকাতার গুরুত্বই ছিল সর্বাধিক। বণিক, শিল্পোদ্যোগী, মহাজন শ্রেণী, কারিগরী শিক্ষায়

শিক্ষিত ব্যক্তি, আমদানি-রপ্তানির কাজে পারদর্শী ব্যবসায়ী—সকল প্রকার লোকের সমাবেশ ঘটে কলকাতা নগরীতে।

মোগল শাসনের পতনোম্মুখতা মারাঠা আক্রমণ প্রভৃতির ফলে বাংলাদেশে যে নিরাপত্তার অভাব দেখা দেয় তা থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে অনেকেই কলকাতা শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কর্মসংস্থানের জন্যও বহু লোক এই নগরীতে আসে। সাতগাঁও, হালিশহর, বাটোর প্রভৃতি স্থান হইতে ব্যবসায়ী, দালাল, কারিগর, শ্রমজীবী প্রভৃতি কলকাতায় আসতে শুরু করে। শেঠ, বসাক প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা বাটোর হতে কলকাতায় এসে সুতানুটিতে কাপড়ের সুতা এবং ব্যবসায় চালু করে। ক্রমে কলকাতা শিল্প, ব্যবসায়-বাণিজ্য সবদিক দিয়ে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। পাকা বাড়ী, ভাল রাস্তাঘাট কলকাতার পৌর সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করে।

সর্বপ্রথম ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক প্রয়োজনে, পরে প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাঙালীর সাহায্য-সহায়তা তাদের প্রয়োজন ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্য আমদানি-রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এবং কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে কাজে লাগান প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে ভারতীয়রা বিশেষতঃ বাঙালীরা দাদনী বণিক, শ্রফ্, বানিয়ান, কনট্রাক্টর, আড়তদার, কোম্পানীর কর্মচারী প্রভৃতি বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের সুযোগ পায়। কোন কোন সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের একচেটিয়া অধিকার আবার কোন কোন বণিককে দেওয়া হত। এই সকল বিভিন্ন পেশার লোক নিয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় গঠিত হতে শুরু করে।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ফলে যে সামাজিক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় তা চিরাচরিত জাতিভেদ প্রথার সহিত সম্পৃক্ত ছিল না। পেশা বা বৃত্তির সহিত জাতির কোন সম্পর্ক না থাকায় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে মৌলিক ঐক্য দেখা দেয়। বিভিন্ন পেশায় ব্রাহ্মণ শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হওয়া তখন আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক, সদ্‌গোপ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বাণিজ্য, চাকরি প্রভৃতিতে প্রবেশ করবার ফলে পূর্বেকার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই জাতিগত বিভেদ এখন আর কার্যকরী ছিল না।

শহরাঞ্চলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি প্রথমে ঘটেছিল বটে, কিন্তু ক্রমে স্বাভাবিক কারণেই গ্রামাঞ্চলেও এই শ্রেণীর উৎপত্তি হয়।

ইংরেজ শাসনের প্রভাব ভারতীয়, বিশেষভাবে বাঙালী সমাজ-জীবনের উপর ব্যাপক-ভাবে প্রতিফলিত হয়। ইংরেজ শাসনের পূর্বেও ভারতবর্ষের শহর-নগরের সংখ্যা ছিল প্রচুর। কিন্তু এগুলির সমাজ-জীবন ও অর্থনীতি ছিল ইয়োরোপীয় শিল্প-ভিত্তিক শহর-নগর অপেক্ষা সম্পূর্ণ পৃথক্। ভারতবর্ষের শহর-নগরগুলির অতি অল্প সংখ্যক অর্থনীতিকে ভিত্তি করে অর্থাৎ শিল্প ও বাণিজ্যকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। অধিকাংশই ছিল গ্রাম-ভিত্তিক।

ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনে প্রথম এক শতাব্দী ধরে তারা কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ

মহানগরী তিনটি ভিন্ন বহু শহর নির্মাণ, সেগুলোর রাস্তাঘাট, বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। প্রশাসনিক প্রয়োজনে ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার এবং ভারতীয়দিগকে বিভিন্ন সংস্থায় চাকরি দানের ফলে ক্রমে শহরগুলিতে আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজের উৎপত্তি ঘটে। চাকরির আশা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে রোজগার, অন্যান্য নানাবিধ কাজে যেমন, রাস্তাঘাট, বাড়ী প্রভৃতি নির্মাণে কাজ পাওয়ার সুযোগ সবকিছু গ্রামাঞ্চলের লোকদিগকে শহরাভিমুখী করে তোলে। তাছাড়া নাগরিক জীবনের প্রলোভনও গ্রামবাসীদের অনেককে আকৃষ্ট করে। ফলে নায়েব, বেনিয়ান, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী এবং ধনিকশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপর দিকে মজুর খাটার বা অপরাপর ধরনের কাজ করার সুযোগ গ্রামের দরিদ্র শ্রেণীকেও শহর-নগরে চলে আসতে উৎসাহিত করে তোলে। এভাবে শহর ও নগরাঞ্চলে যেমন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে তেমনি মজুর, শ্রমিক শ্রেণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারগণ জমির মালিকানা লাভ করলে বিত্তশালী জমিদারদের অনেকেই গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করে শহর-নগরে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। পক্ষান্তরে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জমিদারগণ, যেমন তালুকদার, মিরাশদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী গ্রামাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হিসাবে গড়ে ওঠে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে যে মধ্যস্বত্বভোগী গ্রামাঞ্চলে ছিল না এমন নয়, কিন্তু তখন তারা কোন শ্রেণী হিসাবে গড়ে ওঠে নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পায় যে কেবলমাত্র বাংলাদেশেই উনবিংশ শতকের শেষ দিকে বড় জমিদারের সংখ্যা যেখানে মাত্র বিশ হাজার ছিল সেই স্থলে ছোট ভূস্বামী বা মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ ত্রিশ হাজারে। এই মধ্যস্বত্বভোগীরাই ছিল গ্রামের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। জমিদারদের নায়েব, গোমস্তা, গ্রামের মহাজন, দারোগা, মোড়ল প্রভৃতিও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রসার নতুন নতুন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান স্থাপনের চেষ্টা, সরকারের প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চাকরি লাভ, ইংরেজ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের দালাল, বেনিয়ান হিসাবে কাজ করা, ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ঠিকাদারী প্রভৃতি নাগরিক মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি করে। এইসব বিভিন্ন পেশার লোকেদের মধ্যে 'বাবু-সম্প্রদায়' নামে চিহ্নিত একটি ক্ষুদ্র বিলাসী গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে। শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে উন্নত না হলেও অর্থের দিক দিয়ে এই গোষ্ঠী খুবই সমৃদ্ধ ছিল। এই আর্থিক প্রাচুর্য নানাবিধ বিলাস ও আমোদ-প্রমোদে তাদের উৎসাহিত করত, ফলে অর্থের অপচয়ের সীমা থাকত না।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরেজরা ভারতবাসীর মধ্য থেকে বুদ্ধিজীবী, দূরদর্শী রাজনৈতিক, জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন ব্যক্তি বা সামরিক ক্ষেত্রে সুদক্ষ নেতার উদ্ভব ঘটুক তা চায় নি। থ্যাকারে সাহেব মন্তব্য করেছেন যে, ইংলণ্ডের বিত্তশালী জমিদারদের আর্থিক প্রাচুর্য তাদের নানা আদর্শ সম্পর্কে স্বাধীন চিন্তা করার অবসর ও সুযোগ দিতে সমর্থ হয়। ফলে ইংলণ্ডে দূরদর্শী রাজনীতিক, চিন্তাশীল

বুদ্ধিজীবী, সুদক্ষ সমরনেতা ও জাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে এমন বহু লোকের উৎপত্তি হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে দক্ষ সমর অধিনায়ক, দূরদর্শী রাজনীতিক, আইন-প্রণেতার উৎপত্তি হোক তা ইংরেজগণ পছন্দ করত না। "We do not want generals, statesmen and legislators" from among the Indians—Thackeray.

ভারতবাসীর উপর ইংরেজ প্রভুত্ব বজায় রাখার জন্য এই ধরনের লোকের উৎপত্তি ঘটুক তা ইংরেজ শাসকদের কাম্য ছিল না. বলা বাহুল্য।

পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের পর শিক্ষিত ভারতীয় এবং বিশেষভাবে শিক্ষিত বাঙালী সমাজ ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারীং, ওকালতি, মোক্তারি, শিক্ষকতা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্যোগ সরকারী ও বেসরকারী চাকরিজীবী প্রভৃতি বাঙালী তথা ভারতীয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সম্পূর্ণতা ঘটে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে শিক্ষকতা, রাজনীতি, আইন-প্রণয়ন, ব্যবসা-বাণিজ্য স্থাপন, শিল্প স্থাপন প্রভৃতির মাধ্যমে ক্রমেই যে সচেতন এক নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটতে লাগল তা দমন করে রাখতে ইংরেজ শাসক শ্রেণীর চেষ্টার অন্ত ছিল না। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্যাদা, প্রগতির ইচ্ছা তাদের মধ্যে এক বলিষ্ঠ মানসিকতার সৃষ্টি করে। তাদের আত্মপ্রকাশে শাসক শ্রেণীর বাধাদান স্বভাবতঃই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করে। কারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিদেশী শাসনের অবসানই ভারতবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র পথ। বাঙালী "ভদ্রলোক শ্রেণী" বলতে শিক্ষার প্রতি আগ্রহশীল, শিক্ষকতা, রাজনীতি, আইন-প্রণয়ন, সমাজ-সংস্কার, দেশসেবা, শিল্প, বাণিজ্য, প্রশাসনক্ষেত্রে মর্যাদাপূর্ণ স্থান গ্রহণে আগ্রহী এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কেই বুঝায়। বাংলা তথা ভারতবর্ষের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা, সকল ক্ষেত্রেই এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি ও বিকাশলাভ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

Q. 6. Briefly survey the economic condition of India in the first-half of the nineteenth century.

উত্তর। (১) ভূমিকা ঃ

ভারতবর্ষে ইংরেজ অধিকার বাণিজ্যের সূত্র ধরেই বিস্তারলাভ করে। স্বাভাবিক ভাবেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ব্রিটিশ সরকারের হাতে ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থা হস্তান্তরিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বণিকসুলভ মনোবৃত্তিই যে ইংরেজ শাসনের মূলনীতি হিসাবে প্রচলিত ছিল তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। প্রত্যেক দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন না কোন অর্থনৈতিক নীতি অনুসৃত হয়ে থাকে এবং সেই নীতির উদ্দেশ্যই থাকে প্রজার মঙ্গল সাধন করা। কিন্তু ইংরেজ বণিক কোম্পানীর ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। ভারতবাসীর দেশাত্মবোধের অভাব, তাদের পরস্পরের বিভেদ ও

মতানৈক্য প্রভৃতি ইংরেজ বণিকদের স্বার্থসিদ্ধি করার সুযোগই বাড়িয়ে দেয় এবং সেই সুযোগে বণিক কোম্পানী সৃষ্টি হয়। তাছাড়া বাণিজ্যিক ফসল ক্রয় করে তা বিক্রয়ের মাধ্যমে অর্থ উপায়কারী এক শ্রেণীর মূলধনী গ্রামে উদ্ভূত হয়। তারা কৃষকদিগকে ঋণ দিয়ে তাদের বাণিজ্যিক ফসল ক্রয় করে অর্থ উপায় করত। কোম্পানীর আমলে ভারতীয় জমি বিলি-ব্যবস্থার পরিবর্তনের ফলে ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের পূর্বেই ভারতের কৃষিব্যবস্থা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক ছিল না। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, মধ্যস্বত্বভোগী সম্প্রদায়ের জবরদস্তিমূলকভাবে কৃষকদের নিকট হতে খাজনা আদায়, মহাজন শ্রেণীর শোষণমূলক ঋণদান পদ্ধতি কৃষিব্যবস্থার উন্নতির পথে কঠিন বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

(২) শহরাঞ্চলের পরিবর্তন ঃ

শহর-নগর অঞ্চলে অর্থ নৈতিক পরিবর্তনকে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন বলে আখ্যায়িত করা অযৌক্তিক হবে না। ভারতীয় কারিগর, ভারতীয় কুটীরশিল্প প্রভৃতির বিনাশের ফলে ভারতবাসী বিদেশে রপ্তানি করে পূর্বে যে-অর্থ আয় করত তা বন্ধ হয়ে গেলে পূর্বে যে-সকল স্থান বিভিন্ন সামগ্রী প্রস্তুতের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল এবং রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠেছিল সেগুলোর অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই সকল উৎপাদন এবং বাণিজ্যকেন্দ্র বিনাশপ্রাপ্ত হলে বেকার কারিগর ও অপরাপর ব্যক্তি সেই সকল স্থান ত্যাগ করতে শুরু করে। এই সকল অসংখ্য শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্রের পরিবর্তে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ এই তিনটি মহানগরী ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প সবকিছুর কেন্দ্র হয়ে ওঠে। সরকারের কর্মকেন্দ্রও এই তিনটি মহানগরীতেই স্থাপিত ছিল। এই সকল নগরের জনসাধারণের অর্থ নৈতিক জীবন ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রশাসনিক ও ইংরেজ এবং অপরাপর বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও ইয়োরোপীয়রাই অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শোষণ যথেচ্ছভাবে চলতে থাকে।

ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয় কৃষির উন্নয়নের দিকে বা ভারতবাসীর অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূলভিত্তি কুটীর ও কারিগরী শিল্পের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করে নি। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের লাভজনক বাজার হিসাবেই ভারতবর্ষকে রাখা তারা স্বার্থের দিক দিয়ে শ্রেয় মনে করতে শুরু করে। অর্থ নৈতিক উন্নতির পরিপূরক হিসাবে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকেও স্বাভাবিকভাবেই তারা দৃষ্টিপাত করে নি। রাস্তাঘাট নির্মাণ অবহেলিত হতে থাকে। এরূপ অবস্থায় কৃষক সম্প্রদায় যেমন গ্রামের জমিদার ও মহাজন কর্তৃক শোষিত হ'তে থাকে, শহরাঞ্চলে কারিগর ও এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়। বণিক-সুলভ স্বার্থলোলুপতা ইংরেজদের ভারতবাসীকে শোষণ করতে প্রলুব্ধ করে তোলে। স্বভাবতই প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থক অর্থ নৈতিক কোন নীতি তারা অনুসরণ করে নি। কোম্পানীর রাজত্বকালে তাদের

অর্থ নৈতিক নীতি বলতে কিছু থাকলে তা ছিল শোষণের নীতি। ভারতবর্ষ ইংরেজদের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রস্বরূপ ছিল। ভারতবর্ষের কৃষি বা শিল্পের উন্নয়ন তাদের স্বার্থ-বিরোধী ছিল, স্বভাবতই তাদের কার্যকলাপ অর্থ নৈতিক নীতি বহির্ভূত ছিল। কাঁচামাল সংগ্রহ করে সেগুলো নানাবিধ সামগ্রীতে রূপান্তরিত করে পুনরায় ভারতবাসীর নিকট বিক্রয় করা ছিল তাদের নীতি। তাদের আমদানীকৃত সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় দেশী শিল্প প্রতিযোগিতা করে উঠতে না পারায় কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পগুলোর অপমৃত্যু ঘটলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। সকলেই কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। আবার জমির উপর চাপ বৃদ্ধির ফলে কৃষিও ক্রমে পশ্চাদ্‌পদ হতে শুরু করে। তাছাড়া জোর করে নীল, আফিং প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন করতে কৃষকদিগকে বাধ্য করার ফলে একদিকে যেমন ইংরেজ বণিকদের লাভের মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে, অন্যদিকে কৃষকদিগকে ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত করে তাদের দারিদ্র্যের চরমে উপনীত করে।

কৃষিপ্রধান দেশ ভারতবর্ষে ইংরেজরা নীলচাষের জন্য মূলধন বিনিয়োগ করে প্রচুর লাভ করতে শুরু করে। নীলশিল্পের উন্নতি ভারতবর্ষের কৃষকদের সমৃদ্ধি আনয়ন না করে তাদের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি করে। ১৭৮২-৮৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলা ও বিহারে ইংরেজ বণিকরা নীলচাষ শুরু করে এবং ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই সেই সময়কার হিসাবে বৎসরে ৬২ লক্ষ টাকার নীল বিদেশে রপ্তানি করা হয়। নীলচাষের ইতিহাস নীলকর সাহেবদের ভারতীয় কৃষকদের উপর এক নিষ্ঠুর অত্যাচার ও শোষণের ইতিহাস। নীলচাষ ও নীলকর সাহেবদের আচরণ বাংলা তথা ভারত ইতিহাসে এক বিভীষিকার প্রতীকরূপে দেখা দেয়। নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার শেষ পর্যন্ত 'নীলবিদ্রোহের' সৃষ্টি করে। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল উৎপাদন শুরু হলে নীলচাষের ক্রমে বিলুপ্তি ঘটে। কৃষির ক্ষেত্রে নীলচাষ প্রায় এক শতক ধরে নীলকর সাহেবদের সমৃদ্ধি বাড়ালেও ভারতীয় কৃষকদের কাছে নীলচাষ আর্থিক ও ব্যক্তিগত দিক দিয়ে সর্বনাশাত্মক হয়ে উঠেছিল। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয়রা নীল ভিন্ন পাট, আফিং, চা প্রভৃতি বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনে উৎসাহী ছিল। তার প্রধান কারণ ছিল বিলাতী সামগ্রীর অসম-প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটীরশিল্পের অপমৃত্যু এবং তার ফলে কৃষিজমির উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তও জমির প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি করে। ফলে জমির খাজনাভোগী এক শ্রেণীর মূলধনীর শিল্প-শ্রমিকরা বণিকসম্প্রদায় কর্তৃক তেমনি শোষিত হতে থাকে। এল. এইচ. জেঙ্কস্‌-এর মতে ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম একশ বছরের নীট ফল ছিল বস্ত্রশিল্প, কৃষি প্রভৃতির সর্বনাশ, রাজস্ব ও করের অত্যধিক চাপ এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসরহীনতা। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার যখন ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট থেকে ভারতের শাসনভার সরাসরি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন সেই সময় ভারতের অর্থ নৈতিক পরিস্থিতির দিকে দৃক্‌পাত করলে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, সেই সময়ে ভারতীয় অর্থনীতি অগ্রগতির মূল শক্তিই হারিয়ে ফেলেছিল। কৃষকদের কৃষি উন্নয়নের আর্থিক ক্ষমতা ছিল

না, নতুন পদ্ধতিতে চাষ করা বা চাষের উপযুক্ত বলদ বা যন্ত্রপাতি ক্রয় করা প্রভৃতি তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহাজনের নিকট তাদের ঋণগ্রস্ততা, জমিদারের রাজস্ব আদায় দেবার কঠিন চাপ সব কিছুর ফলে অর্থ নৈতিক কাঠামোর মূল শক্তি কৃষক সমাজ তখন নিপীড়িত, নিঃশেষিত ও হতাশায় নিমজ্জিত।

শহরাঞ্চলে ভারতীয় বণিকশ্রেণীর মূলধনের অভাবহেতু কোনপ্রকার শিল্প-প্রতিষ্ঠান বা কারখানা স্থাপন তাদের ক্ষমতা-বহির্ভূত ছিল। স্থানীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোকানদারি দালালি, মহাজনী প্রভৃতি কাজই তখন অর্থ উপায়ের পথ ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বলতে তখন যাদের বোঝাত, তাদের মধ্যে উপরি-উক্ত শ্রেণী ভিন্ন উকিল, মোক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি পেশাধারী ব্যক্তিরাও ছিলেন।

(৩) উপসংহার ঃ

ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি থেকে ভারতবর্ষের শাসন-ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি অধীন হওয়ার পরও ভারতীয় প্রশাসন যা ঈস্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি গড়ে তুলেছিল, তার কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয় নি। অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে অবশ্য পরিবর্তন ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। এই পরিবর্তনের ফলে যে অর্থাগম হয় তার সিংহভাগই ইয়োরোপীয় বণিক, শিল্পমালিক ভোগ করতেন। খুব সামান্য সংখ্যক ভারতীয় হয়ত বিত্তশালী হওয়ার সুযোগ পান, কিন্তু অধিকাংশ-ই দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত হয়ে পড়েছিলেন। ব্রিটিশ সরকারের অর্থ নৈতিক নীতি ভারতবাসীর আয়বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করে নি। তাদের বাণিজ্যিক নীতির ফলে মধ্যস্বত্বভোগীদের কতক সুবিধা হলেও মূল উৎপাদকের অবস্থা শোচনীয়ই থেকে যায়। অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ইংলণ্ডের সম্পদ বৃদ্ধি করা।

Q. 7. Give an account of the economic transition of India from the second-half of the 18th century to that of the 19th century.

উত্তর। (১) ভূমিকা ঃ

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহ এবং সামুদ্রিক পরিবহণের ক্রমাগত উন্নতি ভারতবর্ষকে পশ্চিম ইয়োরোপের প্রগতিশীল দেশগুলির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আনয়ন করে। অতীতে ভারতের বহির্বাণিজ্য প্রধানতঃ দূর প্রাচ্য ও মধ্য প্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরিবহণের অতিরিক্ত ব্যয় ও ঝুঁকির জন্য কেবলমাত্র স্বল্প ওজনের প্রচুর মূল্যবিশিষ্ট বিলাস সামগ্রীই বিদেশের সহিত বিনিময় করা চলত। পর্তুগীজ নাবিকদের উত্তমাশা অন্তরীপের মধ্য দিয়ে ভারতে আসার সমুদ্র-পথ আবিষ্কারের ফলে পর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, ফ্রান্স এবং ইংলণ্ডে জাহাজে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে

বাণিজ্যসামগ্রী প্রেরণের সুবিধা হওয়াতে ভারতীয় বাণিজ্যের গতিপথ পরিবর্তিত হল। এই সকল দেশের সহিত এবং দূর প্রাচ্যের দেশগুলোর সহিত বাণিজ্যে সুদক্ষ এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ভারতে বর্ধিষ্ণু হয়ে ওঠে। ভারতীয় শাসকেরাও এই জাতীয় বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন বলে তাঁরা ভারতের মৃত্তিকায় পদার্পণকারী প্রথম ইয়োরোপীয় বণিকদের নানাবিধ বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিলেন। এই সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সুবিধার জন্য বিদেশী বণিকদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং পরবর্তীকালে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কর্তৃত্বের দুর্বলতার সুযোগে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এই তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়ে ব্রিটিশ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের জন্য একটি বিশাল সাম্রাজ্য অর্জনে সফলকাম হয়েছিল। এই সমস্ত যুগটি ধরে ভারতীয় বাণিজ্যের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং তার অনুষঙ্গ হিসাবে কৃষি ও শিল্প উভয়ের উৎপাদনের প্রকৃতি ও সংগঠনে, পরিবহণ ও যোগাযোগের মাধ্যমসমূহ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং ধ্যান-ধারণায় নানারকমের পরিবর্তন ঘটে। সাধারণভাবে এই সমস্ত পরিবর্তনকে একযোগে ভারতের অর্থ নৈতিক রূপান্তর বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

(২) বাণিজ্যের প্রসার ঃ

ভারত ও পশ্চিম ইয়োরোপের ভিতর বাণিজ্যিক সম্পর্কের গোড়ার বছরগুলোতে ইয়োরোপীয় বণিকেরা ইয়োরোপে বিক্রয়ের জন্য ভারতের নানা শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করত। কিন্তু যেহেতু ভারতে ইয়োরোপীয় দ্রব্যের বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল সেহেতু ইয়োরোপ থেকে ভারতে ধাতু (সোনা, রূপা ইত্যাদি) প্রেরণ করে ভারতীয় রপ্তানির দাম দিতে হত। ইন্দো-ইয়োরোপীয় বাণিজ্যে ইংরাজ বণিকেরা ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে গুরুত্ব অর্জন করলে ইংলণ্ডের প্রতিষ্ঠিত শিল্পের ক্ষতিসাধন এবং ইংলণ্ডকে মূল্যবান ধাতুর দিক হতে নিঃশেষিত করবার জন্য স্বদেশে ক্রমবর্ধমান সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। মার্কেন্টাইলিজম্ চিন্তাধারার প্রভাবে জনগণের মনেও মূল্যবান ধাতুই দেশের প্রকৃত সম্পদ এইরূপ বিশ্বাসও প্রবল হয়ে ওঠে। ইংলণ্ড হতে সোনা রপ্তানি এবং সে দেশের বাজারে ভারতীয় সামগ্রীর বিক্রয়ের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। সোনা রপ্তানির উপর নিয়ন্ত্রণ যে অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল তা ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের পরে আঞ্চলিক রাজস্ব ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজকোষে আসতে শুরু করলে দূরীভূত হল। এই আঞ্চলিক রাজস্বের একটি বৃহৎ পরিমাণ অংশ 'বিনিয়োগ' হিসাবে ভারত থেকে বাণিজ্যিক সামগ্রী ক্রয় করতে ব্যবহার করা হত; এমন কি ভারতীয় রাজস্বের একাংশ একই উদ্দেশ্যে চীন এবং দূরপ্রাচ্যে দ্রব্য ক্রয় করতেও ব্যবহার করা হত। ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্য ইয়োরোপীয় বাজার থেকে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হলে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের চরিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিল। শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবর্তে শিল্পোপযোগী কাঁচামাল এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় অন্যান্য দ্রব্যাদি যেমন তুলা, নীল, চিনি, চা,

কফি এবং খাদ্যশস্য ভারতীয় রপ্তানিতে প্রাধান্য পেতে শুরু করে। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পরে বৃহদাকারের প্রগতিশীল কৃষির উন্নতির জন্য ইয়োরোপীয়দের ভারতে আসতে এবং বসতি স্থাপন করতে উৎসাহিত করা ব্রিটিশ সরকারের অন্যতম নীতি ছিল, কিন্তু বাস্তবে এই নীতি খুব বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারে নি।

বিশ্বের বাণিজ্যে নিজের শিল্পগত ও সামরিক আধিপত্য স্থাপনের পর ইংলণ্ড যখন একচেটিয়া ব্যবসায়ের নীতি পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে করমুক্ত এবং অবাধ বাণিজ্য-নীতি গ্রহণ করা সমীচীন বোধ করল তখন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার হল। ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড বৈদেশিক জাহাজসমূহের উপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশী জাহাজবাহিত দ্রব্যাদির উপর অত্যধিক হারে কর স্থাপনের নীতি পরিত্যাগ করে। ১৮৫৪-১৮৫৯ সাল এই পাঁচ বছরে ভারতে আমদানির মূল্য (১৫.৩৭ কোটি টাকা) ১৮৩৪-১৮৩৯ সালের আমদানির মূল্য (৪.৯৭ কোটি টাকা) অপেক্ষা প্রায় চারগুণ বেশি ছিল। সে একই সময়ের ভিতর রপ্তানি ১১ কোটী টাকা থেকে বেড়ে ২২.২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়।

১৮৪০ সালের পর, বাষ্পচালিত জাহাজ পালতোলা জাহাজের স্থান গ্রহণ করলে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সাথে ভারতের বাণিজ্য বিস্তারের সুযোগ আরও বৃদ্ধি পায়। ইংলণ্ড ব্যতীত ইয়োরোপের অন্যান্য দেশগুলোতেও তখন অর্থ নৈতিক সম্প্রসারণের পালা শুরু হয়। জার্মানীর নেতৃত্বে পশ্চিম ইয়োরোপীয় দেশগুলোই প্রথম ভারতের সহিত ঘনিষ্ঠতর বাণিজ্যিক সম্পর্কে আসে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপানও ভারতীয় বাণিজ্যের অংশীদার হতে এগিয়ে আসে। তাদের শিল্প সামগ্রীর বাজার ভারতে বিস্তার লাভ করতে থাকে।

সমুদ্রগর্ভপথে তারবার্তা প্রেরণের ব্যবস্থা স্থাপন এবং ডাকযোগে আন্তর্জাতিক সংবাদ আদান প্রদানের সুযোগ-সুবিধার বিস্তার বাণিজ্যিক আদান প্রদান বিস্তারের কাজে প্রভূত সহায়তা করে।

বৈদেশিক বাণিজ্যের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ বাজারও প্রসারিত হয়। দেশের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে দ্রব্যাদির অবাধ চলাচলের প্রতিবন্ধককারী আভ্যন্তরীণ পরিবহণ করসমূহ ১৮৫৬ সালের পর থেকে দ্রুত বিলুপ্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে গৃহীত রেলওয়ে ও সড়ক নির্মাণের কার্যসূচী পরিবহণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যথার্থই বিপ্লব আনয়ন করে। রেলপথগুলি এইভাবে নির্মিত হয় যে, কলিকাতা অথবা বোম্বাইয়ের মত প্রধান বন্দরগুলির সঙ্গে দেশের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলির যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এইভাবে দেশের অভ্যন্তরে এবং দেশ থেকে বাইরে দ্রব্য চলাচলের সুবিধা হয়। ১৮৩৫ সালের পর দেশের সর্বত্র সমমানের টাকা প্রচলনের বিধি অবলম্বিত হলে বিনিময়ের মাধ্যমরূপে মুদ্রা-ব্যবহারের অসুবিধাসমূহ বিদূরিত হয়। এই সমস্ত পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ এই সময়ে দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৩) ভারতীয় শিল্পের অবনতি ঃ

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রকৃতিতে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে ভারতীয় তাঁতশিল্পী, ধাতুশিল্পী এবং লক্ষ লক্ষ অন্যান্য কারুশিল্পী পূর্বে দেশী ও বিদেশীদের ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত হস্তজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন করত সেই সমস্ত শিল্পদ্রব্যের চাহিদা অত্যধিক পরিমাণে হ্রাস পেতে শুরু করে। এই শ্রেণীর লোকেরা সাধারণভাবে দরিদ্র, রক্ষণশীল, জাতিভেদ প্রথায় বিড়ম্বিত এবং অশিক্ষিত ছিল বলিয়া অপেক্ষাকৃত আধুনিক পদ্ধতির শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে বিদেশজাত শিল্পদ্রব্যের আমদানি প্রতিরোধ করতে উদ্যোগী হতে পারে নি। বিদেশী সরকারও এই হতভাগ্যদের দুঃখদুর্দশার প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। এই অবস্থার পরিণতি হিসাবে পৈতৃক ভূমি-সম্পত্তির অংশবিশেষে নিজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে অথবা ভূমিহীন ক্ষেতমজুর হিসাবে চাষের কাজে যোগদান করাই তাদের বাঁচার একমাত্র পথ ছিল। এত ব্যাপকভাবে ভারতীয় কারুশিল্পীদের নিজ নিজ চিরাচরিত শিল্প উপজীবিকা পরিত্যাগ করার ও কৃষিজীবীতে পরিণত হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে ভারতে "শিল্প-অপনয়ন" আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, এই ধরনের ঘটনা ঠিক এমন সময়ে ঘটে যখন অধিকাংশ ইয়োরোপীয় দেশ এবং জাপান নিজেদের অধিবাসীদের জন্য ক্রমাগত শিল্প-উপজীবিকার সৃষ্টি করতে শুরু করে। কৃষি উপজীবিকায় নিযুক্ত লোকের সংখ্যা বিপুলভাবে বৃদ্ধি পাওয়াতে জমির খাজনা এবং জমির মূল্য বৃদ্ধি পায়, ভূ-সম্পত্তির উপবিভাজন এবং বিক্ষিপ্তকরণ ঘটে এবং ক্ষুদ্র জমির মালিকানা হতে উপার্জনের হ্রাস ও ঋণবৃদ্ধির সমস্যার সৃষ্টি হয়।

(৪) ভারতের শিল্প প্রচেষ্টা ঃ

দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তনের জন্যে অবশ্য শিল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি আমদানি করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু এই ধরনের প্রচেষ্টার পরিধি ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। তার প্রথম ও প্রধান কারণ ছিল এই যে অধিকাংশ ভারতীয় তখনও পর্যন্ত উৎপাদনের নতুন কলাকৌশলের সাহায্য নিতে অসমর্থ অথবা অনিচ্ছুক ছিল। এই প্রসঙ্গে অবশ্য স্মরণ রাখতে হবে যে নতুন কলাকৌশলগুলো সাধারণতঃ শ্রমনিবিড় ছিল না এবং যখনই এই ধরনের কলাকৌশল প্রবর্তন করা হত তখনই কর্মচ্যুতি কিংবা অসম্পূর্ণ নিয়োগের সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠত। এমন কোন সংস্থা ছিল না যা প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে কর্মচ্যুত শ্রমজীবীদের উপযুক্ত পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে পারত। ফলে শেষ আশ্রয়স্থল হিসাবে তাদের অধিকাংশকে কৃষি উপজীবিকার উপরই নির্ভর করতে হয়। অবশ্য সড়ক এবং রেলপথ নির্মাণের মত জনহিতকর সরকারী কার্যসূচীর প্রবর্তন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আধুনিক শিল্পসমূহের অভ্যুদয় ভারতীয়দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উদ্যমশীল অংশটির সম্মুখে কিছু পরিমাণে নতুন সুযোগ-সুবিধার পথ অবশ্যই উন্মোচিত

করে। জাতিভেদ প্রথার নিয়ম-কানুননের কড়াকড়ি অগ্রাহ্য করে তারা এই সমস্ত নতুন নতুন ক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের জন্য উদ্যোগী হয়ে ওঠে।

বিদেশের বাজারে ভারী কাঁচামাল বিক্রয়ের সুযোগ-সুবিধা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে রপ্তানির প্রসার ঘটলে, কৃষিপণ্যের উৎপাদনের পদ্ধতিতেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিল। যেখানে পূর্বে কৃষকেরা কেবলমাত্র তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজন মিটাবার জন্য এবং তাদের যে সমস্ত দায় ছিল, যেমন গ্রামের নীচু শ্রেণীর কাজে লিপ্ত লোকেদের ভরণপোষণের নিমিত্ত ব্যয় এবং রাষ্ট্রকে দেয় রাজস্ব, সেই সমস্ত দায় মিটাবার জন্য শুধু উৎপাদন করত, এখন তারা নগদ টাকায় বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে বিক্রয়যোগ্য কৃষিপণ্য অধিকতর পরিমাণে উৎপাদন করতে শুরু করল। পূর্বে জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাতেই কৃষিকার্যের ব্যবহার ছিল; এখন বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে কৃষিকার্যের সূত্রপাত ঘটে এবং ফলে গ্রামের চিরাচরিত বিচ্ছিন্নতার অবসান দেখা দিতে লাগল। কৃষিপণ্য বাণিজ্যপণ্যে রূপান্তর আঞ্চলিক উৎপাদন-বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করল। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কৃষকেরা নিজেদের প্রয়োজনে লাগে এমন ফসল উৎপাদন না করে নগদ টাকায় বিক্রয় করা যায় এবং আঞ্চলিক জলহাওয়ার পক্ষে উপযোগী এমন একটি অথবা দুইটি শস্য উৎপাদন করতে শুরু করল এবং সর্বাধিক মুনাফায় বিক্রয় করার প্রতি দৃষ্টি দিল। এভাবে অর্থ উপার্জন করে তারা নিজ নিজ প্রয়োজনীয় দ্রব্য, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যও, বাজার থেকে ক্রয় করতে আরম্ভ করল। এভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে মুদ্রার ব্যবহার গ্রামাঞ্চলেও পরিব্যাপ্ত হল। পূর্বে কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনেই লোকে সোজাসুজি দ্রব্য বিনিময় করত। এখন নিয়মিতভাবে মুদ্রার ব্যবহারের ফলে গ্রাম ও বহির্বিশ্বের মধ্যে বিনিময় সুপ্রতিষ্ঠিত হল। প্রধানতঃ রপ্তানি বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখেই চা, কফি, পাট এবং নীলের মত কতিপয় নতুন কৃষিজ পণ্যের চাষ প্রবর্তন করা হল। যে সমস্ত পণ্য এতদিন পর্যন্ত ভারতে উৎপন্ন হয় নি, যেমন আলু, বাণিজ্যক্ষেত্রে লাভের আশায় ভারতীয় কৃষকেরা সেই সকল দ্রব্যের উৎপাদনেও আগ্রহের সঙ্গে প্রবৃত্ত হল।

জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাতে যে কৃষিকার্য চলত তার বাণিজ্যিক কৃষিকার্যে রূপান্তর সাধনের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ একদল মধ্যস্থ ব্যবসায়ীর উদ্ভব হয়। তারা নগদ টাকায় বিক্রয় করা যায় এমন শস্যের বিপণনে কুশলী ও অভিজ্ঞ হয়ে ওঠে। এই সকল মধ্যস্থ ব্যবসায়ী গ্রামাঞ্চলের নগণ্য কৃষক ও বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগরক্ষাকারী রপ্তানি সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগসূত্র হয়ে ওঠে। ভারতীয় কৃষিজ পণ্যের মূল্যস্তর ক্রমশঃ বিশ্বের বাজারে প্রতিষ্ঠিত মূল্যস্তরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ভারতীয় কৃষিজ দ্রব্যের জন্য বহির্বিশ্বের চাহিদা নির্ভর করত প্রধানতঃ শিল্পোন্নত দেশগুলোর সমৃদ্ধির উপর। বিভিন্ন শিল্পোন্নত দেশের স্বাচ্ছন্দ্য যখনই বৃদ্ধি পেত, নগদ টাকায় বিক্রয়যোগ্য কৃষিজ পণ্যের মূল্যও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে পারে, দেশে এরূপ প্রত্যাশার সৃষ্টি হত।

রপ্তানি বাণিজ্যের প্রয়োজনে কিছু সংখ্যক ছোটখাট শিল্প, যেমন তুলা কিংবা পাটের গাঁট পাকাবার কারখানা, ধানভানাই কল কিংবা চামড়া পাকা করার কারখানা প্রভৃতি গড়ে ওঠে। কয়লা ব্যতীত অন্যান্য খনিজ দ্রব্যের ব্যবহার ও উৎপাদন প্রধানতঃ বহির্বিশ্বের চাহিদার জন্যই উন্নতি লাভ করে। লাক্ষার মত কিছু কিছু বনজ সামগ্রীর রপ্তানি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ফলে নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বনজ সামগ্রীর নিয়মানুগ উৎপাদনের ব্যবস্থার প্রসার ঘটে।

বাণিজ্য ও উৎপাদনের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ঋণদানের সুযোগ-সুবিধা প্রসারের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিল। গোড়ার দিকে এজেন্সী হাউসগুলো বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে এবং শিল্পোদ্যোগে অর্থ যোগানের প্রাথমিক দায়িত্ব গ্রহণ করে। এখন তাদের পরিপূরক হিসাবে ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় উভয় ধরনের ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। তাদের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মূলধন ভারতীয় বাণিজ্যে এবং শিল্পোদ্যোগে নিয়োজিত হল। তাছাড়া ব্রিটিশ রেলওয়ে কোম্পানীগুলো ভারতে মূলধন বিনিয়োগ করে এবং ভারত সরকার রেলপথ ও সেচ ব্যবস্থা নির্মাণের জন্য ইংলণ্ডের বাজার থেকে ঋণ গ্রহণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের অর্থনৈতিক রূপান্তর বহুল পরিমাণে বিদেশীয়, বিশেষতঃ ইংলণ্ডে সংগঠিত ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসগুলোর মূলধন সংগ্রহে দক্ষতা ও ব্যবসায় নৈপুণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। ইঙ্গ ভারত অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী হাউসগুলোর এক বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল।

(৫) অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঃ

পরিবহণ ও বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধার বিরাট পরিবর্তনের ফলে গ্রামগুলো তাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনের জন্য বহির্বিশ্বের উপর ক্রমশঃ অধিক মাত্রায় নির্ভরশীল হয়ে পড়তে লাগল। এককালে ভারতের প্রাচীন গ্রাম্যগোষ্ঠীকে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রজাতন্ত্রের সাথে তুলনা করা হত। বিশ্বের অন্যান্য জাতির সহিত সংযোগরক্ষা তো দূরের কথা, দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথেও তাদের যোগাযোগ অত্যন্ত সামান্য ছিল। প্রতিটি গ্রামই স্বয়ং নিজের সাধারণ অর্থনৈতিক প্রয়োজন মিটাতে পারত, কেননা প্রত্যেক গ্রামেই স্থানীয় এমন একটি গ্রামীণ কারিগরশ্রেণী ছিল যারা গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে দিত এবং মজুরি হিসাবে প্রথাগতভাবে কৃষিজ পণ্যের একটি অংশ অথবা গ্রামের কর্ষিতব্য জমির একটি অংশ পেত। গ্রামের প্রশাসনগত দায়িত্ব অর্পিত ছিল গ্রাম-প্রধানের হাতে। তাঁকে সাহায্য করার জন্য ছিলেন একজন হিসাবরক্ষক এবং রক্ষীদলের কর্মীরা। কোন কোন গ্রামে একজন গ্রাম-প্রধানের সাথে (অথবা তার পরিবর্তে) পঞ্চায়েত নামে অভিহিত গ্রামীণ প্রধানগণের একটি পর্ষদও থাকত। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে প্রশাসনগত কাঠামোর কিছু কিছু তারতম্য অবশ্যই ছিল এবং তা গ্রামের আয়তন এবং সম্পদের উপরও নির্ভর করত। তাদের উপরে সাধারণতঃ থাকতেন একজন জমিদার। তিনি সাধারণতঃ গ্রাম থেকে দূরেই বসবাস

করতেন এবং তাঁর কাজ ছিল রাষ্ট্রের তরফে রাজস্ব আদায় করা, নিজের ভারপ্রাপ্ত অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং যুদ্ধের সময় তৎকালীন সরকারকে সৈন্যদল দিয়ে সাহায্য করা।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যখন বিভিন্ন প্রেসিডেন্সীতে অতিমাত্রায় কেন্দ্রানুগ রাজস্ব এবং বিচারবিভাগীয় প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন থেকে গ্রামের এই স্বয়ংশাসিত চরিত্রটির প্রভূত পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। স্যার থিওডোর মরিসন দেশের নানা অঞ্চলের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পারেন যে, পূর্বে গ্রাম্য পঞ্চায়েত যে সমস্ত কার্য সম্পাদন করত ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতি সেই সমস্ত কার্যের ভার গ্রহণ করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের প্রবাহকে দুর্বলতর করে দেয়। পরবর্তীকালে স্থাপিত স্বায়ত্তশাসন-ভিত্তিক জেলা বোর্ডগুলি সম্ভবতঃ গ্রামের সংকীর্ণতর কিন্তু অধিকতর সক্রিয় স্বায়ত্তশাসনের বিকল্প হিসাবে কার্যকর হয়ে উঠতে পারে নি। গ্রাম্য কারিগরগণ পূর্বে একটি নির্দিষ্ট প্রথাগত মজুরি পেতেন, তার সহিত বার্ষিক কাজকর্মের পরিমাণের কোন সংযোগ ছিল না। কিন্তু এখন পৃথক পৃথক কাজের জন্যে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের প্রথা দেখা দিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁরা যতটুকু কাজ করতেন সেই কাজের হিসাবকে মজুরি-নির্ধারণে প্রাধান্য দেওয়া হতে শুরু করে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, আমদানীকৃত ভোগ্যপণ্যের অবাধ প্রবেশ বহুক্ষেত্রেই গ্রাম্য কারিগরদের চিরাচরিত কাজের চাহিদা হ্রাস করে। ফলে সাধারণ অদক্ষ শ্রমিকদের দল পুষ্ট করা ছাড়া তাদের গত্যন্তর ছিল না। শ্রমিকেরা যথাসম্ভব গ্রাম ত্যাগ করে নতুন নতুন কারখানা, খনি এবং চা-বাগান ইত্যাদিতে কাজ নিতে সচেষ্ট হয়। অবশ্য রেলপথ কিংবা উন্নয়নশীল শহরাঞ্চল থেকে গ্রামের নৈকট্যের উপরই নির্ভর করত গ্রাম থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া কতটা সম্ভব ছিল।

(৬) সামাজিক পরিবর্তন ঃ

শিল্পে কারখানা পদ্ধতির প্রচলন বহুজাতি ও ধর্মের শ্রমিককে দলবদ্ধভাবে কাজ করাবার ব্যবস্থা করে চিন্তা এবং কর্মের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল নানা অভ্যাসের মূলোৎপাটন করতে সাহায্য করে। রেলের একই কামরায় ভ্রমণ করার সময় উচ্চ এবং নিম্ন জাতির লোকেরা পরস্পরের সহিত মেলামেশা করতে বাধ্য হত। সুতরাং অর্থনৈতিক রূপান্তরের ফলে সমাজে সাধারণভাবে এমন কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে, যার ফলে সমাজের প্রাচীন কাঠামো আর অবিকৃত থাকতে পারে নি। তবে এমন দাবি করা সঙ্গত হবে না যে কোন জীবিকায় নিযুক্ত সামাজিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে জাতিগত সংস্কারের চিরাচরিত সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় গ্রাম বৃহদাকার যৌথ পারিবারিক গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত হত। এই ধরনের পরিবারে সমস্ত নিকট আত্মীয়রা একই গৃহে বাস করত এবং একই সঙ্গে আহারাদি সম্পন্ন করত। যৌথ পরিবারের সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ জীবিত পুরুষ

সদস্যই সাধারণতঃ পারিবারিক সম্পত্তির এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় পারিবারিক কার্যাদির তত্ত্বাবধান করতেন। গ্রামের সাথে শহরাঞ্চলের সংযোগ স্থাপিত হতে শুরু করলে পরিবারের কোন কোন সদস্য চিরন্তবে গ্রাম পরিত্যাগ করে শহরে বাস করা ও শহরাঞ্চলীয় উপজীবিকা গ্রহণ করা লাভজনক বলে মনে করল। শহরাঞ্চলে বাসস্থানের অভাব এবং অন্যান্য কারণের জন্য সমগ্র পরিবারের একই সঙ্গে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল এবং যৌথ পরিবার প্রথায় ভাঙ্গন ধরে। যৌথ জীবনযাপনের কিছু কিছু সুবিধা, যেমন অধিকতর নিরাপত্তা, এভাবে নষ্ট হয়ে গেলেও শহরাঞ্চলীয় জীবনযাপনের অবস্থার সাথে অধিক মাত্রায় সঙ্গতিপূর্ণ 'একক' পরিবার সম্ভবতঃ গৃহকর্তার পক্ষে নিয়মিত কাজের অভ্যাস অনুশীলন করতে এবং সঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হতে সহায়ক হয়। এভাবে এবং অন্যান্য উপায়ে অর্থনৈতিক রূপান্তরের প্রক্রিয়ায় পারিবারিক জীবনেও সুস্পষ্ট পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা দেয়।

(৭) কৃষিজ পণ্যের রূপান্তর ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই শুধুমাত্র পারিবারিক ব্যবহারের জন্য কৃষিজপণ্য উৎপাদন করার পরিবর্তে বাজারে বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন করা শুরু হয়। শতাব্দীর মধ্যভাগে সড়ক এবং রেলপথ দ্বারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হলে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। যে কৃষিকার্য গোড়াতে পারিবারিক স্বয়ং সম্পূর্ণতার জন্যই করা হত বাণিজ্যের ভিত্তিতে তার রূপান্তরের কারণসমূহ নির্দেশ করা শক্ত নয়। প্রথমতঃ, রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থায় নগদ টাকায় খাজনা নির্ধারণ প্রবর্তন করাতে এবং ঋণদানের উদ্দেশ্যে টাকার অধিকতর ব্যবহার হওয়ার জন্য গ্রামে কিছু পরিমাণে নগদ টাকা উপার্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ, দেশের ও বিদেশের বাজারে বাণিজ্যের জন্য শস্য সংগ্রহ করবার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর বণিক গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাদের আগ্রহে গ্রামবাসীরাও নগদ টাকায় বিক্রয়যোগ্য নানা ফসলের চাষ প্রবর্তন করে। বহু ক্ষেত্রে কৃষিজীবীরা উৎসবাদি উপলক্ষে কিংবা কোন আকস্মিক ব্যয়ের জন্য ব্যবসায়িগণের নিকট ঋণে আবদ্ধ হলে তাদের পক্ষে বিক্রয়যোগ্য শস্য চাষ করার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেত। যথাসময়ে বিচক্ষণ চাষী নিজেই নগদ টাকায় বিক্রয়যোগ্য পণ্যাদির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শুরু করে। জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাতে নিজের জমিতে খাদ্য উৎপাদনের পরিবর্তে নগদ টাকায় বিক্রয়যোগ্য পণ্যাদির বিক্রয় করে তা পূরণ করা অনেক ক্ষেত্রেই তার নিকট অধিকতর আকর্ষণীয় বলে মনে হল। ক্রমশঃ বিক্রয়যোগ্য শস্য এবং খাদ্যশস্যের আপেক্ষিক মূল্যান্তর চাষের জমি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে তা নির্ধারণ করতে শুরু করে। ভারত সরকারের কৃষিসম্বন্ধীয় নীতি সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী ধরে এবং এমন কি পরবর্তীকালেও আভ্যন্তরীণ আর্থিক উন্নতি অপেক্ষা বরঞ্চ ব্রিটিশ শিল্পের কাঁচামালের প্রয়োজনীয়তা মিটাবার লক্ষ্যেই অধিকমাত্রায় নিবদ্ধ ছিল। ফলে বিক্রয়যোগ্য কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি স্বভাবতঃ উৎসাহিত হয়।

যেহেতু কৃষকের নগদ টাকার প্রয়োজন ভূমি-রাজস্ব ও অন্যান্য চুক্তিবদ্ধ চাহিদার পরিমাণ দ্বারা কমবেশী নির্ধারিত হত সেহেতু এটা স্বাভাবিক যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে নগদ টাকায় বিক্রয়যোগ্য শস্যাদির উৎপাদনের পরিমাণ এইসব শস্যাদির বাজারদরের বিপরীতক্রমে নির্ধারণ করত।

কৃষিপণ্যের বিপণন-প্রক্রিয়া প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এক একটি কৃষিজ পণ্যের উৎপাদন দেশের এক একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হতে শুরু করে। একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের পক্ষে কেবলমাত্র এক ধরনের বাণিজ্যিক শস্য উৎপাদন এবং স্থানীয় খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন মিটাতে সেই শস্য বেচা-কেনা করা এখন সম্ভব হয়ে ওঠে। স্পষ্টই বোঝা যায় যে তৎকালীন যোগাযোগ ব্যবস্থার বহুল প্রসারের উপরেই এই ধরনের আর্থিক লেনদেন নির্ভরশীল ছিল।

কৃষিজপণ্যের রপ্তানিকে জমির খাজনার মাধ্যমে কৃষকের শোষণের ফলস্বরূপ বলে মাঝে মাঝে মনে করা হয়। স্বর্গত রমেশচন্দ্র দত্ত বিশ্বাস করতেন যে ভারতের আপেক্ষিক সুবিধা ছিল বয়নযোগ্য সুতা উৎপাদনে, কৃষিজ কাঁচামাল উৎপাদনে নয়। ব্রিটিশ সরকার ইংলণ্ডে বয়নযোগ্য সুতার অনুপ্রবেশ কৃত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করে ভারতীয় বাণিজ্যকে এমন খাতে বইতে বাধ্য করে, ভারতের প্রাকৃতিক সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে যা যুক্তিযুক্ত ছিল না। ভূমি-রাজস্ব চাহিদার চাপ সৃষ্টি করে কৃষকদের আরো বেশি পরিমাণে কৃষিজ পণ্য বিক্রয় করতে বাধ্য করা হয়।

(৮) উপসংহার ঃ

একথা সম্ভবতঃ বলা চলে যে কৃষিপণ্যের বাণিজ্য বিস্তৃত হওয়ার ফলে প্রকৃত কৃষকদের অতি সামান্যই উপকার হয়। কৃষিজপণ্য বাণিজ্যের প্রধান মাধ্যম হয়ে ওঠার পর দেশের কৃষিজ রপ্তানি থেকে উদ্ভূত যে কোন লাভের বৃহদংশই আত্মসাৎ করত বণিকশ্রেণীর লোকেরা। অথচ কৃষিজপণ্যের বিশ্ব বাণিজ্যের ব্যবস্থায় যে অস্থিরতা বিদ্যমান সেই অস্থিরতার প্রতিকূল ফলাফল কৃষককেই ভোগ করতে হত। পণ্যমূল্য হ্রাস পাওয়ার বছরগুলোতে দেখা যেত, কৃষকের নিকট যে মূল্যে পণ্য ক্রয় করা হয় তা তৎপরতার সঙ্গে হ্রাস করা হয়েছে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধির বছরে তার সুফল আদৌ কখনও কৃষকের নিকট পৌঁছাত না, কিংবা বিলম্বে পৌঁছাত।

যে সমস্ত ঘটনার জন্য গোড়ার দিকে কৃষিজ পণ্যের বাণিজ্যে স্ফুলিঙ্গের মত তেজীভাবের সঞ্চার হয়, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৭৩-৮৩) ছিল তাদের মধ্যে প্রধানতম। এই যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার কয়েক বছর পূর্ব থেকেই ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলাজাত দ্রব্য উৎপাদনকারীরা, যারা নিজেদের কাঁচা তুলার প্রয়োজন প্রধানতঃ আমেরিকা থেকেই মিটাত, তারা তুলা সরবরাহের একটিমাত্র উৎসের উপর অত্যধিক নির্ভরতার জন্য সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। সেইজন্য ভারতে ভাল ও পরিষ্কার তুলার উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পিত কতিপয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ব্রিটিশ সরকার ভারত সরকারকে নির্দেশ

দেয়। কিন্তু এই ব্যবস্থাগুলি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে নি। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকা যুদ্ধে লিপ্ত হলে ভারতে ব্রিটিশের কাঁচা তুলার ক্রয় অকস্মাৎ বৃদ্ধি পায়। কয়েক বছর পরে কেবলমাত্র তুলা ছাড়াও পাট, তৈলবীজ ইত্যাদি কাঁচামালের রপ্তানিও উল্লেখযোগ্য-ভাবে বৃদ্ধি পায়।

ভারতে বাণিজ্যিক কৃষির প্রসার খাদ্যশস্যের উৎপাদন ক্ষুণ্ণ করেছিল কিনা, তা এখনও বিতর্কের বিষয়। কোন কোন অঞ্চলে এরূপ ঘটলেও সমগ্র চিত্রটি অন্যরূপ। বাণিজ্যিক শস্য চাষের জন্য জমি প্রধানতঃ অতিরিক্ত চাষের জমি থেকেই পাওয়া গিয়েছিল। তাছাড়া মোট জমির কেবলমাত্র শতকরা ২০ ভাগে তুলা, পাট, ইক্ষু এবং অন্যান্য তৈলবীজের মত বাণিজ্যিক শস্যের চাষ হত। ফলে এই পরিবর্তন ভারতের খাদ্যসমস্যা সৃষ্টির জন্য কোনক্রমে দায়ী নয়।

Q. 8. What are the causes of the decline of cottage industries in India in the 19th Century ?

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতের বয়ন শিল্পগুলোর অনুরূপ ব্রিটিশ অথবা অন্যান্য ইয়োরোপীয় শিল্পগুলোর তুলনায় আপেক্ষিকভাবে খরচের সুবিধা ভোগ করত। এইচ্. এইচ্ উইলসনের মতে, "ভারতের তুলা এবং রেশমজাত দ্রব্যাদি ব্রিটিশ বাজারে ইংলণ্ডে উৎপাদিত অনুরূপ দ্রব্যাদি অপেক্ষা ৫০ শতাংশ থেকে ৬০ শতাংশ কম দামে মুনাফাসহ বিক্রয় করা যেত।" ভারতের ধাতুগত শিল্পগুলি প্রযুক্তিবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যত্র অনুরূপ শিল্পগুলোর তুলনায় কোন অংশেই নিকৃষ্টতর ছিল না। ভারত সমগ্র বিশ্বকে বৈচিত্র্যময় অন্যান্য চারুশিল্প সম্মত পণ্যাদির সরবরাহও করত, কিন্তু বহির্বিশ্ব থেকে কেবলমাত্র কতিপয় শিল্পজাত সামগ্রী ভিন্ন অন্য কোন বস্তু আমদানি করার প্রয়োজন সাধারণতঃ ঘটত না।

(২) ভারতের শিল্পের শ্রেণীবিন্যাস ঃ

ভারতে তিন ধরনের শিল্প ছিল। (ক) গ্রামীণ কুটীর শিল্প—এই শিল্প গ্রামের কৃষিজীবীদের দৈনন্দিন প্রয়োজনে সরবরাহ করত ; (খ) শহরাঞ্চলীয় গার্হস্থ্য শিল্প—এই শিল্প শহরবাসীদের ব্যবহারের জন্য নানাবিধ জিনিসপত্র উৎপাদন করত। এই ধরনের শিল্প সাধারণতঃ বাসগৃহের একটি ঘরে পরিবারের সদস্যদের দ্বারাই পরিচালিত হত। (গ) ক্ষুদ্র শহরাঞ্চলীয় কারখানা—এই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অপেক্ষাকৃত মার্জিত সামগ্রীসমূহ উৎপাদন করত। এইসব শিল্প সামান্য সংখ্যায় ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করত এবং সাধারণতঃ এই ধরনের শিল্পে গার্হস্থ্য শিল্প অপেক্ষা অধিক নৈপুণ্যের প্রয়োজন হত। শহরাঞ্চলে প্রায় সব শিল্পই তাদের সমৃদ্ধির জন্য রাজা এবং তাঁর পারিষদবর্গের

পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভরশীল ছিল। মোগলযুগে শহরাঞ্চলগুলো অনেকটা সামরিক শিবিরের অনুরূপ ছিল এবং আধুনিক যুগের বাণিজ্যিক ও শিল্পনগরীর সাথে তাদের খুব বেশী সাদৃশ্য ছিল না।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষে ইংলণ্ড এবং পশ্চিম ইয়োরোপের সাথে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বাণিজ্য চালিয়ে যাওয়া লাভজনক ছিল। ইংরাজ রেশম বয়নকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্য, ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দ থেকে শুরু করে, ভারত থেকে ইংলণ্ডে রেশমজাত দ্রব্য আমদানির উপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণবিধি আরোপিত হওয়া সত্ত্বেও এই সমস্ত নিয়ন্ত্রণবিধিগুলি সূচনায় ভারতীয় হস্ত-শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয় প্রভাবিত করতে পারে নি। বাংলাদেশ থেকে রেশমজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি, ইংলণ্ডে না হলেও, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশসমূহে সততই চলছিল; কিন্তু রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে উপবিভাজন, বিদেশী বণিক এবং তাদের ভারতীয় প্রতিনিধিদের দ্বারা সুদক্ষ কারিগর শ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণ এবং সর্বশেষে ব্রিটিশ বয়ন শিল্পে বাষ্পচালিত শক্তির প্রয়োগ বয়নশিল্পে উৎপাদিকা শক্তির যুগান্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করার ফলে ভারতীয় হস্তশিল্প ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়।

হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের আভ্যন্তরীণ চাহিদার এক বিরাট অংশ সর্বদাই রাজদরবার থেকে আসত। রাজশক্তির পতনের পর এই চাহিদা স্বাভাবিক কারণেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে এবং তার পরিণতি হিসাবে স্থানীয় শাসকগণ এবং তাদের অনুচরবৃন্দ অধিকারচ্যুত হলে, রাজসভা এবং শহরাঞ্চলের অভিজাত শ্রেণীর প্রয়োজন মিটাতে যে সমস্ত কারখানা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাদের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

(৩) ব্রিটিশ সরকারী নীতি ঃ

দেশীয় শাসকগণের শক্তি হ্রাস পেতে থাকলে ব্রিটিশ বণিকগণ এবং তাদের কমিশন এজেন্টগণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং অসঙ্গত অল্প মূল্যে তাদের নিকট মাল সরবরাহ করার জন্য কারিগরদের উপর অবৈধ চাপ প্রয়োগ করতে শুরু করে। মাল সরবরাহ করার জন্য কারিগরগণ এমন চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়, স্বাভাবিক অবস্থায় যে ধরনের চুক্তি করতে তারা কখনোই সম্মত হত না। অবশ্য ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী কারিগরশ্রেণীর উপর এই ধরনের অবিবেচনাপ্রসূত অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে নিষ্ফল সতর্কবাণী উচ্চারণ করত। তাদের কেউ কেউ উপলব্ধিও করেন যে "স্বর্ণডিম্ব প্রসবকারী হংসীকে হত্যা করা" বিজ্ঞজনোচিত নীতি নয়। কিন্তু ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরা দ্রুত অর্থ আহরণপূর্বক দেশে প্রত্যাবর্তন করে চিরকালের মত প্রাচ্যদেশীয় নবাবের ন্যায় জীবন যাপনে আগ্রহী ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে তাদের বেতনাদির বহুল পরিমাণে উন্নতিসাধন

না হওয়া পর্যন্ত তাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চতর কর্তৃপক্ষের সতর্কবাণীর প্রতি কর্ণপাত করেন নি। বিদেশী বণিকদের শোষণের ফলে ভারতীয় কারিগরগণ বহু ক্ষেত্রে নিজ নিজ কারিগরী শিল্প পরিত্যাগ করতে অথবা যে সমস্ত অঞ্চলে তখনো পর্যন্ত আরো সহানুভূতিশীল নীতি অনুসৃত হত, সে সমস্ত অঞ্চলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশকে ইংলণ্ডে শিল্পোৎপাদন প্রণালীতে বাষ্পচালিত শক্তির প্রয়োগ সম্ভব হয়। তন্তুজাত দ্রব্যের বয়নের ক্ষেত্রে একের পর এক আবিষ্কারের ফলে সুতা ও বস্ত্রের উৎপাদনের ক্ষমতা বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেল এবং উৎপাদন ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। একই সময়ে ভারতে তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত হওয়ার ফলে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের পৃষ্ঠপোষকগণ এই উপনিবেশে ইংলণ্ডে প্রস্তুত শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বিস্তৃত করার জন্য ব্যবস্থাদি সহজেই অবলম্বন করতে পারেন। ভারতবর্ষকে শিল্পোৎপাদনের নতুন কলাকৌশল অধিগ্রহণে সাহায্য করার পরিবর্তে নূতন শাসকশ্রেণী ভারতীয় শিল্পদক্ষতায় প্রভূত সম্পদশালী হওয়া সত্ত্বেও সুস্পষ্টরূপে এই নীতি ঘোষণা করে যে ভারত এখন থেকে কেবলমাত্র কাঁচামালের উৎপাদক দেশ হিসাবেই পরিগণিত হবে এবং সেই কাঁচামাল ইংলণ্ডে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনে ব্যবহৃত হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার বছরগুলিতে ভারতের বাজারে অবাধ প্রতিযোগিতার নীতি এবং পাশাপাশি দেশীয় বাণিজ্যের উপর নানা ধরনের বাধানিষেধ আরোপ দেশীয় হস্তশিল্পগুলোকে দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেয়।

(৪) ভারতীয়দের মনোভাব ঃ

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতের উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবন-যাপনের ধারায় বহুবিধ পরিবর্তন এনে দেয়। ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশের চিরাচরিত জীবন-যাপনের রীতি পরিত্যাগ করে ইংরাজ অভিজাত শ্রেণীর রুচিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। ফলে নানাধরনের দেশীয় কারিগরী দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পায় এবং ইংলণ্ড থেকে আমদানির পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে।

(৫) উপসংহার ঃ

যাহোক ভারতের হস্তশিল্প সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল না। গ্রামাঞ্চলে বহু বিস্তৃত দারিদ্র্যের জন্য শহরাঞ্চলের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল পর্যন্ত জীবনধারণের মান অপরিবর্তিত ছিল। শহরাঞ্চলের কারিগরগণ সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের কেনাকাটার উপরই বৃহদংশে নির্ভরশীল ছিল। গ্রাম্য কারিগরগণ আরো বহুদিন পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়। দেশের একান্ত অভ্যন্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করতে বিলম্ব হওয়ার ফলে গ্রাম্য কারিগরগণ কয়েক পুরুষ ধরে নিজেদের কাজকর্ম বজায় রেখে চলতে সক্ষম হয়। বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে ভারতীয় হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের

চাহিদা কিছুটা বজায় ছিল আরও এই কারণে যে, গ্রামীণ জনগণ অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে পরিধানের জন্য নানাধরনের রঙীন বস্ত্র ব্যবহার করত এবং এই ধরনের প্রত্যেকটি চাহিদার পরিমাণ এত অল্প ছিল যে, উৎপাদনের যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ এই ক্ষেত্রে লাভজনক হত না। অনুরূপভাবে গ্রাম্য কর্মকার অথবা সূত্রধরও গ্রাম থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি এই কারণে যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমির কৃষকগণের ছোটখাট যন্ত্রপাতির চাহিদা তাদের পক্ষেই মিটানো সুবিধাজনক ছিল। এই সমস্ত যন্ত্রপাতির মেরামতির ব্যবস্থাদি হাতের নিকট থাকাই কৃষকদের মনঃপূত ছিল। বিত্তশালী ব্যক্তিগণ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের বিশেষ কোন সাহায্য না পাওয়া সত্ত্বেও উপরি-উক্ত বিভিন্ন কারণে গ্রাম্য কুটিরশিল্প তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয়।

Q. 9. What were the causes of the decline of the economic prosperity of Bengal in the first-half of the 18th Century ?

উত্তরঃ (১) রাজস্ব নীতির ত্রুটিঃ

ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দিলেও আলীবর্দী খানের রাজত্বকালে সাধারণভাবে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। শাসকবর্গের পক্ষ থেকে আওয়াব বা অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রবণতাই বাংলাদেশের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা, নবাব সুজা-উদ্-দিন আরও অতিরিক্ত কর আদায় করেন উনিশ লক্ষ চৌদ্দ হাজার পঁচানব্বই টাকা। আলীবর্দী খানের সময় এই টাকার পরিমাণ হয় বাইশ লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশ চুয়ান্ন টাকা। রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে একদিকে প্রজাদের দুর্দশা ক্রমে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে প্রতিবছর মুর্শিদাবাদে নবাবের কোষাগারে রাশি রাশি অর্থ সঞ্চিত হতে শুরু করে। কিন্তু নবাবের কোষাগারে সঞ্চিত ধনরত্ন বাংলাদেশের অর্থনীতিকে কোনভাবেই সমৃদ্ধ করে নি। নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকে নবাব আলীবর্দী খানের শাসন পর্যন্ত প্রচণ্ড শোষণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জগতে যে শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়, স্থার জন শোর সেকথা খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেন। এই সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কর আদায়ের পদ্ধতিই মূলতঃ রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ধ্বংসকারীর ভূমিকা গ্রহণ করার সুযোগ পায়। জমিদার এবং প্রজা এই উভয় পক্ষের জন্যই রাজ্যের শাসকদের অনুসৃত অর্থনৈতিক পদ্ধতি বিন্দুমাত্র সুফল আনয়ন করতে ব্যর্থ হয় এবং অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা জমিদারদিগকে অবৈধভাবে ও বলপূর্বক কর আদায় করতে বাধ্য করে। ফলে রাজ্যের সর্ব শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা ও অর্থসম্পদ গোপন করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং রাজ্যের সর্বত্রই দুর্দশা ও দারিদ্র্যের ছায়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেতে থাকে। রবার্ট ওরমও নবাবের অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে শ্লেষাত্মক ভাষায়

তীব্রভাবে সমালোচনা করেন এবং বলেন যে, "রাজ্যের যে কোন স্থানের যে কোন সম্পদের প্রতিটি অংশের উপরই নবাবের সর্তক দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ।"

(২) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঃ

রাজস্ব আদায়ের জন্য নবাবের নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অতিরিক্ত করের চাপে উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় দ্রব্যমূল্যও যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে এক টাকার বিনিময়ে আড়াই মন থেকে তিন মন চাল পাওয়া যেত, আর ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে এক টাকার বিনিময়ে পাওয়া যেত মাত্র ত্রিশ সের চাল। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে দেশে কোন যুদ্ধবিগ্রহ না থাকা সত্ত্বেও টাকায় সাড়ে বত্রিশ সেরের বেশি চাল পাওয়া যেত না। ১৭৩৮ থেকে ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে স্থতীবস্ত্র ও রেশমজাত দ্রব্যের দামও কমপক্ষে ত্রিশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(৩) মারাঠা আক্রমণ ঃ

পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বছর পূর্বে বর্গীর হাঙ্গামা নামে পরিচিত বাংলাদেশের উপর মারাঠা শক্তির আক্রমণ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ। ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দে মারাঠা সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত এই রাজ্যের সর্বত্র নিষ্ঠুর অত্যাচার ও লুটতরাজ শুরু করেন। রাজমহল থেকে মেদিনীপুর ও জলেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড মারাঠাদের শাসনাধীন হয়। মারাঠাদের অকথ্য অত্যাচারে এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয় এবং সলিম-উল্লার তারিখ-ই-বঙ্গালের বর্ণনা অনুযায়ী, "দেশের সমস্ত ধনী ও অভিজাত ব্যক্তি বাড়ীঘর ত্যাগ করেন এবং স্ত্রী-কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য গঙ্গার পূর্বতীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন।" ইংরেজ বাণিজ্যকুঠির একজন কর্মচারী ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে কলকাতায় লিখে জানান, "বীরভূমে মারাঠা সৈন্যদের লুণ্ঠন অব্যাহত থাকার ফলে এখানকার সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে, স্থানীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ও বস্ত্র শিল্পীরা যে যেখানে পেরেছে, প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে।" হলওয়েল নামে আর একজন ইংরেজ কর্মচারী এই সম্পর্কে বলেন যে, "মারাঠা সৈন্যরা সর্বাপেক্ষা বীভৎস ধ্বংস সাধন করেছে এবং চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছে এবং তাদের ঘোড়া ও অন্যান্য গৃহপালিত জন্তুর খাদ্যের জন্য তুঁতে গাছের সমস্ত আহার্য বিনষ্ট করে রেশম বস্ত্রের শিল্পীদের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। চারদিকে একমাত্র ধ্বংসের প্রতিমূর্তি। এই অঞ্চলের প্রায় সমস্ত অধিবাসী, বিশেষতঃ তাঁতী ও কৃষকরা বাড়ীঘর ছেড়ে পালিয়েছে। রেশম ও বস্ত্রশিল্পের কারখানা ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে জনমানবহীন, শস্যক্ষেত্রগুলোও চাষবাসহীন অবস্থায় কৃষকদের দ্বারা পরিত্যক্ত। মারাঠা আক্রমণের ফলে রেশম শিল্পের কারখানাগুলো এমন আঘাত পায় যে তার পর

থেকেই তাদের মৌলিক বিশুদ্ধতা এবং মর্যাদা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, সম্ভবতঃ তাদের শিল্পের এই বিশুদ্ধতা ও মর্যাদা আর কোনদিন পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হবে না। ধ্বংসকারী যুদ্ধের প্রত্যেকটি দুর্ভোগ এই হতভাগ্য দেশের জনসাধারণ চরম মাত্রায় ও সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছে। এই অঞ্চলের সমস্ত স্থানেই খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাব। শ্রমিকদের বেতনের পরিমাণও প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।” শুধু বীরভূম নয় বাংলাদেশের বিরাট এক এলাকা জুড়েই এই অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। সমসাময়িক কবি গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্র পুরাণে এবং বর্ধমানের রাজসভার সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের রচনায়ও বর্গীদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা জানতে পারা যায়।

(৪) কোম্পানীর নীতি পরিবর্তনের ফল :

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায়ে অর্থলগ্নী করার নীতির পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত কোম্পানী দেশীয় দালালদের মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত। কোম্পানীর দালালরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, নির্দিষ্টমানের পণ্যদ্রব্য নিয়মিত সংগ্রহ করত। দালালরা দাদনি বাবদ কোম্পানীর কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে স্থানীয় তাঁতীদের মধ্যে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের অগ্রিম মূল্যরূপে কিছু টাকা বিনিয়োগ করত। অর্থবিনিয়োগের এরূপ নীতির ফলে কোম্পানীর বাণিজ্য নির্বিঘ্নে পরিচালিত হত। কিন্তু ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পর দেশীয় দালালরা বেশি অর্থ দাবি করায় এবং সাময়িকভাবে কোম্পানীর অর্থাভাব দেখা দেওয়ায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দালালদের পরিবর্তে নিজস্ব গোমস্তা নিযুক্ত করে। গোমস্তাগণ ছিল কোম্পানীর স্থায়ী কর্মচারী। অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে কোম্পানীর নীতি পরিবর্তনের ফলে তাঁতীরা খুব অসুবিধায় পড়ে যায় এবং দালালরাও কর্মহীন হয়ে পড়ে। অপরদিকে অর্থবিনিয়োগের নীতির পরিবর্তনের ফলে কোম্পানীর পক্ষ থেকে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণও যথেষ্ট হ্রাস পায়। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে ফোর্ট উইলিয়ম কাউন্সিলের এক লিখিত প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর দ্বারা সংগৃহীত পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য ছিল তেত্রিশ লক্ষ ছেষট্টি হাজার পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে হ্রাস পেয়ে তার পরিমাণ হয় বার লক্ষ একাশি হাজার দুশ সাঁইত্রিশ টাকা। ঢাকার ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠির নথিপত্র থেকে জানা যায় যে ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে ঐ কেন্দ্রের পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের পরিমাণ ছিল আটচল্লিশ হাজার তিনশ নব্বই টাকা, ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে তার পরিমাণ হ্রাস পেয়ে একলক্ষ আটানব্বই হাজার সাত টাকায় পরিণত হয়। অর্থনৈতিক অবস্থার এরূপ পরিবর্তন দেশের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সুস্পষ্ট পরিচয় বহন করে।

অর্থনৈতিক বিনিয়োগ নীতির আর একটি কুফল দস্তকের যথেচ্ছ অপব্যবহার এবং

দেশীয় মহাজনদের ও নবাবের প্রচুর ক্ষতির বিনিময়ে কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার সীমাহীন বৃদ্ধি। উপরি-উক্ত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করলে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায় যে, নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সিংহাসনে আরোহণের সময় শুধু রাজনৈতিক অবস্থা নয়, অর্থনৈতিক অবস্থাও দেশের জনসাধারণের এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উভয়েরই স্বার্থের প্রতিকূল ছিল।

Q. 10. Discuss the economic condition of India on the eve of the foundation of the British Rule in India.

উত্তর : (১) ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা :

ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি সঙ্কট বারবার দেখা দিয়েছে। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কতিপয় প্রতিদ্বন্দ্বীর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আশায় পারস্পরিক প্রতিযোগিতা এবং তার ফলস্বরূপ শাসনব্যবস্থা ও আর্থিক স্তরবিন্যাসে চূড়ান্ত ভাঙ্গন, এই ছিল সংকটটির রূপ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগও ছিল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে অনুরূপ একটি সংকটের কাল। ভারতীয় সামাজিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় শাসন অবশ্য সর্বদা কতিপয় শহরাঞ্চলেই কমবেশি সীমাবদ্ধ ছিল। কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক কর্তৃত্বের চারিত্রিক রদবদল দ্বারা খুব বেশি প্রভাবিত না হয়ে গ্রামগুলো তাদের যথাবিহিত কার্য নির্বাহ করত। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের সময় যে দ্রুত পরিবর্তন দেখা দেয় তা দূরতম অঞ্চলগুলোতেও নিশ্চয়ই কিছু পরিমাণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এই সুযোগে পরস্বাপহরণ ও লুণ্ঠনের নতুন নতুন প্রতিভূ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং চিরাচরিত শাসকবর্গের স্থলে জন-ঐতিহ্যে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত ও অল্প-প্রোথিত উৎসসমূহকে স্থান নিতে দেখা যায়। যুগ যুগ ধরে ভূমি-রাজস্বই ছিল গ্রামসমাজ ও কেন্দ্রীয় শাসক রাজনৈতিক শক্তির প্রধান সংযোগসূত্র। সেই রাজস্ব এখন দুর্বৃত্ত লুঠেরার দ্বারা বলপূর্বক সংগৃহীত হতে শুরু করে। কৃষিকার্যও সঙ্কুচিত হয়। জনগণ সম্পদ লুক্কায়িত ও গোপন রাখতে বাধ্য হয়। বাণিজ্য ও মহাজনী হতে পূর্বার্জিত সম্পদ যে কেড়ে নেওয়া হবে না তারও নিশ্চয়তা রইল না। একান্ত গোপনীয়তা ও শাসক কর্তৃপক্ষের প্রতি অবিশ্বাসের এই প্রবণতাগুলো, পরবর্তীকালে এই ধরনের অনিশ্চয়তা হ্রাস পেলেও, ভারতীয় গ্রামীণ জনগণের মনে যে ছাপ রেখে গেল তা সহজে মুছে ফেলার নয়।

মোগল সম্রাটদের ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রকৃত চাষীর মধ্যে কমবেশি শক্তিশালী এক বৃহৎ সংখ্যক মধ্যস্বত্বভোগী স্থানীয় প্রতিনিধি দলের সৃষ্টি করেছিল। মোরল্যাণ্ড এই মধ্যস্বত্বভোগীদের সামন্তরাজ, রাজস্ব-প্রতিনিধি, অধিকার-প্রাপ্ত প্রতিনিধি, অধিকার-প্রাপ্ত-গ্রহীতা এবং রাজস্ব-আদায়কারী এই ভাবে ভাগ করেন। মোগলদের নিকট পর্যন্ত হিন্দু রাজারা অনেক সময়ে সামন্ত-রাজ বলে গণ্য হতেন। মোগল

সম্রাটকে নগদ টাকায় কর বা নজরানা দেওয়ার শর্তে তাঁরা এক বিরাট অঞ্চলের জমিজমার নিয়ন্ত্রণ ভার পেতেন। দিল্লীর বাদশাহ এইসব অঞ্চলের আভ্যন্তরীণ শাসনভার সামন্ত-রাজাদের উপর ছেড়ে দিতেন এবং এইসব অঞ্চলে চাষীদের সাথে কেন্দ্রীয় শাসনের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকত না। যতক্ষণ পর্যন্ত সামন্ত-রাজারা সময়মত কর বা নজরানা দিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা খুশীমত নিজেদের প্রজাপুঞ্জের সাথে যথেচ্ছাচার করতে পারতেন। কোনো সামন্ত-রাজা সময়মত রাজস্ব জমা দিতে না পারলে বাদশাহের স্থানীয় প্রতিনিধি ঐ সামন্ত-রাজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান পরিচালনা করতেন। এই উপলক্ষে দরকার হলে সম্রাটের মূল বাহিনী স্থানীয় শাসকের নিয়মিত বাহিনীর সাথে একযোগে অভিযান চালাত।

গ্রামের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা বা গ্রামপ্রধানরা রাজস্ব-প্রতিনিধির কাজ করতেন। তাঁরা স্থানীয় কৃষকদের প্রতিনিধিরূপে ভূমি-রাজস্ব প্রদানের কিছু দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করে কৃষকদের মধ্যে দেয় অংশের পরিমাণ ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিতেন। সরকারী রাজস্ব নির্ধারক ও গ্রাম প্রধানের আলোচনার ভিত্তিতে স্বল্পসময়ের জন্য, কখনও বা কেবলমাত্র একটি আবাদের সময়ের জন্য, এইভাবে দেয় টাকার চুক্তি সম্পাদিত হত। কোন একটি গ্রামের দেয় ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ করতে স্বভাবতই একটি নির্দিষ্ট ফসলের সময় সেই গ্রামে কর্ষিত বা কর্ষিতব্য জমির পরিমাণের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হত।

সরকারী পৌর বা সামরিক কর্মচারীরা অধিকার-প্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসাবে গণ্য হতেন। তাঁরা নগদ বেতনের পরিবর্তে কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংগৃহীতব্য ভূমি-রাজস্ব সম্পূর্ণ বা আংশিক ভোগ করবার অধিকার লাভ করতেন। ভূমি রাজস্ব আদায় করতে পারার জন্য এইসব প্রতিনিধিদের উপর কিছু পরিমাণ শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতাও ন্যস্ত ছিল। তাছাড়া তারা নিজশক্তিতে পাওনা রাজস্ব আদায় করতে ব্যর্থ হলে সাধারণতঃ তাদের সরকার থেকে দেবার ব্যবস্থা ছিল।

অধিকার প্রাপ্ত গ্রহীতারা অধিকার-প্রাপ্ত প্রতিনিধির মতোই ছিলেন। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল এই যে প্রথমোক্তরা সাধারণতঃ প্রশংসনীয় কার্যকলাপ বা বিদ্যাবত্তার পুরস্কার স্বরূপ ভূমি-রাজস্ব ভোগের অধিকার লাভ করতেন। অধিকার প্রাপ্ত প্রতিনিধিরা সন্তোষজনক কার্য সম্পাদনের শর্তে ভূমি রাজস্ব ভোগ করতেন, কিন্তু গ্রহীতাদের ক্ষেত্রে কোন শর্ত আরোপিত হত না। কিন্তু উপযুক্তভাবে কার্য সম্পাদনে ব্যর্থতার অপরাধে প্রতিনিধিরা যেমন অধিকারচ্যুত হতেন, গ্রাহকেরাও সম্রাটের অসন্তোষ বিধানের জন্য ভূমি-রাজস্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত হতেন।

রাজস্ব আদায়কারীরা ছিলেন হয় সরকারী কর্মচারী অথবা বহিরাগত ব্যক্তি। তাঁরা নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক রাজস্ব জমা দেবার দায় গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষকে বহুবিস্তৃত অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত অসংখ্য চাষীদের নিকট থেকে রাজস্ব সংগ্রহের অসুবিধা ও আনুষঙ্গিক ব্যয় থেকে অব্যাহতি দিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রাদেশিক শাসক বা

তাঁর অধস্তন কোন কর্মচারী প্রশাসনিক কাজকর্মের আনুষঙ্গিক কাজ হিসাবে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও গ্রহণ করতেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্থিকলাভ ও মর্যাদার বিবেচনায় স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রাজশক্তির কতৃত্বাধীনে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব গ্রহণে প্ররোচিত হতেন। প্রায় সবক্ষেত্রেই ক্রমশঃ রাজস্ব আদায়ের কাজ একটি বংশানুক্রমিক উপজীবিকায় পরিণত হয়। পিতার মৃত্যুর পর পুত্র সম্রাটের নিকট হতে স্বাভাবিক নিয়মেই এই অধিকার সনদ পেত।

উপরি-উক্ত ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের বিভিন্ন ব্যবস্থা হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মোগল যুগে ভারতে জমি ও ভূমি রাজস্বের উপর মূল দাবি সম্রাটের উপর ন্যস্ত ছিল। কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর বা এমনকি কোনো আমীর পক্ষেও ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব দাবি করা সম্ভব ছিল না। তৎকালীন যুগের অতিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থায় সম্রাটের ইচ্ছাই চূড়ান্ত ছিল। তিনি অভিজাত শ্রেণীর মানুষকে চাষী বা চাষীকে অভিজাত শ্রেণীর মানুষে পরিণত করতে পারতেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রবল ছিল, ততক্ষণ সমস্ত অর্থনৈতিক ব্যাপারেও তাঁর কতৃত্বই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হত। বাস্তবে এই অর্থনৈতিক ক্ষমতার একটিই সীমা ছিল। তাহলে শাসকশ্রেণীর রূঢ় ব্যবহারে কৃষকদের যেন কৃষিকার্য পরিত্যাগ করার প্রবণতা দেখা না দেয় এবং শিল্প ও বাণিজ্যের উপর অত্যধিক করলাভের জন্য যেন শিল্পে উৎপাদিত ও বাণিজ্যের দ্বারা বিদেশ হতে সংগৃহীত বিলাসসামগ্রীর রাজসভায় সরবরাহ বন্ধ হবার উপক্রম না হয়।

এই প্রয়োজনীয় সহজবোধ্য ব্যবহারিক বাধাটি ভূমি রাজস্ব নির্ধারণের ব্যাপারে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে মোগল যুগের প্রথম দিকে কৃষির মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য বলে স্থির হয়। ভূমি রাজস্ব নগদ টাকায় সংগৃহীত হবার ফলে বিভিন্ন শস্যের জন্য বিভিন্ন হার স্থির করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এই হার সাধারণতঃ এক একক অঞ্চল প্রতি একটি নির্দিষ্ট টাকার পরিমাণে স্থির হয়। মোট উৎপন্নের এক তৃতীয়াংশ রাষ্ট্রের প্রাপ্য, এই মূলনীতি আকবরের শাসনকালের শেষ পর্যন্তও যথাসম্ভব কার্যকরী করা হত, কিন্তু পরবর্তীকালে তা কার্যতঃ পরিত্যক্ত হয়। মোগল যুগের শেষ পর্বে মোট উৎপন্নের প্রায় অর্ধাংশ রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের পক্ষে আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভূমি-রাজস্বের এক বৃহৎ অংশই নানা ধরনের মধ্যস্বত্বভোগীদের তত্ত্বাবধানে চলে আসে। এই অধিকার-প্রাপ্ত রাজ-প্রতিনিধিদের অধিকার ভোগের নিরাপত্তা ছিল না বললেই চলে। তাদের অধিকার স্বল্পস্থায়ী ছিল এবং প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের খেয়ালের উপরই এই অধিকার নির্ভর করত। সম্রাট যে কোন মুহূর্তেই অধিকার বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন। তাই অভিজাত শ্রেণীর কোনো ব্যক্তিই উত্তরাধিকারীকে সম্পদ দিয়ে যাবার আশা পোষণ করতে পারতেন না। তার ফলে স্বভাবতই সঞ্চয় ও তার বৃদ্ধি নিরুৎসাহিত হয়। সম্পত্তি গোপন করার

রীতি ব্যাপক হয়ে উঠে। তাছাড়া মোগল সম্রাটের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের প্রতিনিধিদেরও গ্রামাঞ্চলের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতে শুরু করে। দাক্ষিণাত্যের রাজ-প্রতিনিধিরা সশস্ত্র মারাঠা দস্যুদের সঙ্গে রাজস্ব ভাগ করে নিতে বাধ্য হয়। মারাঠারা ভূমি-রাজস্বের উপর তাদের দাবি নিজেদের অস্ত্রবলেই প্রতিষ্ঠা করে। উত্তর ভারতে স্থানীয় অভিজাত শ্রেণী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার সুযোগে নিজেদের অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করেন এবং নিজ নিজ অঞ্চল হতে সরকারী ও প্রতিনিধিদের বিতাড়িত করেন। মোরল্যাণ্ডের ভাষায়, "অষ্টাদশ শতাব্দী এমন একটি যুগ যখন নাকি আইনগত অধিকার অপেক্ষা কার্যকর অধিকারেরই অনেক বেশি প্রাধান্য ছিল। রাজ-প্রধানেরা এতদিন পর্যন্ত সম্রাটকে কর বা নজরানা দেওয়ার পরিবর্তে যে সব অঞ্চল ভোগ করছিলেন, সেইসব অঞ্চলে নিজেদের অধিকার এখন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে প্রবৃত্ত হলেন। স্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা নিজেদের স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ব্রিটিশ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন আবার নিজেদের অধীনে কেন্দ্রীয় ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা করেন, তখন তাদের অসংখ্য দাবিদারের ভূমি রাজস্বের দাবির সম্মুখীন হতে হয়। সেই সকল দাবির পিছনে বহু ক্ষেত্রেই কোনো আইনগত বা দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তি ছিল না।

(২) সামাজিক অবস্থা:

স্মরণাতীত কাল হতে ভারতীয় গ্রাম তিন শ্রেণীর লোক নিয়ে গঠিত ছিল—কৃষক, গ্রাম্য কারিগর এবং তাদের উপর নির্ভরশীল অন্যান্য ব্যক্তি। কৃষক শ্রেণী তাদের উৎপন্ন শস্য হতে রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব-দাবী মিটাবার পর গ্রাম্য কারিগরগণ সারা বছর ধরে যে সকল কার্য সম্পাদন করত তাদের মজুরি দিয়ে এবং ঐতিহ্যগত দয়া-দাক্ষিণ্যের রীতি হিসাবে দুঃস্থদের ভরণপোষণ করে যা অবশিষ্ট থাকত তা নিজেদের পরিবারের ভরণপোষণের জন্য ব্যবহার করত। গ্রামের কৃষকরা নিজেদের গ্রাম্য পর্ষদ গঠন করেছিল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে গ্রাম্য-পর্ষদের সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদেরও বাড়তি জমি চাষ করতে দেওয়া হত। শেষোক্তরা প্রকৃতপক্ষে গ্রাম্য প্রজা ছিল। এইসব ব্যক্তিদের 'পাইকস্ত' রায়ত বলা হত, আর গ্রাম্য-পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা ছিল 'খুদকস্ত'। 'পাইকস্ত' শ্রেণীর রায়তদের অধিকার কোথাও স্পষ্ট করে বলা হয়নি। কিন্তু মনে হয় যে প্রতি বছরের শেষে তাদের উচ্ছেদ করা যেত। তবে বাস্তবে সে সময়ে জমির পরিমাণ কৃষিকার্যে নিযুক্ত জনসংখ্যার তুলনায় বেশি ছিল এবং কৃষিকার্যের প্রসার একটি সার্বজনীন কামনার বস্তু ছিল। তখন জমি হতে বিতাড়নের সম্ভাবনা ছিল নিতান্তই অকল্পনীয়।

পূর্বোল্লিখিত গ্রাম্য-পর্ষদ আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ একদল কৃষক নিয়ে গঠিত হত এবং তারা সমজাতীয় আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ অন্য দল হতে নিজেদের পৃথক

অস্তিত্ব বজায় রাখবার উপর গুরুত্ব দিত। দলের সদস্যরা যদিও পৃথকভাবেই নিজেদের জমিজমা চাষ করত, তথাপি গ্রামের সাধারণ বিষয় সমূহের তত্ত্বাবধান প্রায়শই প্রবীণ-পর্ষদের মাধ্যমে তারা একযোগেই করত। এক একটি গ্রাম্য গোষ্ঠীর ভিতরে অবশ্য পারিবারিক ভিত্তিতে নানা উপবিভাগ ছিল। এই উপবিভাগগুলোর মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ একেবারে বিরল ছিল না। গ্রাম্য সংগঠন তার নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করলেও এই সংগঠনের সাহায্যে সদস্যদের মধ্যে সকলের স্বার্থের চূড়ান্ত সঙ্গতি প্রতিষ্ঠিত হত বলে মনে করবার কোনো কারণ নেই।

সাধারণতঃ প্রতিটি গ্রামের একজন করে শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি বা গ্রামপ্রধান ছিলেন। তিনি গ্রামের কৃষকগণের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রামের সাধারণ বিষয়গুলোর পর্যালোচনা, দয়া-দাক্ষিণ্য ও ধর্মীয় কারণে দেয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রকে দেয় গ্রামের রাজস্ব পরিমাণ নির্ধারণে সরকারী রাজস্ব নির্ধারকের সহিত দর কষাকষি করতেন। এমন অনেক গ্রামপ্রধান ছিলেন যাঁরা গ্রামবাসীদের অধিকার রক্ষায় বেশি জোর দেওয়ার ফলে রাষ্ট্রের অসন্তোষ ভাজন হন। অন্যদিকে আবার এমন চতুর গ্রামপ্রধানও ছিলেন যাঁরা গ্রাম হতে বেশি আদায় করে এবং দরকষাকষিপূর্বক রাষ্ট্রকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অপেক্ষা কম রাজস্ব দিয়ে সহগ্রামবাসী ও রাষ্ট্র উভয়কেই প্রতারিত করতেন। মোগল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গনের মুখে এই সমস্ত গ্রামপ্রধানদের কেউ কেউ কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিজেদের গ্রামের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বংশানুক্রমিক গ্রামমুখ্য হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(৩ শিল্পব্যবস্থা ঃ

শহরাঞ্চলীয় শিল্প প্রধানতঃ সম্রাট ও তার সভাসদদের প্রয়োজন মেটাত। বিলাস সামগ্রী উৎপাদনের কিছু অংশ বিদেশে রপ্তানি হত। সরবরাহের উপর নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখবার জন্য রাজসভার তরফে তাদের নিজ নিজ রাজপ্রাসাদ সমূহে 'কারখানা' নামক কর্মশালা সংগঠন করার রীতি ছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত পরিদর্শনরত ফরাসী চিকিৎসক বার্ণিয়ে সম্রাটের দুর্গের অভ্যন্তরে দেখেছিলেন, কারিগরদের জন্য বিরাট বিরাট হলঘর—বা কর্মশালা। একটি হলঘরে সূচীকর্মনিপুণ শিল্পীরা একজন প্রভুর তত্ত্বাবধানে শান্তভাবে কর্মে নিযুক্ত ছিল। অপরটিতে —স্বর্ণকারেরা, তৃতীয়টিতে চিত্রশিল্পীরা, চতুর্থটিতে বার্ণিশের কাজে নিযুক্ত--রঙ্ পালিশ কর্মীরা; পঞ্চমটিতে হাল্কা আসবাব সামগ্রী প্রস্তুতকারক কর্মী, কুন্দকার, দর্জি, মুচি; ষষ্ঠটিতে রেশম, জরি ও সূক্ষ্ম মসলিন প্রস্তুতকারকেরা। কারিগরের নিজ নিজ কর্মশালায় সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ করত এবং দৈনিক মজুরি হিসেবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেত। তত্ত্বাবধায়করা (বা দারোগারা) তাদের প্রতি খুব রূঢ় আচরণ করত এবং তাদের মজুরি সাধারণতঃ খুব সামান্য ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অভিজাত শ্রেণী বিলাস-

সামগ্রী সুবিধাজনক দামে পাওয়ার জন্য দরিদ্র কারিগরগণের উপর নিজেদের অধিকার ও প্রভাব খাটাতে দ্বিধা করত না। এই পরিবেশে নিত্যনূতন পথে কারিগরগণের দক্ষতা বিকাশের আশা করা অসমীচীন। তবুও উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতায় অনেক ক্ষেত্রেই ভারতের শিল্প ও কলা বহু ইয়োরোপীয় ও দূর প্রাচ্যের পর্যটনকারীর ঈর্ষার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল।

এইসব সরকারী কারখানার বাহিরেও অন্যান্য দক্ষ কারিগর ছিল যারা নিজস্ব কাঁচামালের সাহায্যে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করে বাইরের বাজারে বিক্রয় করত। বিলাস সামগ্রীর বাজার অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল এবং একজন কারিগরের পক্ষে সম্রাট বা কোন স্থানীয় রাজপ্রধানের আনুকূল্য না পাওয়া পর্যন্ত জীবনধারণ করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিগণের সংখ্যা এমন মুষ্টিমেয় ছিল যে, প্রকৃতপক্ষে শিল্প প্রগতিও রাজসভার সৌভাগ্যের উপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। রাজ শক্তির অবসানের ফলে শহরাঞ্চলের সকল শ্রেণীর কারিগরগণের আর্থিক দুর্গতি ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক।

ধর্মীয় পবিত্রতার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু সংখ্যক শহর ও মহানগরে আরও এক ধরনের শিল্প ছিল। বারাণসী, পুরী ও তাঞ্জোরের মত শহরগুলি সারা ভারতের তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করত এবং তারা এই সমস্ত মন্দির নগরগুলোতে যে বিশেষ ধরনের জিনিসপত্র তৈরি হত তাহার পৃষ্ঠপোষকতা করত। যে সমস্ত কারিগররা ধর্মীয় উৎসবে পরিধেয় বস্ত্রাদি বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার্য তৈজসপত্রাদি তৈরি করত তারা রাজশক্তির অবদান বা রাজ-আনুকূল্যের অভাবেও এক অবিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠপোষকতা ভোগ করত।

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত থাকার দরুন শিল্পদ্রব্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল সীমিত। শুধু কিছু জিনিসপত্রের বাণিজ্য, যেমন, চিনি ও লবণ, নাব্য নদীগুলোকে পরিবহণের পথরূপে ব্যবহার করে চালানো হত। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মধ্যে দ্রব্যাদির বিনিময় নানা রকমের আভ্যন্তরীণ পরিবহণ কর চাপানোর ফলে আরও বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভ্রমণের নিরাপত্তাহীনতা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় শাসকগণ টোল কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করার দরুন জিনিসপত্রের অবাধ চলাচল আরও বেশি ব্যাহত হয়।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী হতে যে সমস্ত ইংরেজ, ফরাসী, দিনেমার, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরা ভারতকে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে তারাও অন্যান্য ব্যবসায়ীদের মত সমভাবে এই নিরাপত্তাহীনতার শিকার হয়েছিল। তৎকালীন নিরাপত্তাহীনতার বিরুদ্ধে তাদের বাণিজ্য কুঠিগুলোর রক্ষা ও তাদের নিজ নিজ কোম্পানী-সমূহের মুনাফা বজায় রাখাই এই সময়ে তাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা ও তার আশেপাশে কিছু জমির অধিকার পায়। কলকাতায় তাদের কারখানাসমূহের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনের সূত্রেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তখনকার বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌল্লার সহিত সংঘর্ষে আসে। ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের কাহিনী রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে পলাশীর যুদ্ধে ব্রিটিশের জয়লাভের সঙ্গে

সঙ্গে শুরু হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে ব্রিটিশের জয় বাংলার মসনদে তাদের মনোমত একজন নবাব স্থাপন করার ও পরে দিল্লার বাদশাহের দরবারে নিজেদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করার সুযোগ আনয়ন করে দেয়।

Q. 11 Give an account of the Society, Economy in Eighteenth Century in India.

উত্তর : (১) হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতা :

অষ্টাদশ শতকে ভারতীয় সমাজ তার চিরন্তন বৈশিষ্ট্য নিয়েই চলছিল। দীর্ঘকাল মুসলমানদের পাশাপাশি বসবাসের ফলে হিন্দুদের পূর্বেকার রক্ষণশীলতা সামান্য দূর হলেও হিন্দুসমাজ তখনও জাতিভেদপ্রথা, খাদ্যাখাদ্য সম্পর্কে বাছবিচার ত্যাগ করতে পারে নি। হিন্দুসমাজ উদার মৌল রক্ষণশীলতা, জাতিভেদ প্রথাজনিত ছুৎমার্গ তখনও ত্যাগ করতে পারে নি। অপরদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার অনুপস্থিতি হিন্দুসমাজের সর্বাধম, উপেক্ষিত, অবহেলিত শ্রেণী মুসলমান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হতে শুরু করে। এভাবে সমাজ তখন হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজ—এই প্রধান দুই সমাজে বিভক্ত ছিল।

(২) সামাজিক জীবনের ও কার্যকলাপের ভিত্তি গ্রাম :

সামাজিক কার্যকলাপের মূল ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামে বসবাস করা, পরিবার-পরিজন প্রতিপালন করা, নিজ ধর্মমত অনুসরণ করে চলা সবই গ্রামজীবনকে কেন্দ্র করেই চলছিল। গ্রাম হতেই খাদ্য, বস্ত্র, গৃহের সরঞ্জাম প্রভৃতি সংগ্রহ করা চলত, গ্রামই ছিল তখনকার সমাজ জীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও সাংস্কৃতিক জীবনের কর্মকেন্দ্র।

গ্রামবাসী তখন প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, যথা—কৃষক তথা শ্রমিক শ্রেণী, উচ্চজাতিসম্মিলিত উচ্চ শ্রেণী ও শাসনকার্যে সংযুক্ত অল্পসংখ্যক ব্যক্তি। উচ্চজাতি বলতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য তথা জমিদারিক শ্রেণীকে বুঝাত। মুসলমানদের মধ্যেও অনুরূপ উচ্চশ্রেণী (শরিফ) এবং সাধারণ শ্রেণী অর্থাৎ, শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি ছিল।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রাম্য জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল কৃষি। তখনকার অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল গ্রামের স্বয়ংসম্পূর্ণতা। খাদ্যশস্য ভিন্ন দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, যেমন, তেল, কাপড়চোপড়, লোহার জিনিসপত্র, ফল, শাক-সবজি সব কিছুই গ্রামে উৎপন্ন হত। জনসংখ্যার তুলনায় কৃষিজমির প্রাচুর্য থাকায় কৃষিযোগ্য জমির একাংশ এমনি পতিত থেকে যেত। গৃহপালিত পশু, গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতির চারণভূমি হিসাবে প্রত্যেক গ্রামেই বিস্তীর্ণ চারণভূমি থাকত। মোগল আমলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ কৃষিজমি চাষের অধীনে আনা হয়। কৃষিজমি সম্পর্কে অপর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, খুব অল্প

পরিমাণ জমিই তখন বিক্রয় করা হত। এই সম্পর্কে স্যার জর্জ ক্যাম্বেল বলেন যে, "We are apt to forget that property in land as a transferable marketable commodity, absolutely owned and passing from hand to hand like any chattel, is not an ancient institution but a modern development."

ভূমিদাস প্রথা ভারতে জানা ছিল না। জমিদার বা ঊর্ধ্বতন মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিকারের পথ ছিল গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাওয়া। স্বাভাবিকভাবেই ইয়োরোপে যেমন ভূমিদাসপ্রথা ছিল যাতে কোন কৃষক জমি ত্যাগ করে যেতে পারত না বা গেলেও তাকে ধরে আনা চলত, সেই ধরনের ভূমিদাসত্ব ভারতে দেখা দেয় নি।

গ্রামের অর্থনৈতিক জীবনের প্রথম এবং সর্বপ্রধান ভিত্তি কৃষি হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গড়ে তোলার প্রয়োজনে নানা ধরনের ক্ষুদ্রশিল্প গড়ে উঠেছিল। এগুলোর মধ্যে তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, স্বর্ণশিল্প, চর্মশিল্প প্রভৃতি নানাপ্রকার শিল্প স্বাভাবিকভাবেই গড়ে উঠেছিল। কারিগরি শিল্পীদের মধ্যে কামার, কুমার, স্বর্ণকার, তাঁতী, ছুতার মিস্ত্রী, গুড় ও অপরাপর মিষ্টি প্রস্তুতকারক, নৌকা প্রস্তুতকারক প্রভৃতি নানাধরনের দক্ষতাসম্পন্ন লোক ছিল।

(৩) ব্যবসায় বাণিজ্য ঃ

গ্রামের অভ্যন্তরে এবং এক গ্রামের সহিত অপর গ্রামের ব্যবসায়-বাণিজ্য গ্রামের হাট, বাজারের মাধ্যমে চলত। গৃহপালিত পশু ক্রয় বিক্রয়ের জন্যও হাট বসত। গ্রামের উদ্‌বৃত্ত ফসল ও সামগ্রী ব্যবসায়ীরা ক্রয় করে শহরাঞ্চলে চালান দিত। অন্যস্থান হতে গ্রামাঞ্চলে আমদানি একপ্রকার ছিল না বললেই চলে। গ্রামের উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী, শস্য ইত্যাদি ব্যবসায়ীরা অতি সামান্য দামে কিনে নিয়ে শহরাঞ্চলে বিক্রয় করে যথেষ্ট লাভ করত। সেই লাভের অর্থ গ্রামে বিনিয়োগ করা হত না। ফলে গ্রামের অর্থনৈতিক যে সমৃদ্ধি আশা করা যেত সেইরূপ কোন কিছু হত না। বরং স্বল্প অর্থ ধার দিতে হত।

গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামের শান্তি বজায় রাখা, অপরাধের বিচার করা, সালিশী করা, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অপরাধের শাস্তি বিধান করা হত। মকদ্দম নামক রাজকর্মচারী গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত ছিল। পঞ্চায়েতের উপর কোনপ্রকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বা প্রভাব বিস্তারের সুযোগ মকদ্দমের ছিল না।

পাশ্চাত্য দেশের মত ভারতবর্ষের শহরগুলো শিল্পকেন্দ্র এবং গ্রামগুলো কৃষিকেন্দ্র এভাবে বিভক্ত ছিল না। গ্রাম ও শহরের প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্যশস্য সবকিছু প্রধানতঃ গ্রামেই উৎপন্ন হত। নবাব, বাদশাহ্ বা স্থানীয় রাজপরিবারের রুচিসম্মত জিনিসপত্র প্রস্তুতের জন্য দিল্লী, আগ্রা এবং ভারতের অপরাপর শহরে কারখানা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু ভারতের অর্থনীতির কাঠামো গ্রামের উপরই নির্ভরশীল ছিল। শহরে, নগরে প্রস্তুত সামগ্রীর অতি সামান্যই গ্রামাঞ্চলে প্রেরিত হত। শহর এবং গ্রামাঞ্চলের

শিল্পীদের দাদন দিয়ে দালালরা নিজে অথবা তাদের গোমস্তাদের মাধ্যমে উৎপন্ন সামগ্রী সংগ্রহ করত।

(৪) বৈদেশিক বাণিজ্য ঃ

বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যতম প্রধান রপ্তানিকারী দেশ হিসাবে পরিগণিত ছিল। সপ্তদশ শতক এবং অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ভারতবর্ষ হতে সুতী ও রেশম বস্ত্র, মসলা, নীল, চিনি, ঔষধ, দামী পাথর এবং অন্যান্য সুন্দর সুন্দর জিনিস আমদানি করত। পরিবর্তে রেশমের কাঁচামাল, সোনা, রূপা, টিন, প্রবাল, জিঙ্ক, গন্ধক, সীসা, তামা প্রভৃতি আমদানি করত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় অর্থ ধনবান বণিকসম্প্রদায়ই বিনিয়োগ করত। শেঠ পরিবার এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল।

(৫) শিক্ষা ও সংস্কৃতি ঃ

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, গ্রামে টোল ও মক্তব্ থাকলেও রাজকার্যে যোগদানের যোগ্যতা অর্জনের জন্য শহরাঞ্চলে শিক্ষা গ্রহণের রীতি তখনও চালু ছিল। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল শাস্ত্র—হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক—সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে গ্রামের ধর্ম-জীবনকে সাহায্য করা। শহরের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য ছিল অন্যরূপ। সেখানকার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজকর্মচারি-পদ গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করা, ব্যবসায়-বাণিজ্যের যাবতীয় জটিলতা, আদালতে বিচারের সময় বাদী বা বিবাদী পক্ষ সমর্থন করা—অর্থাৎ উকিল মোক্তারের কাজ শিক্ষা করা। গ্রামের সাংস্কৃতিক জীবন অনেকটা ধর্মাশ্রয়ী ছিল। উৎসব, পূজাপার্বণ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সময়ে সঙ্গীত, যাত্রা, মাহফেল প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হত। সূক্ষ্ম কারিগরি শিল্প যেমন, হাতীর দাঁতের কাজ, তামা, রূপা বা সোনা প্রভৃতি ধাতুর উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য প্রভৃতি প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে অর্থাৎ নবাব-বাদশাহ, রাজা-মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতায়ই গড়ে উঠেছিল। হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার অভাবে প্রাচীন শিক্ষা-ব্যবস্থা পৃথিবীর অপরাপর অংশের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে নি। ধর্ম-ভিত্তিক শিক্ষায় স্থান আধুনিকতা এবং আধুনিক প্রয়োজনের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। অবশ্য হিন্দু শিক্ষা-ব্যবস্থায় দর্শনের স্থান ছিল যথেষ্ট উচ্চে। ব্যাকরণ, দর্শন, ন্যায়, কাব্য, বেদান্ত, গণিত, পুরাণ প্রভৃতি শিক্ষার মান যথেষ্ট উচ্চ ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও আদব (সাহিত্য), হিকমত (দর্শন), তাসির (ইতিহাস ও ঐতিহ্য), তিব (ঔষধ), রিয়াজী ও হৈয়ত (অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার) চর্চা তখন ছিল।

(৬) স্থাপত্য ও চিত্রকলা ঃ

স্থাপত্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতাব্দী সপ্তদশ শতাব্দীর তুলনায় অনেক

পশ্চাৎপদ ছিল, বলা বাহুল্য। ঔরংজেবের সংকীর্ণ ধর্মমত এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য ছিল।

(৭) উপসংহার :

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ হতে ইংরাজদের রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের ফলশ্রুতি হিসাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দিল। তাদের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্প আঘাতপ্রাপ্ত হল। কাঁচামাল রপ্তানি করে তৈরি সামগ্রী আমদানি তারা করতে লাগল। অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফল হিসাবে উৎপাদনের যে উন্নতি সাধিত হয়েছিল তার ফলে ভারতের সেই শিল্পজাত সামগ্রীর সহিত অসম প্রতিযোগিতায় ক্রমেই ভারতীয় শিল্প বিনাশপ্রাপ্ত হতে লাগল। ইংরাজদের রাজস্বনীতিও ভারতের চিরাচরিত রাজস্বনীতির অবসান ঘটিয়ে ভারতবাসীর কৃষি পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন আনয়ন করে। একদিকে ক্ষুদ্রশিল্পের বিনাশ অপরদিকে জমি মালিকানার স্থায়িত্ব চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে লোককে কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীল করেছিল। কৃষি পদ্ধতির কোন উন্নতি সাধন না করে কৃষিজমির উপর অত্যধিক চাপ দেওয়ার ফল আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল না। দারিদ্র্য ও নিম্নমানের জীবনধারণ ভারতবাসীর অর্থনৈতিক জীবনের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়াল।

শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও ইংরাজদের প্রয়োজনের তাগিদে নতুন শিক্ষাক্রম শুরু হল। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এ বিষয়ে তেমন পরিবর্তন সাধিত না হলেও ইংরেজদের অধীনে চাকুরি গ্রহণের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই ইংরেজী শিক্ষার দিকে ক্রমে ঝুঁকতে থাকে।

Q 12. Indicate the part played by the House of Jagat Seth in th. economic life of Bengal in the 18th century

উত্তর : (১) ভূমিকা :

১৭১৮ থেকে ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—প্রায় এই চার দশক ধরে জগৎশেঠ পরিবার বাংলাদেশের অর্থনীতিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। বিশেষতঃ বিদেশী ও ভারতীয় বণিকদের অর্থ লেনদেনের ব্যাপারে এই পরিবারের ভূমিকা বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের অর্থনীতির ও আর্থিক সমৃদ্ধির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত।

রাজস্থানের মারওয়ারে জগৎশেঠ পরিবারের আদি বাসস্থান ছিল। এই পরিবারের হীরানন্দ শাহো অর্থলগ্নীর ব্যবসা করার জন্য পাটনায় একটি দপ্তর স্থাপন করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মাণিকচাঁদ বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ঢাকায় একটি অর্থলগ্নীর প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তারপর তিনি মুর্শিদকুলি খানের সঙ্গে মুর্শিদাবাদে আসেন এবং সেখানে একটি দপ্তর স্থাপন করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের

ব্যক্তিগত ব্যবসায় অর্থলগ্নী করার জন্য জগৎশেঠদের ব্যাঙ্কের সাহায্য সব সময়ই গ্রহণ করা হত। কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণ প্রায়ই নির্দিষ্ট সময় ব্যাঙ্কের ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ হত বলে মাণিকচাঁদের এবং কোম্পানীর কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের মধ্যে মাঝে মাঝেই সংঘর্ষের সৃষ্টি হত। এই সংঘর্ষের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল যে, কোম্পানীর কর্মচারিগণ কোম্পানীর ও ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন পার্থক্য করত না বলে মাণিকচাঁদের কর্মচারীদের পক্ষেও এই পার্থক্য বোঝা অসম্ভব ছিল।

তদানীন্তন মোগল সম্রাট মাণিকচাঁদকে শেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭১৪ খ্রীষ্টাব্দে মাণিকচাঁদের মৃত্যু হয়। ইতিমধ্যে শেঠ পরিবারের ব্যাঙ্ক ব্যবসা খুব উন্নতি লাভ করে এবং কলকাতা, ঢাকা, পাটনা, বেনারস, হুগলি ও অন্যান্য স্থানে তাদের ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করা হয়। মাণিকচাঁদের উত্তরাধিকারী ফতে চাঁদের আমলে এই ব্যাঙ্ক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জীবনে এত বেশি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হয় যে, ইংল্যণ্ডের এডমণ্ড বার্কও এই সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

(২) ফতে চাঁদ ঃ

১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট মোহম্মদ শাহ ফতে চাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি প্রদান করেন। ফতে চাঁদের আমলে বাণিজ্যের প্রয়োজনে অর্থলগ্নীর প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে বাণিজ্যিক স্বার্থ বজায় রাখার প্রয়োজনে কোম্পানীর কর্মচারীদের শেঠদের উপর অত্যন্ত বেশি নির্ভর করতে হত। ১৭৩০ থেকে ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালের কোম্পানীর নথিপত্রে শেঠদের ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কোম্পানীর ঋণ গ্রহণ, ঋণপরিশোধ, মূল্যবান ধাতুপিণ্ড ক্রয়-বিক্রয় অন্যান্য আদান-প্রদানের অনেক উল্লেখ পাওয়া যায়। শেঠ পরিবারের সংস্থা তার সঞ্চিত মূলধন, সততা এবং শাসক গোষ্ঠীর অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হয়ে অল্পদিনের মধ্যেই প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফতে চাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁর আমলেই জগৎশেঠ পরিবারের সমৃদ্ধি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। তাঁর উত্তরাধিকারিগণও এই সংস্থার সুনাম বজায় রাখতে সমর্থ হন।

(৩) শেঠ পরিবার ও বাংলার নবাব ঃ

জগৎশেঠদের ব্যাঙ্ক ধীরে ধীরে নবাবের রাজস্ব গ্রহীতা ও খাজাঞ্চির দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পায়। মুর্শিদকুলি খান মাল জামিনি পদ্ধতি প্রবর্তন করেন। জগৎশেঠের ব্যাঙ্কই প্রায় সমস্ত কর প্রদানকারীদের প্রতিভূ রূপে কাজ করতে শুরু করে। গোলাম হোসেনের রচনা থেকে জানা যায় যে, নিয়মিত করপ্রদানে অক্ষম জমিদারদের জগৎশেঠদের নিকট অর্থ প্রেরণ করতে নির্দেশ দেওয়া হত। রাজস্ব ও নবাবের অন্যান্য আয় জগৎশেঠের ব্যাঙ্কেই জমা হত। আবার প্রয়োজন হলে জমিদারদের রাজস্বপ্রদানের

জন্য এই ব্যাঙ্ক প্রচুর পরিমাণে ঋণ মঞ্জুর করত। রাজস্ব খাজাঞ্চি খানায় জমা হওয়ার পর তা পরীক্ষা ও নথিভুক্ত করে শ্রেণীবিভাগ ও পরিমাপ স্থির করার পর সিক্কা টাকায় পরিণত করার দায়িত্বও তাঁরা পালন করতেন। সোনা আমদানি অথবা রপ্তানির উপর আদায়ীকৃত বাট্টা তাঁদের একটি বিশেষ আয়ের পথ সুগম করে দেয়। ইউসুফ আলির বিবরণ থেকে জানা যায় যে, আর্থিক বছরের প্রারম্ভে (পুণ্যাহ) গত বছরের আদায়ীকৃত অর্থের অর্ধাংশ প্রায় দু সাত লক্ষ টাকা বড় বড় থলিতে করে এনে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হত। জমিদারদের নিকট বকেয়া কোন রাজস্ব থেকে গেলে জগৎশেঠ সেই অর্থ নবাব নাজিমের নিকট জমা দেওয়ার জন্য লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতেন। আদায়ীকৃত রাজস্বের এক দশমাংশ জগৎশেঠ পেতেন এবং বাকি অর্থ নবাবের প্রাপ্য ছিল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার ফলে জগৎশেঠদের এই ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়।

(৪) সিক্কা টাকার ব্যবসা ঃ

জগৎশেঠদের আর একটি ব্যবসা ছিল নগদ অর্থের। জগৎশেঠ পরিবারই একটি প্রথা চালু করে যে, একটি সিক্কা টাকার টাঁকশালে প্রস্তুত হওয়ার পর প্রথম বারো মাস সমান মূল্যমান বাজারে থাকবে। কিন্তু ১২ মাস পরে তার তু'শতাংশ মূল্য হ্রাস পাবে। পরবর্তী বারো মাসে আবার তু'শতাংশ মূল্য হ্রাস পাবে এবং যতদিন পর্যন্ত পুনরায় এই সিক্কা টাকা নতুন মুদ্রায় পরিণত না হয় ততদিন এই মূল্যই তার বর্তমান থাকবে। তবে ঢাকা, পাটনা এবং কলকাতা যে কোন টাঁকশালেই মুদ্রা প্রস্তুত হোক না কেন অবশ্যই তার বাট্টা দিতে হবে। ফলে টাকার এই ব্যবসা জগৎশেঠ পরিবারের আয়ের একটি প্রধান উৎসে পরিণত হয়। বিদেশী মুদ্রার বাট্টাও আয়ের আর একটি উৎস রূপে পরিগণিত হতে শুরু করে। ফলে মোগল সম্রাট ফারুখশিয়রের ফার্মান অনুযায়ী ইংরেজদের মুদ্রা নির্মাণের অধিকার জগৎশেঠদের বিরোধিতার জন্য নবাবের দরবারের সম্মতি লাভ করতে ব্যর্থ হয়। এমনকি পরবর্তীকালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা মীরজাফর এবং মীরকাশিমের নিকট থেকে ইংরেজ কোম্পানি কলকাতায় টাঁকশাল নির্মাণ করে মুদ্রা তৈরির অধিকার লাভ করলে ও শেঠ পরিবারের স্বার্থ বাধাদানে তাদের ইংরেজদের এই অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে।

(৫) মূল্যবান ধাতুপিণ্ডের উপর অধিকার ঃ

জগৎশেঠের ব্যাঙ্ক গোপনে সঞ্চিত টাকা গ্রহণের অধিকার লাভ করলে তাদের আয় আরও বৃদ্ধি পায়। কারণ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তার অভাবের জন্য অনেকেই মূল্যবান ধাতু দ্রব্য গোপনে মজুত করার ব্যবস্থা করত। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর মাণিকচাঁদ নবাবের টাঁকশালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। মাণিকচাঁদ ও তাঁর উত্তরাধিকারিগণ বিদেশী কোম্পানীর দ্বারা অন্য কোন ব্যক্তির কাছে

ধাতবপিণ্ড বিক্রয় করা খুব অপছন্দ করতেন। নবাবের কাছ থেকে তাঁরা এরূপ একটি নির্দেশ লাভ করতে সক্ষম হন যে, জগৎশেঠ ছাড়া আর কোন ব্যক্তি বা সংস্থা রৌপ্য পিণ্ড ক্রয় করতে অথবা ইংরেজদের তৈরি আর্কটের মুদ্রা ক্রয় করতে পারবেন না। জগৎশেঠ বংশের গৌরবময় যুগে বাংলাদেশের অন্যান্য সব ব্যাঙ্কের মালিকগণই হয় তাঁদের আত্মীয় অথবা তাদের অধীনস্থ ছিল। ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট রোজার ড্রেক বলেন যে, জগৎশেঠ পরিবার বাংলাদেশে আমদানিকৃত সকল রৌপ্যপিণ্ড ক্রয়ের অধিকার লাভ করে, ফলে অন্য কোন পক্ষ এই অঞ্চলে টাকশাল নির্মাণ করে তারা তা পছন্দ করতে পারে নি।

(৬) শেঠ পরিবারের সমৃদ্ধি ঃ

জগৎশেঠ পরিবার দিল্লী থেকে ঢাকার অন্তবর্তী উত্তর ভারতের সমস্ত বড় বড় শহরেই তাদের ব্যাঙ্কের শাখা স্থাপন করে। তাদের হুণ্ডির সুনাম এত বেশি ছিল যে, সিন্দুক-বোঝাই টাকা তাদের বিভিন্ন স্থানে পাঠাবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ওলন্দাজ বণিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ইয়োরোপীয় বাণিজ্য কুঠির বাইরে একমাত্র জগৎশেঠ পরিবারই চারটি প্রধান মশলার পাইকারী ব্যবসা করত। গোলাম হোসেনের বিবরণ থেকে জগৎশেঠদের মূলধনের পরিমাণ সম্পর্কে পরোক্ষ ইঙ্গিত পাওয়া যায়। মীর হাবিবের পরিচালনায় মারাঠা সৈন্যদল অকস্মাৎ মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। তারা জগৎশেঠদের কুঠি আক্রমণ করে দু'কোটি আর্কটের টাকা লুণ্ঠন করে। কিন্তু তারপরও যে কোন মুহূর্তে শেঠগণ নবাবকে এক কোটি টাকা দিতে পারত।

শুধুমাত্র টাকা লগ্নী করেই জগৎশেঠ পরিবার তাদের মূলধন বৃদ্ধি করে নি। তারা আধুনিক ব্যাঙ্কের অনেক দায়িত্বই পালন করত। মূলধন সঞ্চয় করে তারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিচালনা সংস্থার উন্নতির জন্য সাহায্য করতেন। তবে অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের কোন আদর্শ ছিল না। সিক্কা টাকার ব্যবসা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তারা আধুনিক যুগের ধনী সম্প্রদায়ের মতো লোভী ও নিষ্ঠুর ছিলেন। তবে শেঠদের ব্যবসায়ের পরিমাণ ও বিস্তৃতি আজও অনেকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে। শেঠদের পতনে অসংখ্য ব্যাঙ্ক বাজারে সবত্র গড়ে ওঠে। কিন্তু শুষ্ঠভাবে এই দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

৭ জগৎশেঠদের বিপর্যয় ঃ

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর শেঠদের পতন অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। সিরাজ-উদ্-দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গেই জগৎশেঠদের সমৃদ্ধি বিনষ্ট হতে শুরু করে এবং ভাগ্য বিপর্যয়ের একটির পর একটি আঘাতে জগৎশেঠ পরিবারের ধ্বংস সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। পলাশীর যুদ্ধের পর বৈদেশিক এবং অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে তাদের কাছ থেকে অর্থ ঋণ

করার কোন প্রয়োজন আর অবশিষ্ট ছিল না। ইংরেজদের ভাগ্য একদিনের মধ্যে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠতে শুরু করে। এমন কি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ইয়োরোপীয় অন্যান্য বণিকগণও তাদের নিকট থেকেই ঋণ গ্রহণ করার সুযোগ পায়। সম্ভবতঃ রবার্ট ক্লাইভ সামগ্রিকভাবে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁর প্রতি জগৎশেঠ পরিবারের বদান্যতার কথা বিস্মৃত হতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর পরে যাঁরা কোম্পানীর কর্ণধার হওয়ার সুযোগ পান শেঠ পরিবারের প্রতি তাঁদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কোন কারণ ছিল না। কোম্পানিকে ১৫ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে অস্বীকার করলে মিস্টার হলওয়েল জগৎশেঠদের ভীতি প্রদর্শন করতেও দ্বিধা বোধ করেন নি। জগৎশেঠ, কুশলচাঁদ নামেমাত্র কোম্পানী জামিনদার হলেও বাংলাদেশের রাজস্ব গ্রহণ করার কোন অধিকারই আর তাঁর ছিল না।

১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত হওয়ার পর জগৎশেঠ পরিবার কোম্পানীর নামেমাত্র জামিনদারের মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত হয়। ইতমধ্যে তাঁদের আয়ের সকল উৎসও বিনষ্ট হয়ে যায়। সিক্কা টাকার ব্যবসায়ও তাদের পরিবর্তে বিভিন্ন সরফদের হস্তগত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অন্তর্দেশীয় বিনিময় ও রাজস্ব গ্রহণের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র পরিচালিত জেনারেল ব্যাঙ্ক গঠিত হওয়ার পর কলকাতার বণিক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে হুজুরী মল ও দয়াল চাঁদকে এই ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখনও টাঁকশালে মুদ্রা তৈরির ব্যাপারে জগৎশেঠদের বিশেষ সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁদের আয়ের উৎস বন্ধ হলেও দেশীয় বণিকদের কাছে অর্থলগ্নীর ব্যাপারে তাঁদের সমকক্ষ কেউ তখনও গড়ে ওঠার সুযোগ পায়নি। অর্থ নৈতিক জগতে দেশীয় ব্যাঙ্কের গুরুত্ব তখন অনস্বীকার্য। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে চলা জগৎশেঠ পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ইতিমধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপর্বে মনোহর দাস দ্বারকা দাস নামে নতুন একটি সংস্থা ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করতে শুরু করে।

Q 13 How did Warren Hastings and Cornwallis deal with currency crisis ?

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা ঃ

১৭৫৭ থেকে ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুদ্রাসম্পর্কিত বিষয়ে প্রচণ্ড বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। মোগল আমলের ১৭৫ গ্রেণের ওজনের রূপোর সিক্কা টাকা প্রতি বছরে দু শতাংশ করে মূল্য হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে তৃতীয় বছরে 'সোনাত' বা বহু ব্যবহৃত পুরানো মুদ্রায় পরিণত হত, মুদ্রার ধাতুতে খাদ মিশাবার এই ছিল স্বাভাবিক রীতি কিন্তু নবাব স্বাভাবিক লাভের জন্য কখনও মুদ্রার ধাতুতে খাদ মিশাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে প্রতি তিন বছর অন্তর আবার পুরানো মুদ্রা গালিয়ে নতুন মুদ্রা তৈরি করার রীতি দীর্ঘদিন ধরেই প্রচলিত

ছিল। সিক্কা ও সোনাত এই দুই প্রকারের মুদ্রা ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত মুদ্রাও বাংলাদেশে ব্যবহৃত হত। আর্কট, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, সুরাট, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে নির্মিত মুদ্রাও বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল। তবে এই সকল মুদ্রার উপর বিভিন্ন হারে বাট্টা দিতে হত। কিন্তু বিভিন্ন মূল্যমানের নানা প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকার ফলে এবং বিভিন্ন মুদ্রার মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য নানারূপ অসুবিধা দেখা দিত। এই অসুবিধা দূর করার জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 'প্রচলিত মুদ্রানামে' একটি কাল্পনিক মুদ্রা কলকাতায় চালু করে। এই কাল্পনিক মুদ্রার মূল্যমান স্থির হয় সিক্কা টাকা $\frac{১০০}{১১৬}$ ভাগ। আর্কটের মুদ্রার মূল্যমান ছিল ১০৮ এবং সোনাতের মূল্যমান ১১১। আনুপাতিক মূল্য হ্রাস বুঝতে বাট্টা শব্দটি ব্যবহার করা হত। কিন্তু অনেক সময়ই কোন নির্দিষ্ট ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ না করে খামখেয়ালের উপরই এই বাট্টা স্থির করা হত। সাধারণতঃ মুদ্রার ধাতুর ওজন এবং তার সূক্ষ্ম কারুকার্যের উপর নির্ভর করে এই বাট্টা স্থির করা হত। ফলে মুদ্রাজগতে নানাপ্রকার অসুবিধার সৃষ্টি হত এবং ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা দিত। প্রকৃত সমস্যা ছিল মুদ্রার ধাতুর ওজন ও তার সূক্ষ্ম কারুকার্যের উপর নির্ভর করে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রার আনুপাতিক মূল্য নির্ধারণ করা।

(২) হেস্টিংসের প্রচেষ্টা ঃ

বাংলা বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীলাভের পর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ মুদ্রা জগতের এই বিশৃঙ্খলা ও সমস্যার সমাধানের জন্য যত্নশীল হয়। ১৭৬৬ এবং ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বি ধাতু মুদ্রা পদ্ধতি (bimetallism) প্রচলন করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি সফল লাভ করে নি। তার মূল কারণ ছিল অযৌক্তিকভাবে স্বর্ণ নির্মিত মুদ্রার মূল্য নির্ধারণ। ফলে মুদ্রা সম্পর্কে গ্রেশাম-এর সূত্র অনুসৃত হতে থাকে এবং স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করার জন্য জনসাধারণ ব্যগ্র হয়ে ওঠে। সুতরাং মুদ্রা জগতে আবার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ফলে ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর এই সমস্যা সমাধান করার জন্য সোনাত এর উপর থেকে বাট্টা তুলে দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব করে। কিন্তু তখন এই প্রস্তাব কার্যকরী করা সম্ভব হয় নি। কিন্তু মুদ্রা সঙ্কট আরও জটিল আকার ধারণ করলে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর নতুন আবার এই প্রস্তাবটি পেশ করে।

ওয়ারেন হেস্টিংস একটি সহজ পন্থায় এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করেন। তাঁর এই পন্থা ছিল মুদ্রা নির্মাণের জন্য মাত্র একটি নির্দিষ্ট টাঁকশাল স্থির করা এবং প্রতি বছরে স্বতন্ত্র ধরনের মুদ্রা নির্মাণ করা। তাঁর এই ব্যবস্থা কার্যকরী করার জন্য মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকার টাঁকশাল বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং একমাত্র কলকাতার টাঁকশালকে সিক্কা টাকা নির্মাণের একমাত্র কেন্দ্রে পরিণত করা হয়। প্রত্যেক মুদ্রায় একই তারিখ ব্যবহার করা হত, যেমন সম্রাট শাহ আলমের রাজত্বকালের উনবিংশতিতম বছরে নির্মিত সকল মুদ্রায় লিখিত হল, 'সম্রাট শাহ আলমের উনবিংশতিতম রাজত্বের বছরে'। তবে

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি মুদ্রায় হিজরা সনেরও উল্লেখ করা হত। ফলে শাহ আলমের 'রাজত্ব বছর' মুদ্রাঙ্কিত করা সম্পূর্ণভাবে মূল্যহীন হয়ে পড়ত। কিন্তু সিক্কা টাকার ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেস্টিংসের এই নীতি সাফল্য অর্জন করে নি। একই ধরনের মুদ্রা প্রচলনের চেষ্টা সফল হয় নি, বরং তাঁর এই নীতি মুদ্রা জগতের বিশৃঙ্খলাকে আরও জটিলতর করে তোলে। মুদ্রা জগতের এই বিশৃঙ্খলার সম্পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে সরফগণ। কারণ ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনা এই তিনটি টাঁকশাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সিক্কা টাকার ও বিভিন্ন ধরনের মুদ্রার অভাব দেখা দিতে শুরু করে এবং সরফগণ জমিদার ও রাজস্ব আদায়কারীদের কাছে বর্ধিত মূল্যে সিক্কা টাকা বিক্রয় করতে ব্যবস্থা করে। অপরদিকে ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য আর্থিক বিনিময়ের কার্যকলাপ অব্যাহত রাখার জন্য বিভিন্ন জেলা ও বিভিন্ন অঞ্চলে নানা প্রকার মুদ্রা ব্যবহৃত হতে থাকে। কোন কোন অঞ্চলে সোনাত ও আর্কটের মুদ্রা অবাধে প্রচলিত ছিল। সুতরাং এই অসুবিধা দূর করার উদ্দেশ্যে সরকার পুনরায় মুদ্রার উপর বাট্টা ব্যবস্থা প্রচলন করতে বাধ্য হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বাট্টা ব্যবহার পুনরায় প্রবর্তনের ফলে মুদ্রা জগতের বিশৃঙ্খলাকে আইনতঃ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, ঢাকার কলেক্টর এই অঞ্চলে প্রচলিত ৩৬ প্রকার মুদ্রাকে ১১টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। হেস্টিংসের মুদ্রা সংস্কারের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয় এবং দেশের আর্থিক সঙ্কটকে আরও বৃদ্ধি করে।

(৩) কর্ণওয়ালিসের প্রচেষ্টা ঃ

প্রকৃতপক্ষে সকল শ্রেণীর মুদ্রার পুনর্বিন্যাস করাই ছিল এই আর্থিক সঙ্কট দূর করার একমাত্র উপায়। কিন্তু এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ ছিল বলে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর তা গ্রহণ করতে সম্মত হয়নি। ১৭৮৯-১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস এই আর্থিক সমস্যা দূর করার জন্য দুটি উপায় গ্রহণ করেন। (১) মুর্শিদাবাদ, পাটনা এবং ঢাকার টাঁকশালে পুনরায় মুদ্রা নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয় (২) একটি টাঁকশালের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধান করার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করা। এই কমিটি পূর্ব প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রা এবং সকল শ্রেণীর স্বল্প মূল্যের মুদ্রা টাঁকশালে সঞ্চিত করার এবং একমাত্র সিক্কা টাকাকেই বৈধ মুদ্রারূপে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অনুমোদন করে। সরকারী সমস্ত প্রকার আদান-প্রদান এই সিক্কা টাকার মাধ্যমে বাধ্যতামূলকভাবে পরিচালিত করার জন্যও এই কমিটি নির্দেশ দেয়। মুদ্রা জাল করা অথবা তার মান হ্রাস করার চেষ্টা আইনতঃ শাস্তিযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। কোম্পানীর পক্ষ থেকে এরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হলে সরফগণ আর্থিক জগতের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে অসমর্থ হয়। এই সময় থেকেই পূর্বেকার প্রচলিত মুদ্রারও অবসান ঘটে।

(৪) স্বর্ণমুদ্রা ঃ

রৌপ্যপিণ্ডের সংকটের জন্যই ১৭৬৬ ও ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু পরীক্ষামূলক এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। স্বর্ণ মুদ্রার অযৌক্তিকভাবে

বর্দ্ধিত মূল্য নির্ধারণই ছিল এই ব্যর্থতার মূল কারণ। তাছাড়া স্বর্ণনির্মিত মোহর এবং রৌপ্য নির্মিত সিক্কা টাকার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ও বিজ্ঞান সম্মত আনুপাতিক মূল্যও স্থির করা সম্ভবপর হয় নি। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণমুদ্রা নির্মাণ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করা হয়। দ্বি-ধাতুমান পদ্ধতি ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস চালু করেন এবং একটি মোহর এর মূল্যমান ১৬টি সিক্কা টাকার সমান বলে স্থির করা হয়। কিন্তু অল্পদিন পরেই বুঝতে পারা গেল যে, মোহর এমনকি খুব ক্ষুদ্র আকারের স্বর্ণমুদ্রাও বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই। শহরাঞ্চলে মোহর ও সিক্কা টাকার প্রচলন থাকলেও গ্রামাঞ্চলে রৌপ্য মুদ্রা ও কড়ির প্রচলনই ছিল বেশি। হেস্টিংস তাম্রনির্মিত মুদ্রা ও অন্যান্য শ্রেণীর মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। এই মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার পর কড়ির ব্যবহার ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

(৫) উপসংহার ঃ

পলাশীর যুদ্ধের পর বিদেশ থেকে ভারতে রৌপ্যপিণ্ড আমদানি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেলেও প্রকৃতপক্ষে ভারতে রৌপ্যের কোন অভাব ছিল না। অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য এবং দৈনন্দিন কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় মুদ্রা নির্মাণের রৌপ্যের সংকটের কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ ছিল না। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রচলিত রৌপ্য মুদ্রার আনুপাতিক মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা এবং নতুন গড়ে ওঠা সকল শ্রেণীর স্বার্থপরতা ও অর্থলোলুপতা একটি কৃত্রিম অর্থ সংকটের এবং রৌপ্য সংকটের সৃষ্টি করে। অপরদিকে ব্রিটিশ সরকারের সুষ্ঠু আর্থিক নীতির অভাবও এই সংকটের জন্য অনেকাংশে দায়ী। তাছাড়া, ভারতের রৌপ্যপিণ্ডের সাহায্যে সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য পরিচালনার নীতির ফলে মাঝে মাঝে রৌপ্যপিণ্ডের অভাব দেখা দিত। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আর্থিক জগতের এই সংকটের মূল কারণ ছিল ব্রিটিশ সরকারের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

Q. 14. Sketch the history of Bengal Silk trade in the 18th century.

উত্তর ঃ (১) প্রাক পলাশী যুগ ঃ

ইংরেজদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার একশ বছর পূর্বে বাংলাদেশে ভারতের রেশম শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হত। বাংলাদেশের উৎপন্ন রেশম শিল্পজাতদ্রব্য শুধুমাত্র মোগল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানেই বিক্রি হতনা, ইয়োরোপ এবং অন্যান্য রাজ্যেও এই সব দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা ছিল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে রাজনৈতিক অরাজকতা, মোগল সাম্রাজ্যের পতন, ভারতের

পশ্চিম উপকূলে চীনের সস্তা রেশমের আমদানি এবং অন্যান্য কারণে বাংলার রেশম শিল্প নানারূপ অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ফলে তাদের বাজারও ধীরে ধীরে সংকীর্ণ হয়ে পড়তে শুরু করে। তাছাড়া বর্গীদের নৃসংশ আক্রমণের ফলেও বাংলার পশ্চিম সীমান্তের বিভিন্ন স্থানের রেশম শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু মোগল যুগের বিলাসিতার ঐতিহ্য তখন ভারতের অভিজাত মুসলিম পরিবারের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল এবং বাংলার রেশম শিল্প তাদের নিকট খুবই সমাদরের বস্তু বলে পরিগণিত হত। সুতরাং নানাপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রেশম শিল্প নিজেদের অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার সুযোগ পায়। এই রেশম শিল্পের সবভারতীয় বাজার তখনও বন্ধ হয়ে যায় নি। নবাব আলিবর্দীর রাজত্বকালে মুর্শিদাবাদের শুল্ক বিভাগের নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, কমপক্ষে ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি বাদেও সত্তর লক্ষ টাকার কাঁচা রেশম বাংলাদেশ থেকে অন্যান্য দেশে রপ্তানি করা হত।

(২) রেশম শিল্পে সংকটের যুগ ঃ

পলাশীর যুদ্ধের পরই বাংলাদেশের রেশম শিল্পের উপর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আঘাত শুরু হয়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর কর্মচারিগণ তাদের এজেন্ট ও গোমস্তাদের সাহায্যে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে যে ভারতের অন্যান্য স্থানের বণিকদের পক্ষে তখন আর রেশম শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করার জন্য বাংলাদেশে প্রবেশ করার সুযোগ ছিল না। বাংলাদেশের অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যে কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের বাণিজ্যিক প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার রূপান্তর ঘটে এবং এই পরিবর্তনের ফলে রেশম শিল্পের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। ইতি মধ্যে উত্তর ভারতের রাজনীতিতেও বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। মোগলদের বিলাসপূর্ণ জীবনযাপনের রীতি পরিবর্তিত হয়ে নবজাগ্রত মারাঠা শক্তি কৃচ্ছ্রসাধন অভিজাতবর্গের জীবনের আদর্শরূপে গৃহীত হয়। ফলে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করে। বাংলাদেশের রাজনীতিতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপন এবং ভারতের এক বিরাট অংশে মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থানের ফলে বাংলার রেশম শিল্প দারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট বন্দরে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত কাঁচা রেশম ও রেশমজাত অন্যান্য দ্রব্যের মোট মূল্য ছিল আড়াই লক্ষ টাকা। কিন্তু ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সুরাট বন্দরে বাংলাদেশ থেকে আমদানিকৃত রেশম ও রেশমজাত দ্রব্যের মোট মূল্য ছিল মাত্র তিন হাজার একশ টাকা। বিশেষতঃ রেশম শিল্পে লগ্নীকৃত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্য এত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যে ভারতের পশ্চিম উপকূলের বন্দর সমূহে এই শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি দ্রুত হ্রাস

পায়। ভারতের পশ্চিমে উপকূলের বিভিন্ন বাণিজ্য বন্দরে বাংলাদেশের রেশম শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদার হ্রাসের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন সাধিত হয়। কলকাতার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের পরিবর্তে দূর প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই সময় থেকেই জাপানে ও মালাক্কায় বাংলাদেশের রেশম শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি হতে শুরু করে। তবে রেশম শিল্পের প্রধান বাজার ছিল ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চল; বিশেষতঃ নেদারল্যাণ্ডে বিভিন্ন শ্রেণীর রেশম শিল্পের চাহিদা ছিল খুবই বেশি। ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দে বিদেয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর ওলন্দাজ বণিকদের সঙ্গে ইংরেজদের একটি আপস-নিষ্পত্তি হয় এবং পরবর্তীকালে ওলন্দাজদের বাণিজ্য, বিশেষতঃ রেশম শিল্পের বাণিজ্য দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত ওলন্দাজদের এই বাণিজ্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই যুদ্ধে হল্যাণ্ড আমেরিকার অধিবাসীদের পক্ষ গ্রহণ করার পর ইংরেজদের সঙ্গে তাদের মনোমালিন্য শুরু হয় এবং বাংলাদেশের বাণিজ্যের উপর তার প্রভাব বিস্তৃত হয়। চন্দননগরের পতন এবং পলাশীর যুদ্ধের পরও বাংলাদেশের কোন কোন স্থানে ফরাসীদের বাণিজ্যকুঠির অস্তিত্ব বজায় ছিল। এইসব বাণিজ্যকুঠির সাহায্যে ফরাসীরাও বাংলাদেশের রেশমজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করার সুযোগ পেত। ফরাসীদের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য তারা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টর-এর সঙ্গে একটি আপস নিষ্পত্তির চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের এই চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হয় নি।

(৩) রেশম শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল কাশিমবাজার, বউলিয়া, জঙ্গীপুর, কুমারখালি, মালদা, রাধানগর, রঙ্গপুর ও রাঙামাটি। কাশিমবাজারের গুজরাটি ও আর্মেনিয়ান বণিকগণ সুরাট, বোম্বাই, নাগপুর, বেনারস প্রভৃতি স্থানে রেশমজাত দ্রব্য প্রেরণ করত। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত সদানন্দ বন্দোপাধ্যায়ের বিবরণীতে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এই বিবরণী অনুসারে জানা যায় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পর থেকেই রেশম শিল্পের অবক্ষয় শুরু হয় এবং এই শিল্পের ধ্বংসও যে আসন্ন তাও স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। শিল্পের মানেও দ্রুত অবনতি দেখা দিতে শুরু করে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও উত্তম শ্রেণীর কাঁচামাল সংগ্রহে অসুবিধাই-ছিল এই শিল্পের মানের অবনতির মূল কারণ। উত্তম মানের রেশমের অভাবের জন্য কারিগরগণ বিভিন্ন শ্রেণীর রেশম ব্যবহার করতে শুরু করে এবং ফলে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের বিশুদ্ধতা ও সুনাম বিনষ্ট হয়।

(৪) ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে সুতী বস্ত্রশিল্পের মতো রেশম শিল্পেও অর্থ বিনিয়োগ করার প্রচণ্ড প্রবণতা দেখা দেয়। বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের সদস্যগণ যদিও

অর্থ বিনিয়োগ করে রেশম শিল্পজাত দ্রব্যের উপর ইংরেজদের পরোক্ষ প্রভাব বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারিগণ এই অর্থ বিনিয়োগের শর্ত বাধ্যতামূলক করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে শুরু করে। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে মন্বন্তরের পর চাষী, কারিগর ও কাঁচা রেশমের প্রচণ্ড অভাব দেখা দিলে মিস্টার উয়িস্ ইয়োরোপীয় বিনিয়োগ প্রথার অনুকরণে রেশম শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার প্রস্তাব করেন। এই সময় বাংলাদেশের রেশম শিল্পের স্বার্থেই কোম্পানী কয়েকটি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করে। এই ব্যবসা থেকে ব্যাপক দুর্নীতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে সমবেত চুক্তি সম্পাদন প্রথা, ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপ প্রভৃতি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়।

১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাঁচা রেশমের জন্য অর্থবিনিয়োগ করা মোটামুটি লাভজনক ব্যবসা বলে পরিগণিত হত। পরবর্তী কয়েক বছরে ইংলণ্ডে রেশমের বস্ত্র তৈরি করার জন্য কাঁচা রেশম সংগ্রহ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে চিহ্নিত হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া দুটি উদ্দেশ্যে এই কাঁচা রেশম রপ্তানির দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়, (১) রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থের উদ্বৃত্ত অংশ প্রেরণের সুবিধা এবং (২) ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষার জন্য ইংলণ্ডের জনগণের সমর্থন লাভ করা। বাংলাদেশের রেশমের একটি বিচ্যুতি দূর করে ইয়োরোপের জলবায়ুতে তা থেকে উচ্চ শ্রেণীর পণ্যদ্রব্য তৈরি করার জন্যও কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করে। কিন্তু রেশমের গুণাগুণ বৃদ্ধি করার ফলে তার উৎপাদন ব্যয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ফলে কোম্পানীর পক্ষ থেকে কাঁচা রেশম স্বদেশে প্রেরণের ব্যবস্থা প্রচুর পরিমাণে আর্থিক ক্ষতির কারণ রূপে দেখা দেয়। সুতরাং বাধ্য হয়ে কোম্পানী রেশম শিল্পের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে এই ব্যবসা পুনরায় ইংরেজ বণিকদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে পরিণত হয়। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কাঁচা রেশম রপ্তানির দায়িত্ব আবার গ্রহণ করে, কিন্তু এবারের সাফল্যও ছিল খুবই সীমাবদ্ধ।

(৫) রেশম শিল্পের অবনতির কারণ :

বাংলাদেশের রেশম শিল্পের ক্রমশঃ অবনতির প্রধান কারণ ইংলণ্ডের বয়নশিল্পের প্রসার ও জনপ্রিয়তা, ফরাসী বিপ্লবের প্রভাব এবং কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উপর হস্তক্ষেপের ফলেই কোম্পানীর তরফ থেকে কাঁচা রেশমের একচেটিয়া ব্যবসা করার প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। এমনকি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় (১৭৭৬-১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দ) কোম্পানী তার কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি করতে সম্মত হলেও অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

মিস্টার বোল্টের বিবরণ থেকে জানা যায় যে নগদ অর্থ বিনিময় করে রেশম শিল্পের কারিগরদের উপর কোম্পানীর কর্মচারীরা নানাপ্রকার নির্যাতন করে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করত। শারীরিক নির্যাতন করতেও তাদের কোন আপত্তি ছিল না।

ফলে অনেক সময় নিজেদের বৃদ্ধাঙ্গুলি স্বেচ্ছায় কর্তন করে কারিগরগণ রেশম শিল্পের কাজে অনুপযুক্ত হয়ে ইংরেজদের অত্যাচারের হাত থেকে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করত। এই কারিগরগণ ছিল ভীরু প্রকৃতির, নতুন কোন উদ্ভাবন করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এমনকি রেশমের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তুঁত গাছের চাষ বৃদ্ধি করারও কোন চেষ্টা করে নি। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের রেশম শিল্পের উৎপাদন, সংগঠন, মূলধন-সংগ্রহ ও রাজার নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে যে সব মৌলিক ত্রুটি ছিল তার ফলেই এই শিল্পের পক্ষে দীর্ঘদিন পর্যন্ত নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অথবা ক্রমশঃ উন্নতি করা সম্ভব ছিল না।

Q. 15 Sketch the condition of the cotton weavers of Bengal in the second half of the 18th century.

উত্তর : (১) ভূমিকা :

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সুতীবস্ত্রের উৎপাদন ও বিদেশে রপ্তানি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করত। তবে মোগল আমলের বৃহৎ বৃহৎ কারখানার কথা পরবর্তীযুগে খুব কমই শুনতে পাওয়া যায়। অথবা ইয়োরোপীয় বণিকগণ সুতীবস্ত্রের প্রধান ক্রেতা হলেও তাদের উপনিবেশ সমূহে বস্ত্রশিল্পের কারিগরদের ভীড় কখনও জমে ওঠে নি এবং তারা সেই সব স্থানে নতুন কারখানা স্থাপন করারও কোন চেষ্টা করে নি। তবে মারাঠা আক্রমণের সময় বিশেষভাবে বাংলাদেশে বর্গীর হাঙ্গামার ফলে বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চলের সুতীবস্ত্রের শিল্পীগণ উত্তরবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উত্তরবঙ্গে তাদের আশ্রয় গ্রহণের পর সেখানে অনেক তাঁতশিল্পের কেন্দ্র গড়ে ওঠে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে কোথায় কোথায় বয়নশিল্প প্রতিষ্ঠিত হলেও মূলতঃ এই শিল্প ছিল কুটিরশিল্প এবং বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই এই শিল্পের কারখানা দেখতে পাওয়া যেত।

(২) পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলাদেশের বয়ন শিল্প :

পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই ১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের বিনিয়োগ পরিবর্তন করতে শুরু করে। ফলে দাদনি ব্যবসায়ীরা বাজার থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কোম্পানীর এজেন্টগণ নানা অত্যাচার করে তাঁতীদের কাছ থেকে বেশি পরিমাণ বস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করে। কারণ, তাঁতীদের স্বাধীনভাবে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষমতা ছিল না। এমন কি অন্যান্য ইয়োরোপীয় বণিকগণ ইংরেজদের তুলনায় ২০ বা ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকলেও তাঁতীদের পক্ষে তাদের কাছে বিক্রয় করা সম্ভব হত না। ফলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাজ করতে অথবা তাদের প্রয়োজনমত পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে তাঁতীদের কোন আগ্রহই ছিল না। এরূপ অবস্থায় কোম্পানীর গোমস্তাগণ জোর করে তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার

চেষ্টা করত। গোমস্তাদের অত্যাচারের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য অনেক তাঁতীই তাদের তাঁত যন্ত্র ও কারখানা ফেলে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করত। মিস্টার বোল্টের বর্ণনায়ও তাঁতীদের দুর্দশার পরিচয় পাওয়া যায়। কোম্পানী যে জোর করে অল্পদামে তাঁতের পণ্যদ্রব্য ইংরেজদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য করত মিস্টার বোল্ট তা স্বীকার করতে আপত্তি করেন নি। তিনি বলেন যে, "The company's goods are in all places 15 p.c. and in some over 40 p.c. less than the goods manufactured would sell in the open bazar." বোর্ড অফ ডাইরেক্টর-এর সদস্যবৃন্দ কোম্পানীর গোমস্তাদের অত্যাচারের কাহিনী জানতেন; তাঁদের চিঠিপত্রেও তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের পলাশীর যুদ্ধের পর তাঁতীদের উপর গোমস্তাদের অত্যাচার ক্রমশঃই বৃদ্ধি পেতে থাকে। উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সাহায্য পাওয়ার ফলে তাদের অত্যাচার মাত্রাহীন হয়ে পড়ে। বে-আইনীভাবে পণ্যদ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় এবং অন্যায়ভাবে গোমস্তাদের বিভিন্নভাবে অর্থ আদায়ের ফলে তাদের দুঃখ দুর্দশার আর অন্ত ছিল না। বিশেষতঃ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে মন্বন্তরের ফলে তাঁত শিল্প সর্বাপেক্ষা ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। মন্বন্তরের কৃষক ও তাঁতী ও কারিগরদের মৃত্যুর ফলে সামগ্রিকভাবেই বয়ন শিল্প ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়ে। বয়ন শিল্পের এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখে কোম্পানীর ডাইরেক্টরগণ চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং তাঁরা এই শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য একটি সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করেন। ১৭৭১ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর তাঁতী ও বয়ন শিল্পের সহিত জড়িত সকলকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে রাজি হন। কিন্তু ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংসের পরামর্শে বয়ন শিল্পের প্রতিটি পর্যায়ে কারিগরদের স্বাধীনতা দান করা হয়।

যদিও আইনতঃ তাঁতীরা ব্যবসায়িক স্বাধীনতা লাভ করে তথাপি তারা বাস্তবে কোম্পানীর কর্মচারীদের নির্দেশ অনুসারেই কাজ করতে বাধ্য ছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে সুতীবস্ত্রের ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার চেষ্টা করত এবং এমনকি কাঁচা রেশমের ব্যবসা তাদের যথেষ্টভাবে আকর্ষণ করত। কোম্পানীর বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের সদস্যগণ কিছুদিন পরে জানতে পারলেন যে কোম্পানীর কর্মচারীরা উৎকৃষ্ট ধরনের সুতীবস্ত্র নিজেদের ব্যবসার জন্য রেখে নিম্ন গুণবিশিষ্ট এবং অনেক ক্ষেত্রে বাতিল পণ্যদ্রব্য কোম্পানীর জন্য ক্রয় করত।

(৩) কর্ণওয়ালিসের আমলের পরিবর্তন ঃ

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে সুতীবস্ত্র সংগ্রহের জন্য ঠিকাদার প্রথা প্রবর্তিত হয়। কয়েকজন ভারতীয় ঠিকাদারও বস্ত্র সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়। কিন্তু অল্পদিন পরেই লর্ড কর্ণওয়ালিশ আবার ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এজেন্সি প্রথা চালু করেন। এই সময়ের বিভিন্ন নথিপত্র এবং কোম্পানীর নির্দেশনামা থাকে জানা যায় যে, ভারতীয়

ব্রিটিশ সরকারের সক্রিয় সহোযোগিতা ব্যতীত এই ব্যবসা পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে বলা যায় কোম্পানীর নির্দিষ্ট দর তাঁতীদের নিকট আদৌ লোভনীয় ছিল না তাছাড়া দালালরাই তাঁতীদের লাভের একটি বিরাট অংশ আত্মসাৎ করত।

তবে কর্ণওয়ালিসের চেষ্টায় ব্রিটিশ সরকারের কর্মচারীদের দুর্নীতি অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। এমনকি কেবলমাত্র বাণিজ্যে লিপ্ত কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতিও তিনি যথেষ্ট পরিমাণে সংহত করতে সমর্থ হন। এজেন্টদের কার্যকলাপের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য তিনি কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন। ফলে তাঁতীদের স্বার্থরক্ষার কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু ভারতীয় এজেন্ট ও দালালরা তাদের কর্মপদ্ধতির বিশেষ কোন পরিবর্তন না করায় তাঁতীদের প্রকৃত অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা খুব কমই ছিল। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেক তাঁতীই তার কারখানা রেজেস্ট্রী করতে বাধ্য ছিল। এই বাধ্যতামূলক নির্দেশও তাঁতীদের মনে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা কোম্পানীর নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়।

(৪) শেষ পরিণতি :

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই বাংলাদেশের বস্ত্র ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। ইতিমধ্যে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধের অবসান ঘটে এবং ফরাসী বাণিজ্য কুঠিগুলো পুনরায় ব্যবসা করতে শুরু করে। ইয়োরোপেও বাংলাদেশের বস্ত্রের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায়। ইয়োরোপের সাধারণ ব্যবসায়ীরাও এই সুতীবস্ত্রের জন্য অনেক বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই বাংলাদেশের সুতীবস্ত্রের ব্যবসা বিশেষ সংকটের সম্মুখীন হয়। বাইরের জগতের আকস্মিক পরিবর্তনের কোন সংবাদই তারা জানত না এবং তখনও তারা নিজেদের তৈরি সুতীবস্ত্রের উচ্চমান সম্পর্কে গর্ববোধ করত। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যেই ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ভারতের উপরও ছায়াপাত করতে শুরু করে এবং ইংলণ্ডে তৈরি বস্ত্র অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের বাজার ছেয়ে ফেলে। আমদানি করে এই বস্ত্র পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের কুটির শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করতে সমর্থ হয়। বাংলাদেশের তাঁতীদের তৈরি মাকড়সার জালের মতো মসৃণ বিশ্ববিখ্যাত মসলিন চিরদিনের জন্য পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে।

(৫) তাঁতীদের আর্থিক অবস্থা :

তাঁত শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম পর্বের বস্তু ছিল। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরদের সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক অবস্থা

কোন ক্রমেই উন্নত মানের ছিল না। প্রকৃত পক্ষে তারা শিল্পীর সম্মান ও আর্থিক সঙ্গতি কিছুই লাভ করতে সমর্থ হয় নি। ডক্টর ডি. বি. মিত্রের তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা চলে যে, বস্ত্র শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগরগণ অতি কায়ক্লেশে দিন যাপন করতে বাধ্য হত। বাংলাদেশে কোম্পানির কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পূর্বে তাঁতীদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাদের সম্বন্ধে যেটুকু তথ্য জানা যায় তা থেকে নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, তাঁতীরা কোন ক্রমেই অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ছিল না। বড় বড় মহাজনদের অনুগ্রহের উপর তাদের নির্ভর করতে হত। কোম্পানীর আমলেও তাদের কোন বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। ডক্টর সুশীল চৌধুরীর মতে, "From various reference in the records of the company it appears that the lot of the poor Weavers' remained the same despite the increase in production and consumption among the buyers." 'Weavers cannot subsist or lie long idle' অথবা 'Weavers live from hand to mouth 'অথবা' such needy generation as the Weavers are'—কোম্পানীর এইসব মন্তব্যগুলো তাঁতীদের আর্থিক অবস্থার উপর যথেষ্ট আলোকপাত করে। ডক্টর চৌধুরীর মতে তাঁতীদের দুর্দশার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল দালাল ব্যবস্থা। ডক্টর মিত্রও মনে করেন যে, কোম্পানীর কর্মচারী এজেন্ট এবং গোমস্তা ও দালালদের অত্যাচারে তাদের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। তাছাড়া তাদের লাভের একটি বিরাট অংশই এইসব ব্যক্তিদের ভোগে নিয়োজিত হত। তাঁতীদের স্বার্থরক্ষার জন্য পরবর্তীকালে ব্রিটিশ সরকার কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা ছিল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বিদেশী বস্ত্রের আমদানির ফলে বাংলাদেশের বস্ত্রশিল্পের ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠলেও ব্রিটিশ সরকার এই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে অথবা কারিগরদের স্বার্থরক্ষার জন্য কোন চেষ্টাই করে নি।

(৬) উপসংহার ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের সমৃদ্ধির মূল কারণ ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর কুটির শিল্প, কৃষিকার্য নয়। এই সব কুটির শিল্পের প্রধান ছিল সুতীবস্ত্র এবং রেশম বস্ত্র। সুতীবস্ত্র রেশম বস্ত্র তৈরির ব্যবস্থা ধ্বংস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জমির উপর অতিরিক্ত চাপ পড়তে শুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সমসাময়িককালেই এইসব কুটির শিল্প ধ্বংসানুখ হয়ে পড়ে। তাঁতীদের মধ্যে আবার অনেকেই ছিল কৃষিজীবী। তাঁতশিল্প ধ্বংস হওয়ার পর তারা সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর নির্ভর করতে শুরু করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ও চাষীদের মধ্যে নতুন সম্পর্ক স্থাপিত হলে স্বাধীন কৃষকগণের অনেকেই আইনতঃ ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করে ব্রিটিশ সরকার এদেশে সামাজিক ক্ষেত্রে একটি সুদূর প্রসারী পরিবর্তন আনয়নের পথ প্রস্তুত করে।

Q. 16. Sketch the history of the Bengal Salt Trade in the 18th century.

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের বিভিন্ন স্থানে প্রচুর পরিমাণে লবণ প্রস্তুত করা হত। লবণ উৎপাদনের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ছিল বালেশ্বর, চট্টগ্রাম, মেদিনীপুরের হিজলি ও তমলুক, চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন স্থান এবং নোয়াখালি। গড়ে সাধারণতঃ প্রতি বছর আঠাশ লক্ষ মণ লবণ প্রস্তুত হত। নবাব আলিবর্দির আমলে প্রতি একশ মণ লবণের মূল্য ছিল চল্লিশ থেকে ষাট টাকা। নবাবী আমলে লবণ উৎপাদন রাজস্ব আদায়ের জন্য সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত এবং নবাব সাধারণতঃ নিজের পছন্দমত ব্যক্তিদের হাতে লবণের ব্যবসা তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেন। এইসব ব্যক্তিরা আবার তাদের অনুগত ব্যক্তিদের লবণের ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার প্রদান করতেন এবং তারা সাধারণতঃ নীলামের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের হাতে লবণের সংগ্রহ ও সরবরাহের দায়িত্ব অর্পণ করতেন। কিন্তু এইসব ব্যবসায়ীদের পক্ষে লবণের ব্যবসা একচেটিয়া করা কখনও সম্ভব হত না, কারণ বিশাল সমুদ্রতটে সুষ্ঠু সতর্ক প্রহরীর বন্দোবস্ত করা কখনই সম্ভব ছিল না। ফলে চোরা কারবারীরা গোপনে লবণ সংগ্রহ ও বিক্রি করার সুযোগ করে নিত। তবে পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে ইয়োরোপীয় বণিকদের কখনও লবণের ব্যবসায় লিপ্ত হতে দেওয়া হত না। পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীযুগে কোম্পানীর কর্মচারিগণ বিনা শুল্কে অথবা নির্দিষ্ট ও সামান্য পরিমাণ একচেটিয়া শুল্ক দিয়ে লবণের ব্যবসা করার সুযোগ পেতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। কোম্পানীর কর্মচারীরূপেই তারা অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের এই সুযোগ দাবি করে এবং মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের অন্যতম প্রধান কারণই ছিল বিনা শুল্কে অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের উপর কোম্পানীর কর্মচারীদের অবাধ অধিকার স্থাপনের প্রচেষ্টা। মীরকাশিমের পতনের পর মীরজাফর পুনরায় বাংলাদেশের সিংহাসন অধিকার করার পর দেশীয় বণিকদের উপর অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য শুল্ক পুনঃস্থাপিত হয়। কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ যথারীতি আড়াই শতাংশ শুল্ক দিয়ে লবণের ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ পায়।

(২) ক্লাইভের পদ্ধতি ঃ

রবার্ট ক্লাইভের নির্দেশ অনুযায়ী ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে সাধারণ ইংরেজ ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি বণিক সমিতি গঠিত হয় এবং এই সমিতি কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সুবিধার জন্য লবণ সহ অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে ব্যবসা করার সুযোগ লাভ করে। এই সমিতি ভারতীয় ঠিকাদারদের কাছ থেকে লবণ ক্রয় করত এবং ভারতীয় ঠিকাদারগণ লবণের প্রকৃত উৎপাদকদের নিকট অগ্রিম অর্থ প্রদান করে লবণের সরবরাহ সুনিশ্চিত করে তোলার ব্যবস্থা করত। ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজ বণিক সমিতি ভারতীয় ব্যবসায়ীদের

নিকট কোম্পানীর পঞ্চাশ শতাংশ শুল্ক সহ প্রতি দু'শমণ লবণ একশ টাকায় বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতীয় বণিকগণ অতিরিক্ত অন্যকোন শুল্ক ছাড়াই এই লবণ দেশের সর্বত্র সরবরাহ করার অধিকার লাভ করে।

ইংরেজ বণিক সমিতি স্থাপিত হওয়ার পর লবণ উৎপাদন, সরবরাহ এবং বন্টনের ব্যাপারে পূর্বেকার ব্যবস্থার তুলনায় অনেক উন্নতি লাভ করে। লবণের মূল্যের ব্যাপারেও একটি স্থিতিস্থাপকতা আসে, যদিও পূর্বের তুলনায় এই সময় লবণের মূল্য অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বোর্ড অফ ডাইরেক্টরের সদস্যবৃন্দ জীবনধারণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় একটি পণ্যদ্রব্যের দুর্নীতিপূর্ণ এইরূপ একচেটিয়া ব্যবসায়ের বিপক্ষে ছিল। ফলে তাদের অনমনীয় মনোভাব এবং প্রচণ্ড বিরোধিতার জন্য ১৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে এই সমিতি ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু সমিতির কাছে পূর্বেকার মজুত ভাণ্ডারের বিক্রি করার নাম করে বহুদিন পর্যন্ত তারা লবণের ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে।

কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের পক্ষ থেকে লবণের একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই ব্যবসা জনসাধারণের কাছে উন্মুক্ত করে দেওয়া। কিন্তু ফল সম্পূর্ণ বিপরীত হল। লবণের ব্যবসা কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায় পরিণত হয়। কলকাতার গভর্নর ভেরলেস্ট দুঃখ করে বলেন যে, "প্রকৃত মালিকদের খুব সহজেই পোষ্য রূপে পরিচিত করা যায়।" ইয়োরোপীয় বণিকগণ তাদের ভারতীয় নামে লবণের ব্যবসা পরিচালনা করতে শুরু করে। নন্দকুমারের বিচারের অন্যতম প্রধান সাক্ষী কামাল-উদ্-দিনও লবণ ব্যবসায়ের একজন এজেন্ট ছিল।

(৩) হেস্টিংসের নীতি ঃ

লবণের একচেটিয়া ব্যবসা তুলে দেওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যাশিত শুল্কের পরিমাণের তুলনায় অনেক কম শুল্ক আদায় হতে শুরু করে। সুতরাং সরকারের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ওয়ারেন হেস্টিংস পুনরায় লবণ ব্যবসায়ে পরিবর্তন সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে তিনি কোম্পানীর হস্তে লবণের ব্যবসা তুলে দিতে প্রস্তুত হন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি একটি রেগুলেশন ঘোষণা করেন। এই রেগুলেশন অনুসারে লবণ সংগ্রহকারিগণ পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্ত হত এবং তারা এই পাঁচ বছরের সংগৃহীত সমস্ত লবণ নির্দিষ্ট মূল্যে কোম্পানীর কাছে জমা দিতে বাধ্য ছিল। কোম্পানী তখন অগ্রিম মূল্য প্রদানকারী বণিকদের কাছে লবণ সরবরাহ করত। ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে এই রেগুলেশনের সামান্য পরিবর্তন সাধন করা হয়। তখন থেকে লবণ উৎপাদনকারিগণই ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে সরাসরিভাবে লবণ সরবরাহ করতে শুরু করে।

এই ব্যবস্থার ফলে কিছুদিনের জন্য সরকারের রাজস্ব অনেক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তারপরই আবার রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পেতে শুরু করে। স্থানীয় কর্মচারীদের দুর্নীতিই ছিল এই অবস্থার জন্য প্রধানতঃ দায়ী তারা উৎপাদনের একটি অংশ নিজেদের জন্য গোপনে মজুত রাখার ব্যবস্থা করত। হেস্টিংস তখন উৎপাদন কারীদের পরিবর্তে

এজেন্টদের উপর লবণ সরবরাহের দায়িত্ব অর্পণ করে। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে একজন করে বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারী প্রত্যেক বিভাগে এজেন্টদের কার্যকলাপ পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত করেন এবং তাদের কার্যকলাপ তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব কলকাতায় অবস্থিত কম্পট্রোলারের উপর অর্পণ করা হয়। মলঙ্গী অর্থাৎ লবণ উৎপাদনকারিগণ এজেন্টদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ পেত এবং একমাত্র নিজ নিজ এজেন্টের কাছেই তারা লবণ বিক্রি করতে পারত। এজেন্টগণ সরকারের নির্ধারিত মূল্যে পাইকারী ব্যবসায়ীদের নিকট লবণ বিক্রি করত। মলঙ্গীদের এবং পাইকারী ব্যবসায়ীদের মধ্যে লবণের মূল্যের পার্থক্য লবণের শুল্ক হিসাবে ধার্য হত। এভাবে লবণ উৎপাদন ও বিক্রির উপর সরকার আবার একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

এই ব্যবস্থার ফলে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে এই নতুন পদ্ধতি অপেক্ষা লবণের ব্যবসায় চোরাকারবারীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়ার ফলেই সরকারের আয় বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকার ব্যতীত অন্য কোন সংস্থা লবণ সংগ্রহ, আমদানি এবং বণ্টন করার অধিকার ভোগ করত না। হেস্টিংস রাজস্ব বৃদ্ধি করে খুব কৃতিত্ব দাবি করতে শুরু করেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যবস্থার ফলে সাধারণ লোকের দুর্দশা খুব বৃদ্ধি পায় এবং গৃহপালিত পশুদের লবণ খেতে দেওয়া একেবারে অসম্ভব হয়ে ওঠে।

(৪) বাংলাদেশের লবণের চাহিদা :

আসাম, বিহার, নেপাল প্রভৃতি স্থানে বাংলাদেশের লবণের খুব চাহিদা ছিল। কিন্তু অযোধ্যার লোকদের বাংলাদেশের লবণ সম্পর্কে যথেষ্ট অনীহা ছিল। বাংলাদেশে লবণের উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যাপারে কয়েকটি অসুবিধা থাকার জন্য বিশাখাপত্তনম, রাজমুণ্ড্রি, নেলোর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থানের লবণ আমদানি করার ব্যবস্থা করা হত। তবে বাংলাদেশের অধিবাসীদের সুবিধার পরিবর্তে সমুদ্র উপকূলে কার্যরত ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানীর স্বার্থের জন্যই এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা হয়। সস্তায় অন্য স্থান থেকে লবণ আমদানির ফলে বাংলাদেশের লবণ ব্যবসায়ের উপরও আঘাত পড়তে শুরু করে।

(৫) মলঙ্গীদের অবস্থা :

মলঙ্গীদের দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় আযুরাহ্ ও ঠিকা। আযুরাহ্ নামে তারাই পরিচিত ছিল যারা লবণ উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজ করত। তারাই ছিল লবণের প্রকৃত উৎপাদক। সংখ্যায় তারা প্রায় ছিল ষাট হাজার। দুর্নীতিপূর্ণ আযুরাহ্ ব্যবস্থা ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঠিকা মলঙ্গীরা দিন মজুর ছিল। ব্রিটিশ আমলে লবণ ব্যবসায়ে নানারূপ পরিবর্তনের ফলেও সম্ভবতঃ মলঙ্গীদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি।

Q 17. Trace the history of the indigo plantation in India. What were the causes of grievances of the peasants against the planters ?

উত্তর : (১) ভূমিকা :

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নীল চাষ শুরু হয়। নীলচাষের সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল যশোর, খুলনা, নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি জেলাগুলো। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের অন্যান্য স্থানে নীলচাষ করা হত। নীলচাষ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের দৃষ্টি এই লাভজনক ব্যবসার দিকে আকৃষ্ট হয় এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নীলচাষের জন্য নতুন নতুন জমি তারা অধিকার করার চেষ্টা করতে শুরু করে। এই ব্যাপারে ইংরেজ শাসকগণ ছিলেন তাদের প্রধান সহায়ক। অল্পদিনের মধ্যেই বাংলাদেশে নীলের চাষ ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড বাইরের দেশে ২০,৯৬,৯১১ পাউণ্ড নীল রপ্তানি করে, তার মধ্যে বাংলাদেশের অংশ ছিল ৬,২২,৬৯১ পাউণ্ড। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৪৩,৬৮,০২৭ পাউণ্ড, তার মধ্যে বাংলাদেশের অংশ ছিল ২৯,৫৫ ৮৬২ পাউণ্ড। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে বোর্ড অফ ডাইরেক্টরদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে বাংলাদেশের উনীল ৎপাদনে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। এই বিবরণে বলা হয় যে, "The article (indigo) appears to be establised as a great staple of Bengal. It supplies with much of the consumption of Europe and no rival to arise ; it will, therefore, probably continue to be largely in demand."

বাংলাদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চল নীলচাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত হলেও বিহারের কোন কোন স্থানে নীলচাষ করা হত। বিহারের সীমানা অতিক্রম করে উত্তরপ্রদেশের কিছু অংশে এই চাষের প্রচলন হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বসমেত ৯৮৩টি নীলকুঠি ছিল। নীলচাষের সঙ্গে যুক্ত কোম্পানীর সংখ্যা ছিল ১২৪ এবং তাদের অধীনে মোট জমির পরিমাণ ছিল ১৭, ২২, ৪০৫ বিঘা।

(২) কৃষকদের বিক্ষোভ :

(ক) অতিরিক্ত মুনাফার লোভে নীলকর সাহেবগণ উন্নত ধরনের জমিতে নীল চাষ করার ব্যবস্থা করতে শুরু করে। সাধারণভাবে উঁচু, নাবাল এবং উর্বর জমিই ছিল এই চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। আবার এই সব জমিতেই ধান প্রভৃতি খুব বেশি পরিমাণে উৎপন্ন হত। স্বাভাবিকভাবেই এইসব জমি নীলচাষের জন্য নির্দিষ্ট হতে শুরু করলে চাষীদের মধ্যে প্রচণ্ড অসন্তোষ দেখা দিতে শুরু করে। কিন্তু নীলকর সাহেব-গণ অগ্রিম দাদন দিয়ে চাষীদের এইসব জমিতে ধান চাষের পরিবর্তে নীল চাষ করতে

বাধ্য করে। অনেক ক্ষেত্রেই চাষীরা নীলকরদের এই নীতির ঘোর বিরোধিতা করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকারী কর্মচারীদের এবং নীলকুঠির দেওয়ান, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতির অত্যাচারের ভয়ে নীল চাষ করতে স্বীকার করত। কারণ অর্থলোলুপ নীলকর সাহেবগণ দুর্বল ও দরিদ্র চাষীদের আর্থিক ক্ষতিসাধন করেই সন্তুষ্ট ছিল না, তাদের উপর শারীরিক নির্যাতন করতেও তারা বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করত না। অনেক সময় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কৃষকরা নীলকরদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেও তাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। নীল চাষ করতে অস্বীকৃত হলে জোর করিয়ে চাষীদের দিয়ে জমি চাষ করান হত। অনেক সময় প্রাণভয়ে চাষীরা বাড়ী-ঘর, জমি-জমা পরিত্যাগ করেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করত। ইংরেজ রাজকর্মচারীদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে এই লাভজনক ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকার জন্য চাষীদের বাড়ী-ঘর ত্যাগ করেও পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্র লিখিত নীলদর্পণ নাটকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়।

(খ) নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে কৃষকদের বিতৃষ্ণার অন্য কারণ ছিল বিনা অনুমতিতে উর্বর জমিগুলো নীলকরদের জন্য চিহ্নিত করা। এই ব্যাপারে কৃষকদের আপত্তি অকেজো করে তোলার জন্য নীলকর সাহেবদের প্ররোচনায় প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করে এবং নীলকর সাহেবদের হাত থেকে যাতে চাষীরা অব্যাহতি পেতে না পারে সেজন্য 'ইণ্ডিগো কনট্রাক্ট অ্যাক্ট' বিধিবদ্ধ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই আইনের দ্বারা ইংরেজ সরকার নীলকর সাহেবদের স্বার্থ রক্ষার ব্যবস্থা করে। তখন থেকে নীলকর সাহেবরা এই আইন প্রণয়নের পর নিজেরা জমি ক্রয় করে যেমন চাষীদের দ্বারা নীল উৎপাদন করত তেমনি আবার ভারতীয় চাষীদের জমিতে জোর করে নীলচাষের ব্যবস্থা করতে শুরু করে। যে সকল চাষী দাদন অর্থাৎ নীলচাষ করার এবং উৎপন্ন নীল নীলকর সাহেবদের কুঠিতে বিক্রয় করতে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অগ্রিম অর্থ গ্রহণ করত তারা নীলকর সাহেবদের একপ্রকার ভূমিদাসে পরিণত হত। নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে চুক্তি অনুসারে নীলগাছ কুঠিতে জমা না দিতে পারলে তাদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত।

(গ) কৃত্রিম উপায়ে নীল উৎপাদন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বাবধি নীলচাষ ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে সঙ্গে নীল চাষীদের উপর জুলুম জবরদস্তির মাত্রাও বৃদ্ধি পায়। ইংরেজ সরকারের সমর্থনেই নীলকর সাহেবরা আরও সাহসী হয়ে ওঠে এবং তাদের অত্যাচারের প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না। নীলকুঠির বেতনভুক লাঠিয়ালদের বর্বর অত্যাচারের ভয়ে চাষীরা সবসময়ই সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। নীলকর সাহেব এবং তাদের লাঠিয়ালদের অত্যাচার শুধুমাত্র চাষীর উপরই সীমাবদ্ধ ছিল না, চাষীর পরিবারও তাদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পায় নি।

(ঘ) নীলকর সাহেবরা চাষীদের উপর শুধু অত্যাচার করেই খান্ত হয় নি, তাদের ন্যায্য পাওনা থেকেও বঞ্চিত করতে দ্বিধা বোধ করত না। উৎপাদনে কৃষকদের খরচের কথা চিন্তা না করেই নীলকর সাহেবরা নীলের দাম ধার্য করত। ফলে তাদের লাভের অঙ্ক ক্রমেই বৃদ্ধি পেলেও লোকসানের সম্পূর্ণ ভাগ কৃষকদের বহন করতে হত। কিন্তু নীলচাষ ত্যাগ করে যাওয়ারও তাদের কোন উপায় ছিল না। একবার দাদন নিয়ে নীলচাষ শুরু করলে তার আর নিষ্কৃতি ছিল না। স্বার্থলোলুপ নীলকর সাহেব জোর করে কৃষকদের জমি দখল করে নীলচাষ শুরু করতেও দ্বিধাবোধ করত না। ব্যবিংটন মেকলে নীলচাষের ব্যাপারে যে অসহনীয় অমানুষিক ব্যবস্থা চালু ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, "অত্যধিক অন্যায় বা অবিচার সর্বদাই লেগে থাকত, নীলকর সাহেবরা আইনের মাধ্যমে চাষীদের উপর যেটুকু অন্যায় করতে পারত, তা'ত করতই, তাছাড়া আইন বহির্ভূত আরও অধিক অন্যায় অবিচার করে, নীলচাষীদের ভূমিদাসে পরিণত করে"—"the great evils exist, that great injustice is frequently committed that many ryots have brought partlv by the operation of the laws and partly by acts committed in defiance of law, into a state not far removed from that of predial slavery." নীলকর সাহেবদের এই অত্যাচারের ফলেই ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের নীল উৎপাদক জেলাগুলোতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়।

Q. 18. What do you know of the Famine of 1770 ? What were the circumstances that retarted the recovery of the economy of Bengal from the effects of the Famine of 1770 ?

উত্তর : (১) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর :

১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে (১১৭৬ বাংলা সনে) বাংলাদেশে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বাংলা ১১৭৬ সনে এই দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল বলে এই দুর্ভিক্ষকে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়। এই দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার লোকসংখ্যার মোট এক-তৃতীয়াংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম ছিল—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রধান কারণ এই বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা। কিন্তু দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়া মাত্র মোহম্মদ রেজা খাঁ প্রমুখ-ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উচ্চপদস্থ দেশীয় কর্মচারিগণ এবং কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারিগণের অর্থগৃধ্নুতার ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এই দুর্ভিক্ষের সময় বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, পথে-ঘাটে অসংখ্য শিশু, বৃদ্ধ, নর-নারী যখন খাদ্যাভাবে প্রতিদিন হাজারে হাজারে প্রাণ হারায়। এমন কি পিতামাতা তখন একমুষ্টি অন্নের জন্য সন্তান বিক্রয় করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। মানুষ তখন মৃতদেহ ভক্ষণ করতে শুরু করে। W. W. Hunter-এর Annals of Rural Bengal-এ এই দুর্ভিক্ষের বিশদ

বিবরণ পাওয়া যায়। "All through the stifling summer of 1770 the people went on dying. The husbandmen sold their cattle, they sold their implements of agriculture, they devoured their seed grain, sold their sons and daughters till at length no buyer of children could be found, they ate leaves of trees and the grass of the field, and in June 1770 the Resident at the Durbar affirmed that the living were feeding on the dead." বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠেও অনুরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়।

কিন্তু দেশের এরূপ পরিস্থিতিতেও অধিক মুনাফার আশায় কোম্পানীর দেশীয় ও ইংরেজকর্মচারিগণ খাদ্যশস্য বাজার হতে ক্রয় করে মজুত করতে সঙ্কোচবোধ করে নি। তাছাড়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত অঞ্চল থেকে সৈন্যবাহিনী অপসারিত না করায় যা কিছু সামান্য খাদ্যশস্য তখনও পাওয়া যেত তা তাদের জন্যই ক্রয় করার ব্যবস্থা করা হত। সেই সময়ের পরিবহণ ব্যবস্থার অসুবিধা, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সম্পর্কে ইংরজগণের অনভিজ্ঞতা এবং কোম্পানীর কর্মচারিগণের মানুষের দুর্দশার সুযোগ গ্রহণ করে অর্থলোভের অমানুষিক মনোবৃত্তি বাংলাদেশকে শ্মশানে পরিণত করে। এমন কি পরের বছরেও (১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে) কোম্পানীর কর্মচারিগণ রাজস্ব আদায়ে কোন প্রকার উদারতা প্রদর্শন করে নি। দারিদ্র ও দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত জনসাধারণের নিকট থেকে সে বছর অন্যান্য বছর থেকে দুলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা অধিক রাজস্ব আদায় হয়।

(২) অর্থনৈতিক পুনরুন্নয়নের পথে বাধা ঃ

(ক) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুন্নয়নের পথে প্রথম বাধা ছিল কোম্পানীর ভারতীয় ও ইংরেজ কর্মচারীদের সহানুভূতিহীন দৃষ্টিভঙ্গী। দ্বৈতশাসনের কুফল হিসাবে দায়িত্বহীন ইংরেজ কোম্পানী এবং ক্ষমতাহীন বাংলার নবাবের শাসনে মন্বন্তরের প্রকোপ থেকে আত্মরক্ষায় সমর্থ বাংলাদেশের জনগণ কোনরূপ সক্রিয় সাহায্য লাভ করতে সমর্থ হয় নি। সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করলে মন্বন্তরের পরেই বাংলাদেশের আইনতঃ ও প্রকৃত শাসকদ্বয় বাংলাদেশের জনজীবনে পুনরায় শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে অর্থনৈতিক পুনরুন্নয়নের ব্যাপারে সাহায্য করতে পারত। সরকারী ব্যাপক সাহায্য ব্যতীত ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একাজ করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি পুনরুদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা রহিত করা হলেও বাংলাদেশের ক্ষয়-ক্ষতি পূরণের জন্য সরকারীভাবে কোন চেষ্টা করা হয় নি।

(খ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে বাংলাদেশের দুটি প্রধান শিল্প—সুতীবস্ত্র ও রেশম মরণোন্মুখ হয়ে পড়ে। ১১৭৬-এর দুর্ভিক্ষে কৃষক সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই দুই শিল্পের সঙ্গেই তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। দুর্ভিক্ষের সময় বৃষ্টিপাতের অভাবে তুঁত-গাছের চাষ বন্ধ হয়ে যায়। কার্পাস তূলোর অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়ে। বর্গীর হাঙ্গামার পর থেকেই এই দুটি শিল্পের উপর বারবার আঘাত শুরু হয়। তথাপি কৃষক ও তাঁতী সম্প্রদায় প্রাণপনে চেষ্টা করে এই দুটি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার। কিন্তু ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর এই দু'টি শিল্পের পক্ষেই পূর্বশক্তি নতুন করে উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। যদিও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিশেষভাবেই অবগত ছিল যে বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধির মূল কারণ কৃষি নয়—সুতী ও রেশম শিল্প। ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্যের একটি বিরাট অংশও এই দুটি শিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল। তথাপি তারা এই শিল্প দুটির দিকে সতর্কদৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে নি। বাংলাদেশের প্রধান দুটি শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হয়ে ওঠায় এই দেশের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গ) দুর্ভিক্ষের অনতিকাল পরেই বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নানাপ্রকার 'ব্যবসায়ী-কৃষিপণ্যের' উৎপাদন শুরু হয়। ইংরেজ সরকার নিজেদের প্রয়োজনে এই সব কৃষি যথা : পাট, ইক্ষু, নীল প্রভৃতির চাষ জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু এইসব কৃষি পণ্যের মূল্য সব সময় পরিবর্তিত হয়। বাজারের চাহিদা অনুযায়ী এই সব পণ্যের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধি হওয়ার ফলে কৃষকদের আয় বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পেতে শুরু করে। অপর দিকে নতুন নতুন জমিতে এইসব কৃষিপণ্য চাষের ফলে ধানের জমির পরিমাণও হ্রাস পায়। ফলে খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ব্যবসায়ী পণ্য বিক্রি করে কিছু পরিমাণে অধিকঅর্থ কৃষকদের হাতে পড়লেও খাদ্যশস্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিসপত্র ক্রয় করতে তা ব্যয় হতে শুরু করে। ফলে তাদের আর্থিক সঙ্গতির উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা কিছুমাত্র ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। ফলে তাদের অর্থ নৈতিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ায় সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক পুনরুন্নয়নের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।

(ঘ) রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে কোম্পানীর পক্ষ থেকে বারবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাও ছিল বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক দুর্দশার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থ নীতি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কিন্তু একসালা, পাঁচসালা, দশসালা প্রভৃতি বন্দোবস্ত করার ফলে বারবার ভূস্বামীদের পরিবর্তনে কৃষককুলের অবস্থা অবর্ণনীয় হয়ে পড়ে। প্রত্যেক ভূস্বামীই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ খাজনা আদায় করার জন্য সচেষ্ট ছিল। ফলে কৃষকদের উপর নির্যাতনেরও আর অন্ত ছিল না। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই অবস্থার অবসান ঘটলেও জমির মালিক কৃষকগণ তখন থেকে জমির মালিক জমিদারদের অধীনে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মুষ্টিমেয় জমিদারের আর্থিক উন্নতির সহায়ক হলেও বেশি সংখ্যক কৃষকদের কাছেই অভিশাপরূপে দেখা দেয়।

(৬) সর্বোপরি ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রচণ্ড আঘাত পায়। সুতী ও রেশম বস্ত্রের ব্যবসায় বাংলাদেশের শিল্পীগণ বিশ্বজোড়া সুনাম অর্জন করতে সক্ষম হয়। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে সস্তায় দ্রুত উন্নত মানের বস্তু নির্মাণের কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার পর বাংলাদেশের তাঁতীদের পক্ষে এই শিল্পে আর অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। প্রতিযোগিতায় তারা হেরে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের শিল্প প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। এভাবে তাঁত শিল্পে নিযুক্ত কারিগররা পুরাতন জীবিকা থেকে বিতাড়িত হয়ে নতুন জীবিকার সন্ধানে জমির উপর ভীড় জমাতে শুরু করে। বাংলার এই দুটির শিল্পের ধ্বংসই তার অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ। অপর দিকে সীমিত চাষযোগ্য জমির উপর অধিক সংখ্যক লোকের চাপের ফলে অর্থনৈতিক সংকট আরও ঘনীভূত হয়। বিকল্প কোন জীবিকার সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনীতির পুনরুন্নয়নের সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়।

Q. 19. Sketch briefly the economic policy of the East India Company till 1857.

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা ঃ

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীকে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে লর্ড ক্লাইভের পত্র থেকে জানা যায় যে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী অধিগ্রহণের পর কোম্পানীর ভারতীয় রাজস্বের পরিমাণ বার্ষিক ২ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। পরবর্তী বছরগুলোতে রাজস্বের পরিমাণ আরও ২০ লক্ষ টাকা থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার প্রত্যাশা ছিল। বাণিজ্যিক বিনিয়োগ ব্যতীত অন্যান্য উদ্দেশ্যে কোম্পানীর ব্যয় ছিল মোটামুটিভাবে অসামরিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৬০ লক্ষ টাকা, বাংলার নবাবকে দেয় ভাতা ৪২ লক্ষ টাকা এবং দিল্লীর বাদশাহকে দেয় নজরানা ২৬ লক্ষ টাকা অর্থাৎ মোট এক কোটি আটশ লক্ষ টাকা।

(২) বাণিজ্যিক নীতি ঃ

কোম্পানী কর্তৃক বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ তখন থেকে রাজস্বের উদ্বৃত্ত অংশ হতেই সংগৃহীত হত। ইংলণ্ডে রপ্তানির উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ পৃথক করে রাখা হত তাকেই বিনিয়োগ বলা হত। বহুবছর পর্যন্ত বিনিয়োগের পরিমাণই ভারতে কোম্পানীর উদ্যোগের সাফল্যের মাপকাঠি হিসাবে বিবেচিত হত। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে কোম্পানীর বাণিজ্যিক সামগ্রী ক্রয়ের অর্থ ছিল দেশে মূল্যবান ধাতুর অনুপ্রবেশ শ্লথ করা এবং এই নীতি অনুসরণ করে মূলধন সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সঞ্চয়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। দেশের আভ্যন্তরীণ চাহিদা হ্রাস পেতে শুরু করলে, অনেক দ্রব্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে

বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে, চাহিদা বজায় রাখার জন্য কোম্পানীর মতে বিনিয়োগের পরিমাণই ছিল প্রধান অবলম্বন। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার করতে হবে যে, এই উপায়ে রপ্তানির জন্য অর্থ সরবরাহ করার পদ্ধতি যথার্থ পারস্পরিক বিনিময়ের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বাণিজ্যের শিল্পোৎপাদন পদ্ধতির প্রতিযোগিতার ফলে দেশের শিল্পক্ষেত্রে নিয়োগ চূড়ান্তভাবে বন্ধ হওয়ার পূর্বে, কয়েক বছরের জন্য শিল্পে বিনিয়োগ বজায় রাখার সহায়ক হিসাবে কোম্পানীর বিনিয়োগের ভূমিকা যাই হোক না কেন, একথা সন্দেহাতীত যে বহুবছর ধরে পারস্পরিক বিনিময় ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বলে এইরূপ রপ্তানি প্রথা বাংলাদেশ উৎপাদনের ভিত্তি দুর্বল করে তোলে। ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাণিজ্যিক লভ্যাংশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে ইয়োরোপীয়দের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এই ধরনের মুনাফাকে ইয়োরোপে প্রেরণ করাই কাম্য বলে বিবেচনা করে। ফলে ভারত হতে মূল্যবান বাণিজ্য সামগ্রী নিঃসরণের পরিমাণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়।

(৩) ভূমি রাজস্ব ঃ

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসনব্যবস্থার মাধ্যমে সংগৃহীত রাজস্বকে বাণিজ্যিক রাজস্ব হতে পৃথক রাখার জন্য কোম্পানিকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কোম্পানীর বেসামরিক ও অসামরিক প্রতিষ্ঠানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ ও কোম্পানীর ভারতীয় ঋণের উপর সুদ প্রদানের জন্য শাসনসংক্রান্ত রাজস্বকে বিশেষভাবে পৃথক করে রাখাই ছিল এই নির্দেশের উদ্দেশ্য। কোম্পানীর বাণিজ্যিক মুনাফাকে হুণ্ডি সংক্রান্ত অর্থপ্রদান এবং অন্যান্য ঋণের উপর সুদ প্রদান, ঋণ পরিশোধ এবং কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডারগণকে লভ্যাংশ প্রদানের জন্য ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১৮১৩ থেকে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে কোম্পানীর শাসন ভুক্ত অঞ্চলসমূহ হতে সংগৃহীত রাজস্বের পরিমাণ ছিল বছরে ২ কোটি পাউণ্ড অপেক্ষাও বেশি। এই রাজস্বের বেশির ভাগই বাংলা প্রেসিডেন্সি থেকে সংগৃহীত হত। এই অঞ্চল থেকে প্রায় ১ কোটি ৩১ লক্ষ পাউণ্ড আয় হত। আর এই আয়ের বেশির ভাগই আদায় হত ভূমি রাজস্ব থেকে। ১৮১৩ থেকে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মোট রাজস্বের প্রায় ৬২·৫ শতাংশ ভূমিরাজস্ব থেকে পাওয়া যেত। রাজস্ব সংগ্রহের অন্য উৎস ছিল আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং পরিবহণ শুল্ক এবং আমদানি শুল্ক এবং সরকারী সংস্থায় প্রস্তুত আফিম এবং লবণ ইত্যাদির বিক্রয় হতে লব্ধ নীট রাজস্ব।

(৪) আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যশুল্ক ঃ

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুল্ক প্রাক্ ব্রিটিশ যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। এই ধরনের শুল্ককে বাণিজ্যক্ষেত্রে বিরক্তিজনক এবং দুর্নীতির উৎস বলে বিবেচনা করা হত। কিন্তু রাজস্বের প্রয়োজন এত ব্যাপক ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত এইরূপ একটি বাণিজ্য স্বার্থবিরোধী উৎসকেও পরিত্যাগ করা সম্ভব হয় নি। এই উৎস থেকে বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল প্রায় ২,২০,০০০ পাউণ্ড। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দের পরে শুল্ক আরোপের প্রচলিত সাধারণ হার ছিল পণ্যমূল্যের ৩২ শতাংশ।

(৫) **বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক ঃ**

বহির্বাণিজ্যের উপর শুল্ক সাধারণতঃ পণ্যমূল্যের ৭২/১ শতাংশ হারে ধার্য করা হত। কিন্তু নির্ধারিত কয়েকটি পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করা হত। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ভিন্ন অন্যজাতির জাহাজ দ্বারা বাহিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ধার্য শুল্ক-হার বর্ধিত করে এই হারের দ্বিগুণ করা হয়। ব্রিটিশ জাহাজ বাহিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে নিম্নতর হারে শুল্ক প্রদান অব্যাহত থাকে। একই সময়ে উপকূলবর্তী বাণিজ্যে ব্রিটিশ ছাড়া অন্য জাহাজের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড হতে আমদানিকৃত কতিপয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে আরও বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। এই সময় কোন কোন ব্রিটিশ দ্রব্যের আমদানির উপর শুল্কহার হ্রাস করে ২২/১ শতাংশ হারে শুল্ক আরোপ করা হয় এবং কিছু সংখ্যক দ্রব্যকে আমদানি শুল্ক থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দেওয়া হয়। ব্রিটিশ জাহাজ বাহিত কিছু কিছু রপ্তানি সামগ্রী যেমন, তুলা, নীল, পশম, শন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও অনুরূপ পক্ষপাতমূলক আচরণ করা হত। ভারত-ইয়োরোপীয় বাণিজ্যের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যদিও ভারতীয় সুতীবস্ত্রের রপ্তানি ক্রমবর্ধমান অসুবিধার সম্মুখীন হয়, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সুতীবস্ত্রের রপ্তানি ক্রমবর্ধমান অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তবুও ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত সুতীবস্ত্রের ক্ষেত্রে রপ্তানি শুল্কের কোন রেহাই মঞ্জুর করা হয় নি।

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে পক্ষপাতমূলক আচরণ ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করা হয়। যেখানে ব্রিটিশ দ্রব্যের ক্ষেত্রে কোনও শুল্ক প্রদান হতে সম্পূর্ণ অব্যাহতি কিংবা ২২/১ শতাংশ হারে শুল্ক প্রদানের ব্যবস্থা ছিল সেখানেও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ এবং আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ৫ শতাংশ হারে শুল্ক প্রদানের প্রয়োজন হত এবং অন্যান্য যে কোন দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে ৭২/১ শতাংশ হতে ১০ শতাংশের মধ্যে শুল্ক প্রদান করতে হত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদেশী জাহাজে দ্রব্য আনয়ন করলে শুল্ক হারগুলো দ্বিগুণ হত। রপ্তানীর ক্ষেত্রেও ব্রিটেন এবং ইয়োরোপীয় দেশসমূহ ও আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অনুরূপ পক্ষপাতমূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়।

(৬) **উপসংহার ঃ**

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পর অন্তর্বাণিজ্য শুল্কের অবসান ঘটলে সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপর শুল্কের হার আরও বৃদ্ধি করার আবশ্যকতা দেখা দেয়। এজন্য ১৮৪০ হতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাণিজ্য শুল্ক বিধি সম্পূর্ণভাবে সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল ব্রিটিশ এবং বিদেশী জাহাজের মধ্যে যে বিভেদমূলক আচরণ প্রচলিত ছিল তার অবসান। কিন্তু ব্রিটেনে উৎপন্ন দ্রব্যের অনুকূলে পক্ষপাতমূলক আচরণ আরও কয়েক বছর ধরে অব্যাহত থাকে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহ দমন করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের প্রচুর পরিমাণে অর্থ ব্যয় করতে হয়। অতিরিক্ত ব্যয় সংকুলানের উদ্দেশ্যে পরবর্তী বছরে এই শুল্ক রীতির আবার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

Q. 20. Give an account of the Banking system in the later part of the 18th and early part of the 19th century.

উত্তর (১) ভূমিকা ঃ

প্রাচীনযুগ থেকেই ভারতবর্ষে ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও মনুসংহিতায় ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। মোগল শাসনকালে ব্যাঙ্ক কারবারীগণ এবং অর্থবিনিয়োগকারীগণ সমাজে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসকগোষ্ঠীর আর্থিক স্থিতিশীলতা দেশের মুখ্য ব্যাঙ্ক কারবারীগণের উপর নির্ভর করত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার নবাবের দরবারে জগৎশেঠ নামে অভিহিত রাজকীয় ব্যাঙ্কারগণ প্রচণ্ড প্রভাবশালী ছিলেন।

বাণিজ্য উপলক্ষ্যে ইয়োরোপীয় বণিকগণ ভারতে উপস্থিত হওয়ার পর ভারতের দেশীয় ব্যাঙ্ক কারবারীগণের সাহায্য গ্রহণ করতে শুরু করে। ইয়োরোপীয় বণিকসংস্থাগুলো যে স্বর্ণপিণ্ড আমদানি করত তা সাধারণত রাজকীয় ব্যাঙ্ক কারবারীগণের নিকটই কিছু বাট্টা দিয়ে বিক্রি করত এবং এই কারবারীগণ স্বর্ণপিণ্ড ক্রয়ের ব্যাপারে প্রায়শই একচেটিয়া ক্রেতার সুবিধ ভোগ করত। কোম্পানীগুলো সাধারণতঃ ভারতে বাণিজ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য মাঝেমাঝে দেশীয় ব্যাঙ্ক কারবারীগণের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হত। এই ঋণের জন্য বিদেশীদের সর্বনিম্ন ৯ এবং সর্বোচ্চে ১২ শতাংশ সুদ দিতে হত। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত তাদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থপ্রেরণের জন্য এই দেশীয় ব্যাঙ্কগুলোর সাহায্য গ্রহণ করত। বাংলাদেশের উপর ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃত্ব স্থাপিত হওয়ার পর তাদের উদ্বৃত্ত রাজস্ব অন্যান্য স্থানে ব্যবসায় বিনিয়োগ করার জন্যও দেশীয় ব্যাঙ্কগুলোর উপর নির্ভরশীল ছিল। বিশেষতঃ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকার জন্য দেশীয় ব্যাঙ্কের সাহায্য ব্যতীত তাদের অর্থপ্রেরণের অন্য কোন উপায় ছিল না।

(২) এজেন্সী হাউসের উদ্ভব ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইয়োরোপীয় এজেন্সি হাউসগুলোর উদ্ভব শুরু হয়। এই প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণতঃ ইংরেজ বণিকশ্রেণী এবং কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সঞ্চিত মূলধনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। এজেন্সি হাউসগুলো এমন কয়েক ধরনের আর্থিক কার্য সম্পাদন করত যার জন্য পূর্ববর্তীকালের দেশীয় ব্যাঙ্ক কারবারীগণের সাহায্য গ্রহণ করা আবশুক হত: দেশীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানগুলো পূর্বেই রাজকীয় পৃষ্ঠপোষককতার অভাব এবং দেশে ইংরেজগণ কর্তৃত্ব নতুন রাজস্ব প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন এই উভয় কারণে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ইয়োরোপীয় এজন্সী হাউসগুলোর উদ্ভবেরর ফলে তাদের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে।

(৩) ব্যাঙ্কের উদ্ভব ঃ

ইয়োরোপীয় এজেন্সী হাউসগুলোর অন্যতম ছিল মেসার্স আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোম্পানী। এই কোম্পানীর আনুকূল্যে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সর্বপ্রথম ইয়োরোপীয়

ব্যাঙ্ক 'দি-ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্থান' কলকাতায় স্থাপিত হয়। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই ব্যাঙ্ক তার ব্যবসা অব্যাহত রাখে। এই সময় এই ব্যাঙ্কে যে হাউসগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা কারবার গোটাতে বাধ্য হয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একটি জেনারেল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। এই ব্যাঙ্কের উপর বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী শহর ও জেলাগুলোতে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা প্রসারের জন্য দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। কিন্তু এই ব্যাঙ্ক তার উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয় এবং দু'বছর পরে ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কের কার্য গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কলকাতা শহরেই এই ব্যাঙ্ক প্রথম গড়ে ওঠে। এই ব্যাঙ্ক নিজস্ব কাগজী মুদ্রা প্রচলন করে এবং চেক্ পদ্ধতি প্রবর্তনের প্রাথমিক প্রয়োগের জন্যও এই সংস্থা কৃতিত্ব দাবি করতে পারে। বেঙ্গল ব্যাঙ্কের সহিত কোন এজেন্সী হাউসের যোগ ছিল না। প্রায় পনের বছর ধরে এই ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিল।

(৪) অন্যান্য ব্যাঙ্ক ঃ

(ক) ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে যৌথ-মূলধনী নীতি এবং অংশীদারগণের সীমিত দায়বদ্ধতার ভিত্তিতে সর্বপ্রথম ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা দেখা দেয়। সেই বছরই দ্বিতীয় জেনারেল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া তার কার্যকলাপ শুরু করে। এই ব্যাঙ্কও নিজস্ব কাগজী নোট প্রচলন করে। ইংরেজ সরকারও এই ব্যাঙ্কের সাহায্য গ্রহণ করত এবং বিপদের সময় ব্যাঙ্কও সরকারের সাহায্যের উপর নির্ভর করত। কিন্তু ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় প্রচণ্ড আর্থিক সংকটের সৃষ্টি হওয়ার ফলে এই ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যায়।

(গ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যাঙ্ক অফ ক্যালকাটা নামে একটি নতুন ব্যাঙ্কের উদ্ভব হয়। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাঙ্কের নাম পরিবর্তিত হয়ে 'ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গল' হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই ব্যাঙ্কের মূলধনী তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা প্রদান করে। মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল ৫০ লক্ষ টাকা। কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষকতার সুবিধা ভোগ করার দরুন এই ব্যাঙ্ক অতি শীঘ্রই সমগ্র ভারতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাঙ্কে পরিণত হয় এবং এই ব্যাঙ্কের উপর সরকারী তহবিলের নিরাপত্তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। এই ব্যাঙ্ক ব্যতীত অন্য কোন ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রবর্তিত নোট সরকারের নিকট গ্রহণীয় ছিল না। এই ব্যাঙ্কের প্রবর্তিত নোট ও অন্যান্য দায়ের ৩৩⅓ ভাগ নগদ রিজার্ভ রেখে নিজস্ব কার্যকলাপ পরিচালনা করত।

১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্ক আইন অনুযায়ী ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলকে একটি প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর কয়েকজন সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং কাগজী-মুদ্রা প্রচলনের উপরও কিছু নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। বোম্বাই ও মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলো যথাক্রমে ১৮৪০ এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাঙ্ক দুটির উভয়কেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ৩ লক্ষ করে টাকা প্রদান করে। প্রেসিডেন্সী ব্যাঙ্কগুলোর কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতার উপর কয়েকটি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। পরে ১৮৬২ থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সরকার

কাগজী মুদ্রা প্রচলনের ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করলে এই ব্যাঙ্কগুলোর নোট প্রচলনের ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়।

(গ) ১৮০০ থেকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এদেশের ইয়োরোপীয় ধাঁচে ৪০টিরও বেশি ব্যাঙ্কের উদ্ভব হয়। এই ব্যাঙ্কগুলোর সবকটিতেই ইয়োরোপীয় মালিকানার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ক্ষেত্রে ৪ জন ভারতীয় পরিচালকের সন্ধান পাওয়া যায়। মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ব্যাঙ্ক-গুলোতেই ভারতীয় অংশীদারদের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু সংখ্যায় ভারতীয়রা অতি নগণ্য।

(৫) বিনিয়োগ পদ্ধতি ঃ

ব্যাঙ্কে সংগৃহীত অর্থ সাধারণতঃ বিভিন্ন শিল্প-উদ্যোগে বিনিয়োগের জন্য বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিকে ঋণ হিসাব দেওয়া হত। তবে ইংরেজদের দ্বারা পরিচালিত এইসব ব্যাঙ্কের সঞ্চিত অর্থের প্রায় সমস্ত অংশই ইংরেজ বণিকদের শিল্প-উদ্যোগে ব্যবহৃত হত। ভারতীয় শিল্পপতিদের পক্ষে এই সব ব্যাঙ্ক থেকে আর্থিক সাহায্য লাভ করা প্রায় অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ বাণিজ্য পণ্যের নতুন কৃষি প্রথা এদেশে চালু হওয়ার ফলে নীল, পাট, আফিম, চা প্রভৃতি কৃষিপণ্যের মালিকানা প্রায় সম্পূর্ণভাবেই ইংরেজদের হস্তগত ছিল। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে ব্যাঙ্ক এই সব শিল্পপতিদের অতিরিক্ত সুদে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করত। কিন্তু এই সব কৃষিপণ্যের বাজার ছিল খুবই অশিক্ষিত, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাঙ্কের পক্ষে নিয়মিতভাবে ঋণ পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে উঠত। এইরূপ কৃত্রিম আর্থিক সংকটের ফলে অনেক সময়ই ব্যাঙ্কগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হত। প্রকৃতপক্ষে সরকারের পক্ষ থেকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাঙ্কের লেন-দেন নিয়ন্ত্রণের কোন ব্যবস্থা না থাকার জন্যই এদেশে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

Q. 21 Briefly review the social changes in Bengal during the first half of the 19th century.

উত্তর ঃ (১) ভূমিকা ঃ

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের শ্রেণীবিচারের প্রধান মাপকাঠি ছিল বংশ কৌলীন্য। আর্থিক বৈষম্য বল্লালী কৌলীন্যের সহিত মিলিত হয়ে সমাজে এক বিরাট শ্রেণীভেদের সৃষ্টি করে। কিন্তু শ্রমশিল্পের যুগে ধনতন্ত্রের বিকাশে কৌলীন্য ও রক্ত সম্পর্কের আভিজাত্য মুদ্রার কাছে পরাজয় বরণ করে। মধ্যযুগের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে গতিশীল অর্থনৈতিক কার্যবিধি আত্মপ্রকাশ করে। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে দুর্ভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অনেক পরিমাণে ভেঙ্গে পড়ে। নতুন শ্রেণী বিন্যাসে দেখা দিল ধনিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও শ্রমজীবীশ্রেণী। ইংরেজ আমলের পূর্বে ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে মাঝামাঝি বিত্ত সম্পন্ন লোক যে ছিলনা তা নয়, তবে এই শ্রেণীর সংখ্যা খুবই অল্প ছিল বলে শ্রেণী হিসাবে

তাদের বিশেষ কোন প্রাধান্য বা প্রভাব ছিল না। এই ধনিক ও মাঝামাঝি রকমের বিত্ত-সম্পন্ন লোকদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কৌলীন্য লক্ষ্যণীয়ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। অর্থসম্পদই ক্রমে নতুন শ্রেণী বিন্যাসের মধ্যে শ্রেণী বিচারের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়।

(২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের প্রভাব :

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মধ্যযুগীয় ভূমিব্যবস্থার দারুণ পরিবর্তন ঘটে। বড় বড় জমিদার, তালুকদার, চৌধুরী, তরফদার অথবা অন্যান্য মধ্যবর্তী রাজস্ব আদায়কারীদের মধ্যে একজনকে জমির মালিক বলে গণ্য করে তার সহিত জমির বন্দোবস্ত করা হয়। এই জমিদার প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট হারে গভর্ণমেণ্টকে খাজনা দিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হল। এই বন্দোবস্তের ফলে জমিদারবর্গের মধ্যে স্তরভেদ বিনষ্ট হওয়াতে সকলে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং ইংরেজ জমিদার শ্রেণীকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করে নতুন স্বত্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। এই সম্পর্কে ডক্টর এন. কে. সিংহ বলেন যে, "It would be wrong to assert that this class was a creation of British rule. Under the British there were only ramifications of this class and the profession contributed very considerably to its growth"

কিন্তু বর্ধিত হারে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব আদায়ের কঠোরতার জন্য বহু প্রাচীন বনেদী জমিদার বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। ফরাসী, দিনেমার ও ইংরেজদের অধীনে কর্ম বা ব্যবসা বাণিজ্য করে যারা কিছু অর্থ সঞ্চয় করেছিল তারা অনেকে জমিদারী ক্রয় করতে শুরু করে। এইভাবে ইংরেজের অনেক বেনিয়ান জমিদার হওয়াতে নতুন শ্রেণী বিন্যাসের প্রকাশ ঘটে। এই সম্পর্কে ডক্টর নরেন্দ্র সিংহ মন্তব্য করেন যে, "One-third to one-half of the Zemindaries of Bengal were sold by the rigour of the Sale-Law and they were mostly bought by rich parvenus, the banians from Calcutta, who had amassed their fortunes in their transactions with the English, the French and the Dutch and by those who had money by banking, contracts, inland trade and such other activities."

রেশম ব্যবসায়ী কান্তবাবু, মহারাজা নবকৃষ্ণ ও শিল্পপতি দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর ছায়ায় শিল্পদযোগী হয়ে প্রচুর অর্থসম্পদ যাঁরা লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে মতিলাল শীল, রামদুলাল দে, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রামকৃষ্ণ মল্লিকের নাম নানা কারণে পরিচিত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাংলায় পুঁজিপতি শ্রেণীর যে উদ্ভব হয় এই সময় থেকেই তার প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের যুগ। বাঙ্গালীর এই মূলধন সঞ্চয়ের যুগে বিশেষভাবে স্মরণীয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম ঐ যুগের ভোগ-লালসায় লিপ্ত জমিদারদের মধ্যে তিনি ছিলেন বিরাট ব্যতিক্রম। জমিদার ও ইংরেজ সরকারের আফিম ও লবণ বিভাগের দেওয়ান

হিসাবে তিনি প্রচুর অর্থ আয় ও সঞ্চয় করার সুযোগ পান এবং সেই অর্থকে উপযুক্ত ভাবে ব্যবহার করে দক্ষ শিল্প-সংগঠকের পরিচয় দিতে সমর্থ হন। দ্বারকানাথ নীলকুঠি স্থাপন করেন, আখ চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং 'কার ঠাকুর এণ্ড কোম্পানী' নামে একটি বাণিজ্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। এই কোম্পানী সম্পর্কে ডক্টর ত্রিপাটি মন্তব্য করেন, "the first instance in which an open and avowed partnership has been established between the European and the Bengali merchants." ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কার ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানী আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে চিনাকুরি কয়লা খনি ক্রয় করে এবং ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কার, ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানী ও গিলমোর, হমফ্রে অ্যাণ্ড কোম্পানী, যুগ্মভাবে বেঙ্গল কোল কোম্পানী গঠন করে। দ্বারকানাথের এই উদ্যোগ ছিল সম্পূর্ণ নতুন প্রকৃতির। যদিও শিল্পসংগঠক হিসাবে দ্বারকানাথ খুব সাফল্যের পরিচয় দিতে পারেন নি তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অনেকেই কয়লা শিল্পের উন্নতি সাধন করার ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ব্যর্থতার মূল কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা। তখনও ভারতে রেলপথ খোলা হয়নি। রেলপথ খোলার পূর্বে দেশে কয়লার চাহিদা খুব সীমাবদ্ধ ছিল। রেলপথ শুধু মাত্র এই খনিজদ্রব্যের ব্যবহারের নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেয় নি, বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কল-কারখানাগুলোতেও প্রয়োজনীয় কয়লা পৌছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। প্রকৃতপক্ষে কয়লা শিল্পের মৌলিক অসুবিধাগুলো দূর করতে অসমর্থ হওয়ার ফলে দ্বারকানাথের এই প্রচেষ্টা বিফল হয়।

(৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঃ

ইংরেজ আমলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব একটি বৈপ্লবিক ঘটনা। এই মধ্যবিত্ত কথাটির প্রকৃত সংজ্ঞা দেওয়া বড়ই কঠিন। মধ্যবিত্ত দুই প্রকার—(১) জমিবিহীন অর্থাৎ চাকুরীজীবী বা সামান্য ব্যবসাজীবী এবং (২) সামান্য জমিজমাসম্পন্ন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অধিকাংশেরই কিছু না কিছু জমি-জমা ছিল। কিন্তু ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষিতে মাথা পিছু চাপ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে কৃষির উপর কেবলমাত্র নির্ভর না করে সরকারী অফিস, বিভিন্ন শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে চাকুরী গ্রহণে অথবা ছোটখাট ব্যবসা অবলম্বন করতে তারা বাধ্য হয়। এইভাবে একদল চাকুরীজীবী অথবা ব্যবসায়ী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিপত্তি ও প্রভাব বিস্তৃত হয় পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের ফলে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে যারা বিশেষভাবে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা বিদ্বৎ-সমাজ বা গোষ্ঠী নামে পরিচিত হল। তবে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিরাট অংশ সরকারী ও বেসরকারী অফিসে কেরানীর পদে নিযুক্ত থাকত।

বাঙ্গলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে হিন্দু প্রাধান্যের কারণ মুসলমানরা হিন্দুদের মতো

ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে নি। মুসলমানদের নিকট থেকে ইংরেজরা রাজশক্তি অধিকার করে; সেজন্য মুসলমানদের ইংরেজীদের প্রতি একটি বিদ্বেষভাব ও ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা ছিল। তারা স্বাভাবিক কারণেই নিজেদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে গর্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বোধ করত। শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই বিদ্বেষভাব ও অসহযোগিতা উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজে অবনতির মূল কারণ। এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজনৈতিক কারণে ইংরেজগণ মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব এবং হিন্দুদের প্রতি পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি প্রদর্শন করত। বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট মুসলমানরা সেইজন্য হিন্দুদের মতো সুযোগ সুবিধা না পেলেও, যেটুকু পেয়েছিল তারও সদ্ব্যবহার করেনি। পুঁজিপতি শ্রেণীর মধ্যে এজন্যই হিন্দু প্রাধান্য দেখা যায়।

(৪) মজুর শ্রেণী:

মজুর শ্রেণীর উৎপত্তিই এই যুগেই শুরু হয়। ধনতান্ত্রিক যুগে এই শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটতে বাধ্য এবং তাদের দ্বারাই শ্রেণী সংগ্রাম অনিবার্যভাবে দেখা দেয়। চিরস্থায়ী-বন্দোবস্তের ফলে বহু কৃষক ও কারিগর জমি থেকে উৎখাত হয়। তাদের মধ্যে অনেকে কয়লাখনি, পাটকল, নীলক্ষেত, চা বাগান প্রভৃতিতে যোগ দিয়ে মজুর শ্রেণীর সৃষ্টি করে। মজুর শ্রেণীর দুটি প্রধান ভাগ—(১) গ্রামের ক্ষেতমজুর এবং (২) শহরের কলকারখানার মজুর।

নবযুগের নতুন শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে শ্রেণী বিরোধের বীজ উপ্ত হয়। ধণিকতন্ত্রের প্রথম যুগে সম্পদের স্বচ্ছলতার জন্য এই বিরোধ তেমন স্পষ্ট আকার ধারণ করে না। কিন্তু ধনিকতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও মজুর শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বেকারত্ব দেখা দিলে শ্রেণী সংগ্রাম প্রকাশ পায় এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাদর্শ ধীরে ধীরে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। তবে এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই নতুন শ্রেণীবিন্যাসের মধ্যে মধ্যযুগের রক্তের মর্যাদা ও কৌলীন্য অর্থহীন।

Q. 22 How and why the monoploy of trade of the East India Company abolished?

উত্তর। (১) ভূমিকা

ভারত ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডের একদল বণিক 'দি গভর্নর অ্যাণ্ড কোম্পানী অফ মারচ্যান্টস্ অব লণ্ডন ট্রেনিং ইনটু দি ঈস্ট ইণ্ডিজ' নামে একটি বাণিজ্য সংস্থা গঠন করে। তবে সাধারণভাবে এই প্রতিষ্ঠান ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামেই পরিচিত। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর ইংলণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের একটি সনদ অনুসারে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উত্তমাশা অন্তরীপের পূর্বদিকে সমগ্র অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার

লাভ করে। কয়েক বছর পরে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যসংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কিছু সুবিধা আদায়ের জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ক্যাপ্টেন হকিন্সকে দূতরূপে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করেন। কিন্তু পোর্তুগীজদের বিরোধিতার জন্য তাঁর পক্ষে জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বিশেষ কোন সুযোগ আদায় করা সম্ভব হয় নি। পরে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের দূতরূপে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে আসেন। তিনি নানারূপ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মোগল বাদশাহের কাছ থেকে কিছু কিছু বাণিজ্যিক সুযোগ আদায় করতে সমর্থ হন। ইতিমধ্যে আগ্রা, আর্মাগাওঁ, মসুলিপত্তনম, বরোচ প্রভৃতি স্থানে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগরের সামন্তরাজ চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে ইংরেজগণ মাদ্রাজ বন্দরের পত্তনি লাভ করে। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সম্রাট শাহজাহানের কাছ থেকে একটি ফরমান লাভ করে। এই ফরমান অনুসারে সম্রাট শাহজাহান ইংরেজ কোম্পানীকে বাণিজ্য-শুল্ক সংক্রান্ত কয়েকটি সুযোগ দিতে সম্মত হয়। ইতিমধ্যে বঙ্গোপসাগরের উপকূলে উড়িষ্যার বালেশ্বর এবং হরিহরপুরে ও মেদিনীপুরের নিকটবর্তী পিপলিতে ইংরেজদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে হুগলি এবং ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় এবং কিছুদিন পরে মালদহ ও রাজমহলে ইংরেজগণ বাণিজ্যকুঠি নির্মাণ করে। ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই বন্দরেও ইংরেজদের একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় ইংরেজদের সঙ্গে মোগলদের সংঘর্ষ দেখা দিলেও ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব ইংরেজদের একখানি নতুন ফরমান দেন এবং ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতায় একটি বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য সংঘর্ষ শুরু হলে কোম্পানীর বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নানারূপ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সুতরাং কোম্পানী মোগল সম্রাটের কাছ থেকে আর একখানি নতুন ফরমান আদায়ের চেষ্টা করে। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন মোগল সম্রাট ফারুখশিয়ার ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে একখানা ফরমান ও দুখানা-হুসব-উল হুকুম মঞ্জুর করেন। এই ফরমানে বাংলাদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে বলা হয় যে, হুগলি বন্দরের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বাণিজ্য শুল্কের পরিবর্তে ইংরেজ কোম্পানীর প্রতি বছর তিন হাজার টাকা সরকারী খাজাঞ্চিখানায় জমা দিতে হবে এবং এই তিন হাজার টাকা ব্যতীত তাদের কাছ থেকে অন্য কোন বাণিজ্য শুল্ক আদায় করা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করা হল। ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য কোনভাবে চুরি হলে তা পুনরুদ্ধার করা এবং চোরকে শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব ও মোগল রাজকর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা হয়। বাণিজ্যকুঠি স্থাপনের জন্য সরকারী কর্মচারীদের উপ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ও সাহায্য দানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাছাড়া মাদ্রাজে (চীনাপত্তন) নির্মিত মুদ্রার রৌপ্যের মান বাংলাদেশে প্রচলিত মুদ্রার সমান হলে কোনপ্রকার বাট্টা ব্যতীতই এই মুদ্রা বাংলাদেশের বণিকদের গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

(২) অন্যান্য বণিকদের কার্যকলাপ ঃ

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই একদল ইংরেজ বণিক কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের উপর অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করে। প্রথম থেকেই কোম্পানীর কর্মচারীরা এবং কয়েকজন ইংরেজ বণিক ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের ব্যক্তিগত ব্যবসা স্বাধীনভাবে পরিচালনা করার সুযোগ লাভ করেন। ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে এই সুযোগ শুধুমাত্র টংকিন এবং ফরমোসা ব্যতীত নিরক্ষবৃত্তের উত্তরের সমগ্র অঞ্চলেও বিস্তৃত করা হয়। এই ব্যবসা অত্যন্ত লাভজনক ছিল বলে ব্যবসায়ীরা নানা প্রকার দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করে। কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ কোম্পানীর জাহাজ ব্যবহার ব্যক্তিগত লোকসানকে কোম্পানীর লোকসানে পরিণত করা এমন কি কোম্পানীর মূলধন ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লগ্নী করা অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সবকিছুই করতে অভ্যস্ত ছিল। কিন্তু ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতিসাধনের ব্যাপারে কোম্পানীর কর্মচারীরা ছিঁচকেচোর মাত্র, প্রকৃতপক্ষে বাণিজ্যে ক্ষেত্রে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপকারীরা ছিল দুর্দান্ত ডাকাত। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ইংলণ্ডের একদল বণিক কোম্পানীর ব্যবসা বাণিজের ক্ষেত্রে নানাপ্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এইসব বাণকরা বণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপকারী (interloper) নামে পরিচিত। কোম্পানীর অসাধু কর্মচারীদের সঙ্গেও বাণিজ্যক্ষেত্রে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপকারীদের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। বিশেষত: মোগল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোম্পানীর শোচনীয় পরাজয়ের পর এই অবৈধ ব্যবসায়ীদের সুযোগ-সুবিধা অনেকগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের হাউস অফ কমন্সে একজন অবৈধ ব্যবসায়ী দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, এই ব্যবসাকে তিনি অন্যায় বলে মনে করেন না এবং পার্লিয়ামেণ্টে অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করার জন্য কোন আইন প্রণয়ন না করা হলে, কখনই তিনি এই ব্যবসা ত্যাগ করতে রাজি নন। অন্যদিকে কোম্পানী ১৬৮৭ থেকে ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজা এবং পার্লিয়ামেণ্টের সদস্যদের নিজেদের পক্ষে রাখার জন্য এক লক্ষ সাত হাজার পাউণ্ডের বেশি খরচ করলেও পার্লিয়ামেন্ট থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ইংলণ্ডের যেকোন ব্যক্তিই পূর্বদেশে বাণিজ্য করার সমান সুযোগ পাবে। ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ কারীর 'ইংলিশ ট্রেডিং কোম্পানী টু দি ঈস্ট ইণ্ডিজ নামে একটি বাণিজ্য সংস্থা গঠন করে। তবে বাংলাদেশে এই নতুন সংস্থা বিশেষ কোন সুযোগ লাভ করতে পারে নি। এগারো বছর কোন রকমে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে এই বাণিজ্য সংস্থা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে মিলিত হয়ে ইউনাইটেড কোম্পানী অফ দি মার্চ্যাণ্টস্ অফ ইংল্যাণ্ড ট্রেডিং টু দি ঈস্ট ইণ্ডিজ গঠন করে। কিন্তু এই কোম্পানী গঠিত হওয়ার পরেও ইংলণ্ডের বণিকগণ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করে।

(৩) একচেটিয়া অধিকার বিলোপ ঃ

পলাশীর যুদ্ধের পর অবস্থার বিরাট পরিবর্তন হয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক সংস্থা থেকে রাজনৈতিক সংস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার সুযোগ পেতে শুরু করে। মীরজাফর ও মীরকাশিমকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করার সময় কোম্পানী তাদের ব্যবসা ও বাণিজ্যিক স্বার্থ বৃদ্ধি করার জন্য নানারূপ নতুন নতুন শর্ত আরোপ করতে শুরু করে। বিশেষত: ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্র থেকে ফরাসী ও ওলন্দাজ বণিকদের ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে বিদায় গ্রহণের পর ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় থেকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের এক বিরাট অঞ্চলের অন্তর্দেশীয় ও বহির্দেশীয় বাণিজ্যের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হয়। সুতরাং ইংলণ্ডে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লোপ করার জন্য আবার প্রবল আন্দোলন শুরু হয়। ভারতীয় বাণিজ্য সকল ইংরেজ বণিক এবং বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের নিকট সমভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়াই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। কিন্তু কোম্পানীর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস্ পার্লিয়ামেন্টের সদস্যদের সাহায্যে কোম্পানী এই অধিকার বজায় রাখতে চেষ্টা করে। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীকে ভারতে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করার জন্য একটি নতুন সনদ দেওয়া হয়। এই সময় ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস। লর্ড কর্নওয়ালিস কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার তুলে দিলে স্বার্থলোলুপ ইংরেজ বণিকদের পরস্পর প্রতিযোগিতায় ইংলণ্ডের ভারতীয় বাণিজ্যের সর্বনাশ ঘটবে এই যুক্তি প্রদর্শন করে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হন। প্রকৃতপক্ষে ভারতের বাণিজ্যের সঙ্গে ইংলণ্ডের রাজা থেকে শুরু করে পার্লিয়ামেন্টের বহু সদস্যের স্বার্থই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার ফলে অন্যান্য বণিকদের দাবি পার্লিয়ামেন্টে প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্ট দ্বারা আরও বিশ বছরের জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেওয়া হয়। অবশ্য বছরে মোট তিন হাজার টন পণ্য দ্রব্যাদি ইংলণ্ডের সাধারণ বণিকদের ভারতবর্ষ থেকে ক্রয় করার অতি নগণ্য অধিকার এক চার্টার দ্বারা স্বীকৃত হয়। তবে এই সাধারণ সুযোগ প্রাপ্তির মধ্যেই সাধারণ বণিকদের আন্দোলনের জয় সূচিত হয় এবং তারা ভবিষ্যতে আরও প্রবল আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে থাকে।

ইতিমধ্যে ইয়োরোপের রাজনীতিতেও এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ফলে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীতে আবার বিশ বছরের জন্য নতুন সনদ দেওয়ার পূর্বে ইংলণ্ডের সাধারণ বণিকগণ কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করতে শুরু করে। সেই সময় ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মহাদেশীক ঘোষণা দ্বারা ইয়োরোপের বাণিজ্য বন্দরগুলোতে ইংরেজদের বাণিজ্য জাহাজ এবং ইংরেজ বণিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। ফলে ইংরেজ বণিকদের মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করার জন্য এক ব্যাপক আগ্রহ দেখা দেয়। ঈস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরোধিতা পার্লিয়ামেন্টের অভ্যন্তরে ও বাইরে তীব্র আকার ধারণ করে। ফলে ভারতের বাণিজ্য কয়েকটি শর্তাধীনে অন্যান্য বণিকদের নিকটও উন্মুক্ত করা হয় এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বভাবতই এক তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সনদের একটি শর্ত দ্বারা ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার সম্পূর্ণরূপে বাতিল করা হয়।

Q. 23. What were the causes of the decline of the old Zaminder's ? How did they survive ?

উত্তর। (১) ভূমিকা ঃ

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ১২ই আগস্ট ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দিল্লীর বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করেন। এই দেওয়ানী লাভের পরিবর্তে ক্লাইভ শাহ আলমকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা ভাতা এবং কারা ও এলাহাবাদ এই দুটি প্রদেশের অধিকার দিতে সম্মত হন। লর্ড ক্লাইভ মুর্শিদাবাদের নবাব নাজিব-উদ-দৌলাকে বার্ষিক ৫৩ লক্ষ টাকা ভাতাদানের বিনিময়ে বাংলা সুবার উপর তাঁর দাবি ত্যাগ করতে বাধ্য করেন। নাজিব-উদ্-দৌলা সিংহাসনে উপবেশন করার পর মহম্মদ রেজাখানকে বাংলাদেশের নায়েব-সুবা বা ডেপুটি গভর্নর নিযুক্ত করেন। ক্লাইভ রায় দুর্লভ ও জগৎ শেঠকে রেজা খানের সহকারীরূপে নিযুক্ত করে একই হস্তে ক্ষমতা ন্যস্ত করার সম্ভাব্য বিপদ এড়াবার ব্যবস্থা করেন। তাছাড়া রাজা সীতাব রায়কে পাটনা বাণিজ্যকুঠির প্রধানের সহিত যুগ্মভাবে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দেওয়া হল। কিন্তু দেওয়ানি লাভের পর অনেক বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার পরও ক্লাইভের পক্ষে বাংলাদেশের ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হল না। তাছাড়া কোম্পানীর কর্মচারিবর্গের দেশীয় রাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা, তাদের মধ্যে ব্যাপক দুর্নীতি এবং সর্বোপরি বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের ঈর্ষা প্রভৃতির কথা বিবেচনা করে ক্লাইভ দেওয়ানীর কাজ প্রকাশ্যভাবে কোম্পানীর হস্তে গ্রহণ করতে সম্মত হলেন না। দেওয়ানী সংক্রান্ত কাজের দুটি প্রধান দায়িত্ব ছিল রাজস্ব আদায় এবং দেওয়ানী মামলা বিচার। নবাবের উপর এই সকল দায়িত্ব পূর্বের মতই থেকে গেল। অথচ রাজস্বের মালিক হল কোম্পানী। ফলে নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এবং কোম্পানী পেল দায়িত্বহীন ক্ষমতা। এইরূপ অকার্যকর ও অদ্ভুত ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে বাংলাদেশের প্রজাবর্গের বিশেষতঃ জমিদারদের দুর্দশার সীমা ছিল না। এই ব্যবস্থা চালু হওয়ার কিছুদিন পরে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ইতিহাসে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়াতে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং বাংলাদেশের বহু জমিদার পরিবারের পক্ষেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে।

(২) জমিদারদের দুর্ভোগ ঃ

তবে বাংলাদেশের ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের প্রকোপ শতগুণে বৃদ্ধি করে তোলার চেষ্টা করে ইংরেজ ও নবাবের কর্মচারীরা। দুর্ভিক্ষ, পীড়িত দরিদ্র জনসাধারণের নিকট থেকে সেই বছর (১৭৭০-৭১ খ্রীষ্টাব্দে) অপরাপর বছর অপেক্ষা দু লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা অধিক রাজস্ব আদায় হয়। তাছাড়া জমিদারদের এবং সাধারণ প্রজাদের সর্বনাশ করার জন্য ইংরেজ কর্মচারী, এমনকি স্বয়ং গভর্নরও নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে শুরু করেন। বর্ধমানের মহারাণীর অভিযোগ থেকে জানা যায় যে গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস পনের হাজার টাকা ঘুষ নিয়ে তাঁর পছন্দ করা এক ব্যক্তিকে বর্ধমানের জমিদারীর একটি বিরাট অংশ পত্তনি দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষ এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের প্লাবনের ফলে জনসাধারনের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেলে তাদের উপকারার্থে নাটোরের জমিদার রাণী ভবানী প্রজাদের কর মকুব করেন। ফলে সরকারী কোষাগারে নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব জমা দিতে অসমর্থ হন। ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্দেশে রাণীর প্রাসাদ আক্রমণ ও অবরুদ্ধ করে বাকি খাজনা আদায় করার ব্যবস্থা করা হয় এবং দুলাল রায় নামক এক ব্যক্তিকে রাজসাহীর জমিদার নিযুক্ত করা হয়। পরে যদিও রানী পুনরায় তাঁর সম্পত্তির উপর তাঁর অধিকার স্থাপন করতে সমর্থন হন তথাপি ইংরেজ সরকারের এই নীতির ফলে তাঁর সম্পত্তির একটি অংশ তাঁর হাতছাড়া হয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানের অনেক জমিদার এই সময় তাদের ভূ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং অনেকের পক্ষে বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও সেই সম্পত্তি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

(৩) ইংরেজ সরকারের রাজস্বনীতি ও জমিদারগণ ঃ

ওয়ারেন হেস্টিংস শাসন দায়িত্ব লাভ করার পর রাজস্ব বিভাগ সংস্কারের চেষ্টা করেন। তিনি প্রতি পাঁচবছরের জন্য জমিদারদের সঙ্গে একটি নতুন বন্দোবস্ত করার নীতি অনুসরণ করেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের রাজস্ব ব্যবস্থা সদিচ্ছাপ্রসূত হলেও সাফল্য অর্জন করেনি। হেষ্টিংস ব্যক্তিগতভাবে পূর্বেকার জমিদারদের সহিত বন্দোবস্তের পক্ষপাতী হলেও কার্যক্ষেত্রে যে সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয় তাদেরই জমিদারী দেওয়া হয়। ফলে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জমিদার যেমন তাদের জমিদারী থেকে বঞ্চিত হয়, কোম্পানীও অভিজ্ঞ রাজস্ব-আদায়কারীদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়। হেষ্টিংসের পঞ্চবার্ষিক বন্দোবস্তের পূর্বে জমিদারগণ প্রতি বছরই নতুন করে বন্দোবস্ত গ্রহণ করতেন বটে, কিন্তু তাঁরা নিজ জমিদারী হতে কোনকালে বঞ্চিত হতেন না। কিন্তু অভিজ্ঞ জমিদারদের স্থলে নতুন জমিদারদের নিয়োগের ফলে রাজস্ব বিভাগের জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলাদেশের রাজস্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ স্যার জন শোরের মতামত উপেক্ষা করে তাঁর প্রবর্তিত দশ বছরের বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত করার ব্যবস্থা করেন। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার সময় জমি জরীপ, নতুন কর নির্ধারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ের উপরই দৃষ্টি না দেওয়ায় এই ব্যবস্থার

মধ্যেও অনেক ত্রুটি দেখা দেয়। কিন্তু কর্নওয়ালিস ও জন শোর উভয়েই পূর্বতন অভিজ্ঞ জমিদারদের স্বত্ব জমিদারীতে পুনর্বহাল করার চেষ্টা করেন। ফলে প্রাচীন ও বনেদী বহু জমিদার পরিবার আবার তাদের জমিদারী ফিরে পেতে সমর্থ হন। কিন্তু এই ব্যবস্থায় কঠোর 'সূর্যাস্ত আইন' বলবৎ থাকার জন্য অনেক জমিদারের পক্ষেই জমিদারীর আয়তন অটুট রাখা সম্ভবপর হয় নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কার্যকরী হওয়ার পরবর্তী ২০ বছরের মধ্যে অনেক বড় বড় জমিদারই নির্দিষ্ট সময়ে রাজস্ব জমা দিতে অসমর্থ হয়ে তাঁদের জমিদারীর অংশ বিক্রয় করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় পুরো জমিদারীও বিক্রি হতে শুরু করে। রাজসাহী অথবা বর্ধমানের জমিদারগণও তাঁদের জমিদারীর বহু অংশ বিক্রি করতে বাধ্য হন। এইভাবে বহু পুরানো জমিদারবংশের বিলুপ্তি ঘটে এবং নতুন নতুন জমিদারদের উদ্ভব হয়।

তবে এইরূপ অবস্থায় জমিদারদের পক্ষে দুটি সুযোগ থাকার জন্য তাদের অস্তিত্ব একেবারে বিলোপ হয়ে যায় নি। প্রথমতঃ, পত্তনি অথবা স্থায়ীভাবে লীজ দিয়ে জমিদারগণ তাদের জমিদারী রক্ষা করার একটি অভিনব পন্থা গ্রহণ করেন। তালুকদার, জোতদার বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যগদের (Middleman) সঙ্গে জমির বন্দোবস্ত করে জমিদারগণ নিশ্চিন্ত মনে গ্রাম ত্যাগ করে নাগরিক জীবনের বিলাসবহুল জীবন যাপন করার সুযোগ পেতে শুরু করেন। নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির আয়ের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল তালুকদারগণ কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করে জমিদারদের প্রাপ্য নির্দিষ্ট সময়ে প্রেরণ করার ব্যবস্থা করতেন। ফলে জমিদারদের আর্থিক দুর্ভাবনা ও সূর্যাস্ত আইনের বিভীষিকা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুযোগ-প্রাপ্ত জমিদারগণের সরকারকে দেয় রাজস্বের হারের পরিমাণ যথেষ্ট কম ছিল। জমিদারী থেকে তাদের প্রকৃত আয় এবং সরকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্বের মধ্যেও বিরাট পার্থক্য ছিল। এই অতিরিক্ত আয় তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। তাছাড়া অব্যবহৃত ও পতিত জমি উদ্ধারের পর এই সময় জমি নতুন করে পত্তনি দেওয়া হয় এবং জমিদারদের আয় বৃদ্ধির নতুন একটি পথের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারদের সঙ্গে সরকারের নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের ভিত্তিতে বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে এই নতুন জমির আয়ের কোন অংশই সরকারের প্রাপ্য ছিল না। নতুন জমি থেকে আদায়ীকৃত রাজস্বও জমিদারদের বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয়।

Q. 24. Write a critical note on the Muslim society of Bengal.

উত্তর : (১) বাংলার মুসলিম সমাজ :

অবিভক্ত ভারতবর্ষে বসবাসকারী মুসলমানদের অর্ধেকের বেশিই একমাত্র বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে বাস করত এবং এই দেশের অন্যান্য এলাকার মুসলমানদের সঙ্গে তাদের প্রচণ্ড পার্থক্য দেখা যায়। তার মূল কারণই হল বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমানই অবজ্ঞাত, অস্পৃশ্য ও অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের বংশধর। নানাশ্রেণীর হিন্দুদের সহিত

বিদেশী আরবী ইরানী তুর্কী, আফগান মুসলমানদের সংমিশ্রণের ফলে বাংলার স্বল্প সংখ্যক আশরাফ বা অভিজাত মুসলমানের সৃষ্টি হয়। কিন্তু এদেশের অধিকাংশ মুসলমানই অনভিজাত অর্থাৎ ধর্মান্তরিত হিন্দুদের বংশধর। এই হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা উৎপীড়িত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। মানবপন্থী বাংলাদেশে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় তাই সহজে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। এই সম্পর্কে ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লেখেন যে, "ধর্মোন্মত্তার ফলে হিন্দুদের বলপূর্বক কিছু কিছু মুসলমান করিয়া দেওয়া যে হয় নাই, তাহা নহে। তবে পীর, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া প্রভৃতিদের প্রচার ও কেরামতীর ফলে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণদের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ বৌদ্ধ ও অন্যান্য মতের বাঙ্গালী, ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। বাংলাদেশে যে মতের মহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা খাঁটি শরিয়তী অর্থাৎ কোরান অনুসারী ইসলাম নহে। বাংলাদেশে ইসলামের সুফীমতই বেশী প্রসার লাভ করে। সুফীমতের ইসলামের সহিত বাংলার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর তেমন বিরোধ নাই। সুফীমতের ইসলাম সহজেই বাংলার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন মার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। মধ্যযুগে তুর্কীবিজয়ের পর হইতে যে ইসলাম বাংলায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর পক্ষে সহজগ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাংলাদেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই 'মজমুঅ অল বহ্রৈন' অর্থাৎ দুইটি সাগরের সম্মিলন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।"

(২) সমাজের অবস্থার পরিবর্তন ঃ

কিন্তু মুসলমান শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজরা যে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাণী বাংলাদেশে নিয়ে আসে তার সঙ্গে মুসলমান ভাবধারা আপস করতে সমর্থ হয়নি। তবে মুসলমানদের এই আপসহীন মনোভাবের জন্য কয়েকটি কারণ বিশেষভাবে দায়ী। W. W. Hunter তাঁর The Indian Muslims নামক গ্রন্থে অষ্টাদশ শতাব্দীর মুসলমানদের দুরবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তদানীন্তন সম্ভ্রান্তবংশীয় মুসলমানদের অর্থাগমের তিনি তিনটি প্রধান উপায়ের কথা বলেন। এগুলো হল —সামরিক বিভাগ রাজস্ব বিভাগ এবং বিচার অথবা রাজনৈতিক বিভাগে চাকুরী। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি থেকে মুসলমানরা সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত হয়। সাধারণভাবে ইংরেজদের সামরিক বিভাগে কোন মুসলমান নিয়োগ করা বন্ধ হল। যদি কখনও কোন মুসলমান এই বিভাগে প্রবেশ করার সুযোগ পেত, তার সম্পদ সংগ্রহের কোন সুযোগ অবশিষ্ট ছিল না।

মুসলমান আমলে রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদগুলোতে সাধারণতঃ মুসলমানদেরই অধিষ্ঠিত থাকতে দেখা যায়। তবে কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত কর্ম হিন্দু নাজির বা বেলিফরাই সম্পাদন করত। এই অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীরা ঊর্ধ্বতন মুসলমান কর্মচারীদের নিকট সংগৃহীত রাজস্ব জমা দেওয়ার সময় তাদের প্রাপ্য লভ্যাংশ গ্রহণ করত। তবে ঊর্ধ্বতন মুসলমান কর্মচারীরাই রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে সম্রাটদের নিকট দায়ী থাকতেন। এই ব্যবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহের সূত্রে মুসলমান কর্মচারিগণ

প্রচুর অর্থসম্পদ লাভ করতেন। কারণ, কোন দেওয়ানী আদালতের নিয়ম অনুযায়ী তাঁরা রাজস্ব স্থির করতেন না। কিন্তু তাঁদের ধার্য রাজস্ব তাঁরা সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বলপূর্বক আদায় করার ব্যবস্থা করতেন।

দিল্লীর সম্রাটের নিকট থেকে ইংরেজরা প্রধান রাজস্ব আদায়কারী হিসাবে বাংলাদেশ লাভ করে। এই রাজস্ব আদায়ের অধিকার তারা তরবারির জোরে লাভ করলেও তাদের আইনসম্মত উপাধি ছিল দেওয়ান বা রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী। সেজন্য মুসলমানগণ মনে করত যে, ইংরেজরা মুসলমান পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য। ইংরেজরাও প্রথম দিকে মুসলমান কর্মচারীদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখা তবে পূর্ববঙ্গে, এমনকি মুসলিম রাজত্বের যুগেও হিন্দুদের প্রাধান্য ছিল।

লর্ড কর্নওয়ালিস ও স্যার জন শোর ক্রমে ক্রমে এই মোগল পদ্ধতির কতকগুলো পরিবর্তন সাধন করে। এই পরিবর্তনগুলো পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হয়ে মোগল রাজস্ব ব্যবস্থাকে একটি নতুন রূপ দান করে। ১৭৯৩, খ্রীষ্টাব্দের এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান কর্মচারীর স্থলে প্রত্যেক জেলায় একজন ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত হন। এই বন্দোবস্তের অন্যতম নীতি হল অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারীদের জমিদার হিসাবে স্বীকৃতি দান। এভাবে মুসলমান রাজস্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে মুসলমান-শীর্ষস্থানীয় পরিবারসমূহের পদমর্যাদা বিনষ্ট হতে শুরু করে এবং মুসলমানদের সম্পদ হিন্দুর হাতে আসতে শুরু করে। এই সম্পর্কে W W. Hunter বলেন যে, "The Permanent Settlement, however, consummated rather than introduced this change. It was in another respect that it most seriously damaged the position of the great Mahammedan Houses. For the whole tendency of the Settlement was to acknowledge as the landholders the sub-ordinate Hindu officers who dealt directly with the husbandmen"

তৃতীয় উপায় অর্থাৎ শাসন বিভাগীয় কর্ম, যা মুসলমানদের প্রায় একচেটিয়া ছিল। তখন তাও তাদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। সরকারী চাকুরী এবং বেসরকারী উচ্চপদ অধিকার থেকেও মুসলমানগণ বঞ্চিত হতে শুরু করে। অপরদিকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এইসব পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের শিক্ষাপদ্ধতিও সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে এবং মুসলমান সমাজের ধীরে ধীরে শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে পড়ে।"... the Muhammedans are now shut out equally from Government employ and from the higher occupation of non-official life. Hundred of ancient families were ruined and the educational system of the Muslims, which was almost entirely maintained by rent free grants, received its death blow."

(৩) নবজাগরণ ও মুসলিম সমাজ ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। অপরদিকে উনবিংশ-

শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ফার্সীর স্থলে কোর্ট-কাছারীতে ইংরেজী ভাষা, প্রবর্তিত হয়। অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও এই ভাষার পরিবর্তনের ফলেও মুসলমানদের ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং মুসলমানগণ ইংরেজ শাসন পদ্ধতির সহিত সহযোগিতা করতে এমনকি ইংরেজী ভাষা শিখতেও আগ্রহ প্রকাশ করে নি। তবে ইংরেজী শিক্ষার বিপক্ষে যাওয়ায় মুসলমানদের আরও দুটি কারণ ছিল—(১) খ্রীস্ট ধর্মান্তরিত হওয়ার ভয় ও (২) ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলজনিত ব্রিটিশ বিদ্বেষ। ওয়াহাবী আন্দোলনের ঢেউ বাংলার দূরতম প্রান্তেও গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বাংলার নবজাগরণের ভাবধারার প্রধানতঃ ইংরেজী শিক্ষা-দীক্ষা হতে জন্মলাভ করে। সেজন্য ইংরেজ বিদ্বেষবশতঃ মুসলমানগণ নবজাগরণ থেকে দূরে সরে থাকে এবং নবজাগরণের প্রাণচাঞ্চল্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলমান সমাজে বিশেষ দৃষ্ট হয় নি।

ওয়াহাবী আন্দোলনেই ছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মুসলমান সমাজের প্রধান ঘটনা। ওয়াহাবী আন্দোলন বাংলার মুসলমান কৃষকসমাজে বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। নীলকরদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবীগণ আন্দোলন চালায়। বলতে গেলে এই আন্দোলনকারীরাই বাংলার প্রথম সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের মধ্য হতেই প্রথম রাজনৈতিক আসামী দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হয়।

(৪) উপসংহার ঃ

তবে ওয়াহাবী আন্দোলন ছাড়া এই সময় মুসলমান সমাজের মধ্যে জাগৃতির কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যায় নি। কলকাতার মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মুসলমান ছিল। ব্রিটিশ শাসনে যে ধনিকশ্রেণীর সৃষ্টি হয় তার মধ্যেও মুসলমান ছিল না বললেই চলে। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতার আইন ব্যবসায়ীদের বেশির ভাগই ছিল মুসলমান। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের পরে নতুন একজনও মুসলমান আইন ব্যবসায়ী কলকাতা কোর্টে যোগদান করেন নি। সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এই অবস্থার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের সকল সরকারী চাকুরীই প্রায় মুসলানদের হস্তগত ছিল কিন্তু একশ বছর পরে ইংরেজ সরকারের কাজে নিযুক্ত ভারতীয়দের মধ্যে মাত্র ১২ শতাংশ পদ মুসলমানগণের অধিকারে ছিল। ভূসম্পত্তির ব্যাপারেও বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। এমনকি পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণের সংখ্যাধিক্য থাকলেও ভূস্বামীগণ বেশিই ছিলেন হিন্দু। বাখরগঞ্জ (বরিশাল) জেলার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৬৮·৮ জন ছিল মুসলমান ধর্মাবলম্বী কিন্তু ঐ জেলার মাত্র ১০ শতাংশ জমি তাদের হাতে ছিল এবং মোট ভূমি রাজস্বের মাত্র ৯ শতাংশ তাদের কাছ থেকে আদায় হত। ময়মনসিংহ জেলায় ১৬ শতাংশ জমির মালিক ছিল মুসলমানগণ এবং তারা ঐ জেলার ভূমিরাজস্বের মাত্র ১৬ শতাংশ দিত। তাছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি মূলতঃ ছিল নগরকেন্দ্রিক কিন্তু বাংলাদেশের বেশির ভাগ মুসলমানই গ্রামে বাস করত ফলে এই সংস্কৃতি ও সমৃদ্ধির কোন সুফল ভোগ করাও তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

Q. 25. Do you think that the concept of "domination effect" is useful to understand the operations of the East India Company in the late 18th Century ?

Ans. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইংরেজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি উৎপাদন সংগঠন ও বাজারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেছিল। এর ফলে বাংলার অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছিল। ১৮১৩-র চার্টার আইন পর্যন্ত কোম্পানি বাংলায় যে ধরনের বাণিজ্যিক কাঠামো তৈরী করেছিল তা "Domination Effect" নামে পরিচিত। কোম্পানি যে ধরনের অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল তা বাজারের স্বতস্ফূর্ত নিয়ম থেকে উদ্ভূত হয় নি। এর পশ্চাতে এমন কিছু কারণ ছিল যা অর্থনীতির স্বাভাবিক জ তের বহির্ভূত। তিনটি বিষয় নিয়ে এই আধিপত্য গড়ে উঠেছিল। এগুলি হল—(১) কোম্পানির কার্যকলাপের ব্যাপকতা, (২) মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থায় কোম্পানির ভূমিকা এবং (৩) সামগ্রিক বাংলার অর্থনীতিতে কোম্পানির প্রতিষ্ঠা।

শিল্পের ক্ষেত্রে কোম্পানি তিনভাবে Domination অথবা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। (১) কোম্পানি একক বৃহত্তম ক্রেতা হিসাবে বাজার নিয়ন্ত্রণ করেছিল। (২) কোম্পানি নিজেদের সুবিধামতো জিনিসের আমদানী ও রপ্তানী পরিচালনা করত। (৩) নিয়ন্ত্রণের জন্য কোম্পানি এমন একটি কাঠামো তৈরী করেছিল, যার সাহায্যে মৌলিক শিল্পদ্রব্য পাওয়া সম্ভব হত। সুতরাং ভারতীয় পুঁজির গতিবিধি কোম্পানির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত।

১৭৫৩ থেকে ১৭৭০-এর শেষ দশক পর্যন্ত বস্ত্রশিল্পে এই তিন ধরনের পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়। দাদনী থেকে Agency প্রথায় চলে আসা, অন্যান্য ইউরোপীয় প্রতিযোগীদের ক্ষমতা খর্ব করা, অল্প সময়ের মধ্যে (১৭৫৭-৬৩) বাংলার রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং কোম্পানির প্রতিনিধিদের ক্ষমতা বস্ত্রশিল্পে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। ইংরেজরা ১৭৮০-র দশকের মধ্যে তাদের আধিপত্য মজবুত করেছিল। তাদের প্রতিযোগী বলতে আর কেউ ছিল না এবং তারা প্রায় একচেটিয়া আধিপত্য স্থাপন করেছিল।

এই রাজনৈতিক আধিপত্য ১৭৬৫ থেকে কোম্পানির অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিল। ঐ সময় কোম্পানি দেওয়ানী লাভ করায় তার পক্ষে বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব কৃষি থেকে শিল্পে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ কোম্পানি এই সময়ে বাণিজ্যের স্বার্থে ভূমি-রাজস্ব ব্যবহার করেছিল।

আধিপত্য বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের কার্যকলাপে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সমকালীন তথ্য থেকে জানা যায় যে, কোম্পানি মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত শর্তগুলি নিজেদের স্বার্থে ঠিক করে। মজুরির হারকে প্রায় নিম্নতম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বস্তুতঃ এটা কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার অঙ্গ ছিল। ঢাকায় ইংরেজ রেসিডেন্ট লিখেছেন যে,

তাঁতীরা ১০% থেকে ৩০% হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কোম্পানি যে হারে তাদের কাছ থেকে কাঁচামাল কিনত এবং মজুরি দিত তা মোটেই পর্যাপ্ত ছিল না।

আধিপত্যের ফল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। দেবেন্দ্র বিজয় মিত্রের মতে ইংরেজরা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে সক্ষম হয় নি। তাঁর মতে ইংরেজ কোম্পানীকে ফরাসী ও ডাচদের বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোন কোন সময়ে অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। যেমন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে। এই বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে কোম্পানি বাণিজ্যিক রেসিডেন্ট নির্ধারিত বিনিয়োগ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিল। মিত্রের মতে মোট তাঁতীর ৩৩% কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণে ছিল।

ইংরেজ কোম্পানি আরো একটি কারণে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ হয়েছিল। তা হল তাঁতীদের প্রতিরোধ। তাঁতীরা কোম্পানির কাছ থেকে দাদনী বাবদ অগ্রিম টাকা নিতে অনিচ্ছুক ছিল। তার কারণ এতে তাদের অত্যন্ত সামান্য লাভ হত। ব্যক্তিগত বাণিজ্যকারী এবং অন্যান্য বিদেশী কোম্পানিগুলির এজেন্টরা ইংরেজ কোম্পানি অপেক্ষা ১৫% থেকে ৪০% বেশী দাম দিতে প্রস্তুত ছিল। ইংরেজ কোম্পানি জিনিস ক্রয়ের সময় এত বেশী দাম দিতে পারত না। তার কারণ তাদের হাতে নগদ টাকার অভাব ছিল। তাছাড়া কোম্পানি কেনা কাপড়ের মান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিল। সুতরাং তাঁতীরা কোম্পানির অনুশাসন অমান্য করত। কোম্পানি ১৭৮৬-৮৭তে তাঁতীদের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিল। পরে এইসব অনুশাসন কোম্পানির প্রতি তাঁতীদের আরো বিরূপ করে তুলেছিল।

মিত্র আরো লিখেছেন যে, তুলো ও বস্ত্রশিল্পের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে রেশম, আখ ও নীল চাষের সম্প্রসারণ ঘটেছিল। তার ফলে কাঁচামাল ও আধা শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। অধ্যাপক ত্রিপাঠী এই মত সমর্থন করেন। তাঁর মতে ভারতীয় অর্থনীতিবিদরা ভারতে তুলো উৎপাদনের অবক্ষয় নিয়ে এত বেশী আলোচনা করেছেন যে, তাঁরা কাঁচামাল নিয়ে বাণিজ্যিক অগ্রগতির দিকটি উপেক্ষা করেছেন।

মিত্রের যুক্তিতে কিছু ফাঁক রয়েছে। তিনি যে ধরনের নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছেন তার অর্থ এই নয় যে, অন্য শ্রেণীর ক্রেতার অস্তিত্ব ছিল না। ১৭৫৭-৬৭-তে যে ধরনের অনুশাসন চালু ছিল তা থেকে দু'টো জিনিস বোঝা যায়—বাজারে আরো ক্রেতা ছিল এবং কোম্পানি তার নিয়ন্ত্রণ বজায়ের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। তাছাড়া বাজারের স্বাভাবিক নিয়ম ছাড়াও কোম্পানি অন্য উপায়ে তার একচেটিয়া অধিকার রাখার চেষ্টা করেছিল।

মিত্র দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ কোম্পানির সঙ্গে ফরাসী ও ডাচ কোম্পানিগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখনই জোরদার হত তখন ইংরেজরাই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করত। ইংরেজরা ফরাসীদের যেসব সুবিধা দিয়েছিল তা ছিল অত্যন্ত কম। ডাচদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যেসব গোমস্তা কোম্পানি সমর্থন-পুষ্ট ছিল

তাদের অবস্থা ছিল বিশেষ সুবিধাজনক। মোট কথা এই যে, এই বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংরেজ কোম্পানি রাজনৈতিক শক্তির সাহায্য নিয়েছিল।

মিত্র দেখিয়েছেন যে, নতুন ধরনের বাণিজ্যিক ফসলের সাহায্যে বস্ত্র শিল্পে অবক্ষয় জনিত ক্ষতি অনেকটা লাঘব হয়েছিল। বাণিজ্যিক ফসলের প্রসারের ফলে বাংলার কৃষি বৃটেনে কাঁচামাল সরবরাহের ভূমিকা নিয়েছিল। চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চা এবং আফিং ব্যবহার করা হয়েছিল। ইউরোপের সঙ্গে সুষম বাণিজ্যের স্বার্থে নীল ব্যবহার করা হয়েছিল। সুতরাং ভারতীয় কৃষি বৃটিশ শিল্প বিপ্লব এবং তৎজনিত চাপ সহ্য করে টিকে ছিল। বাংলার কৃষি আন্তর্জাতিক বাজারের উপর আরো বেশী নির্ভরশীল হয়েছিল। সুতরাং বিদেশের বাজারের দামের ওঠানামা বাংলার কৃষিকে প্রভাবিত করেছিল।

নতুন বাণিজ্যিক ফসলের পশ্চাতে একমাত্র ইংরেজরা অর্থ ব্যয় করেছিল। তারা এর সাহায্যে তাদের ভাগ্য তৈরী করেছিল। এ ব্যাপারে তারা এজেন্সী সংস্থাগুলির মাধ্যমে কাজ করেছিল। ইংরেজদের-অর্থ নৈতিক আধিপত্য তখনও বজায় ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ রেশমের কথা উল্লেখযোগ্য। পলাশীর পর পুরনো শিল্পের অথবা রেশম উৎপাদনের জায়গায় নতুন শিল্পের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।

এরপর নতুন রেশমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা গুটিপোকার চাষে উৎসাহ দিয়েছিল। ১৭৭০-এ দুর্ভিক্ষের সময় গুটিপোকার চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৭৮৫-র মধ্যে রেশমের বাজারে আবার পুনরুত্থান ঘটেছিল। ইংরেজরা উন্নতমানের জিনিস পেতে চেয়েছিল কোর্ট অফ্ ডিরেক্টার্স সেই উদ্দেশ্যে (ভাল মানের জিনিস পাওয়া এবং প্রতিযোগিতা দূর করা) বাংলার সরকারকে গুটিপোকার চাষ নিয়ন্ত্রণ করতে বলেছিল। অনেক ইংরেজ ব্যবসায়ী তাদের নিজের পুঁজি দিয়ে গুটিপোকার চাষে উৎসাহ দেখিয়েছিল। এখানেও আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

শেষ অধ্যায়ে মিত্র লিখেছেন যে, আধিপত্যে চেষ্টা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। তবে আমরা দেখেছি যে, নানাভাবে ও নানা কারণে ইংরেজরা অর্থনীতির উপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল। সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও মিত্র বাণিজ্যিক ও অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। যখন আমরা 'Domination'-এর মতো শব্দ প্রয়োগ করি তখন আমরা কোন একটি বিশেষ বৎসর চিহ্নিত করি না। সাধারণভাবে ১৭৫৭-র পরবর্তী যুগে বাংলার অর্থনীতির উপর ইংরেজ আধিপত্য নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

Q. 26. Discuss the growth activity and fall of Managing Agency H.

Ans (১) ভূমিকা :

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই কোম্পানীর জাতীয় সংগঠনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ভারতে ম্যানেজিং এজেন্সী হিসাবে পরিচিত অনন্যসাধারণ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান

গড়ে উঠতে শুরু করে। যৌথমূলধনী কোম্পানীগুলো সাধারণতঃ বহুসংখ্যক অংশীদার নিয়ে গঠিত হত, কিন্তু ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক অংশীদার নিয়ে গঠিত হয়। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো কোম্পানীগুলোর পরিচালক অথবা প্রতিনিধি হিসাবে কোম্পানীগুলোর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে এবং কোম্পানীগুলো যে উদ্দেশে গঠিত হয়েছিল সেই কাজ সম্পাদন করে। অন্য একদল লোকের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পরিচালনা করার প্রথম দিকের একটি উদাহরণ কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত একটি বীমা প্রতিষ্ঠানের কার্য বিবরণী থেকে জানা গিয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে এই ধরনের ম্যানেজিং এজেন্ট নিয়োগ করার রীতি ব্যাপকভাবে ব্রিটিশ এবং ভারতীয় উভয় ধরনের কোম্পানী কর্তৃক অনুসৃত হয়।

(২) **ম্যানেজিং এজেন্সী গঠনের কারণ ঃ**

ভারতীয় ব্যবসায়ীগণের মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো কেন দ্রুত গড়ে ওঠে এবং জনপ্রিয়তা অর্জন করে তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতে ব্যবসায়ী উদ্যোগ, বিশেষতঃ পথ-প্রদর্শনকারী প্রকৃতির ব্যবসা-উদ্যোগ খুবই কম ছিল। কিন্তু ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার মতো মূলধন দুষ্প্রাপ্য ছিল না। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ, ইয়োরোপীয় বণিকগণ এবং ভারতের বণিকগোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত সঞ্চয়ের পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য ছিল না। যে সকল শ্রেণীর লোকদের নতুন বাণিজ্যিক ও শিল্প উদ্যোগে মূলধন বিনিয়োগ করার ক্ষমতা ছিল তাদের অনেকেই এই ধরনের উদ্যোগের দেখাশোনা করার দায়িত্ব বহন করতে সমর্থ ছিলেন না। ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থা একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সত্বাধিকারী এবং পরিচালক গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রম বিভাগ সম্ভব করে এই সমস্যার সমাধান করে। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান পারিশ্রমিকের পরিবর্তে অন্যের মালিকানাধীন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার কার্যভার গ্রহণ করত। এই পারিশ্রমিকের ভিত্তি এবং পরিমাণ ম্যানেজিং এজেন্সীর চুক্তির ধারা অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন রকমের হত। তবে এই পারিশ্রমিকের পরিমাণ বিচক্ষণ ব্যবসায়ীদের নিজেদের ম্যানেজিং প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে উৎসাহ দিত এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূলধন নিয়ে অন্যান্য পুঁজিপতির বিনিয়োগীকৃত মূলধনের তত্ত্বাবধান করতে প্রেরণা দান করত। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে একদিকে প্রখর ব্যবসায়ীবুদ্ধি এবং অপর দিকে অন্যের নিকট থেকে সংগৃহীত মূলধন এই দুটি পরস্পর পরিপূরক উপাদান, একে অন্যের সাহায্য করতে মিলিত হতে পারত।

(৩) **ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা ঃ**

ইংলণ্ডে সমিতিবদ্ধ কোম্পানীগুলোর ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সীগুলোর ক্ষেত্রে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রথাকে পছন্দ করার অতিরিক্ত একটি কারণ ছিল। এই ধরনের কোম্পানীগুলোর অংশীদারদের পক্ষে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে কোম্পানীগুলোর দৈনন্দিন প্রশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য একটি পরিচালকগোষ্ঠী খুঁজে বার করা খুবই কঠিন ছিল। ভারতে অবস্থিত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো যে শুধু অংশীদারদের এই দুশ্চিন্তা

থেকে মুক্ত করতে পারত তাই নয়, তারা ব্রিটেনে অবস্থিত অংশীদারগণকে ভারতে নতুন নতুন ব্যবসায়ে অর্থলগ্নী করার জন্য প্রস্তাবও দিতে পারত। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ বিনিয়োগ কারীগণ তাদের ভারতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সীমিতরূপে হলেও যে গতিশীলতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন তা এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলোর অস্তিত্ব না থাকলে সম্ভব হত কিনা সন্দেহ। সংক্ষেপে বলা যায় যে, ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমেই ব্রিটেনে বসবাসকারী বিনিয়োগকারীগণ নিশ্চিন্ত মনে ভারতে মূলধন বিনিয়োগ করতে উৎসাহিত বোধ করেন। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবর্তন ও জন-প্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই একই ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের উপর বিদেশে সমিতিবদ্ধ কয়েকটি কোম্পানীর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। অপর দিকে কয়েকটি কারণে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোম্পানীগুলো পরিচালিত হওয়ার ফলে প্রশাসনিক ব্যয়েরও যথেষ্ট সাশ্রয় হত। পরস্পরের সহিত সম্পর্কহীন একাধিক কোম্পানীর পক্ষে একটি সাধারণ কার্যালয়, একই নগদ পুঁজির ভাণ্ডার এবং ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠান নিযুক্ত একই বিশেষজ্ঞ দলের সাহায্য গ্রহণ করা সম্ভব হত বলে স্বাভাবিকভাবেই কোম্পানীর পরিচালনার ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেত। কিন্তু কখনও কখনও অতিরিক্ত দায়ভার গ্রস্ত ম্যানেজিং এজেন্ট ভারপ্রাপ্ত কোম্পানীগুলোর ক্ষতির কারণরূপে দেখা দিত।

(৪) মূলধন সংগ্রহের সুযোগ ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র শিল্প এবং বাণিজ্যসংক্রান্ত অভিজ্ঞতার কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হত না, তাদের হাতে যথেষ্ট পরিমাণে পুঁজির সঞ্চয়ও গড়ে উঠতে শুরু করে। কোন কোম্পানীর ব্যবসাসংক্রান্ত সুনাম আবার তার ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের উপর অনেকাংশে নির্ভর করত। কোম্পানীর আর্থিক প্রতিষ্ঠাও কোম্পানী নিযুক্ত ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের সুনামের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভরশীল ছিল। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলো কোন একটি কোম্পানীকে, এমনকি তার স্থায়ী সম্পত্তির জামিনের ভিত্তিতে ঋণ দেওয়ার সময়ও ম্যানেজিং এজেন্টের স্বাক্ষরের উপর জোর দিতে শুরু করে। অর্থাৎ ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও দুর্নামের উপর কোম্পানীর সুনাম ও দুর্নাম নির্ভরশীল ছিল। সুতরাং ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার বিকাশের সময় একমাত্র আর্থিক কারণে অনেক কোম্পানীর পক্ষে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর শরণাপন্ন হওয়ার আবশ্যিকতা দেখা দেয়। একটি নতুন প্রতিষ্ঠিত কোম্পানী যতক্ষণ একজন প্রতিষ্ঠিত ম্যানেজিং এজেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করতে না পারত ততক্ষণ তার পক্ষে শেয়ার বিক্রি করা প্রায় অসম্ভব ছিল এবং চলতি পুঁজি খুঁজে পাওয়াও খুব কঠিন ছিল। ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব কোম্পানীকে নিজেদের ছত্র ছায়ায় স্থাপন করতে সম্মত হত সেই সব কোম্পানীর শেয়ারে নিজস্ব এই বিলের কিছু অংশও বিনিয়োগ করত এবং পরে সুবিধা অনুযায়ী নিজেদের শেয়ারগুলো জনসাধারণের নিকট বিক্রি করে দিত। যে কালে

দেশের মূলধনীবাজার পশ্চাদপদ ছিল এবং শেয়ার বিনিয়োগের জন্য প্রত্যক্ষ আবেদনও যখন জনসাধারণের কর্ণগোচর হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল সেই সময়ে ম্যানেজিং এজেন্সীর তহবিল এইভাবে নতুন কোম্পানী গঠনের জন্য এক ধরনের 'আবর্তিত তহবিল' হিসাবে ব্যবহৃত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রসারে সাহায্য করত।

(৫) **দোষ-ত্রুটি :**

ম্যানেজিং এজেন্সী ব্যবস্থার কার্যকারিতা এইভাবে দেখা গেলেও নানাকারণে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বহু দোষ ত্রুটির আশঙ্কা দেখা দিতে শুরু করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বার্থ তাদের পরিচালনাধীন কোম্পানীর অংশীদারদের স্বার্থের সহিত অভিন্ন থাকত না। স্বার্থের এই ধরনের কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাবে। ম্যানেজিং এজেন্টদের পারিশ্রমিক প্রায়ই একটি ব্যবসায়ের মোট উৎপাদনের ভিত্তিতে নির্ধারিত হত এবং এই সকল ক্ষেত্রে লাভজনক মূল্যের যতটা উৎপাদন বিক্রয় করা সম্ভব হত তা অপেক্ষা অধিকতর উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা এজেন্টগণের স্বার্থের অনুকূল হয়ে দাঁড়াত। ফলে তাঁরা কোম্পানীগুলোকে বেশি উৎপাদন করার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করত। কোন কোন সময় ম্যানেজিং এজেন্টগণ ক্রয় মূল্যের উপর একটি কমিশন পেতেন। সুতরাং এই ক্ষেত্রে তাঁরা তাঁদের স্বার্থের খাতিরে ক্রয়মূল্যকে স্ফাতি করে নির্ধারিত করতেন। যদিও ক্রয়মূল্যের স্ফীতি সাধন উৎপাদন ব্যয়বৃদ্ধি এবং মুনাফার ক্ষতিসাধন করত। অপর দিকে একজন ম্যানেজিং এজেন্ট তাঁর পরিচালনাধীন একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত তহবিল হতে অপেক্ষাকৃত সস্তা হারে ঋণ গ্রহণ করতে পারতেন এবং অন্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের ঋণের প্রয়োজন, সেই সব প্রতিষ্ঠানকে এই অর্থ অধিকতর উচ্চহারে পুনরায় ঋণ দিতেন। এই ভাবে নিজের স্বার্থের জন্য তাঁর অধীনস্থ একটি প্রতিষ্ঠানের তিনি ক্ষতি করতেও দ্বিধাবোধ করতেন না। অনেক সময় ন্যায় নীতি-জ্ঞানহীন ম্যানেজিং এজেন্টগণ তাঁদের পরিচালনাধীন কোম্পানীর শেয়ার ফাটকা বাজারে কারবার করার জন্য তাদের কার্যকালের তথ্যাদির ব্যবহার করত এবং এইভাবে এই কোম্পানীগুলোর অংশীদারদের উপর লোকসানের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এই সব কারণেই ম্যানেজিং এজেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলো কুখ্যাতি অর্জন করে তাদের নিজেদের পতন অনিবার্য করে তোলে।

(৬) **উপসংহার :**

উপরি-উক্ত দোষত্রুটি ছাড়াও ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যান্য অসুবিধা-গুলো দূর করার জন্য বিভিন্ন সময়ে নানারূপ আইন বিধিবদ্ধ করে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনার মধ্যে ন্যায়, সততা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই চেষ্টা সুফল প্রসব করতে পারে নি। এই কারণগুলো হলো : (১) ভারতীয় কোম্পানী আইন ভারতীয় বাস্তবকে উপেক্ষা করে প্রায় সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ আইনের ধাঁচে গঠিত হয় ; (২) মাঝে মাঝে আইনের আমূল পরিবর্তন করে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারে চেষ্টা করা হয়। ১৯১৪

খ্রীস্টাব্দেও ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিচালনায় ব্যাপক পরিবর্তন করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু ব্রিটিশ এবং ভারতীয় বাণিজ্যিক গোষ্ঠীর নিকট হতে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় এবং (৩) কালক্রমে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের পূর্বতম দক্ষতা হারিয়ে ফেলে। এজেন্সীগুলোর পরিচালনা বংশানুক্রমিক হয়ে ওঠে এবং দক্ষতা বিহীন উত্তরাধিকারীগণ পথ-প্রদর্শক পূর্বসূরীদের যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়ে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর উপযোগিতা বিনষ্ট করে তোলে। ফলে ধীরে ধীরে ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়।

Q 27. Would you argue that the growth of cash crop cultivation in your period was an instance of forced commercialization ?

Ans. (১) **ভূমিকা :**

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সর্বপ্রথম নীল, তুলা, পাট এবং তৈলবীজ জাতীয় ভারতীয় কৃষিজ পণ্যাদির রপ্তানির প্রচুর সম্ভাবনা আছে তা উপলব্ধি করতে পারে। এই সময়ে ইংলণ্ডে শিল্পোন্নতির ফলে এবং সে দেশে ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানির উপর আরোপিত সংরক্ষণমূলক নিয়ন্ত্রণবিধির চাপে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য নতুন নতুন কৃষিজ পণ্যের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি দিতে থাকে। সুতরাং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ভারতে কৃষি-সংক্রান্ত নীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করার চেষ্টা করে। তাঁদের উদ্ভাবিত নতুন কৃষি-সংক্রান্ত নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের দিকে। দেশের কৃষি উৎপাদনের ব্যবস্থায় বৈচিত্র্যসাধন এবং অধিকতর মুনাফা প্রদানে সমর্থ কৃষিপণ্যগুলোর উৎপাদন ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল তাঁদের প্রধান নীতি। এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চা, নীল এবং আফিমের চাষে উৎসাহ সৃষ্ট করার চেষ্টা শুরু হয়। কৃষি উন্নতির কোন সাধারণ নীতির ফল হিসাবে তাদের চাষে উৎসাহ দেওয়া হয় নি। সুতরাং এই ধরনের একদেশদর্শী নীতি যে জনগণের সাগ্রহ স্বীকৃতি পায়নি তা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। নিজেদের বিনিয়োগ হতে মুনাফা লাভের আগ্রহে উৎপাদন এবং স্বাভাবিক নিয়মবিধিকে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সকল সময়ই লঙ্ঘন করত।

(২) **নীলচাষ :**

কৃষিপণ্যের মধ্যে সবচাইতে প্রথম শুরু হয় নীলের চাষ। মিনডেন উইলসনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৭৮২ থেকে ১৭৮৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে লুই বোনার্ড নামে জনৈক ফরাসী ব্যবসায়ী বাংলাদেশে এবং ফ্রাঙ্কয় গ্রাণ্ড নামক অপর একজন ফরাসী বণিক বিহারে ব্যবসায় ভিত্তিতে নীলচাষ শুরু করেন। তবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নথি-পত্রে প্রিন্সেপ নামে জনৈক ইংরেজকে নীল চাষের পথ প্রদর্শক বলে বর্ণনা করা হয়। কলকাতার ফার্গুসন, ফেয়ারলি, ডেভিড স্কট এবং জোসেফ ব্যারেটো প্রভৃতি ম্যানিজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠানের অর্থানুকূল্যে এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রাজনৈতিক বিদ্রোহ

দেখা দেওয়ার ফলে ইয়োরোপে ভারতে উৎপন্ন নীলের চাহিদা বৃদ্ধি পেলে ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানিকৃত নীলের পরিমাণ তিন মিলিয়ন পাউণ্ডে পরিণত হয়। তখনকার দিনে এই নীলের বাজার দাম ছিল বাষট্টি লক্ষ সিক্কা টাকা।

কিন্তু ফাটকা ব্যবসায়ীদের স্বার্থপরতা এবং নীলে ভেজাল দেওয়ার জন্য ভারতের নীলের চাহিদা প্রচণ্ড হ্রাস পায় এবং ১৮০১-১৮০২ খ্রীস্টাব্দে রপ্তানিকৃত নীলের পরিমাণ ৫৮ লক্ষ সিক্কা টাকায় পরিণত হয়। ডেভিড স্কটের অনুরোধে লর্ড ওয়েলেসলি নীল ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা না করলে অবস্থা হয়ত আরও শোচনীয় হয়ে পড়ত। অপরদিকে ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের সুতিবস্ত্র শিল্প ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ার সঙ্গে ইংরেজ ব্যবসায়ীগণ নীলচাষ ও উৎপাদনের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং ১৮২৪-১৮২৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নীলচাষের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই সময় ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে প্রায় প্রতি বছর নীল শিল্পে লগ্নী হতে শুরু করে এবং একমাত্র বাংলা প্রেসিডেন্সীতেই ৮৯৭টি নীলের কারখানা গড়ে ওঠে। কিন্তু নীলকুঠির মালিকগণ জোর করে স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা নীলচাষ শুরু করলে রায়ত ও জমিদারদের সঙ্গে তাদের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সুতরাং ইংরেজ কুঠিয়ালগণ ব্রিটিশ সরকারের শরণাপন্ন হয়। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে নীলকুঠি সাহেবদের প্রয়োজন হলে বলপূর্বক জমি অধিকার করে চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করার অনুমতি দান করেন। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার কুঠিয়ালদের জমির মালিকানা স্বত্ব এবং নীলচাষ করা সম্পর্কে চুক্তি করার অধিকারও দান করে। তবে অনেকক্ষেত্রেই কুঠিয়ালগণ দাদন দিয়ে চাষীদের নিজের জমিতেই নীলচাষ করতে বাধ্য করত। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে কৃত্রিম উপায়ে নীল প্রস্তুত করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে ভারতের এক বিরাট অঞ্চলে নীলচাষ অব্যাহত ছিল।

(৩) চা ও কফি :

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের চার্টার অনুযায়ী বাণিজ্যের উপর কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার বিলুপ্ত হওয়ার পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতে চা উৎপাদনের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশেষ চিন্তা করতে শুরু করে। যদিও ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে স্যার জোসেফ ব্যাঙ্কস্ সর্বপ্রথম আসাম অঞ্চলে বন্য চা-গাছের সন্ধান পান, তাহলেও চা-এর প্রকৃত আবিষ্কর্তা হিসাবে রবার্ট ব্রুসের নাম চিরস্মরণীয়। ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি আসামের জঙ্গলে বহু চা গাছ দেখতে পান এবং পরবর্তীকালে তাঁর প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করে ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে সরকারী ভাবে চা-গাছের অস্তিত্বের কথা স্বীকার করা হয়। তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক চা গাছের আবিষ্কারের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারী চা-চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। অল্পদিনের মধ্যেই চা-চাষ প্রবর্তনের জন্য ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনের ব্যবসায়ীগণ আসাম কোম্পানী নামে একটি সংস্থা গড়ে তোলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-

যোগ্য যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের 'কার, ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানী' একই সময় 'বেঙ্গল টি অ্যাসোসিয়েসন' নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। পরে দুটি কোম্পানী এক যোগে কাজ শুরু করে এবং পঞ্চাশ লক্ষ টাকা এই শিল্পে বিনিয়োগ করে। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চা শিল্পের ক্ষেত্রে আসাম কোম্পানীর একাধিপত্য থাকলেও ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় বিশটি কোম্পানী চা শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও অনেকে চা বাগান গড়ে তুলতে শুরু করে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের পর ইয়োরোপের বাজারে ভারতের চায়ের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চা-চাষের জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

চা বাগানগুলো ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় আয়তনের থাকলেও সাধারণভাবে এই শিল্প বৃহদায়তন শিল্পে পরিণত হওয়ার বিশেষ প্রবণতা দেখা যায়। বিশেষতঃ ইয়োরোপীয় মালিকগণ ছোট ছোট চা বাগিচাগুলো সংযুক্ত করে বৃহৎ বাগিচায় পরিণত করার পক্ষপাতী ছিলেন। অপরদিকে নীলচাষ অপেক্ষা চা-শিল্পে অর্থ বিনিয়োগ করার দিকে ইয়োরোপীয়দের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তবে সাধারণতঃ ম্যানেজিং এজেন্সীর মাধ্যমেই চা বাগানগুলোর পরিচালনার ব্যবস্থা সম্পাদিত হত। ১৮৯০ থেকে ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে চা-শিল্পে বিনিয়োগীকৃত মূলধনের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয় বণিকগণও এই শিল্পের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন।

১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম কফি চাষ শুরু হয়। দ্রুত কফি উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য ইয়োরোপীয় বণিকগণ এই শিল্পের একচেটিয়া অধিকার লাভ করেন। কিন্তু বাংলাদেশে কফি চাষ খুব লাভজনক না হওয়ায় দক্ষিণ ভারতের মালভূমি অঞ্চলে কফি চাষের জন্য চাষ-ভূমি নির্দিষ্ট করা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে ভারতের কফি শিল্পের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে রপ্তানিকৃত কফির মোট মূল্য ছিল ১৮৮, ৫৩২স্টার্লিং পাউণ্ড কিন্তু ১৮৭৯খ্রীস্টাব্দে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৬,৩৩,০৩২ স্টার্লিং পাউণ্ডে পরিণত হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে ভারতের কফি শিল্প দুটি বিপদের সম্মুখীন হয় একদিকে কফি গাছে এক প্রকার পোকা জন্মাবার জন্য বহু জমিতে চাষ-আবাদ বন্ধ হয়ে যায়, অপর দিকে ব্রাজিলে উৎপন্ন কফির চাহিদা ইয়োরোপে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কফি শিল্প বিরাট আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়। ফলে আর্থিক ক্ষতির ভয়ে ব্যবসায়ীগণ কফি শিল্পে অর্থলগ্নী করতে শঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং ধীরে ধীরে কফি শিল্পের প্রসার ও উন্নতির পথে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি হয়।

(৪) **পাট ঃ**

নীল, চা, কফি চাষে সাধারণভাবে ভারতে বসবাসকারী ইংরেজ বণিকগণ ও কোম্পানীর কর্মচারীরা নিজেদের উদ্বৃত্ত সঞ্চিত অর্থ বিনিয়োগ করেই এই সব শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করতেন। কিন্তু পাট শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়। ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানী পাটশিল্পজাত পণ্যদ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করতে শুরু করলেও প্রথম প্রথম এই শিল্প বিদেশে কোন চাহিদার সৃষ্টি করতে পারেনি। তবে ১৭৯৩ থেকে ১৭৯৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই ভারতের পাট শিল্পের চাহিদা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পেনাঙ ও সিঙ্গাপুরে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বহির্বিশ্বের বাজারে পাট-শিল্প জাত দ্রব্যাদির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কৃষকদের পাট-চাষে উৎসাহিত করে তোলার চেষ্টা করে। পূর্বে সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাবার জন্য সুর্মা উপত্যকায় এবং ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গানদীর অববাহিকা অঞ্চলে পাট চাষ করা হত। কিন্তু বাইরের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে পাটচাষের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায় এবং নগদ অর্থের লোভে কৃষকগণ পাটচাষের দিকে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। ফলে আসাম, বাংলাদেশ ও বিহারের বহু স্থানেই পাট-চাষ শুরু হয়। তবে পাট উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্রই ছিল বাংলাদেশ। প্রথম দিকে কাঁচা মাল হিসাবে পাট ইংলণ্ডে প্রেরিত হত এবং সাধারণতঃ ডাণ্ডিতে অবস্থিত বিভিন্ন পাটশিল্পের কলকারখানা এই সব কাঁচা মাল ক্রয় করত। কিন্তু পরে ১৮৫০ থেকে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাট শিল্পের কলকারখানা গড়ে ওঠে। তবে সূচনাকাল থেকেই ভারতের পাটশিল্পকে কয়েক বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ডাণ্ডির পাট শিল্পের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু সুলভতর মূল্যে কাঁচামাল এবং শ্রমিক সরবরাহের এবং নিম্নতর হারে কর প্রদানের অধিকতর সুযোগ থাকায় ভারতীয় চটগুলো প্রতিযোগিতায় নিজেদের রক্ষা করতে এবং তুলনামূলকভাবে প্রভূত মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়।

(৫) ইক্ষু, তুলা ও আফিম :

ইংরেজবণিকগণ নিজেদের স্বার্থের জন্যই ভারতে ইক্ষু, তুলা এবং আফিমের চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করার চেষ্টা করে। ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই ইক্ষু থেকে চিনি তৈরি করার পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও চাহিদার তুলনায় ইক্ষুজাত উৎপাদন সামগ্রীর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত নগণ্য। বিদেশ থেকে চিনি আমদানি করার প্রয়োজন দেখা দিত। আভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা মেটাবার উদ্দেশ্যে ইক্ষুচাষ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করা হলেও ভারতের পক্ষে বিদেশ থেকে চিনি আমদানি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। বিশেষতঃ মরিসাসের চিনি ব্যবসায়ে লিপ্ত ইংরেজ বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ব্রিটিশ সরকার ভারতে চিনি উৎপাদনের উপর তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব আরোপ করে।

প্রাচীনকাল থেকেই বয়ন শিল্পে ভারত উন্নত থাকলেও ব্রিটিশ সরকার ল্যাঙ্কাশায়ারের শিল্পপতিদের স্বার্থে ভারতের সুতী-শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে। ফলে সুতীশিল্পের রপ্তানিকারী দেশ ভারত সুতীশিল্পের আমদানিকারী দেশে পরিণত হয়। ভারতে উৎপন্ন তুলাও ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে ল্যাঙ্কাশায়ারে কাঁচামাল হিসাবে রপ্তানি হতে শুরু করে। বিশেষতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সময় সেখান থেকে ইংলণ্ডে তুলা রপ্তানি বন্ধ হলে ভারতের তুলার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ব্রিটিশ সরকার চাষীদের তুলাচাষে উৎসাহিত করে। মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ এবং সিন্ধু ও পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চলে তুলা চাষ পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরের তুলা অপেক্ষা ভারতের তুলার মান নিকৃষ্ট হওয়ার ফলে বিশ্বের বাজার অধিকার করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বাণিজ্যিক প্রয়োজনেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন স্থানে আফিমের চাষ শুরু করে। বিশেষতঃ উত্তর প্রদেশ, বিহার এবং বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলে আফিমের চাষ খুব সমৃদ্ধি লাভ করে। চীন দেশে আফিম রপ্তানি করার জন্যই আফিমের চাষের উপর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী খুব গুরুত্ব আরোপ করে। ১৮৩০ এর পর থেকে আফিম চাষের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তবে চীনদেশে আফিম আমদানি নিষিদ্ধ হলে আফিমের চাষ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে শুরু করে।

(৬) উপসংহার ঃ

বাণিজ্যিক প্রয়োজনে বিটিশ সরকার ভারতে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। কৃষিপণ্য উৎপাদনের পশ্চাতে দুটি প্রধান কারণ দেখা যায় যথা—ভারতের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বিলুপ্তির ক্ষতিপূরণের প্রচেষ্টা এবং ইংলণ্ডের শিল্প বিপ্লবের চরম পরিণতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ করা। ব্রিটিশ সরকারের এই প্রচেষ্টার ফলে ব্রিটিশ শাসকদের শোষণের পথ আরও উন্মুক্ত হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে ভারতের আর্থিক সঙ্কট আরও বৃদ্ধি পায়।

Q. 28. Would you agree with the view that Dwarkanath Tagore was saved from utter ruin because he had landed estate ?

Ans (১) দ্বারকানাথের শিল্পোদ্যোগ ঃ

উনবিংশ শতকের বাঙালী শিল্পপতিদের মধ্যে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইংরেজ সরকারের আফিম ও লবণ বিভাগের দেওয়ান হিসাবে তিনি প্রচুর অর্থ আয় করার সুযোগ লাভ করেন। অপর দিকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর বিস্তৃত জমিদারী ছিল, এই উভয় উৎস থেকে আয়ের একটি বিরাট অংশ তিনি সঞ্চয় করে সেই উদ্বৃত্ত অর্থ বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত করার চেষ্টা করেন। প্রকৃত পক্ষে তদানীন্তন ভোগলালসায় লিপ্ত অন্যান্য জমিদারদের সঙ্গে এখানেই ছিল প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রধান পার্থক্য। তিনি ইয়োরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের অনুকরণে উদ্বৃত্ত অর্থ শিল্পে নিয়োগ করার চেষ্টা করেন। শিল্প সংগঠক হিসাবে তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দেন। ইয়োরোপীয় বণিকদের অনুকরণে তিনি নীলকুঠি স্থাপন করেন, আখ চাষ ও চিনি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আসাম অঞ্চলে চা চাষ ব্যবস্থা প্রবর্তন হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার ইয়োরোপীয় বণিকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে Bengal Tea Association নামে একটি কোম্পানী গঠন করেন এবং চা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই কোম্পানী সম্পর্কে ডক্টর অমলেশ ত্রিপাঠি মন্তব্য করেন, "the first instance in which an open and avowed partnership has been established between the European and the Bengali merchants." পরবর্তীকালে Bengal Tea Association লণ্ডনে প্রতিষ্ঠিত Assam Tea Company-র সঙ্গে যুক্ত হলে ভারতে চা শিল্পের উন্নতির জন্য কাজ করতে শুরু করে।

১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে কার, ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানী আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড কোম্পানীর কাছ থেকে চিণাকুরি কয়লা খনি ক্রয় করে এবং ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে কার, ঠাকুর অ্যাণ্ড কোম্পানী যুগ্মভাবে বেঙ্গল কোল কোম্পানী গঠন করে। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রিন্স দ্বারকানাথের এই উদ্যোগ ছিল সম্পূর্ণ নতুন ধরনের। বাংলাদেশে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর থেকেই সাধারণতঃ স্থানীয় ধনীব্যক্তিগণ কোন প্রকার শিল্পোদ্যমে অংশ গ্রহণ না করে জমিদারী ক্রয় করার দিকেই বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন। নীলামে ছোট ছোট জমিদারী ক্রয় করে তাঁরা বিশাল ভূসম্পত্তির মালিক হওয়ার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করতেন। জমির মালিকানা স্বত্বই তখন সামাজিক মর্যাদার প্রধান মাপকাঠি ছিল। তাছাড়া এই সব জমিদারগণ তাদের জমিদারী আয়ের একটি বিরাট অংশ বিলাস-ব্যসনে ব্যয় করার চেষ্টা করতেন। অলস ও বিলাসবহুল জীবন যাপন করাই ছিল তদানীন্তন বাঙ্গালী সমাজের সাধারণ ব্যবস্থা। কিন্তু প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন এই পদ্ধতির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি অনলসভাবে পরিশ্রম করে শিল্পোদ্যোগে আত্মনিয়োগ করেন এবং ইয়োরোপীয় ধনিকগোষ্ঠীর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দেখা দেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক লভ্যাংশের অন্যতম অংশীদার হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

(২) ব্যর্থতার কারণ ঃ

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের শিল্পোদ্যোগ বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারে নি। তাঁর এই ব্যর্থতার জন্য কয়েকটি কারণও নির্দেশ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ,বেঙ্গল কোল কোম্পানীর ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা। তখনও ভারতে রেলপথ খোলা হয়নি। রেলপথ খোলার পূর্বে দেশে কয়লার চাহিদা খুব সীমাবদ্ধ ছিল। রেলপথ শুধু মাত্র এই খনিজ দ্রব্যের ব্যবহারে নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেয় নি। বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত কল-কারখানাগুলোতেও প্রয়োজনীয় কয়লা পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। অপরদিকে কয়লাখনিতে কাজ এবং কয়লা উত্তোলন শুরু হলেও জ্বালানি হিসাবে কয়লা তখন পর্যন্ত কোন ক্রমেই জন প্রিয় হয়ে উঠেনি। সংস্কারের বশবর্তী হয়েই ভারতীয়গণ দৈনন্দিন জীবনে কয়লা ব্যবহারে উৎসাহী ছিল না। ফলে সীমিত ব্যবহারে কয়লা বিক্রির সম্ভাবনা নিয়ে কয়লা শিল্পের মতো একটি বৃহদায়তনের শিল্প নিজে অস্তিত্ব রক্ষা করতে সমর্থ ছিল না। খনি শ্রমিকদের কর্মে ঔদাসীন্য এবং জনসাধারণের বিরূপতা কয়লা শিল্প গড়ে ওঠার পথে দুরতিক্রম্য বাধার সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ, চা, নীল প্রভৃতি শিল্প সংগঠনে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর অসামান্য যোগ্যতার পরিচয় দিলেও তাঁর পক্ষে সীমিত মূলধন নিয়ে বিদেশী কোম্পানীগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করান সম্ভব ছিল না। অপর দিকে ভারতের এই সব উৎপন্ন দ্রব্যের প্রধান বাজার ছিল ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের না হলেও ইংলণ্ডের বহু লোকের ভারতে অবস্থিত ইংরেজ কোম্পানীগুলোর সঙ্গে স্বার্থের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সুতরাং বাইরে বাজার তৈরি করার ব্যাপারে তারা বিশেষ

সুযোগ পেত যা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কোম্পানীর পক্ষে সম্ভব হয়নি। যেমন চিনির বাণিজ্যক্ষেত্রে মরিসাসের ইংরেজ বণিকগণ যে সুযোগ পেতেন ভারতীয় বণিকদের সে-রকম সুযোগ পাওয়া কখনও সম্ভব হয় নি। তৃতীয়তঃ, জমিদারীর আয় থেকে উদ্বৃত্ত অর্থ মূলধনরূপে বিনিয়োগ করে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বাণিজ্য সংস্থাগুলো গড়ে তোলার ব্যবস্থা করেন। কোন কারণে জমিদারীর আয় হ্রাস পেলে অথবা ব্যবসা ক্ষেত্রে মন্দা দেখা দিলে তাঁর পক্ষে বাণিজ্য সংস্থাকে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা অসম্ভব হয়ে উঠত। কিন্তু বিদেশী কোম্পানীগুলি বেশিই ছিল যৌথ মূলধনে সংগঠিত এবং ম্যানেজিং এজেন্সীর দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং কোন ক্ষেত্রে ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দিলেও বিশেষ কোন সদস্যের ব্যক্তিগত ক্ষতির পরিমাণ ছিল অতি সামান্য। তাছাড়া ম্যানেজিং এজেন্সী প্রতিষ্ঠানগুলো সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সংস্থাকে অর্থ সাহায্য করে তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সমর্থ হত। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় গড়ে তোলা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলোর সেরূপ কোন সুযোগ ছিল না।

(৩) উপসংহার ঃ

প্রবল বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যবসা ক্ষেত্রে মন্দা, অপ্রতুল চাহিদা এবং প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবের জন্য প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো অল্পদিনের মধ্যে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। কিন্তু দ্বারকানাথ অসীম ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। শিল্পোদ্যোগের ক্ষতিপূরণ করার জন্য তিনি জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আয়ের একটি বিরাট অংশ ব্যয় করতে শুরু করেন। ফলে তাঁর জমিদারীর অবস্থাও ক্রমে ক্রমে শোচনীয় হয়ে উঠতে শুরু করে। বাধ্য হয়ে তিনি কোন কোন অঞ্চলের জমিদারী হস্তান্তরিত করতেও বাধ্য হন। তবে একথা ঠিক যে, এই সময় জমিদারী থেকে প্রাপ্ত আয় তাঁকে সাহায্য না করলে তিনি সম্পূর্ণভাবে দেউলিয়া হয়ে পড়তেন। জমিদারীর উদ্বৃত্ত আয়ই তাঁকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে সমর্থ হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুরের অনুকরণে পরবর্তীকালে অনেক ভারতীয় বাণিজ্য ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করে অর্থ ও যশ লাভ করলেও তাঁর প্রাথমিক প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই ফলবতী হয় নি। বরং বলা চলে যে,জমিদার গোষ্ঠী সম্ভূত না হলে এই বিশাল আর্থিক ক্ষতি তাঁর পরিবারকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলতে সমর্থ হত। এমন কি তিনি সমূহ বিপদের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ ঋণ করতেও বাধ্য হন। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সময় এই ঋণ তাঁর পক্ষে শোধ করা সম্ভব হয় নি, যে ঋণ পরবর্তীকালে তাঁর পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিশোধ করতে বাধ্য হন।

Q 29. Discuss the prevailing view on the composition of migrant peasant immediately after the famine and their role in local economy.

Ans. (১) ভূমিকা :

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে সর্বপ্রথম যে ভয়াবহ মন্বন্তর দেখা দেয় তা হল ১৭৭০-১৭৭১ খ্রীস্টাব্দের (বঙ্গাব্দ ১১৭৬) বাংলা, বিহার এবং উড়িষ্যার মন্বন্তর। সাধারণ-ভাবে এই মন্বন্তর 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। ১৭৬৮ খ্রীস্টাব্দে মৌসুমীবায়ুর স্বল্পতার জন্য বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম ছিল। ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দেও এই একই কারণে বৃষ্টিপাত খুব কম হয়। ফলে অনাবৃষ্টির জন্য খাদ্যশস্য উৎপাদন প্রচণ্ড পরিমাণে হ্রাস পায় এবং খাদ্যাভাব দেখা দিলে খাদ্য শস্যের মূল অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই সময় মিহি চালের দাম টাকা প্রতি আটাশ সের থেকে বৃদ্ধি পেয়ে টাকা প্রতি তিন সের হয়। নিকৃষ্টতর চাল ও অন্যান্য খাদ্য শস্যের দাম টাকা প্রতি পঁয়তাল্লিশ সের থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বিয়াল্লিশ সের হয়। অপর দিকে এক শ্রেণীর ব্রিটিশ কর্মচারী এবং তাঁদের প্রতিনিধিবর্গের নীতি-বিগর্হিতভাবে খাদ্য শস্যের মজুত গড়ে তোলার জন্য অবস্থা আরও গুরুতর আকার ধারণ করে। সমসাময়িক হিসাব অনুযায়ী জানা যায় যে, প্রায় এক কোটি লোক, অর্থাৎ এই অঞ্চলের মোট লোক সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এই দুর্ভিক্ষের ফলে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই বিরাট ও অভূতপূর্ব বিপর্যয়ের মুখে শাসকবর্গ প্রয়োজনের তুলনায় অতি অল্পসংখ্যায় লঙ্গরখানা খোলা এবং খাদ্যশস্যের ব্যবসায়ের উপর কতিপয় নিষ্ফল নিয়ন্ত্রণ বিধি আরোপ করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি এমন কি দুর্ভিক্ষের পরে ভূমি-রাজস্ব মকুব করার সিদ্ধান্তও কোম্পানী নাকচ করে দেয়। অপর দিকে ভূমিরাজস্বের দাবি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে দুর্ভিক্ষের পরবর্তীকালীন শোচনীয় অবস্থা হতে উদ্ধার সাধারণলোকের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।

(২) কৃষকদের সমস্যা :

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে যে সকল সমস্যার উদ্ভব হয় তাদের অন্যতম ছিল কৃষকদের নিজস্ব বাড়ীঘর জমিজমার মায়া পরিত্যাগ করে অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ অঞ্চলে বসবাস করার জন্য চেষ্টা করা। এই মন্বন্তর ব্যাপকভাবে বাংলা ও বিহারে দেখা দিলেও দুর্ভিক্ষের প্রকোপ সর্বত্র সমান ছিল না। বাংলাদেশের রাঢ় অঞ্চলে এই উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশে এই দুর্ভিক্ষ সর্বাপেক্ষা ভয়াবহরূপ গ্রহণ করে। তুলনামূলকভাবে পূর্ববঙ্গে এবং উত্তরবঙ্গের পদ্মার অববাহিকা অঞ্চলে এই দুর্ভিক্ষ প্রবল আকার ধারণ করার সুযোগ পায়। বৃষ্টিপাতের স্বল্পতা সত্ত্বেও এই অঞ্চলে নদী-নালার প্রাচুর্য থাকার জন্য অনেক জমিতেই চাষ-বাস করা সম্ভব হয়েছিল। বিশেষতঃ যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা থাকার জন্য এই অঞ্চলের

উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য অন্যান্য ঘাটতি অঞ্চলে সরবরাহ করা সম্ভব হয় নি বলে ঐ সব অঞ্চলে খাদ্যাভাব তেমন তীব্রভাবে অনুভূত হয় নি, যাহোক ঘাটতি অঞ্চলের কৃষকগণ প্রাণরক্ষার তাগিদে অন্যান্য অঞ্চলে যেয়ে বসবাস করার ফলে নানারূপ সমস্যার উদ্ভব হয়। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৭৭০-৭১ খ্রীস্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বাংলাদেশে চালু হলেও ইতিপূর্বেই বাংলাদেশের দেওয়ানী ব্রিটিশ সরকারের হস্তগত হলেও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কে নতুন সরকার কোন স্থির নীতি গ্রহণ করতে পারে নি। মোগল যুগের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়া সত্ত্বেও এবং রাজস্ব আদায়কারী জমিদারগণ বে-আইনীভাবে জমির মালিকে পরিণত হতে শুরু করলেও অনেকস্থানে কৃষকগণই ছিল জমির প্রকৃত মালিক। সুতরাং তারা তাদের জমি ফেলে অন্যত্র গমন করতে শুরু করলে স্বার্থান্বেষী জমিদারগণ তাদের পরিত্যক্ত জমি অধিকার করতে শুরু করে। ফলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস পেলে বাসস্থানত্যাগী কৃষকগণ পুনরায় যখন স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তাদের জমিজমা অধিকার করার চেষ্টা করতে শুরু করে তখন তাদের সঙ্গে জমিদারদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অনেক স্থানে এইসব সংঘর্ষ ভয়াবহ রক্তপাতের কারণরূপে দেখা দেয়। বীরভূম, রংপুর এবং পূর্ণিয়া জেলায় এইরূপ সংঘর্ষের সংখ্যা ছিল সব চাইতে বেশি। দুর্ভিক্ষের পূর্বে বীরভূম, পূর্ণিয়া, রংপুর এই তিনটি জেলাই কৃষি সম্পদে খুব সমৃদ্ধ ছিল। কিন্তু সমসাময়িক স্থানীয় রাজকর্মচারীদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দুর্ভিক্ষের সময় দলে দলে কৃষক এই সব জেলা পরিত্যাগ করে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। দুর্ভিক্ষের পরবর্তীকালে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানের জন্য যে আমিনী কমিশন নিযুক্ত হয় তাদের প্রতিবেদনে জানা যায় বাংলাদেশের বিশটি জেলার মধ্যে বীরভূম, পূর্ণিয়া, রংপুর, জাহাঙ্গীরপুর ও যশোহরেই সবচাইতে বেশি সংখ্যক কৃষক জমি-জমা ত্যাগ করে। বীরভূমে এই সংখ্যা ছিল ৩৫.১৫, পূর্ণিয়ায় ২৫.১৮; রংপুরে ২২.৫১; জাহাঙ্গীরপুরে ২৮.৭৭ এবং যশোহরে ১৮.১। বংলাদেশে এই সংখ্যার গড় ছিল ১৭.৬।

তবে এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণ করা প্রয়োজন যে, অনেক ক্ষেত্রে কৃষকগণ নিজেদের জমি ছাড়াও তাদের মৃত আত্মীয়-স্বজনের জমি দখল করার জন্য চেষ্টা করে। সেক্ষেত্রে জমিদারদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। যদিও অনেক সময় জমিদারগণ উদার হস্তে খাদ্যশস্য, বীজ ধান ইত্যাদি মঞ্জুর করে আঞ্চলিক সমৃদ্ধি ফিরিয়ে আনার জন্য কৃষকদের প্ররোচিত করার চেষ্টা করেন, তা সত্ত্বেও একথা কখনই মনে করা উচিত নয় যে, কোন কোন জমিদার এই সুযোগে বহু জমির উপর তাঁর খাস দখল কায়েম করার চেষ্টা করেন।

(৩) **অন্যান্য সমস্যা :**

শুধুমাত্র জমি-জমা পরিত্যাগকারী কৃষকগণই-স্ব স্ব অঞ্চলে প্রত্যাবর্তন করে সমস্যার সৃষ্টি করে নি, দুর্ভিক্ষের ফলে যে দুটি সম্প্রদায়ের লোক সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থাৎ ভূমিহীন চাষী ও মৎস্যজীবিগণ তারাও অনেক অঞ্চলে জটিল সমস্যার সৃষ্টি করে। বহুসংখ্যক চাষীর মৃত্যুর ফলে অনেক জমি অনাবাদী পড়ে থাকার আশঙ্কা দেখা দেয়। ফলে জমিদারগণ বিভিন্ন স্থানের ভূমিহীন চাষী ও মৎস্যজীবিদের জমি-জমা দিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে চাষ-বাসে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেন। কিন্তু নতুন এই ধরনের চাষীদের সঙ্গেও জমিদারদের বিবাদ অল্পদিনের মধ্যেই দেখা দিতে শুরু করে। ভূমি-রাজস্ব দিতে অনভ্যস্ত ভূমিহীন চাষী ও মৎস্যজীবিগণ জমিদারদের ন্যায্য পাওনা দিতে অস্বীকার করে ফলে জমিদারদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ ঘটে।

(৪) **অর্থনীতির উপর প্রভাব :**

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গ্রাম বাংলার অর্থনীতিকে শোচনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তোলে। নতুন ধরনের কৃষি ও কৃষক সমস্যা দেখা দিলে এই বিপর্যস্ত অর্থনীতি আরও জটিল ও সংকটময় হয়ে ওঠে। যদিও ১৭৭২ থেকে শুরু করে পর পর কয়েক বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ মৌসুমী বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষিকার্য পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সুযোগ পায়, তা হলেও কৃষক ও জমিদারদের সম্পর্ক পুনরায় আর সৌহার্দ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে নি। অপর দিকে দুর্ভিক্ষের পূর্ববর্তীকালে প্রত্যেক স্থানেরই একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অর্থনীতি বহুদিন ধরে প্রচলিত ছিল। ঐ অর্থনীতিকে কেন্দ্র করেই স্থানীয় সমৃদ্ধি স্থাপিত হত। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ফলে সেই চিরাচরিত অর্থনৈতিক ধারা ব্যাহত হয়ে পড়ে। অপরদিকে দুর্ভিক্ষের ফলে মানুষের জীবনের মূল্যবোধেরও পরিবর্তন ঘটে এবং প্রাচীন রীতি-নীতির উপর তারা অনেক পরিমাণে আস্থাহীন হয়ে পড়ে ফলে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন অর্থনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীগণ নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করার চেষ্টা করে।

Q. 30. Mention the various forces that led to the gradual decline and ultimate extinction of the Fort William College.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

তরুণ এবং সদ্য নিযুক্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের ভারতের ভাষা, লোকাচার, ইতিহাস ভূগোল এবং হিন্দু ও মুসলিম আইন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ করে তোলার উদ্দেশ্যে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে নভেম্বর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়। গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি ছিলেন এই কলেজ স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। ওয়েলেসলির অভিমত ছিল যে, ইংলণ্ডে যেমন কোন উচ্চপদস্থ ও দায়িত্বশীল কর্মচারীর যে জ্ঞানবুদ্ধি, বিদ্যা বা ট্রেনিং দরকার, ভারতেও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য তেমন গুণাবলীই প্রয়োজন। তিনি মনে করতেন যে, ভারতে নতুন গড়ে ওঠা ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ভিত্তি দৃঢ় করে তোলার জন্য এদেশের রাজকর্মচারীদের স্থানীয় ভাষা, সংস্কৃতি ও আচার-ব্যবহারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করা খুবই প্রয়োজন। তাঁর মতে সরকারী কর্মচারীদের শিক্ষা হবে মিশ্র প্রকৃতির—এই শিক্ষার ভিত্তি হবে ইয়োরোপীয় পাণ্ডিত্য এবং বহিরঙ্গ হবে ভারতীয়।

(২) **ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান :**

বাংলাদেশের তথা ভারতবর্ষের সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের কৃতিত্ব খুবই প্রশংসনীয়। এই কলেজের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ওয়েলেসলির ধারণা ছিল যে, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে তৈরী হবে সুদক্ষ আমলা, কিন্তু তার পরিবর্তে তৈরি হল আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তি। যেখানে অনুগত কর্মচারী তৈরি হওয়ার কথা ছিল, সেখানে আত্মসচেতন মানুষ তৈরির সূচনা হল। প্রকৃতপক্ষে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ তার সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যকে অতিক্রম করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুন সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করে দিতে সমর্থ হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্যবই রচনার মধ্য দিয়ে নতুন সাহিত্য সৃষ্টির পথ সুগম হয়। অনুবাদের মধ্য দিয়েই বাংলার মানুষ প্রাচীন সাহিত্যের স্বাদ পেতে শুরু করে। বাংলাভাষায় জীবনী, ইতিহাস, তর্কবিদ্যা এমন কি, বিজ্ঞানের বইও রচিত হতে থাকে। বাংলা ভাষার গঠন সম্পর্কেও বিজ্ঞানসম্মত চর্চার সূচনা হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষকবৃন্দই ছাত্রদের প্রয়োজনে সর্বপ্রথম বাংলা-ইংরেজি এবং বাংলা, ফারসি অভিধান রচনা করেন।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আর একটি অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই কলেজের প্রাঙ্গণেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধের সঙ্গে প্রাচ্য সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়। উভয় সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে একটি নতুন ভাবধারার উদ্ভব ঘটে। বিশেষতঃ এই যুগটি ছিল ফরাসী বিপ্লবোত্তর যুগ। ইংলণ্ডেও এই যুগের চিন্তাধারায় আদর্শ স্থানে ছিলেন জেরমি বেন্থাম ও জেমস স্টুয়ার্ট মিল। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেই যুগের প্রভাব ভারতেও উদারনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তি স্থাপন

করে। প্রকৃতপক্ষে এই কলেজের প্রাঙ্গণে দুটি শক্তিশালী সংস্কৃতির যোগাযোগের ফলে ভাবমানসে যে আলোড়নের সৃষ্টি হয় তার ঢেউ কলেজের সীমানা লঙ্ঘন করে সাধারণ সমাজকেও আন্দোলিত করে তোলে। এই আলোড়নই নবজাগরণ তথা জাতীয়তা-বোধের প্রথম সোপানের সৃষ্টি করে।

(৩ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবলুপ্তি ঃ

প্রথমতঃ, লর্ড ওয়েলেসলি ফোর্ট উইমিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করার সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইংলণ্ডস্থ পরিচালক মণ্ডলীর মতামত বা অনুমোদন গ্রহণ করেন নি। সুতরাং কোম্পানীর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ওয়েলেসলির এই প্রচেষ্টাকে প্রথম থেকেই সুনজরে দেখেন নি। তাই তাঁরা এই কলেজের প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেন নি এবং কলেজের ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থ মঞ্জুর করতেও অসম্মত হন। ফলে প্রথম থেকেই এই কলেজ কর্তৃপক্ষের কোপ দৃষ্টিতে পতিত হয় এবং আর্থিক অনটনে এই প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা সমর্থন না করার পক্ষে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী আরও একটি শক্তিশালী যুক্তির সন্ধান পায়। কলেজের মধ্যে ইংরেজ ছাত্র ও শিক্ষকদের সঙ্গে দেশীয় শিক্ষকদের মেলামেশা এবং ভাবের আদান-প্রদান ছাড়াও কলেজের বাইরেও এর হৃদ্যতা সম্প্রসারিত হতে শুরু করলে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাঁদের ধারণা হয় এর ফলে বৃটিশ রাজকর্মচারীদের 'শাসক চরিত্র' নষ্ট হয়ে যাবে।

অপরদিকে এই সময়ে ভারতের নবাগত তরুণ ইংরেজ রাজকর্মচারীদের সকলেই ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় পুষ্ট। সুতরাং কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর ধারণা হয় যে, এই সব তরুণ রাজকর্মচারীরা ভারতীয়দের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

তৃতীয়তঃ, ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজকে বন্ধ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী ইংলণ্ডের হার্টফোর্ড অঞ্চলে হেইলিবেরিতে সিভিলিয়ানদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য একটি কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ বা 'হেইলিবেরি কলেজ' নামে পরিচিত।'

ইতিমধ্যে ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি ভারতবর্ষ ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ফলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের অনুপস্থিতিতে ঐ কলেজের পক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত লোকের অভাবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবলুপ্তির পথে আর কোন বাধা রইল না।

(৪) শেষ পর্যায় ঃ

তবে সিভিলিয়ানদের ট্রেনিং দেওয়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলেও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজটিকে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেওয়া হয় নি। ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ঐ কলেজটি বাংলা ভাষার শিক্ষার প্রতিষ্ঠানরূপে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখার সুযোগ পায়। এই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ

The Sahelas businessmen in

বিদ্যাভূষণসহ অনেক বাঙালী মনীষীই এই বিদ্যালয়ে কোন না কোন সময়ে শিক্ষকতার কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৮০১ থেকে ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উইলিয়াম কেরী বিভিন্ন পদমর্যাদায় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের দুয়ার চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়।

They did not import gold and silver from out-side

To what extent was the silver crisis in the late 18th century due to the abrupt increased demand for silver at that time ?

A very great amount of wealth gone to England

Ans. (১) **কোম্পানীর শোষণ :**

পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলেই প্রধানত রৌপ্য সংকট দেখা দিতে শুরু করে। সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরজাফরকে সিংহাসনে স্থাপনের বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীবৃন্দ নতুন নবাবের নিকট থেকে নানারূপ সুযোগ-সুবিধা ও নানাপ্রকার মূল্যবান উপহার আদায় করেন। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী মীরজাফরের নিকট থেকে দুকোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা আদায় করে। অপরদিকে ফরাসী বাণিজ্য কোম্পানী বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া প্রভাব বিস্তার করে পরবর্তীকালে বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজয়ের পর বাংলাদেশের বাণিজ্যক্ষেত্রে ইংরেজদের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইল না। এই সময় থেকেই কোম্পানী অন্য কোনস্থান থেকে স্বর্ণ বা রৌপ্যপিণ্ড আমদানি না করে বাংলাদেশে আদায়ীকৃত অর্থের সাহায্যেই পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনা করার চেষ্টা করে। অপর দিকে বাংলাদেশ থেকে আদায়ীকৃত অর্থের একটি বিরাট অংশ ইংলণ্ডে নানাভাবে সঞ্চিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের রৌপ্যসংকট আরও ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ভারতে অবস্থিত ইংরেজ কর্মচারীগণ স্বদেশে রৌপ্যের মাধ্যমে অর্থলগ্নী করা বিশেষ লাভ জনক বিবেচনা করে এদেশে সঞ্চিত সম্পদ অর্থ বিনিময়ের সাহায্যে রৌপ্য সংগ্রহ করে স্বদেশে প্রেরণ করতে বিশেষভাবে উৎসাহী হয়।

অপর দিকে ১৭৫৭ থেকে ১৭৫৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলাদেশের মসনদে নতুন নবাব স্থাপন এবং পুরাতন নবাবদের বিতাড়িত করায় অভূতপূর্ব ব্যবসার মাধ্যমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রচুর অর্থলাভ করতে সমর্থ হয়। মীরজাফর ও তাঁর পরবর্তী নবাবগণ সিংহাসন লাভের দক্ষিণাস্বরূপ কোম্পানীকে ২১, ৬৯, ৬৬৫ পাউণ্ড উপহার দান করেন। এই প্রচুর পরিমাণ অর্থ ব্যতীত ঐ একই সময়ের মধ্যে কোম্পানীর কর্মচারীরা আরও ১০, ৭৩১, ৬৮৩ পাউণ্ড আদায় করেন। এই সমস্ত অর্থই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর, তথা সঞ্চিত স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ডের উপর প্রচুর চাপের সৃষ্টি করে। অপরদিকে পলাশীর যুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে কোম্পানী বাংলাদেশে বিদেশ হতে স্বর্ণ এবং রৌপ্যপিণ্ড আমদানি বন্ধ করে। তা ছাড়া, তখন থেকে কোম্পানী

বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপিণ্ড ভারতের অন্যান্য স্থানে এমন কি চীনদেশেও রপ্তানি করতে শুরু করে।

(২) একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিক্রিয়া ঃ

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়াভাবে শোরার ব্যবসা পরিচালনা করার অধিকার লাভ করে। ইংরেজ কোম্পানীর শোরার একচেটিয়া অধিকার লাভের পর শোরার মূল্য ৬ টাকা ১২ আনা ৬ পাই থেকে ৩ টাকা ১২ আনায় পরিণত করা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রতি বছর কমপক্ষে একলক্ষ মণ শোরা ক্রয় করত এবং শোরার মূল্য হ্রাসের ফলে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের প্রতিবছর ৭১,৮৭৫ টাকা ক্ষতি স্বীকার করতে হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আফিম ও লবণের ব্যবসায়ের অধিকার লাভ করে এবং তার ফলেও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হয়। অপরদিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ও তাদের অসাধু কর্মচারীগণ অতিরিক্ত মুনাফার অর্থ বাংলাদেশে লগ্নী না করে স্বদেশে রৌপ্য বা স্বর্ণ পিণ্ড হিসাবে প্রেরণ করতে শুরু করে। ফলে বাংলাদেশে মূল্যবান ধাতু পিণ্ডের কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি হয়।

কলকাতায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর টাঁকশাল স্থাপনের ফলেও বাংলাদেশের অর্থনীতির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। প্রতিবছর কোম্পানী এই টাঁকশাল থেকে ত্রিশ লক্ষ টাকা তৈরী করে মুদ্রা মূল্যের উপর মোট সাত শতাংশ লাভ করার সুযোগ পায়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ থেকে শোরা, লবণ ও আফিমের একচেটিয়া ব্যবসা পরিচালনা ও মুদ্রা তৈরির সুযোগ পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মোট ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫,৪৫,৮১০ পাউণ্ড। এই প্রসঙ্গে মিস্টার ভেরলেস্ট বলেন, "চন্দননগরের পতনের পর থেকে শুরু করে ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায় স্বর্ণমুদ্রা তৈরি করার কাজ শুরু না করা পর্যন্ত, প্রচলিত নিয়ম লঙ্ঘন করে এই অঞ্চলে স্বর্ণ বা রৌপ্য আমদানি না করার নীতি গ্রহণ করার ফলে বাংলাদেশের আট মিলিয়ন পাউণ্ড স্টার্লিং ক্ষতি হয়।"

(৩) অন্যান্য কারণ ঃ

বাজারে এই সময় বিভিন্ন প্রকার মুদ্রা প্রচলিত থাকার জন্যও রৌপ্যের কৃত্রিম সংকট দেখা দিত। নির্দিষ্ট কোন বিনিময় হার প্রচলিত না থাকার জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ডের চাহিদা ও সরবরাহ অনুসারে বিনিময় হার পরিবর্তিত হত। বিভিন্ন মুদ্রার পারস্পরিক বিনিময় হার স্থির রাখার সরকারী কোন ব্যবস্থা না থাকায় বাট্টার ভিত্তিতে টাকা বিনিময়ের জন্য পেশাদারী বিনিময়কারীদের আবির্ভাব ঘটে। এই সব ব্যবসায়ীগণ কৃত্রিম মুদ্রাসংকট সৃষ্টি করত। তা ছাড়া, ব্রিটিশ শক্তির উত্থানের পূর্বে এবং পরেও চলতি মুদ্রা হিসাবে কড়ির বহুল প্রচলন ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে কড়ির প্রচলন ক্রমশঃ হ্রাস পেতে শুরু করে। সুতরাং প্রয়োজনীয় মুদ্রা নির্মাণের জন্য অতিরিক্ত রৌপ্যপিণ্ডের প্রয়োজন দেখা দেয়।

(৪) উপসংহার :

দেশীয় বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকোচন, বিদেশ থেকে মূল্যবান ধাতু আমদানি বন্ধ, কিন্তু রপ্তানি বৃদ্ধি, কড়ির ব্যবহার হ্রাসপ্রাপ্তি প্রভৃতির ফলে রৌপ্য পিণ্ডের সংকট দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের চাহিদা অপেক্ষা ব্রিটিশ সরকারের নীতিই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকের রৌপ্য-সংকটের মূল কারণ।

Q. 32 Examine in detail the Government's policy towards education till 1835.

Ans. (১) **ভূমিকা :**

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঘোষণা করে যে, ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, ধর্ম প্রভৃতির উপর তারা হস্তক্ষেপ করবে না। যখনই কোন অসন্তোষের সম্ভাবনা দেখা দিত, তখনই কোম্পানী নিরপেক্ষতার নীতি ঘোষণা করে ভারতবাসীকে আশ্বস্ত করত। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে নিরপেক্ষতা নীতি সাম্রাজ্যের স্বার্থানুকূল থাকলেও উনবিংশ শতাব্দীতে অবস্থার পরিবর্তন দেখা দেয় এবং নিরপেক্ষতার নীতির পরিবর্তে হস্তক্ষেপ করার নীতিই সাম্রাজ্যের স্বার্থানুকূল হয়ে ওঠে। ফলে ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে কোম্পানী নিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করে হস্তক্ষেপ করার নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ শুরু হয় ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই, কারণ ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদে শিক্ষার জন্য কমপক্ষে প্রতি বছর এক লক্ষ করে টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কোন পন্থায় এবং কোন প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই অর্থ ব্যয় করা হবে অথবা কিভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করা হবে সে সম্পর্কে কোম্পানীর পরিচালকদের পরিষ্কার ধারণা না থাকলেও, সাম্রাজ্যের স্বার্থেই যে এই অর্থ ব্যয় করা হবে সে কথা তারা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করেন। এই প্রসঙ্গে চার্লস মেটকাফের কথা উল্লেখযোগ্য, "The more blessing we confer on them, the better hold we shall on their affection, and in consequence the greater strength and duration to our Empire."

(২) **শিক্ষা কমিটি গঠন :**

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদে শিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া সত্ত্বেও এই সম্পর্কে সুচিন্তিত কোন কর্মপন্থা গ্রহণের জন্য প্রায় দশ বছর সময় অতিবাহিত হয়। শেষ পর্যন্ত ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে 'জনশিক্ষার সাধারণ কমিটি (General Committee of Public Instruction) গঠিত হয়। পরের বছর কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী ঘোষণা করেন যে, শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁরা অর্থব্যয়ে কোন কার্পণ্য প্রদর্শন করবেন না। কিন্তু শিক্ষা কমিটির মধ্যে তখন প্রাচীনপন্থী প্রাচ্য শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনে উৎসাহী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল। ফলে তাঁরা কলকাতা মাদ্রাসার উন্নতি সাধন, কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ স্থাপন, সংস্কৃত ও আরবী পুস্তক প্রকাশনা, নির্বাচিত ইংরেজি বই

ভারতীয় ভাষায় অনূদিত করা প্রভৃতির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তবে পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁরা একেবারে উদাসীন ছিলেন না। প্রাচ্য বিদ্যার কলেজেও আইন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পারদর্শী ইয়োরোপীয় অধ্যাপকদের নিযুক্ত করতে শুরু করেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশের চিন্তা জগতে পরিবর্তন দেখা দিতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর কলেজ ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে এবং পাশ্চাত্যের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রতি ছাত্রদের স্বাভাবিক আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এদের মুখপাত্র হিসাবে রামমোহন রায় ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের কাছে প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দাবি করেন। প্রাচ্য শিক্ষায় আগ্রহী 'জনশিক্ষার সাধারণ কমিটি রামমোহনের প্রস্তাবের প্রতি বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ না করলেও ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ প্রাচ্য বিদ্যা চর্চায় অর্থব্যয়ের যুক্তি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের পরিবর্তে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনের পরামর্শ দেন।

ইতিমধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্যকলাপেরও পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার লুপ্ত হয় এবং বাণিজ্যের পরিবর্তে শাসনকার্যের দিকে তার বেশি দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর পরিচালক মণ্ডলী ঘোষণা করেন যে, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হবে দক্ষ সরকারী কর্মচারী তৈরী করা। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক ঘোষণা করেন যে ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য হল ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান করা। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও লর্ড বেন্টিঙ্কের এই ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানায়। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের সনদ মঞ্জুর করার সময় বলা হয় যে, শিক্ষিত ভারতীয়দের উপযুক্ত সরকারী চাকুরী দেওয়াই হল সরকারের নীতি। এই ঘোষণার পর স্বাভাবিকভাবে ইংরেজি শিক্ষার চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া, ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই মিশনারীরা ইংরেজি শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করতে শুরু করেন। বেসরকারী ভাবে ইংরেজি শিক্ষার বহু প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মিস্টার উইলসনের প্রচেষ্টায় হিন্দু স্কুল প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য লাভ করে এবং জনশিক্ষার সাধারণ কমিটি পরোক্ষভাবে ইংরেজি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। জনশিক্ষার সাধারণ কমিটিতে ধীরে ধীরে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থকদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কমিটির প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হলে সাময়িকভাবে কমিটির কার্যকলাপ ব্যাহত হয়ে পড়ে।

(৩) প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিরোধ :

প্রাচ্য শিক্ষার সমর্থকদের পূর্বসূরী ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড মিণ্টো, চার্লস মেটকাফে, উইলিয়াম জোনস্ প্রভৃতি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থকদের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সময়

এই দলের নেতা ছিলেন মিস্টার প্রিন্সেপ। এই দলের অভিমত ছিল যে শিক্ষাপদ্ধতি ও সংস্কৃতি জোর করে বাইরে থেকে এনে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। প্রাচ্য বিদ্যা কোন ক্রমেই নিকৃষ্ট নয় এবং ভারতবাসীরা পাশ্চাত্যের শিক্ষা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে। সুতরাং প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য শিক্ষা-পদ্ধতি চালু না করে তার পরিবর্তে অনুবাদের মাধ্যমে ভারতীয়দের পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত করে তোলার চেষ্টা করা উচিত। তাঁরা আরও মনে করতেন যে, সনাতনপন্থী অভিজাতদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের মাধ্যমেই এদেশে ইংরেজদের পক্ষে স্থায়িত্ব লাভ করা সম্ভব। সুতরাং এই শিক্ষার বিষয়বস্তু হবে প্রাচ্যের ধর্মতত্ত্ব, সাহিত্য ও দর্শন। সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া হবে। তবে কিছু কিছু ইংরেজি বই-এর অনুবাদ পাঠ্যসূচীর সঙ্গে যুক্ত করা হবে ।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থকদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন সুলিভান, চার্লস গ্রান্ট, ডাফ, উইলবারফোর্স, রামমোহন প্রভৃতি। এই সময় এই দলের নেতা ছিলেন মিস্টার সি. ই. ট্রেভিলিয়ান। তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা অপেক্ষা পাশ্চাত্য ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ অনেক বেশি আধুনিক, বিজ্ঞান সম্মত এবং যুক্তিবাদী। অনুবাদের মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান পরিবেশনের তুলনায় সরাসরি ইংরেজি ভাষায় এই জ্ঞান অর্জন অনেক বেশি সহজতর এবং সুবিধা-জনক। বে-সরকারী প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইংরেজি শিক্ষা ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, সুতরাং সরকারীভাবে চেষ্টা শুরু হলে অল্পদিনের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থা দ্রুত উন্নতি লাভ করার সুযোগ পাবে।

(৪) মেকলের অভিমত :

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা করার দায়িত্ব গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্কের গ্রহণ করতে হয়। তিনি নিজের হাতে এই দায়িত্ব না রেখে ইংলণ্ড থেকে সদ্য আগত গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন সদস্য টমাস ব্যাবিংটন মেকলের উপর এই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নির্দেশ দেন। নথিপত্র বিচার করে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী মেকলে যে অভিমত ব্যক্ত করেন তাই 'মেকলের মিনিট' নামে পরিচিত। মেকলে তাঁর 'মিনিটে' বলেন যে, ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদে 'শিক্ষিত' ও 'শিক্ষা' বলতে শুধুমাত্র প্রাচ্য শিক্ষা ও প্রাচ্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের কথা বলা হয় নি। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরাও প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিরূপে বর্ণিত হয়। তা ছাড়া, মেকলে এই রূপ অভিমত প্রকাশ করেন যে, প্রাচ্যের জ্ঞানভাণ্ডার কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং যুক্তিহীনতায় পরিপূর্ণ। ইয়োরোপের কোন একটি ভাল গ্রন্থাগারের সামান্য অংশে রক্ষিত জ্ঞানভাণ্ডারের তুলনায় প্রাচ্য জগতের সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডারও নিকৃষ্ট। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষা ভারতীয়দের শুধুমাত্র উন্নত করে তুলবে না, প্রকৃত জ্ঞানের সঙ্গেও তাদের পরিচিত করে তুলবে এবং তাদের নৈতিক উন্নতি হবে। মেকলে ইংরেজি ভাষাকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতের শাসকগোষ্ঠী এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ভাষা বলেও দাবি করেন।

তাঁর মতে, ইংরেজি ভাষা থেকে শক্তি আহরণ করে ভারতীয়দের ভাষাসমূহ উন্নতি লাভ করার সুযোগ পাবে। ইংরেজি শিক্ষায় ভারতীয় আগ্রহ ও দক্ষতার কথাও তিনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন এবং বলেন যে, সরকারীভাবে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থার প্রচলন হলে ভারতবাসীরা অল্পদিনের মধ্যেই তা আয়ত্ত করার সুযোগ পাবে। তবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক দলের মতো মেকলেও এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, আপামর জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের নয়।

(৫) মেকলের মিনিটের মূল্যায়ন :

মেকলের বক্তব্য সম্পর্কে দুটি ভিন্নমত পোষণ করা হয়। কেউ কেউ মেকলেকে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত এবং ভারত সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ দ্রষ্টারূপে তাঁকে চিহ্নিত করেন। অনেকে মনে করেন যে, মেকলে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তা বোধ এবং রাজনৈতিক সচেতনার সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে এই দুটি আদর্শই ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত হতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। কিন্তু কেউ কেউ মেকলের শিক্ষাপদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাঁদের মতে মেকলে পাশ্চাত্য শিক্ষার নামে একটি বিকৃত শিক্ষা পদ্ধতি ভারতে প্রবর্তন করে তথাকথিত ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা অল্প ব্যয়ে সরকারী দপ্তরগুলো পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই কৌশল অতি সুন্দরভাবে ইংরেজ সরকার কার্যকরী করার ব্যবস্থা করে।

তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, মেকলে ভারতে ইংরেজি শিক্ষার অগ্রদূত নন, কারণ তাঁর ভারতে পদার্পণ করার প্রায় বিশ বছর পূর্ব থেকেই সরকারী ও বেসরকারী ভাবে ইংরেজি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এদেশে প্রচলিত হয়। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য পূর্বেই মনস্থির করেন। মেকলে শুধুমাত্র কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তগুলোকে কার্যকরী করার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মেকলে কোম্পানীর স্বার্থ রক্ষার জন্য যতটা উৎসাহী ছিলেন ভারতের জনসাধারণের স্বার্থের কথা ততটা চিন্তা করেন নি। কারণ তিনি স্পষ্টভাবেই বলেন যে, ইংরেজি ভাষা ও শিক্ষার সাহায্যে ভারতে একশ্রেণীর মানুষ তৈরি করা হবে যারা ভারতীয় হয়েও চিন্তা ও আদর্শে ইংরেজদের অনুকরণ করবে। এই ভারতীয়রাই এদেশে ইংরেজ শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করে তাকে স্থায়িত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। রাজনৈতিক চাতুর্যের সাহায্যে যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত হয় তিনি শিক্ষা ও সংস্কৃতির শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে তাকে জাতীয় জীবনের আরও গভীরে প্রবিষ্ট করার চেষ্টা করেন।

(৬) বেণ্টিঙ্কের ঘোষণা :

মেকলের সুপারিশ পাওয়ার একমাস পরে ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ লর্ড বেণ্টিঙ্ক শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতি ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণায় বলা হয় :

(১) শিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্যের উদ্দেশ্য হবে ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান অধ্যয়নে সহায়তা করা। সুতরাং শুধুমাত্র ইংরেজি শিক্ষার জন্যই সরকারী তহবিলের অর্থ ব্যবহার করা হবে; (২) প্রাচীন শিক্ষার ক্ষেত্রে যেসব দায়িত্ব পূর্বে গ্রহণ করা হয়েছে তা পুরোপুরিভাবে অব্যাহত থাকবে। কিন্তু নতুন কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা হবে না; (৩) প্রাচীন প্রাচ্য সাহিত্য প্রকাশনার জন্য সরকারী তহবিল থেকে কোন অর্থ ব্যয় করা হবে না। বেন্টিঙ্কের এই ঘোষণার উপর নির্ভর করেই সরকারীভাবে ভারতে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তিত হয়।

Q. 33. What were aims of the introduction of permanent settlement? How did it create a new middle class?

Ans. (১) **ভূমিকা:**

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস রাজস্ব বিভাগের কোম্পানীর অভিজ্ঞ কর্মচারীদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। কিন্তু তিনি তাঁর এই রাজস্ব বিভাগের পুনর্গঠনের ব্যাপারে পুরাতন ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের উপর নির্ভর করতে সাহসী হন নি। সুতরাং তিনি একটি নতুন জমিদার শ্রেণী তৈরি করার চেষ্টা করেন যারা জাতীয় ঐতিহ্য, বিবেক এবং সনাতন মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত নন। প্রাক্তন শাসকগোষ্ঠী অর্থাৎ মুসলমানদেরও তিনি এই নতুন পরিকল্পনা থেকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করেন। বাংলাদেশের জমিদারী বণ্টনের ব্যাপারে নবাব মুর্শিদকুলি খান যে নীতি অনুসরণ করেছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিসও প্রায় সেই পন্থা অনুসরণ করে শাসিতদের মধ্যে একটি অনুগত শক্তিশালী শ্রেণী গঠন করার চেষ্টা করেন। তিনি যথার্থভাবেই এই আশা পোষণ করতেন যে, এই সব নতুন জমিদারদের সাহায্যে চিরদিনের জন্য ব্রিটিশ শাসনের প্রয়োজনে কৃষির ও কৃষক শ্রেণীর উন্নতির সম্ভাবনার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের স্বার্থ ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করে ব্রিটিশ স্বার্থের রক্ষাকারী একদল শক্তিশালী ভূম্যাধিকারীতে তাঁদের পরিণত করার সুযোগ লাভ করবেন। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা উচিত যে, শুধুমাত্র ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের স্থায়িত্ব লাভের কথা চিন্তা করেই লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন নি, ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকেও তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে শিল্প বিপ্লবের যুগের সূচনা হয়। সুতরাং তিনি ভারতীয় জমিদারদের সাহায্যে ব্রিটিশ ভারতকে কৃষিমূলক স্তরে আবদ্ধ রাখবেন এবং স্বদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প থেকে অধিক সংখ্যক মানুষকে কৃষির উপর নির্ভরশীল করে ইংলণ্ড থেকে আমদানি শিল্পজাত দ্রব্যে ভারতের বাজারের উপর প্রতিদ্বন্দ্বীহীনভাবে অধিকার করতে সমর্থ হবেন। এই লক্ষ্যের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেই লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলাদেশে জমিসংক্রান্ত ব্যাপারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন।

(২) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য ঃ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য খুব সংক্ষেপে এইভাবে বলা যায়ঃ (১) প্রত্যেক জমিদারীর উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ বার্ষিক কর আরোপ করে সরকারী রাজস্বের নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করা এবং কঠোরভাবে তা আদায়ের ব্যবস্থা করে সরকারী রাজস্বের নিরাপত্তা বিধান করা ; (২) প্রচুর টাকার মালিক শহরের নতুন গড়ে ওঠা বিত্তশালী শ্রেণীকে জমিদারী ও মধ্যস্বত্বের অধিকার ক্রয় করতে এই অর্থ বিনিয়োগে উৎসাহিত করা।

লর্ড কর্নওয়ালিস এবং তাঁর সহযোগীগণ এই আশা পোষণ করতেন যে, যদি এই ভাবে জমি ও কৃষির ক্ষেত্রে বিত্তশালী ব্যক্তিদের সঞ্চিত অর্থ নিয়োগ করা সম্ভব হয় তা হলে তিনটি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে: (১) ভারতের সমস্ত কুটির ও অন্যান্য শিল্প অল্প দিনের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে এবং ভারত একটি কৃষিমূলক দেশে পরিণত হয়ে ইংলণ্ডের নতুন গড়ে ওঠা শিল্পের প্রয়োজনে কাঁচামাল সরবরাহ করবে এবং ভারত ইংলণ্ডের শিল্পজাত দ্রব্যের বাজারে পরিণত হবে ; (২) এই ব্যবস্থা জমিদারদের তাদের জমিদারীর উন্নতির জন্য অনুপ্রাণিত করবে এবং তার ফলে কৃষিসংকটের সমাধান হবে। লর্ড কর্নওয়ালিস দৃঢ়ভাবে এই মত পোষণ করতেন এবং তিনি তাঁর এই অভিমত ইংলণ্ডের কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকেও তা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এবং (৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে এমন একদল জমির মালিক সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যাঁরা নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করবেন এবং যাঁরা কখনই ইংরেজ শাসনের বিরোধিতা অথবা কোন প্রকার রাজনৈতিক পরিবর্তন করার কখনও চেষ্টা করবেন না। তা ছাড়া, পরের পরিশ্রমের উপস্বত্ব ভোগী এই জমিদার শ্রেণী সকল প্রকার উদ্যম পরিত্যাগ করে শিল্প-বাণিজ্য সংগঠনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করে ইংরেজ শাসকদের উপর সকলপ্রকারে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়বে।

ইংরেজ শাসকরা এ কথা স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে, নিরঙ্কুশভাবে ক্ষমতা ভোগ করার জন্য শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল একটি শক্তিশালী নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি এবং পুরাতন সামাজিক ভিত্তির পরিবর্তন করা একান্ত প্রয়োজন। তাঁরা আরও বুঝতে সক্ষম হন যে, জমিদার শ্রেণী শাসকগোষ্ঠীর লুণ্ঠনের একাংশ পেয়ে ব্রিটিশ শাসন রক্ষার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া আদৌ যুক্তিহীন নয় যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে-কোন প্রকার রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক বিপ্লব প্রতিরোধ করা। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক স্পষ্টভাষায় এই বক্তব্য সুন্দর ভাবে প্রকাশ করেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, যদি কখনও বিপ্লবের উত্তাল তরঙ্গে ইংরেজদের শাসন টলমল করে ওঠে জমিদার শ্রেণীই নিজেদের স্বার্থে এই শাসনকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসবে। পরবর্তীকালের ঘটনা থেকে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবক্তারা সঠিকভাবেই ঘটনার বিশ্লেষণ করতে সক্ষম ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের সময়

বাংলাদেশে যে কোন আন্দোলন হয় নি তার অন্যতম প্রধান কারণও এখানেই নিহিত। জমিদার ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বাঙ্গালীরা ভারতীয়দের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পরিবর্তে এদেশে ইংরেজদের রাজত্ব বেশি পছন্দ করত। কারণ তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করত যে, ইংরেজদের শাসনে তাদের স্বার্থ অধিকতরভাবে সংরক্ষিত হবে। সুতরাং তারা নিজেরা এই বিদ্রোহের প্রতি কোন সহানুভূতি প্রকাশ করে নি এবং সাধারণ কৃষকরাও যাতে এই বিদ্রোহ থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকে তার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুতরাং এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করার সুযোগ পায়।

(৩) নতুন শ্রেণীর উদ্ভব ঃ

জমিদারী প্রথার সঙ্গে ব্রিটিশ শাসনের সংযোগের ফলে বাংলাদেশে একটি নূতন সমাজের পত্তন ঘটে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে পত্তনীদার, দরপত্তনীদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব ভোগীদের আবির্ভাব দেখা দেয়। ১৮০৬-১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই বাংলাদেশের ভূমিব্যস্থায় এই মধ্যস্বত্বভোগীদের আবির্ভাব দেখা দেয় এবং ক্রমেই এই ব্যবস্থার আকৃতি ক্রমান্বয়ে সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের একটি প্রত্যক্ষ ফল বাংলাদেশে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব এবং ব্রিটিশ সরকার একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়েই এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে তোলার ব্যবস্থা করে। বৃহৎ জমিদার ও ভূস্বামীদের সংখ্যা কম ছিল। কিন্তু ছোট জমিদার ও ভূস্বামীর সংখ্যা ছিল অসংখ্য। এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের নিয়েই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। সরকারের পক্ষ থেকে কৃষকশ্রেণীর স্বার্থের কথা চিন্তা না করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একটি শক্তিশালী সম্প্রদায় হিসাবে গঠন করার চেষ্টা করা হয়। সরকারের সহানুভূতি সম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলাদেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি শক্তিমাণ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হওয়ার সুযোগ পায়।

নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, পত্তনী প্রথার প্রধান সামাজিক ফল হল ক্রমান্বয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মতো একটি কৃষি প্রধান দেশে এই-রূপ অবস্থার উদ্ভবই ছিল স্বাভাবিক রীতি। আবার অপর দিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভবের ফলেই শিল্প প্রসারেও বাধার সৃষ্টি হতে থাকে। জমিদারগণও এই নীতিকে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সমর্থন করতে থাকেন। কারণ এই ব্যবস্থার ফলে তারাই সবচাইতে বেশি আর্থিক বিষয়ে লাভ করার সুযোগ পান। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ স্থায়ীভাবে নির্দ্ধারিত হয় এবং তার পরিমাণ ছিল ২৮৬ লক্ষ টাকা। কিন্তু তার পর থেকে ক্রমান্বয়ে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, পতিত জমি উদ্ধার করে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, যোগাযোগের উন্নতি এবং নতুন বাজারের প্রসারের ফলে কৃষিজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি এবং মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি প্রভৃতির ফলে জমিদারদের আদায়ীকৃত খাজনার

পরিমাণ ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ৩১৮ লক্ষ টাকা থেকে ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে ১,৪৪২ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে এই সময় ভূমিরাজস্ব ২৮৬ লক্ষ টাকা থেকে মাত্র ৩২৩ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পায়। জমিদারদের আয়বৃদ্ধিতে প্রলুব্ধ হয়ে সম্পদশালী আইনজীবী, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য জীবিকার লোকেরা সঞ্চিত উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা জমিদারী ক্রয় করতে শুরু করেন। এইভাবে যাঁরা জমির মালিক হয়ে উঠতে শুরু করেন তাঁরা সাধারণত জমিদারী থেকে দূরে শহরে বসবাস করতেন এবং জমিদারী পরিচালনার দায়িত্ব তাঁদের এজেন্ট—অর্থাৎ নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতির উপর অর্পণ করতে শুরু করেন। এই সব জমিদাররা জমি ক্রয়ের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং আর্থিক লাভের দিকেই বেশি সতর্ক ছিলেন।

লর্ড কর্নওয়ালিস এবং তাঁর সহযোগীদের ধারণা ছিল যে, স্থায়ীভাবে জমির মালিকানা লাভের পর জমিদারগণ কৃষক ও কৃষির উন্নতির দিকে যত্নবান হবেন। কিন্তু তাঁদের এই আশা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অপর দিকে কৃষকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সুদখোর মহাজনী প্রথা গ্রাম্য অর্থনীতির রূপান্তর ঘটায়। জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা সুদখোর মহাজনী ব্যবসায় অংশগ্রহণ করেন। আর সকল মহাজনই জমি নিয়ে ব্যবসা শুরু করেন। ফলে সুদখোর মহাজনদের স্বার্থের সঙ্গে জমির স্বার্থ জড়িয়ে পড়ে। জমিদার ও মহাজনী স্বার্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা আরও জটিল আকার ধারণ করে এবং কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই আরও শোচনীয় হয়ে পড়ে। এই জটিল ভূমি ব্যবস্থার মধ্য থেকেই বাংলাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

৪ সরকারী নীতি :

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল নিয়মিতভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করা। কোন কোন আইন অনুসারে, যেমন সূর্যাস্ত আইন অনুসারে, অনেক পুরাতন জমিদার বংশ অসুবিধার সম্মুখীন হয়, তথাপি ধীরে ধীরে জমিদারগণ এই সব অসুবিধা অতিক্রম করে নিজেদের অধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হন এবং তাঁদের মধ্যে নিরাপত্তার মনোভাব বৃদ্ধি পায়। সরকারের সহানুভূতি লাভ করার ফলে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপর দিকে এই সময় বহু পতিত জমি উদ্ধার, জঙ্গলাকীর্ণস্থান আবাদী জমিতে পরিণত হওয়ায় নতুন প্রজার পত্তন করে জমিদারগণ তাঁদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেন। ফলে পরবর্তীকালে সূর্যাস্ত আইন জমিদারদের আর বেশি অসুবিধায় ফেলতে পারে নি। বিভিন্ন সময়ে সরকারের পক্ষ থেকে রায়তদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কয়েকটি আইন প্রণীত হলেও ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে ভূমি ব্যবস্থার যে মূল কাঠামো প্রবর্তিত হয় তা প্রায় অপরিবর্তিতই থেকে যায়।

Q. 34. Do you agree with the view that signs of cracking up were surely noticable in the economic of Bengal before Plassey ?

Ans. (১) ভূমিকা :

মোগল শাসনের সমৃদ্ধির যুগে ভারতের বৃহৎ অংশের উপর তাদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় এবং সম্রাটদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য অভাবনীয় উন্নতি লাভ করে। রাজনৈতিক স্থিতি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তার ফলে শিল্পজাত দ্রব্য এবং কৃষিপণ্যের উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে এবং মোগল বাদশাহদের অধীনস্থ এলাকা উত্তর থেকে দক্ষিণে চারশ কিলোমিটার এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে একশ ষাট কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৭২৪ থেকে ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের এক বিরাট অংশ, গুজরাট, রোহিলাখণ্ড, অযোধ্যা প্রভৃতি অঞ্চলের উপর মোগল বাদশাহদের কর্তৃত্ব বিলুপ্ত হয়। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে পূর্বাঞ্চলের বাংলা বিহার এবং উড়িষ্যাও মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে প্রায় সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন ভাবে শাসিত হতে শুরু করে। অপর দিকে নবজাগ্রত মারাঠা শক্তির বারবার আক্রমণ এবং নাদির শাহের ভারত-অভিযানের ফলে পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।

(২) অর্থনৈতিক অবস্থা :

আধুনিক যুগের ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্কটই মোগল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও পতনের প্রধান কারণ। তাঁদের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থনৈতিক এই সঙ্কট চরম অবস্থায় উপনীত হয়। রাজনৈতিক অব্যবস্থা, বৈদেশিক আক্রমণ, রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্র, রাজকর্মচারীদের অপদার্থতা ও স্বার্থপরতার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের চারদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং শিল্প ও বাণিজ্য প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত কারিগরগণ সম্রাটের দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্য বৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। অনেক ক্ষেত্রে তারা পূর্ববর্তী বাসস্থান পরিত্যাগ করেও অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা এবং বাহিঃ শত্রুর আক্রমণের ফলে দিল্লীর অর্থনৈতিক বাজার সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। গালিবের রচনায় পরিত্যক্ত দিল্লীর বিষাদময় চিত্র প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। অগ্রা শহরের অবস্থাও দিল্লীর মতোই হয়ে পড়ে। দিল্লী ও আগ্রার বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে অযোধ্যার কারিগরগণ খুব বিপদগ্রস্ত হয় এবং তাদের শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। পাঞ্জাবের শিখদের বিদ্রোহের ফলে বাণিজ্যকেন্দ্র লাহোরের পথ রুদ্ধ হয়। ফলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার বাণিজ্যের স্থলপথ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে এবং ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে।

(৩) **মারাঠা আক্রমণ :**

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তের মতো পূর্বপ্রান্তও মারাঠাদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এই সময় দ্রুত অবণতি ঘটে। কলকাতার ইংরেজ বাণিজ্য কুঠির কর্মচারী মিস্টার জে. জেড. হল-ওয়েলের রচনা থেকে জানা যায় যে, মারাঠাদের আক্রমণের ফলে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের সমস্ত কুফল এই অঞ্চলে দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের প্রচণ্ড অভাব, শ্রমিকদের বেতন অসম্ভব রূপে বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্য অলঙ্ঘ্য বাধার এবং নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়। সুতিবস্ত্র এবং রেশম বস্ত্রের কারিগরগণ প্রাণভয়ে তাদের বাসস্থান পরিত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। বস্ত্রশিল্পের কারখানাগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে মূলধন বিনষ্ট হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। বিদেশী কোম্পানীগুলো অর্থাভাবে বাণিজ্যকুঠিগুলো বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। তা ছাড়া, নতুন নতুন স্বাধীন রাজ্যগুলো নানা প্রকার বাণিজ্য শুল্ক আরোপ করতে শুরু করলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য শুধুমাত্র পূর্বে আসাম এবং পশ্চিমে অযোধ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

এই সময় বীরভূমের একটি বাণিজ্যকুঠি থেকে কলকাতায় জানানো হয় যে, মারাঠারা শুধুমাত্র রেশম শিল্পের ক্ষতি করেই সন্তুষ্ট থাকে নি। মারাঠাদের সঙ্গের ঘোড়াগুলো তুঁতে খেত এমনভাবে নষ্ট করে যে, পরবর্তী মরশুমেই রেশম বস্ত্র তৈরীর সম্ভাবনা খুবই কম আশঙ্কা করা হয়। এই চিঠিতে তিনি আরও জানান যে মারাঠাদের অত্যাচারে রেশম শিল্পে নিযুক্ত চাষী ও কারিগরদের এত বেশি ক্ষতি হয় যে পরবর্তীকালে রেশম বস্ত্রের পূর্বের মান বজায় রাখা তাদের পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

মারাঠা বর্গীদের আক্রমণে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মেদিনীপুর, হুগলী, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম মুর্শিদাবাদ, নদীয়া প্রভৃতি অঞ্চল। সুতিবস্ত্র অপেক্ষা এই অঞ্চলের রেশম বস্ত্রই সমধিক বিখ্যাত ছিল এবং বাইরের জগতে তাদের প্রচণ্ড চাহিদা ছিল। মারাঠাদের আক্রমণে এই রেশম শিল্পই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া, মারাঠারা এইসব স্থানের লোকদের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার করে তাদের সঞ্চিত সকল অর্থ লুণ্ঠন করে। গৃহপালিত পশুও মারাঠাদের লুণ্ঠনের হাত থেকে রেহাই পায় নি। তা ছাড়া, স্থানীয় সরকারী খাজাঞ্চিখানায় সঞ্চিত অর্থও তাদের হস্তগত হয়। ফলে বাংলাদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, তারা তখন বাধ্য হয়ে মাদ্রাজ থেকে রৌপ্যপিণ্ড আমদানি করতে শুরু করে এবং বাট্টা দিয়ে সেই রৌপ্যপিণ্ড বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে বাধ্য হয়। কোম্পানীর এই অর্থাভাবও বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। পূর্বে প্রচলিত দাদন দেওয়ার নীতি তারা পরিত্যাগ করে এবং কোম্পানী এজেন্টের মাধ্যমে রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। ফলে সাধারণ চাষী ও কারিগরদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে।

নবাব আলীবর্দীর রাজত্বকালে ১৭৪২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মারাঠারা তিনবার বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলে। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাদের উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশের রাজস্ব থেকে বছরে বারো লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হয়ে নবাব আলীবর্দী তাদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি স্থাপন করতে বাধ্য হন। প্রতি বছরে বারোলক্ষ টাকা দেওয়ার ফলেও বাংলার কোষাগারের উপর যথেষ্ট চাপ পড়ে।

অনেকে মনে করেন যে, মারাঠা আক্রমণ প্রতিরোধ এবং বিহারের আফগানদের বিদ্রোহ দমন করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয়ে আলবর্দী সাধারণ প্রজা ও বণিকদের কাছ থেকে বলপূর্বক অর্থ আদায় করে কোষাগারের ক্ষতি পূরণ করার চেষ্টা করেন। তাঁর এই নীতির ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাধারণ প্রজাদের নিকট থেকে তিনি কখনও জোর করে অর্থ আদায় করেন নি। তিনি রাজশাহীর জমিদার রাজা রামকান্ত, দিনাজপুরের জমিদার রাজা রামনাথ এবং নদীয়ার জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র প্রভৃতি প্রধান জমিদারদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করেন। ইংরেজ কোম্পানী একবার তাঁকে সাড়ে তিন লক্ষ আর একবার ৪৩,৫০০ টাকা দিতে বাধ্য হয়। ফরাসীরা ৪৫,০০০ হাজার টাকা নবাবকে দেয়। তিনি ২২,২৫,৫৫৪ টাকা অতিরিক্ত কর বা আবওয়াব আদায় করেন। তাঁর এই-নীতি বাণিজ্য সম্পর্কের পরিবর্তে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করে।

(৪ উপসংহার ঃ

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং নিরবচ্ছিন্ন সশস্ত্র সংঘর্ষ ভারতের বিভিন্নস্থানের অর্থনৈতিক জীবন নিঃসন্দেহে বিপর্যস্ত করে ফেলে। কিন্তু এর ফলে সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক সাধারণ অবস্থার কি পরিমাণ ক্ষয়-ক্ষতি হয় তা নির্দ্ধারণ করা খুবই কঠিন। কারণ মারাঠা এবং জাঠদের দ্বারা বারবার আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও আগ্রার সমৃদ্ধি ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। এমন কি, দিল্লীর অনেক নাগরিক নিরাপত্তার জন্য এই শহরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিত্তশালী শিল্পী ও কারিগরগণ দিল্লী ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিত্যাগ করে ভারতের পূর্বপ্রান্তের বহু শহরে আশ্রয় গ্রহণ করে জীবিকা অর্জন করার চেষ্টা করে। বিদেশী পর্যটকগণ সুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ শহরের সমৃদ্ধি ও প্রাচুর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সুবে বিহারের রাজধানী আজিমাবাদ বা পাটনার সমৃদ্ধিরও খুব খ্যাতি ছিল। ইংরেজ বাণিজ্য কুঠির কেন্দ্রস্থলে গড়ে ওঠা কলকাতা শহরও অল্প দিনের মধ্যেই বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে খুব উন্নতি লাভ করে। পূর্ববঙ্গের বাণিজ্য বন্দর ও শহর হিসাবে জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকার সমৃদ্ধিও পর্যটকদের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা লাভ করে। বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তের শেষ সীমানায় অবস্থিত চট্টগ্রাম বন্দর বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। ইংরেজ বণিকগণ বাদেও ফরাসী, পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় বণিকগণ চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমগ্র পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায়

রাখার চেষ্টা করত। হুগলির সপ্তগ্রাম, মেদিনীপুরের তাম্রলিপ্ত, উড়িষ্যার হরিহরপুর এবং বালেশ্বরের বাণিজ্যকেন্দ্র বন্ধ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে হুগলি নদী বাংলাদেশের সঙ্গে বিদেশী বণিকদের যোগাযোগের প্রধান সেতুতে পরিণত হয় এবং এই নদীর উভয় তীরে নতুন নতুন বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ভব ঘটে। কলকাতা, শ্রীরামপুর, ব্যাণ্ডেল, হুগলি, চুঁচুড়া, চন্দননগর প্রভৃতি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। সেজন্য বলা যায় নবাব আলীবর্দীর রাজত্বকাল এবং সিরাজউদ্-দৌলার আমলের পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব শোচনীয় হয়ে পড়ে নি। নানারূপ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেও বাংলাদেগের অর্থ নীতি সাধারণভাবে চিরাচরিত মান বজায় রাখতে সমর্থ হয়। বাস্তব পরিস্থিতি সম্যক ভাবে বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক তপন রায় চৌধুরী মন্তব্য করেন যে, "Despite the the Maratha raids and Alivardi's extortions the real decline in Bengal's economy was largely a ost-Plassey and even post 1813 phenomenon." তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে তিনি উল্লেখ করেন যে, সপ্তদশ শতকের চল্লিশের দশকে মারাঠা আক্রমণের ফলে কাশিমবাজারের নিকটবর্তী অঞ্চলের রেশম শিল্প ধ্বংসপ্রায় হয়ে পড়লেও ঐ শতকের পঞ্চাশের দশকে ইংলণ্ডে রেশম শিল্পজাত-দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের রেশম শিল্প পুনরুজ্জীবন লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত সুতীবস্ত্র শিল্পও তার পূর্বের সুনাম এবং বাইরের বাজার অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে এই শিল্পের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় একলক্ষ লোক তাঁতশিল্পের উপর নির্ভরশীল ছিল। মিস্টার বোল্টস বলেন যে, তাঁতশিল্পের অর্থনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেই নবাব আলীবর্দী বলপূর্বক তাঁতীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করা থেকে বিরত হন। বাংলাদেশের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল চিনি ; আলীবর্দী ঐ শিল্পের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেন নি। মিস্টার মিলবার্নের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে বছরে পঞ্চাশ হাজার মন চিনি বিদেশে রপ্তানি করা হত। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত স্থানীয় যুদ্ধ-বিগ্রহ ব্যবসা-বাণিজ্যের মারাত্মক ক্ষতি করে নি এবং বেনারস থেকে ভারতের পূর্বপ্রান্তের বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ণই ছিল। পলাশীর যুদ্ধ এই অবস্থাকে সামগ্রিকভাবে পরিবর্তিত করে তোলে।

বাংলার ইতিহাস

অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর

Q. 1. Critically examine the relation between Warren Hastings and Chait Singh.

Ans. (১) ভূমিকা :

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সঙ্গে মারাঠাদের যুদ্ধ এবং ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ শুরু হলে কোম্পানীর কোষাগারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে এবং ওয়ারেন হেস্টিংস অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু এই অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি অত্যন্ত নীতিবিগর্হিত ও মর্যাদা হানিকর পন্থা গ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশ পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলোর মধ্যে অর্থ সংগ্রহের এই নীতি অন্যতম প্রধান কারণ রূপে পরিগণিত হয়। তাঁর এই নীতিকে সমর্থন করার জন্য বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শিত হলেও অন্যায় ভাবে এইরূপ অর্থ আদায়ের নীতি তাঁর শাসনকালের দুরপণেয় কলঙ্ক রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে নতুন ঋণের সাহায্যে ওয়ারেন হেস্টিংস এই অর্থাভাব দূর করতে পারতেন, কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি কোম্পানীর পূর্বতন সমস্ত ঋণ পরিশোধ করে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেন এবং কৃতিত্ব অবিচল রাখার জন্যই তিনি নতুন ঋণ গ্রহণ করার বিপক্ষে ছিলেন। সুতরাং তিনি বেনারসের রাজা চৈৎ সিংহের নিকট থেকে অর্থ আদায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(২) চৈৎ সিং ও ওয়ারেন হেস্টিংস :

চৈৎ সিং-এর পিতা বলবন্ত সিং অযোধ্যার শাসক নবাব ওয়াজিরের অধীনস্থ সামন্ত ছিলেন। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যার নবাব কর্তৃক বেনারসের শাসন দায়িত্ব ইংরেজদের হাতে সমর্পিত হয়। ঐ বছরে রাজা চৈৎ সিং এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বেনারসের চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে স্থির হয় যে, বেনারসের রাজা প্রতি বছর সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে কর দিতে বাধ্য থাকবেন। এই চুক্তিতে আরও স্থির হয় যে, এই করের বাইরে কোম্পানী আর কোন দাবি চৈৎ সিং-এর উপর পেশ করতে পারবে না এবং তাঁর রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনের ব্যাপারে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে পারবে না অথবা, কোনভাবে তাঁকে বিরক্ত করতে পারবে না। কিন্তু এই চুক্তির সব শর্ত লঙ্ঘন করে ওয়ারেন হেস্টিংস নিয়মিত সাড়ে বাইশ লক্ষ টাকা স্থলে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা চৈৎ সিং-এর নিকট দাবি করেন। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণও ওয়ারেন হেস্টিংসের মতের প্রতি সমর্থন জানান। সুতরাং চৈৎ সিং-এর প্রতি অন্যায় ব্যবহারের জন্য ওয়ারেন হেস্টিংসের কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যগণ সমান ভাবেই দায়ী ছিলেন। কাউন্সিলের সদস্য ফ্রান্সিস প্রথমে ওয়ারেন হেস্টিংসের এই নীতির বিরোধিতা করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, চৈৎ সিং-এর উপর ভবিষ্যতে যেন এরূপ দাবি আর করা না হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনিও কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যের মতো ওয়ারেন হেস্টিংসের মতের প্রতিই সমর্থন জানান। পরবর্তী দুবছরও চৈৎ সিংএর নিকট অনুরূপ দাবি করা হয়। চৈৎ সিং প্রাচ্য জগতের অন্যান্যদের মতো এইরূপ অন্যায় দাবির প্রতিবাদ করেন কিন্তু, শেষ পর্যন্ত কিছু কাল বিলম্ব করে কোম্পানীর দাবি পুরণ করতে সম্মত হন।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত কঠোর ভাবে তাদের দাবি অনুযায়ী অর্থ আদায় করার ব্যবস্থা করে। ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কোম্পানীর দাবিকে এই এক বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখার জন্য কাউন্সিলের সদস্যদের অনুরোধ করেন। কিন্তু চৈৎ সিং-এর এই 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ' প্রস্তাবে কাউন্সিলের সদস্যগণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং কিস্তিবন্দীর পরিবর্তে তাঁকে একসঙ্গে সমস্ত অর্থ প্রদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়। চৈৎ সিং নিরুপায় হয়ে ছয় বা সাত মাসের মধ্যে সমস্ত অর্থ পরিশোধ করার অনুমতি প্রার্থনা করলে কোম্পানীর পক্ষ থেকে জানান হয় যে, কাউন্সিলের নির্দেশ যথাযথ ভাবে পালিত না হলে ধরে নেওয়া হবে যে, তিনি এই দাবি সম্পূর্ণভাবে নাকচ করে দিয়েছেন। চৈৎ সিং কোম্পানীর এই নির্দেশের উত্তরে জানান যে, কোম্পানীর সঙ্গে তাঁর সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী অর্থের অতিরিক্ত অন্য কোন আর্থিক দাবি থেকে তাঁকে অব্যাহতি দেওয়াই আইনসম্মত। কিন্তু চৈৎ সিং-এর এই চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানী তাঁর বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং এই সৈন্যের ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁকে আরও দু-হাজার পাউণ্ড অনতিবিলম্বে দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে যেদিন চৈৎ সিং কোম্পানীর দাবি অনুযায়ী ৪৫ হাজার টাকা পরিশোধ করে দেন, সে দিনই তাঁর নিকট আর একটি নতুন দাবি পেশ করা হয়। এই দাবিতে কোম্পানীকে দু'হাজার অশ্বারোহী সৈন্য সাহায্য করার কথা বলা হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি অনুসারে কোম্পানীর পক্ষ থেকে চৈৎ সিংকে দু'হাজার অশ্বারোহী রাখার সম্মতি দেওয়া হয় এবং তখনই স্থির হয় যে, এই সৈন্য দিয়ে কোম্পানীকে সাহায্য করার কোন বাধ্যবাধকতা তার উপর আরোপ করা হবে না। কোম্পানীকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কোম্পানী তখন তাদের দাবি হ্রাস করে এবং এক হাজার অশ্বারোহী প্রেরণ করতে নির্দেশ দেয়। চৈৎ সিং ৫০০ অশ্বারোহী সৈন্য এবং ৫০০ পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করে ওয়ারেন হেস্টিংসকে সংবাদ পাঠান যে, তাঁর সৈন্যগণ কোম্পানীর অধীনে কাজ করার জন্য প্রস্তুত আছে। পরবর্তীকালে চৈৎ সিং বলেন যে, এই সংবাদের কোন উত্তর তিনি কোম্পানীর নিকট থেকে লাভ করেন নি। চৈৎ সিং-এর বক্তব্য ওয়ারেন হেস্টিংসও পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস লিখিত Narrative of the Insurrection থেকে জানা যায় যে, "I do not know but it may be true. He had received positive orders and those had been repeated. It was his duty to obey them, not to waste his time with letters of excuse."

ওয়ারেন হেস্টিংস এই সময় চৈৎ সিং-এর নিকট থেকে ৫০ লক্ষ স্টার্লিং জরিমানা স্বরূপ আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তাঁর Narrative of the Irsurrection-এ তিনি লিপিবদ্ধ করেন যে, "I was resolved to draw from his guilt the means of relief to the Company's distress...In a word I have determined to make him pay largely for his pardon, or to exact a severe vengeance for his past delinquency." এই সময় ওয়ারেন হেস্টিংস প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ভাবে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুযোগ পান কারণ, কাউন্সিলের সদস্যদের মধ্যে মিস্টার হোয়েলার

ব্যতীত বাকি সবাই কলকাতার বাইরে ছিলেন। সুতরাং ঠিক হয় যে, ওয়ারেন হেস্টিংস চৈৎ সিং-এর সঙ্গে কোম্পানীর বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য বেনারস অভিমুখে যাত্রা করবেন এবং এই সমস্যা সমাধানের সব দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পণ করা হয়। ফলে মিস্টার হোয়েলারের উপর বাংলাদেশের শাসনভার অর্পণ করে হেস্টিংস বেনারস অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে গভর্নর জেনারেল উত্তরদিকে যাত্রা করেন। রাজা চৈৎ সিং বকসার নামক স্থানে ওয়ারেন হেস্টিংস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অত্যন্ত অনুনয় বিনয়ের সঙ্গে তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁকে জানান যে, বেনারসে যাওয়ার পূর্বে তিনি এই সম্পর্কে তাঁকে কোন কথা দিতে সম্মত নন। বেনারসে উপস্থিত হওয়ার পরও হেস্টিংস চৈৎ সিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসম্মত হন এবং লিখিতভাবে সকল দাবি-দাওয়া তাঁর নিকট পেশ করতে শুরু করেন। এই সময় তিনি চৈৎ সিং-এর নিকট থেকে একখানি পত্র পান, যে পত্রের প্রতিটি অক্ষর চৈৎ সিং-এর দাসসুলভ মনোভাবের পরিচয় বহন করে কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস এই চিঠি সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "Not only unsatisfactory in substance but offensive in style."

ওয়ারেন হেস্টিংসের সঙ্গে শক্তিশালী কোন বাহিনী না থাকলেও তিনি চৈৎ সিংকে বন্দী করার নির্দেশ দেন। রাজা চৈৎ সিং বিনীতভাবে ইংরেজ সৈন্যদের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু তার সৈন্যগণ নিজ রাজ্যের রাজধানীতে রাজার এই অপমানে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে অকস্মাৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং একদল ইংরেজ সৈন্যকে তাদের সেনাপতি সহ হত্যা করে। তার সৈন্যদের বিদ্রোহ এবং ইংরেজদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে চৈৎ সিং অত্যন্ত আতঙ্কিত হন এবং বেনারসের ইংরেজ শিবিরের বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে তিনি বিদ্রোহী সৈন্যদের সঙ্গে যোগদান করেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে ওয়ারেন হেস্টিংসও অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং নিজের নিরাপত্তার জন্য চুনারে পলায়ন করেন। চুনারে পৌঁছবার পর হেস্টিংস তার স্বভাবসিদ্ধ স্থৈর্যের পরিচয় দিয়ে সম্ভাব্য সকল প্রকার শক্তি সংগ্রহ করে শত্রুপক্ষের সৈন্যদের সেখান থেকে বিতাড়িত করেন। অপরদিকে চৈৎ সিং ব্রিটিশ সৈন্যের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা অস্বীকার করলেও ওয়ারেন হেস্টিংস তার বিরুদ্ধে পুনরায় সৈন্য প্রেরণ করেন এবং অনন্যোপায় হয়ে চৈৎ সিং গঙ্গানদী অতিক্রম করে গোয়ালিয়রে আশ্রয় গ্রহণ করেন। চৈৎ সিং রাজ্য ত্যাগ করে চলে যাওয়ারপর ব্রিটিশ সৈন্যগণ বেনারস অধিকার করে এবং ওয়ারেন হেস্টিংস চৈৎ সিং-এর এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে বেনারসের অধিপতি রূপে ঘোষণা করেন। নতুন রাজার সঙ্গে কোম্পানীর চুক্তি অনুসারে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি দেয় বার্ষিক করের পরিমাণ ২২৫,০০০ পাউণ্ড থেকে বৃদ্ধি করে ৪০০,০০০ পাউণ্ড ধার্য করা হয়।

(৩) সমালোচনা:

কাউন্সিলের তদানীন্তন দুই সদস্য হোয়েলার এবং ম্যাকফারসন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের চৈৎ সিং সম্পর্কে নীতি সমর্থন করতে গিয়ে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হন এবং এই সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্নও তাঁদের বিব্রত করে তোলে। প্রথমত ওয়ারেন হেস্টিংস চৈৎ সিং-এর ব্যাপারে যে হঠকারিতার পরিচয় দেন তাকে কোন্ যুক্তি অনুসারে সমর্থন করা যায়? -দ্বিতীয়ত, চৈৎ সিং-এর পক্ষ থেকে কোম্পানীর সব দাবি মেনে নেওয়া হলেও

কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল ? তৃতীয়ত, কোম্পানীর সঙ্গে চৈৎ সিং-এর নির্দিষ্ট শর্ত অনুযায়ী চুক্তি থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁর নিকট থেকে বারবার অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ? ফলে গর্ভর্নর জেনারেল হেস্টিংসের এই কাজ তাঁরা বাধ্য হয়ে সমর্থন করলেও হেস্টিংসের এই নীতি সম্পর্কে তাঁরা নিন্দাসূচক একটি প্রস্তাবও গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে পার্লামেন্টে হেস্টিংস অভিযুক্ত হওয়ার সময়ও চৈৎ সিং-এর ঘটনা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। চৈৎ সিং-এর রাজনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার কথাও অভিযোগ সংক্রান্ত আলোচনার সময় বারবার উল্লেখ করা হয়। চৈৎ সিং জমিদারশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হলেও তিনি অন্যান্য জমিদারদের তুলনায় অনেক বেশি স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তা ছাড়া, চৈৎ সিং সম্পর্কে অভিযোগের উত্তরে ওয়ারেন হেস্টিংসও স্বীকার করেন যে, অন্য কোন জমিদারের নিকট থেকে অতিরিক্ত কোন অর্থ দাবি করা হয় নি। অপরদিকে ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দের বেনারস চুক্তির শর্ত অনুসারে কোম্পানী কখনই ২২৫,০০০ পাউণ্ডের বেশি বার্ষিক কর হিসাবে চৈৎ সিং-এর নিকট দাবি করতে পারে না। যদিও ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন যে, ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে চৈৎ সিং-এর সঙ্গে কোম্পানীর যে নতুন একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে উল্লেখ করা হয় যে, পূর্বেকার চুক্তির সকল শর্তই বাতিল বলে গণ্য করা হবে এবং সেই চুক্তির উপর নির্ভর করেই তিনি অতিরিক্ত অর্থ দাবি করেন। কিন্তু চৈৎ সিং যুক্তিসঙ্গত ভাবেই ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দের চুক্তির নতুন শর্ত মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ফলে ওয়ারেন হেস্টিংসের এই যুক্তি কোনক্রমেই সমর্থনযোগ্য নয়। অভিযোগের সময় এডমণ্ড বার্ক এই যুক্তির উপর নির্ভর করে ওয়ারেন হেস্টিংসের কার্যকলাপকে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন।

চৈৎ সিংকে বিদ্রোহী বলে মনে করা যায় কিনা এই সম্পর্কেও ইংলণ্ডের রাজনীতিবিদ ও আইন বিশারদদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। রাজার প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে বেনারসের সৈন্যদের বিদ্রোহ ঘোষণা এবং ইংরেজ সৈন্যদের হত্যা না করা পর্যন্ত চৈৎ সিং ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ বিরোধী কোন কাজে লিপ্ত হন নি, এবং তিনি ওয়ারেন হেস্টিংসের দাবি অযৌক্তিক মনে করা সত্ত্বেও তা মেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক অনটনে বিব্রত হয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতীয় জমিদারদের সম্পর্কে তাঁর চিরাচরিত উদার মনোভাব পরিত্যাগ করে অযৌক্তিকভাবে চৈৎ সিং-এর কাছ থেকে অর্থ লাভের চেষ্টা করেন। আইনগত জটিলতার কথা বাদ দিলে সাধারণভাবে যে-কোন সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিই স্বীকার করবেন যে চৈৎ সিং-এর প্রতি ওয়ারেন হেস্টিংসের ব্যবহার নির্মম ও প্রতিশোধ পরায়ণতার চরম দৃষ্টান্ত। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দের একটি ঘটনা থেকে বিষয়টি স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। সেই বছরে কোম্পানীর পক্ষ থেকে তৃতীয়বার ৫০,০০০ পাউণ্ড দাবি করা হলে চৈৎ সিং তাঁর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে কলকাতায় পাঠিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংসকে ২০,০০০ পাউণ্ড উপহার স্বরূপ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। ৫০,০০০ পাউণ্ডের দাবির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে তিনি ২০,০০০ পাউণ্ড ওয়ারেন হেস্টিংসকে উৎকোচ দিতে সম্মত হন। ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে এই অর্থ গ্রহণ করতে অসম্মত হলেও সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণে অর্থাভাব দেখা দিলে এই অর্থ গ্রহণ করেন। হেস্টিংস তাঁর কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদের নিকট থেকে বিষয়টি সম্পূর্ণ গোপন

রেখে ঐ অর্থ গ্রহণ করেন এবং তার পরই আবার ৫০,০০০ পাউণ্ড নগদ অর্থ এবং সামরিক বাহিনী প্রেরণের জন্য চৈৎ সিং-এর উপর চাপ দেন। তা ছাড়া এই সময় তিনি তাঁকে আরও জানান যে, অনতিবিলম্বে তাঁর দাবি স্বীকৃত না হলে জরিমানা স্বরূপ আরও ৫০,০০০ পাউণ্ড চৈৎ সিং দিতে বাধ্য থাকবেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের অযৌক্তিক আর্থিক দাবি সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে আলফ্রেড লয়াল মন্তব্য করেন যে ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে সংকটের সময় পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে চৈৎ সিং গোপনে কাউন্সিলের সদস্য ক্লেভারিং-এর নিকট যে দূত প্রেরণ করেছিলেন সে কথা ওয়ারেন হেস্টিংসের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব হয় নি।

আর্থিক লেন-দেন সম্পর্কে নৈতিকতার প্রশ্ন বাদ দিলেও ওয়ারেন হেস্টিংস চৈৎ সিং সম্পর্কে যে নীতি গ্রহণ করেন তা কোনক্রমেই সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। অন্যান্য যুক্তি ভিত্তিহীন বলে বিবেচিত হওয়ার পর শুধুমাত্র আর্থিক অনটনের যুক্তি প্রদর্শন করে ওয়ারেন হেস্টিংস তাঁর নীতি সমর্থন করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, তদানীন্তন রাজনৈতিক জটিল পরিস্থিতির হাত থেকে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি চৈৎ সিং-এর কাছ থেকে অর্থ আদায় করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর নীতি সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। চৈৎ সিং-এর কাছ থেকে তিনি অতিরিক্ত কোন অর্থ আদায় করতে সমর্থ হন নি এবং তাঁর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ে। চৈৎ সিংকে গ্রেপ্তার করে তিনি যে অভিমৃষ্যকারিতার পরিচয় দেন তার ফলে বেনারসের সৈন্যগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং চৈৎ সিং কোষাগারে সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ নিয়েই পলায়ন করতে সমর্থ হয়। অপরদিকে হেস্টিংস-এর একখানি চিঠির ভাষার ত্রুটির জন্য ইংরেজ সৈন্যগণ বিজয়গড় অধিকার করে কোষাগারের অবশিষ্ট তেইশ লক্ষ টাকা লুণ্ঠন করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়। বেনারসে সামরিক অভিযানের ফলে কোম্পানীর প্রচুর ব্যয় হয় কিন্তু তার পরিবর্তে ওয়ারেন হেস্টিংস এক কপর্দকও লাভ করতে অসমর্থ হন। যদিও ওয়ারেন হেস্টিংস পরবর্তীকালে গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে, "I lost the Zemindary with the rent of 22 lakhs, I recovered it with a revenue of 40." কিন্তু তাঁর এই গর্ববোধ করারও কোন যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছিল না, কারণ পর পর দুবছর দুর্ভিক্ষ দেখা দেওয়ায় এবং ইংরেজ সৈন্যদের লুণ্ঠনের ফলে বেনারসের অর্থ নৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে ওঠে। ফলে বেনারসের নতুন রাজার কাছ থেকে কর আদায় করা হেস্টিংসের পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। বেনারসের প্রতি ওয়ারেনহেস্টিংস যে দুর্ব্যবহার করেছিলেন সে সম্পর্কে তিনিও ব্যক্তিগতভাবে অবহিত ছিলেন। কারণ তিনি ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে চুনার থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তনের সময় ইচ্ছাকৃত ভাবেই বেনারসে যান নি। বক্সার থেকে জুশি পর্যন্ত অতিক্রম করার সময় বহু লোক তাঁর নিকট নানাপ্রকার অভিযোগ উত্থাপন করেন এবং বেনারসের আর্থিক দুর্গতির জন্য তিনিই যে দায়ী সে কথাও তারা উল্লেখ করে। ১৭৮৮ খ্রীস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস জোনাথান ডানকানকে বেনারসে কোম্পানীর কমিশনার হিসাবে প্রেরণ করেন এবং তাঁকে বেনারস সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে নির্দেশ দেন। তিনি জেলা ভিত্তিক প্রতিবেদন তৈরি করেন এবং কোম্পানীর নীতির ফলেই বেনারস রাজ্যের যে সামগ্রিকভাবে ক্ষতি সাধিত হয় তাও সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন। বহু জেলার অধিকাংশ জমিই পতিত জমিতে পরিণত হয়। তিনি আরও জানান যে, চৈৎ সিংকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত

করার পর থেকে এরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়। সুতরাং বলা যায় যে ওয়ারেন হেস্টিংসের নীতির ফলে ব্যক্তিগতভাবে শুধুমাত্র চৈৎ সিং ক্ষতিগ্রস্ত হন নি, সমগ্র বেনারস রাজ্যেরও অপূরণীয় ক্ষতি হয়।

Q. 2. Write a note on the cultural attitude of Jonathan Duncan.

১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে জোনাথান ডানকান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরূপে আসেন। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেনারসে কোম্পানীর স্থায়ী দুত ও কমিশনারের পদে নিযুক্ত হন। তিনি বেনারসে বসবাস কালে সেখানকার শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করার চেষ্টা করেন। বেনারসের প্রতি ওয়ারেন হেস্টিংসের নির্মম ও প্রতিহিংসামূলক ব্যবহারের ফলে ঐ অঞ্চলের কৃষিকার্যেরও যে ক্ষতি সাধিত হয় তা তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন এবং কৃষিকার্যের উন্নতির জন্য নানারূপ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেন। শিশুহত্যা নিবারণের জন্যও তিনি বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হন। পরে ১৭৯৫ থেকে ১৮১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বোম্বাই প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হন। এই সময় তিনি কাথিয়াওয়ার অঞ্চলে প্রচলিত শিশু হত্যা বন্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সৎ এবং ন্যায় পরায়ণ কর্মচারী হিসেবে জোনাথান ডানকানের খুব সুনাম ছিল। ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের দিকেও তাঁর খুব সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

সমাজ-সংস্কারক হিসাবে সমসাময়িক ইংরেজ রাজকর্মচারীদের মধ্যে জোনাথান ডানকান একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হলেও ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং প্রাচীন ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। এই সময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসরণ করার পক্ষপাতী ছিল। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে কলকাতার মুসলিম অধিবাসীদের অনুরোধক্রমে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। জোনাথান ডানকান তখন বেনারসে ছিলেন। দীর্ঘ দিন যাবৎ সংস্কৃত চর্চার এবং প্রাচ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কেন্দ্ররূপে বেনারসের খুব সুখ্যাতি ছিল। রাজকার্যের অবসরে জোনাথান ডানকান সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু করেন এবং প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হন। সুতরাং তিনি প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে বেনারসে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করার চেষ্টা করেন। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা পদ্ধতির ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রাচীনকালের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করে এই কলেজের পাঠ্য-সূচি তৈরি করা হয়। পঠন পাঠন পদ্ধতি, পাঠ্যকাল প্রভৃতি বিষয়েও প্রাচীন ভারতীয় রীতিই অনুসৃত হয়। এমন কি কলেজের ছুটির তালিকা প্রস্তুতির ব্যাপারেও পুরাতন ঐতিহ্যের অনুকরণ করা হয়। সংক্ষেপে বলা যায় যে বেনারসের সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিটি বিষয়ই ছিল ভারতের সনাতন ধর্মশাস্ত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

জোনাথান ডানকান ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন এবং ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তা পুনরুদ্ধারের কাজে তিনি ব্রতী হন। পাশ্চাত্য ভাবধারার দ্বারা প্রভাবান্বিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রাচীন ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের পুনর্মূল্যায়নের জন্য ইংরেজ সরকারকে অনুরোধ জানান। বিশেষত ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে কলকাতায়

এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হওয়ার ফলে তাঁর আশা অনেকাংশে সাফল্য লাভ করে। বেনারসে সংস্কৃত কলেজ স্থাপন ছিল এই আশা পূরণ হওয়ার আর একটি বাস্তব পদক্ষেপ। তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, তদানীন্তন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের পৃষ্ঠপোষকতাও তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে অনেকাংশে সাহায্য করে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি জোনাথান ডানকানের আন্তরিক শ্রদ্ধা অন্যান্য রাজকর্মচারীদেরও ভারতীয় সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁদের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই প্রাচীন ভারতের সভ্যতা পুনরায় উপযুক্ত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুযোগ পায়।

Q. 3. Give a brief account of the judicial reforms of Lord Cornwallis.

Ans. (১) সংস্কার :

শাসনতান্ত্রিক এবং রাজস্ববিভাগের সংস্কারের মতো লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনেও মনোযোগী হন। তাঁর বিচার বিভাগীয় সংস্কারকে সাধারণভাবে ফৌজদারী ও দেওয়ানী এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। ইতিপূর্বে ওয়ারেন হেস্টিংস মুর্শিদাবাদে সদর নিজামত আদালত নামে সর্বোচ্চ ফৌজদারী বিচারালয় স্থাপন করেন। এই বিচারালয়ে বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করতেন বাংলার নবাব। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে কর্ণওয়ালিস সদর নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন এবং বাংলার নবাবের স্থলে সপরিষদ গভর্নর জেনারেল এই আদালতের বিচার কার্য পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সপরিষদ গভর্নর জেনারেলকে ভারতীয় আইন-কানুন ও রীতি-নীতি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার জন্য কাজী ও মুফতি নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়ত সদর দেওয়ানী আদালতের অধীনে কর্ণওয়ালিস চারটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্থাপন করেন। এইসব বিচারালয়ে দুজন করে ইংরেজ বিচারক নিযুক্ত হতেন। ভ্রাম্যমাণ বিচারকগণ বছরে দুবার করে বিভিন্ন জেলা পরিভ্রমণ করতেন এবং স্থানীয় ফৌজদারী বিচারকার্য সম্পাদন করতেন। তৃতীয়ত পূর্বে কোন কোন অপরাধের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর দণ্ডদানের রীতি প্রচলিত ছিল। কর্ণওয়ালিস এই সকল নিষ্ঠুর দণ্ডদানের প্রথা রহিত করেন। চতুর্থত, পূর্বে নরহত্যা রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে অপরাধ বলে বিবেচিত হত না। ফলে, হত্যাকারী ভীতিপ্রদর্শন করে বা হত্যাকারীর আত্মীয়-স্বজনকে অর্থ প্রদান করে মামলা মিটিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত। কর্ণওয়ালিস হত্যার অপরাধকে সমাজ ও রাষ্ট্র বিরোধী কার্য বলে ঘোষণা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এই নীতি প্রবর্তন করেন যে, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর হত্যাকারীর বিচার নির্ভর করবে না। রাষ্ট্রই হত্যাকারীর বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। পঞ্চমত, মুসলিম আইন অনুসারে পূর্বে অমুসলমানদের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে কোন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া আইনত নিষিদ্ধ ছিল। আবার কোন কোন মামলার ক্ষেত্রে দুজন অ মুসলমান সাক্ষীকে একজন মুসলমান সাক্ষীর সমান বলে বিবেচনা করা হত। কর্ণওয়ালিস আইনের ক্ষেত্রে এইসব বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা তুলে দিয়ে আইনের চোখে হিন্দু ও মুসলমানকে সমান অধিকার দান করেন। ষষ্ঠত, পূর্বে রাজস্ব অর্থাৎ দেওয়ানীর সঙ্গে দেওয়ানী মামলার বিচার ব্যবস্থা জড়িত ছিল বলে

রাজস্ব ব্যবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন করলেই আইন সংক্রান্ত ব্যাপারেরও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা অনিবার্য হয়ে উঠত।

(২) সংস্কারের উদ্দেশ্য ঃ

লর্ড কর্ণওয়ালিসের নির্দেশ অনুসারে চার্লস গ্রান্ট এবং চার্লস স্টুয়ার্ট 'বোর্ড অফ ট্রেড-এর' সদস্যরূপে কোম্পানীর বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করেন। রাজস্ব ও আইন বিভাগের সংস্কারের দিকেও এই সময় সমভাবে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এই বিষয়ে লর্ড কর্ণওয়ালিসের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন স্যার জন শোর। ইতিপূর্বেই তিনি গভর্নরের কাউন্সিল এবং রেভেনিউ বোর্ডের সদস্যরূপে দক্ষতার পরিচয় দিতে সমর্থ হন। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি রেভেনিউ বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং রাজস্ব ও বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনের অধিকাংশ কৃতিত্বই তাঁর প্রাপ্য। পূর্ববর্তী রাজস্ব বিভাগের সংস্কার সাধনের সময় মিস্টার ম্যাকফারসন ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলকে পয়ত্রিশটি জেলায় বিভক্ত করেন এবং প্রত্যেকটি জেলায় একজন করে ইংরেজ কালেক্টর নিযুক্ত করার সুপারিশ করেন। রাজস্ব ব্যাপারে এই সব কর্মচারীরাই জেলার সকল দায়িত্ব বহন করতেন। কিন্তু দায়িত্বের তুলনায় তাঁদের বেতন ছিল খুবই সামান্য সুতরাং তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে অবৈধভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়ে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতেন। সুতরাং লর্ড কর্ণওয়ালিস ব্যয় সঙ্কোচন, শাসনতান্ত্রিক সরলীকরণ এবং শাসন বিভাগকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য সংস্কার কার্যে মনোনিবেশ করেন। ব্যয় সঙ্কোচনের জন্য জেলার সংখ্যা হ্রাস করা হয়, ব্যয় সঙ্কোচন ও শাসনতান্ত্রিক সরলীকরণের জন্য রাজস্ব ও বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্রীকরণের প্রস্তাব করা হয় এবং শাসন ব্যবস্থাকে দুর্নীতি মুক্ত করার জন্য ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

রেভেনিউ বোর্ডের সুপারিশ ক্রমে জেলার সংখ্যা হ্রাস করে তেইশ করা হয় এবং সঙ্গে দ্বিতীয় পরিবর্তনের অর্থাৎ রাজস্ব বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে স্বতন্ত্র করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু হয়। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে এই সংস্কারকে কার্যকরী করার জন্য সকল ব্যবস্থা গৃহীত হয় এবং জুন মাসের মধ্যে প্রাথমিক সংস্কারকে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়। কলেক্টরগণকে পুনরায় দেওয়ানী আদালতের বিচারকের পদে নিযুক্ত করা হয়। এই ক্ষমতার বলে তাঁরা দেওয়ানী মামলার বিচার করার সুযোগ লাভ করেন তবে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর বিচারের দায়িত্ব সদর দেওয়ানী আদালতের উপর অর্পণ করা হয়। কলেক্টরকে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক বিচারালয়ে একজন করে 'রেজিস্টার' নামে পরিচিত ভারতীয় বিচারক নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁর উপর ২০০ টাকা পর্যন্ত মামলাগুলোর বিচারের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার বিচারের দায়িত্ব এই সব বিচারালয়ের পরিবর্তে রেভেনিউ বোর্ডের উপর ন্যস্ত করা হয়। অপরদিকে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে জুন কলেক্টরদের উপর ফৌজদারী মামলার বিচারের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে কলেক্টরদের উপর সেই দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তখন থেকে তাঁরা শুধু অপরাধীকে গ্রেপ্তার করার অধিকারই ভোগ করতেন না শান্তিভঙ্গের মামলাগুলোর বিচার করার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শাস্তি দেওয়ার অধিকারও ভোগ করতেন। তবে গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলোর বিচারের দায়িত্ব

তখন পর্যন্ত ভারতীয় বিচারালয়েই সম্পাদিত হত এবং মুর্শিদাবাদে অবস্থিত নিজামত আদালত এই অধিকার ভোগ করত।

কর্ণওয়ালিসের এই সংস্কারের ফলে কলেক্টরদের অধীনস্থ জেলাগুলোর আয়তন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁরাই প্রতিটি জেলায় সর্বপ্রধান রাজকর্মচারীরূপে পরিগণিত হতে শুরু করেন। প্রতিমাসে ১২০০ টাকা বেতনের পরিবর্তে কলেক্টরদের ১৫০০ টাকা বেতনরূপে স্থিরীকৃত হয় এবং এই অর্থকে জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম বেতন বলে মনে করা হত। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দে কলেক্টরদের দায়িত্ব আরও বৃদ্ধি করা হয়। দেওয়ানী সংক্রান্ত মামলার বিচার কার্যে রেভিনিউ বোর্ডের অস্বাভাবিক রকম বিলম্ব ঘটায় বিচারাধীন মামলার সংখ্যা ক্রমশই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। সুতরাং স্থানীয় ভাবে নতুন আদালত বা মাল আদালত স্থাপিত হয় এবং স্থানীয় দেওয়ানী আদালতের মতো এইসব বিচারালয়ের উপরও কলেক্টরদের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এইসব বিচারালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আবেদন করার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু মাল আদালত স্থাপিত হওয়ার পরই কলেক্টরদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায়।

১৭৮৮ থেকে ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ফৌজদারী বিচার বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। কর্ণওয়ালিস এই সময় বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন যে ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের সংস্কার আংশিক ভাবে বিচার বিভাগের ত্রুটি দূর করতে সমর্থ হয়েছে। সুতরাং তিনি খুব সতর্কভাবে নীতি নির্ধারণ করে অবশিষ্ট ত্রুটিগুলো দূর করার ব্যবস্থা করতে শুরু করেন। ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মধ্যে তিনি বিভিন্ন স্থানের ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট বিচার বিভাগের ত্রুটি সম্পর্কে সমস্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করেন। এই ত্রুটি সমূহের মধ্যে প্রধান ছিল দুটি ত্রুটি—ন্যায় বিচার সম্পর্কে ইংরেজদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী মুসলিম আইনের ত্রুটি এবং বিচারালয়ের সাংগঠনিক ত্রুটি। সুতরাং তিনি এই দুটি ত্রুটি দূর করার চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু প্রথম ত্রুটিটি দূর করা খুবই কঠিন ছিল। কারণ মুসলিম আইনের পরিবর্তনের ব্যাপারে অসুবিধার কথা কর্ণওয়ালিসের অজানা ছিল না। সুতরাং তিনি খুব সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে শুরু করেন। ১৭৯০ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তারিখের এক সরকারী নির্দেশনামায় অনেকগুলো ত্রুটি সম্পর্কে সরকারী সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা হয়। বাকি ত্রুটি সমূহ দূর করার ব্যাপারে উইলিয়ম জোনস-এর ভারতীয় আইন সম্পর্কে গবেষণা সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করে।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন বিচার বিভাগের ব্যাপারেও তার কোন অভাব দেখা যায় নি। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের সংস্কারের ফলে ফৌজদারী বিচার বিভাগের দায়িত্ব ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত থাকে। মুর্শিদাবাদের সদর নিজামত আদালত থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন ফৌজদারী বিচারালয় পর্যন্ত ভারতীয়গণই বিচার বিভাগের দায়িত্ব বহন করতেন। গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিল এবং ফৌজদারীর বিচারালয়ের ম্যাজিস্ট্রেটগণ ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে ন্যূনতম ক্ষমতা ভোগ করতেন। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস স্থির করেন যে, বিচার বিভাগ থেকে ভারতীয়দের অপসৃত করে ইয়োরোপীয়দের উপর সম্পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত না করা পর্যন্ত বিচার বিভাগের দুর্নীতি ও বিচারের প্রহসন বন্ধ করা সম্ভব নয়। তিনি ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা অগাস্ট এই

অভিমত ব্যক্ত করেন যে "I conceive that all regulations for the reform of the department would be useless and nagatory whilst the execution of them depends any native whatsoever." আবার ঐ বছরের ৩রা ডিসেম্বর তিনি বলেন যে, "We ought not, I think to leave the future control of so important a branch of government to the sole direction of any native, or indeed of any single person whatsoever."

প্রাদেশিক বিচারালয় গঠনের ব্যাপারেও লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতীয়দের সম্পর্কে একই প্রকার অবিশ্বাসের মনোভাব পোষণ করতেন। প্রত্যেক জেলায় দারোগার অধীনস্থ বিচারালয় ছাড়াও তিনি যে চারটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্থাপন করেন সেখানেও দুজন করে ইংরেজ বিচারকই নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পান। কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনায় এই চারটি বিচারালয়ের মূলকেন্দ্র স্থাপিত হয়। অপর দিকে কলেক্টরদের শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। এই সব ক্ষমতার মধ্যে শাস্তিপ্রাপ্ত ও বিচারাধীন বন্দীদের তত্ত্বাবধান করা এবং বিচারালয়ের রায় কার্যকরী করার দায়িত্ব প্রাধান্য লাভ করে।

দেওয়ানী বিভাগের মতো ফৌজদারী বিভাগের সংস্কারের ফলেও কালেক্টরদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে কর্ণওয়ালিস ভারতীয়দের পরিবর্তে ইংরেজ কর্মচারীদের নিয়োগের যে নীতিতে বিশ্বাস করতেন তার ফলেই কলেক্টরদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পায়। শাসনতন্ত্রকে দুর্নীতি মুক্ত এবং সুসম্বদ্ধ করে তোলার জন্য কর্ণওয়ালিস যে নীতি অনুসরণ করেন তার ফলে ইংরেজ রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি পায় এবং ভারতীয়দের উপর তাদের প্রভাব বিস্তার করার নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হয়। লর্ড কর্ণওয়ালিস যদিও তার বিচার বিভাগীয় সংস্কার অবলম্বিত করার পরিবর্তে বিলম্বিত করার পক্ষপাতী ছিলেন তথাপি তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের বিচার বিভাগের অনুকরণে ভারতীয় বিচার বিভাগ গঠন করা। কিন্তু ভারতীয় শাসন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত রেখে এরূপ পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব ছিল না। প্রচলিত আইনের পরিবর্তন করার প্রয়োজন বিশেষভাবে অনুভূত হতে শুরু করে। ইউরোপীয় বিচারক নিযুক্ত করার ফলেই আইনের পরিবর্তনের পথ উন্মুক্ত হয় এবং ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বরের কর্ণওয়ালিসের মন্তব্য থেকে তা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়।

(৩) পরবর্তী সংস্কার ঃ

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কর্ণওয়ালিস দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থাকে রাজস্ব ব্যবস্থাতে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করে নিম্নতর স্তর থেকে ঊর্ধ্বতম স্তর পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বিন্যাস করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের ১লা মের সরকারী নির্দেশ-নামা ব্রিটিশ শাসনের সমস্ত বিভাগকে প্রভাবিত করে। এই সময় বিচার বিভাগেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমত, দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থার সর্ব নিম্নে সদর আমিন ও মুনসেফি বিচারালয়গুলো স্থাপিত হয়। এই সকল বিচারালয়ে সাধারণ শ্রেণীর দেওয়ানী মামলার বিচার ব্যবস্থা সম্পাদিত হত। দ্বিতীয়ত, সদর আমিন ও মুনসেফি বিচারালয়ের উপরে প্রতি জেলায় একটি করে জেলা বিচারালয় স্থাপন করা হয়। জেলা বিচারালয়গুলো এক একজন করে ইংরেজ জেলা জজের অধীনে ছিল। তৃতীয়ত,

জেলা বিচারালয়ের উপর চারটি প্রাদেশিক বিচারালয় স্থাপন করা হয়। কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও পাটনায় এই প্রাদেশিক বিচারালয়গুলো স্থাপিত হয়। এগুলোর পরিচালনার দায়িত্বও ছিল ইংরেজ বিচারকের উপর ন্যস্ত। জেলাজজের বিচারকের রায়ের বিরুদ্ধে প্রাদেশিক বিচারালয়ে আপিল করা যেত। চতুর্থত, সমগ্র দেওয়ানী বিচারের সর্বোচ্চে ছিল দেওয়ানী আদালত। সপরিষদ গভর্নর জেনারেল এই বিচারালয়ের বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। পঞ্চমত, পূর্বে জেলার কলেক্টরগণ দেওয়ানী মামলার বিচার কার্য পরিচালনা করতেন। কর্ণওয়ালিস তাদের বিচার ক্ষমতা নাকচ করেন এবং তাদের শাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তবে সাধারণ ধরনের বিচার কার্য তাঁরাই পরিচালনা করতেন।

Q. 4. Discuss the role of Jagat Sett in Bengal Politics.

Ans. (১) ভূমিকা :

জগৎ শেঠ উপাধির অর্থ 'জগতের অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাঙ্কের মালিক অথবা মহাজন'। মাণিকচাঁদ ছিলেন মুর্শিদাবাদের জগৎ শেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তার ভ্রাতুষ্পুত্র ও দত্তক পুত্র ফতেচাঁদকে দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহ ১৭২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দে জগৎ শেঠ উপাধিতে ভূষিত করেন। ফতেচাঁদের আমলেই জগৎ শেঠ পরিবার ধন-সম্পদে সবাপেক্ষা সমৃদ্ধি লাভ করে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক মর্যাদার উচ্চশিখরে আরোহণ করার সুযোগ পায়। জগৎ শেঠ পরিবারের সদর দপ্তর মুর্শিদাবাদে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঢাকা, পাটনা প্রভৃতি স্থানেও তাদের অর্থ নৈতিক কার্যকলাপের জন্য শাখাদপ্তর স্থাপন করা হয়। সমসাময়িক ইংরেজদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থে জগৎ শেঠ পরিবারের ধনসম্পদের প্রশংসাসূচক উল্লেখ পাওয়া যায়। রবার্ট ক্লাইভ এবং এডমণ্ড বার্ক জগৎ শেঠ পরিবারের আর্থিক লেন-দেনের সঙ্গে ব্যাঙ্ক অফ ইংলণ্ডের লেন-দেনের তুলনা করেন। শুধুমাত্র আর্থিক লেন-দেন করার মধ্যেই জগৎ শেঠ পরিবারের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পরিবার বাংলাদেশের সরকারের অর্থদপ্তরের প্রায় সমস্ত কাজই নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ ভোগ করত। জগৎ শেঠ পরিবার স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ড ক্রয় করে মুর্শিদাবাদে টাঁকশাল স্থাপন করার পথ প্রশস্ত করে তোলে। বাংলাদেশের সরকারের পক্ষ থেকে এই পরিবারই জমিদারদের কাছ থেকে নিয়মিত রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা করত। দিল্লীর বাদশাহের কোষাগারে বাংলাদেশের সরকারের দেয় বার্ষিক অর্থও শেঠ পরিবারের মাধ্যমে প্রেরণ করা হত। বহির্বাণিজ্যের ফলে বিদেশ থেকে আগত মুদ্রার বিনিময়ের হারও নির্ধারণ করার দায়িত্ব তাদের উপর অর্পণ করা হয়। বাংলাদেশের অর্থনীতির উপর এরূপ নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব করার সুযোগ পাওয়ার ফলে বাংলাদেশের রাজনীতির উপর জগৎ শেঠ পরিবারের গভীর প্রভাব স্থাপিত হয় এবং নবাব মুর্শিদকুলি খানের আমল থেকে নবাব মীর কাশিমের আমল পর্যন্ত তাদের এই ক্ষমতা অব্যাহত থাকে।

(২) জগৎশেঠ ফতেচাঁদ :

১৭১৪ থেকে ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই পরিবারের প্রধান পরিচালক ছিলেন ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ। এই সময় বাংলাদেশের নবাব ছিলেন যথাক্রমে মুর্শিদকুলি খান (১৭০৭-১৭২৫ খ্রীস্টাব্দ), সুজাউদ্দিন (১৭২৫-১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দ), সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রীস্টাব্দ) এবং আলিবর্দী খান। নবাব মুর্শিদকুলি খান নামেমাত্র মোগলদের অধীনতা

স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বাধীন ভাবে বাংলাদেশের উপর রাজত্ব করতেন। তিনি এই স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করার জন্য বাংলাদেশের তদানীন্তন হিন্দুনেতৃবৃন্দের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করতে শুরু করেন। আর এই হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রধান ছিলেন ফতে চাঁদ জগৎ শেঠ। মুর্শিদকুলি খানের প্রধান কৃতিত্ব বাংলাদেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি আনয়নের জন্য নতুন ভূমিবণ্টন ব্যবস্থার প্রবর্তন, রাজস্ব বিভাগের পুনর্গঠন এবং অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। এই তিনটি কাজেই তার প্রধান সহায়ক ছিলেন জগৎ শেঠ। প্রয়োজনের সময় প্রচুর অর্থ ঋণ দিয়ে তিনি মুর্শিদকুলি খানের নীতি বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকতেন। এমন কি বৈদেশিক বণিকদেরও তিনি ঋণদানে কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না। এই অর্থ নৈতিক শক্তির বলেই তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে নিজের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সমর্থ হন এবং মুর্শিদকুলি খানও বাংলাদেশে নিরুপদ্রবে রাজত্ব করার জন্য ফতেচাঁদের সাহায্য অপরিহার্য মনে করে তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব কবার কোন চেষ্টা করেন না।

মুর্শিদকুলি খানের পর সিংহাসন লাভ করেন তাঁর জামাতা সুজা-উদ্ দিন। তিনি সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব থেকেই ফতেচাঁদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। মুর্শিদকুলি খান মৃত্যুর পূর্বেই তাঁর দৌহিত্র সরফরাজ খানকে বাংলাদেশের মসনদে স্থাপন করার উদ্দেশ্যে বাদশাহ ফারুখ শিয়রের সম্মতি আদায় করেন। কিন্তু সুজা-উদ্ দিন পুত্রের দাবি অগ্রাহ্য করে নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফলে জগৎ শেঠ ফতেচাঁদের মত প্রভাবশালী ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য লাভ করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং তিনি ফতেচাঁদকে তাঁর অন্যতম পরামর্শদাতারূপে নিযুক্ত করেন। ফতেচাঁদও এই সুযোগে নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন।

সুজা-উদ্-দিনের পৃষ্ঠপোষকতায় জগৎ শেঠ পরিবারের অর্থ নৈতিক ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। তিনি জমিদারদের শেঠদের মাধ্যমে রাজস্ব প্রদান করতে নির্দেশ দেন। তিনি নিজেও শেঠদের মাধ্যমেই দিল্লীর বাদশাহকে এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পাঠিয়ে বাংলাদেশের সিংহাসনের উপর তার অধিকারের আইনত সমর্থন আদায় করতে সমর্থ হন। কিন্তু কয়েক বছর রাজত্ব করার পর সুজা-উদ্-দিন আড়ম্বরপ্রিয় ও বিলাসী হয়ে ওঠেন এবং শাসনকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করতে শুরু করেন। ফলে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হাজি-আহমেদ, দেওয়ান আলম চাঁদ এবং ধনকুবের ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ বাংলাদেশের প্রকৃত শাসকে পরিণত হন। এই তিন জন প্রভাবশালী ব্যক্তির স্বার্থপরতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে জটিল এবং বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থার ভিত্তিকে শিথিল করে তোলে। রিয়াজ-উস্-সালাতিন-এর লেখক গোলাম হোসেন এবং তারিখ-ই-বঙ্গাল-এর লেখক সলিম উল্লার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, হাজি আহমেদ, আলম চাঁদ এবং ফতেচাঁদ কি-ভাবে সুজা-উদ্-দিন এবং সরফরাজ খানের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেন। এই তিন শক্তিশালী ব্যক্তির ষড়যন্ত্রের ফলেই সরফরাজ খান এবং তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা মহম্মদ তকি খানের মধ্যেও বিরোধের সূচনা হয়।

নবাব সুজা-উদ্ দিনের মৃত্যুর পর সরফরাজ খান বাংলার মসনদ লাভ করেন। দুর্বল, আরামপ্রিয় এবং অভিজ্ঞ নবাব সরফরাজ খানের আমলে বাংলাদেশেয় অবস্থা শোচনীয়

হয়ে ওঠে। শক্তিশালী সেনাপতি ও উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। সরফরাজ খানকে পদচ্যুত করে তাঁর পরিবর্তে বিহারের ডেপুটি গভর্নর আলিবর্দীকে সিংহাসনে স্থাপন করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ছিলেন আলিবর্দীর জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি আহমেদ। তিনি আলম চাঁদকে তাঁর দলে আনয়ন করতে সমর্থ হন। জগৎ শেঠও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ফতেচাঁদ জগৎ শেঠের এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার কারণ ছিল রাজনৈতিক, সরফরাজকে বিপদগ্রস্ত করে নিজের প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি করা। অপরদিকে হাজি আহমেদ এবং আলম চাঁদ জানতেন যে জগৎ শেঠকে তাঁদের দলভুক্ত করতে না পারলে কোন ক্রমেই এই রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে জগৎ শেঠ পরিবার তখন যে ক্ষমতা ভোগ করত তাতে তাদের বাদ দিয়ে বাংলা সুবায় কোন রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং ফতেচাঁদ সরফরাজের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান অংশীদারে পরিণত হন। গিরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দী সরফরাজকে পরাজিত ও নিহত করে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। আলিবর্দীর রাজত্বকালের প্রথম দিকে মারাঠাদের আক্রমণে মুর্শিদাবাদ বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং জগৎ শেঠ পরিবারও নানা-ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মারাঠা সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত ফতেচাঁদ জগৎ শেঠের গৃহ থেকে তিন লক্ষ টাকা আদায় করে নেওয়ার সুযোগ পান। কিন্তু মারাঠা আক্রমণের ফলে বাংলা ও উড়িষ্যার একটি বৃহৎ অংশ বিধ্বস্ত হওয়ার ফলে বাংলার নবাবের অর্থ-নৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তিনি রাজ্যের আর্থিক সমস্যা দূর করার উদ্দেশ্যে উত্তরোত্তর জগৎ শেঠ পরিবারের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে শুরু করেন। বিশেষত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপর আলিবর্দী খানের অধিকারের প্রতি স্বীকৃতি স্থাপন করে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে ফরমান মঞ্জুর করার ব্যাপারে জগৎ শেঠ আলিবর্দীকে নানাভাবে সাহায্য করেন। ফলে আলিবর্দী ফতেচাঁদ জগৎ শেঠের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ছিলেন।

(৩) মহতাবচাঁদ জগৎ শেঠ :

ফতেচাঁদ জগৎ শেঠ ১৭৪৪ খ্রীস্টাব্দে মারা যান এবং তারপর জগৎ শেঠ পরিবারের কর্তৃত্ব লাভ করেন মহতাবচাঁদ জগৎ শেঠ। মহতাবচাঁদ এবং তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা ও অংশীদার মহারাজা স্বরূপচাঁদ নবাব আলিবর্দীর রাজত্বকালে বাংলাদেশের রাজনীতির উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেন। আলিবর্দীর রাজত্ব কালেই (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দ) জগৎ শেঠ পরিবারের সঙ্গে ইংরেজ বণিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করে। বাংলা-দেশে নির্বিঘ্নে বাণিজ্যপরিচালনার জন্য জগৎ শেঠ পরিবারের সহানুভূতি ও সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন দূরদর্শী ইংরেজ বণিকদের নিকট তা অজানা ছিল না। নবাব আলিবর্দী জগৎ শেঠ পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করলেও অপুত্রক নবাবের মৃত্যুর পরই বাংলাদেশের রাজনীতিতে যে জটিল পরিস্থিতি উদ্ভবের আশঙ্কা অমূলক নয় সে কথাও মহতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদ সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হন। বিশেষত দৌহিত্র সিরাজ-উদ্-দৌলাকে নবাব আলিবর্দী তাঁর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক

ক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। ফলে আলিবর্দীর জীবিতকালেই বাংলাদেশে যে গোপন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র শুরু হয় জগৎ শেঠ পরিবারের পক্ষে তার সঙ্গে যুক্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ, রাজা রায় দুর্লভ, মিরজাফর, উঁমি চাদ প্রভৃতি সিরাজ-উদ্‌ দৌলার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে শুরু করলে মহতাবচাঁদ জগৎ শেঠকেও তারা তাঁদের অন্যতম সঙ্গী করার চেষ্টা করেন। কারণ বাংলার রাজকোষের প্রকৃত অবস্থা একমাত্র জগৎ শেঠেরই জানা ছিল। তাছাড়া ষড়যন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করার ক্ষমতাও একমাত্র তিনিই ভোগ করতেন।

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে নবাব অলিবর্দী মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলা বাংলার নবাব পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থাকার সুযোগ পান। সিরাজ-উদ্‌ দৌলার রাজত্বকাল অত্যন্ত স্বল্পস্থায়ী হলেও রাজনৈতিক দিক থেকে এর গুরুত্ব খুবই বেশি। সিংহাসনে আরোহণের পূর্ব থেকেই সিরাজ-উদ্‌ দৌলা তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের কথা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন এবং এই ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে ইংরেজদের গোপন যোগাযোগের কথাও তার অজানা ছিল না। সুতরাং তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত ব্যর্থ করার জন্য তার সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী পূর্ণিয়ার নবাব সৌকৎ জঙ্গ এবং ষড়যন্ত্রকারীদের প্রধান সহায়ক ইংরেজ বণিকদের দমন করার চেষ্টা করেন। এই দুই শক্তিকে দমন করার পর তিনি দরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অগ্রসর হন। উদ্ধত প্রকৃতির তরুণ নবাব সিরাজ-উদ্‌-দৌলা আলিবর্দীর আমলের প্রভাবশালী প্রায় সব রাজপুরুষকেই অপমান করেন। ধনকুবের মহতাবচাঁদ ও স্বরূপচাঁদকে অপমান করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু ইতিমধ্যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন সাধিত হয়। কর্নেল ক্লাইভ মাদ্রাজ থেকে বাংলাদেশে পদার্পণ করে শুধুমাত্র কলকাতা নগরী পুনরুদ্ধার করে সন্তুষ্ট হন নি, তিনি বাংলাদেশে রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনের জন্য স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ক্লাইভের সঙ্গে মহতাবচাঁদের সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। সম্ভবত কলকাতার বণিক উঁমিচাদ বা আমানচাঁদ উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই দুই বণিকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। ক্লাইভ এসেই নবাব সিরাজ-উদ্‌ দৌলার সঙ্গেও যোগাযোগ করেন এবং কলকাতা ও বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে নবাব কর্তৃক বাণিজ্য কুঠি অধিকার ও লুণ্ঠনের জন্য প্রচুর পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। এই সময় ক্লাইভ নিয়মিত ভাবে জগৎ শেঠদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন এবং সম্ভবত তাদের মাধ্যমেই নবাবের দরবারের সমস্ত সংবাদ আহরণ করতেন। এমনকি নবাব ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে উদ্ভূত বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য ক্লাইভ জগৎ শেঠের সাহায্যও প্রার্থনা করেন। কিন্তু উভয়পক্ষের বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা অসম্ভব বিবেচিত হওয়ায় সিরাজ-উদ্‌ দৌলা পুনরায় কলকাতা আক্রমণ করেন কিন্তু তিনি ক্লাইভের দ্বারা আকস্মিক ভাবে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আলিনগরের সন্ধিতে স্বাক্ষর দিয়ে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

আলিনগরের সন্ধির পরই রবার্ট ক্লাইভ সিরাজ-উদ্‌-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জগৎ শেঠ রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, ঘসেটি বেগম, প্রভৃতি প্রভাবশালী

ব্যক্তিগণ তার এই মত সমর্থন করেন এবং মীরজাফরকে নবাবের পদে স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জগৎশেঠ মহতাবচাঁদের সাহায্য ও সমর্থনের আশ্বাস না পেলে কখনই মীরজাফর সিংহাসন লাভের জন্য উৎসাহী হতেন না। কারণ তিনি জানতেন যে অর্থ-নৈতিক কারণেই তাঁকে জগৎশেঠের দ্বারস্থ হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এই সময় জগৎশেঠ পরিবার বাংলাদেশের রাজা-নির্মাতা'র (King maker) স্থান অধিকার করতে সমর্থ হন। অপরদিকে ইংরেজ বণিকগণও দেশীয় এই বণিককে তাঁদের ষড়যন্ত্রের অংশীদারে পরিণত করে নিঃশব্দে এই রাজনৈতিক বিপ্লব সংঘটিত করার ব্যবস্থা করেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফর বাংলার নবাবী লাভ করেন। কিন্তু তিনি একদিকে রবার্ট ক্লাইভ এবং অপরদিকে মহতাবচাঁদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। সিংহাসন বজায় রাখার জন্য এই দুজনের সাহায্য তাঁর পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দাবি পূরণ করার জন্যও তাঁর জগৎশেঠের দ্বারস্থ হতে হয়। এমন কি মোগল বাদশাহের নিকট থেকে তাঁর সিংহাসন আরোহণের স্বীকৃতি স্বরূপ ফরমান লাভের জন্যও তাঁর রবার্ট ক্লাইভ ও জগৎশেঠকে অনুরোধ জানাতে হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সময় বাংলাদেশের রাজনীতি পুরোপুরি দুই বণিক ক্লাইভ ও জগৎশেঠের উপর নির্ভর করতে শুরু করে।

কিন্তু মীরকাশিমের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন শুরু হয়। যদিও তিনি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই বাংলাদেশের সিংহাসন লাভ করেন তথাপি তিনি স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তিনি অচিরেই উপলব্ধি করেন যে, স্বাধীন ভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে শুধু-মাত্র বিদেশী ইংরেজদের থেকেই তিনি বাধা প্রাপ্ত হবেন না, স্বার্থান্বেষী ও প্রভাবশালী দেশীয় ব্যক্তিগণও এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য না করে বরং পদে পদে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। সুতরাং তিনি রাজ্যের এই সব প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অত্যন্ত সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করেন। নতুন গোলন্দাজ বাহিনী গঠনের জন্য অর্থের প্রয়োজন দেখা দিলে তিনি জগৎ শেঠের নিকট কয়েকবার অর্থও দাবি করেন। রায় দুর্লভ, রাজবল্লভ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূর্ব থেকেই মীরকাশিমের প্রতি বিরূপ ছিলেন। এবার জগৎশেঠও তাদের দলে যোগ দেন। সুতরাং ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁরা যেমন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি বিপ্লব ঘটাতে সমর্থ হয়েছিলেন ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দেও তাঁরা পুনরায় বাংলার রাজনীতিতে আবার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে কৃতসংকল্প হন। ইংরেজের সঙ্গে নবাব মীরকাশিমের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ শুরু হলে মীরকাশিম রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ প্রভৃতির সঙ্গে জগৎশেঠকেও নবাব বন্দী করেন। কিন্তু এরূপ অবস্থায়ও তাঁরা ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেন। ফলে মীরকাশিম তাঁদের জীবিত রাখা বিপজ্জনক মনে করে ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁদের নৃশংসভাবে হত্যা করার নির্দেশ দেন। মহতাবচাঁদ জগৎশেঠের মৃত্যুর পরেই জগৎশেঠ পরিবার নিদারুণ দুর্দিনের সম্মুখীন হতে শুরু করে।

(8) উপসংহার ঃ

মীরকাশিমের পরাজয় ও পতনের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করে। নামে মাত্র মুর্শিদাবাদের নবাব, ইংরেজদের ক্রীড়নকে পরিণত হন। অপর-

দিকে ইস্ট ইণ্ডিয়া জগৎ শেঠদের নিকট তাদের আর্থিক ঋণের কথা অস্বীকার করায় জগৎশেঠ পরিবার ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। মহতাবচাঁদ জগৎশেঠের মৃত্যুর পর তাঁর অধস্তন ষষ্ঠপুরুষ পর্যন্ত জগৎশেঠ উপাধি ধারণ করার অধিকার ভোগ করলেও এক সময়ে বাংলাদেশের অপ্রতিহত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী জগৎশেঠ পরিবার ইংরেজ সরকারের পেন্সন ভোগী আশ্রিত পরিবারে পরিণত হয়।

Q. 5. Discuss the elements of peasants consciousness during 1783-1860.

Ans. (১) ভূমিকা:

বাংলাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন স্থানের কৃষকদের মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্রোহ দেখা দিতে শুরু করে। ভূমি-রাজস্ব আদায়ের বর্ধিত কঠোরতা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের হাতে কারিকর সম্প্রদায়ের শোষণ, প্রাচীন জমিদারদের জমিদারী থেকে উৎখাত করা প্রভৃতি কারণে কৃষকদের বিদ্রোহী হয়ে ওঠার পটভূমিকা তৈরি হয়। নিজেদের অভাব অভিযোগের দ্বারা তাড়িত হয়ে কৃষক ও কারিগর সম্প্রদায়ের অনেকেই এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে তারাই এই বিদ্রোহের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। বিশেষতঃ ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর এই সব বিদ্রোহভাবাপন্ন কৃষকদের ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী করে তোলে। অনাবৃষ্টি ও শস্য উৎপাদনের স্বল্পতা ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের অন্যতম প্রধান কারণ রূপে পরিগণিত হলেও ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা এবং সরকারী কর্মচারীদের নিষ্ঠুরতা কৃষকদের মধ্যে দারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সুতরাং কৃষকগণ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে আত্মসচেতন হয়ে উঠতে বাধ্য হয় এবং যৌথ ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার চেষ্টা করে।

বাংলাদেশে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে কৃষকগণই ছিল জমির প্রকৃত মালিক। জমিদারগণ তাদের কাছ থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতেন, কিন্তু তারা জমির মালিক ছিলেন না। কিন্তু মুসলিম শাসনের শেষ দিকে রাজ্যে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে জমিদারগণ অন্যায় ভাবে জমির মালিকানা অধিকার করার চেষ্টা শুরু করেন। ফলে কৃষকগণ তাদের চিরাচরিত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় এবং ধীরে ধীরে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হতে শুরু করে। ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর প্রচলিত ব্যবস্থাকেই তারা স্বীকৃতি দেয় এবং কৃষকদের পরিবর্তে জমিদারদের জমির মালিক রূপে গণ্য করতে শুরু করে। অবস্থার এই পরিবর্তন কৃষকদের পক্ষে সহজভাবে স্বীকার করে নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই নীতির বিরুদ্ধে তাদের মানসিক বিক্ষোভ প্রকাশ্য বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে শুরু করে।

অপরদিকে ইংরেজগণ বাংলাদেশের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সমর্থ হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা ছিল একটি বণিক সঙ্ঘের প্রতিভূ। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক স্বার্থ দেখাই ছিল তাদের প্রধান কর্তব্য। সুতরাং তারা অধিক মুনাফার লোভে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিবর্তে কৃষকদের কৃষি পণ্য উৎপন্ন করতে বাধ্য করতে শুরু করে। ইংরেজ সরকারের প্রচেষ্টার ফলে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন জেলা আফিম ও তামাক উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হয় এবং সরকারী কর্মচারিগণ নতুন নতুন এলাকা আফিম ও তামাক চাষের অধীনে

আনয়ন করার জন্য চেষ্টা করতে শুরু করেন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গে আবহাওয়া ও মৃত্তিকা পাট চাষের পক্ষে উপযোগী হওয়ায় ইংরেজ সরকার এইসব অঞ্চলে পাট চাষের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করতে শুরু করে। মধ্য বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের একাংশে নীল চাষ খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কৃত্রিম নীল আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে বাংলাদেশের নীলই নীলের আন্তর্জাতিক বাজার অধিকার করতে সমর্থ হয়। সুতরাং এই লাভজনক নীল চাষের প্রতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয় এবং তারা জমিতে নীল চাষ করার জন্য কৃষকদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। রেশম শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশের পশ্চিমাংশের জেলাগুলো এবং বিহারের পূর্বদিকের জেলা সমূহ। বহু বছর পর্যন্তই বাংলার রেশমশিল্পের উপর ইংরেজ বণিকদের একাধিপত্য স্থাপিত হয়। দাদন দিয়ে তারা কৃষকদের প্রকৃতপক্ষে ক্রীতদাসে পরিণত করার সুযোগ লাভ করে এবং বাইরের দেশে রেশমশিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন জমিতেও তুঁতে চাষ করার জন্য কৃষকদের বাধ্য করে।

অপরদিকে বাংলাদেশের বস্ত্র-শিল্পকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়। ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে এই সময় বস্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠান-গুলো গড়ে উঠতে শুরু করলে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানের বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্রগুলো ধ্বংস করতে শুরু করে। এমন কি, নিজেদের স্বার্থে তারা বাংলার মসলিনের মতো উচ্চ ধরনের বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করতেও বিন্দু-মাত্র কুণ্ঠিত হয় নি। বস্ত্রশিল্প ছাড়া অন্যান্য কুটির শিল্পও ব্রিটিশ সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের ফলে ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়তে থাকে। এই সব শিল্পের ধ্বংস বাংলা ও বিহারের কৃষকদের আর্থিক অবস্থাকে শোচনীয় করে তোলে। কারণ সেই সময় অধিকাংশ কৃষক পরিবারই অবসর সময়ে শিল্পোদ্যোগে অংশ গ্রহণ করত। ফলে কৃষি ও শিল্প থেকে লব্ধ অর্থে তাদের সচ্ছন্দে জীবন যাপন করা সম্ভবপর হত। কিন্তু কৃষি থেকে প্রাপ্ত অর্থের উপর এককভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের অভাব দূর করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। কৃষিকার্যে স্বাধীনতার বিলুপ্তি এবং শিল্পক্ষেত্র থেকে অপসারিত হওয়ার ফলে বাংলাদেশের কৃষক সমাজের মনে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে থাকে।

উপরি-উক্ত অর্থ নৈতিক কারণ ছাড়াও ধর্মীয় কারণও এই সময় কৃষকদের ব্রিটিশ শাসন-বিরোধী করে তুলতে সাহায্য করে। খ্রীস্টান মিশনারীগণ ভারতের বিভিন্ন স্থানে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচার করতে শুরু করলে সাধারণত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় তারা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হন। প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে অনবরত নিন্দা বর্ষণ করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সুখ-সুবিধার আশ্বাসে প্রলুব্ধ করে খ্রীস্টান ধর্ম প্রচারকগণ বহু আদিবাসীকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার সুযোগ লাভ করেন। খ্রীস্ট ধর্মে দীক্ষিত আদিবাসিগণের সঙ্গে সনাতন পন্থী আদিবাসীদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বিশেষত সমষ্টিগত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত আদিবাসিগণ অংশ গ্রহণ করতে অসম্মত হলে এই সংঘর্ষ গুরুতর আকার ধারণ করতে শুরু করে। ফলে সনাতন

পন্থী আদিবাসিগণ খ্রীস্ট ধর্ম প্রচারক ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের ধর্মীয় চেতনা একদিকে যেমন নিজেদের ঐক্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে অপরদিকে এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করে পুনরায় নিজেদের শাসনব্যবস্থা উদ্ধার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

খ্রীস্টধর্ম ও ধর্ম প্রচারকগণ যেমন সনাতনপন্থী আদিবাসী কৃষকদের বিদ্রোহ মনোভাবাপন্ন করে তোলে অনুরূপভাবে মুসলমান সমাজে এই সময় ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের এবং পরিশুদ্ধির জন্য আন্দোলন শুরু হয়। এই সব আন্দোলনের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ওয়াহাবি আন্দোলন এবং বাংলাদেশের ফরাজি আন্দোলন। কিন্তু এইসব ধর্মশুদ্ধির আন্দোলনকারিগণ পরে যে ভাবে ধর্ম নির্বিশেষে নতুন জমিদার, ভূস্বামী এবং মহাজনদের সামনাসামনি আক্রমণ করতে শুরু করে তা থেকে মনে হয়, কৃষকগণই ছিল এই আন্দোলনের প্রধান শক্তি। দার-উল-হারব অর্থাৎ বিধর্মীদের রাজ্যের পরিবর্তে দার-উল-ইসলাম অর্থৎ মুসলমানদের রাজ্য স্থাপনের ধর্মীয় চেতনা থেকে সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায় যে, ইংরেজ শাসকদের দেশ থেকে বিতাড়িত করাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য। সেজন্য তারা সরাসরি ভাবে ইংরেজ শাসকদের আক্রমণ করতে না পারলেও শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থের প্রহরী জমিদার শ্রেণীকে তারা আক্রমণ করতে শুরু করে।

(২) বিভিন্ন কৃষক বিদ্রোহ ঃ

বাংলাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আন্দোলন শুরু হয়। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় সব চাইতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক সমাজ। সেজন্য সন্ন্যাসী ও ফকির আন্দোলনের প্রধান সমর্থক ছিল কৃষকগণ। তবে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য থেকে বরখাস্ত সৈন্যগণও এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তরের পর দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে উত্তর বঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলায় সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ ইংরেজ শাসন উচ্ছেদ করার চেষ্টা শুরু করে। পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, মালদহ, রংপুর, বগুড়া ও রাজশাহী জেলায় এই আন্দোলন সবাপেক্ষা তীব্র আকার ধারণ করে। সন্ন্যাসীদের অধীনে হিন্দু কৃষকগণ এবং ফকিরদের নেতৃত্বে মুসলমান কৃষকগণ ইংরেজ রাজকর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ফকির সম্প্রদায়ের নেতা মজনুর বীরত্বে ইংরেজ সৈন্যগণ এত বিব্রত হয়ে পড়েন যে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে ভূটানের দেবরাজের সঙ্গে একটি চুক্তি করে সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ যাতে ভূটানে আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারেন তার ব্যবস্থা করেন। এমন কি, তিনি বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করার জন্য বেনারসের রাজা চৈৎ সিংকে সৈন্য পাঠাবার নির্দেশ দেন।

মজনুর ভয়ে স্থানীয় জমিদারগণ ভীত হয়ে ওঠেন এবং অনেকে বাড়ীঘর ত্যাগ করে নতুন স্থানে বাসস্থান নির্মাণ করতে বাধ্য হন। সরকারী নথিপত্রে মজনু বাদেও আরও কয়েকজন দুঃসাহসী বিদ্রোহী নেতার উল্লেখ পাওয়া যায়। ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানী নামে জনৈক নেত্রীও বিদ্রোহ পরিচালনায় খুব কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কিন্তু এই সব বিদ্রোহী নেতৃবর্গ কখনও সাধারণ লোকের উপর অত্যাচার করেন নি। ইংরেজ সরকার এবং তাদের সমর্থক জমিদারগণই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য।

বাংলাদেশের পশ্চিমাংশ ও বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে প্রচুর আদিবাসী বাস করে। ব্রিটিশের ক্ষমতার প্রসার ও ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার বিস্তারকে তারা কখনও সুনজরে দেখে নি। বিশেষতঃ তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহিরাগত লোকের অনুপ্রবেশ তাদের চিরাচরিত জীবনধারার উপর গভীর আঘাত করে। ব্রিটিশের প্রতিনিধি হয়ে আদিবাসী মানুষকে ঔপনিবেশিক অর্থনীতি এবং শোষণ ব্যবস্থার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করে তোলে মহাজন, ব্যবসায়ী ও জোতদারের দল। তাদের সরল জীবনে এই সব গোষ্ঠীর অনুপ্রবেশ আদিবাসী মানুষকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। আদিবাসী অঞ্চলে অনেকবার বিদ্রোহ দেখা দেয় তবে তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ।

কৃষক সমাজের আর একটি বিদ্রোহ বিশেষভাবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি হল ফরাজি বিদ্রোহ। ফরিদপুরের হাজি শরিয়ত-উল্লা এই আন্দোলন শুরু করেন। পবিত্র ইসলাম ধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য এই আন্দোলন শুরু হলেও ধীরে ধীরে এই আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে। ফরিদপুর, যশোর, নদীয়া, চব্বিশ পরগনা প্রভৃতি জেলার মুসলিম কৃষকগণ এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে জমিদারগণের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। তবে শরিয়ত উল্লার নেতৃত্বে এই আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তারের সুযোগ না পেলেও পরবর্তীকালে চব্বিশ পরগণার তিতুমীরের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শক্তিশালী কৃষক বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করে। তিনি চব্বিশ পরগণার নারিকেল বেড়িয়ায় একটি বাঁশের কেল্লা নির্মাণ করে নিজের সৈন্যদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন। তিতুমীর ও তাঁর সৈন্যদের দাপটে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদারগণ সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। তবে তিতুমীরের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই ছিল হিন্দু জমিদারগণ। সেই দিক দিয়ে তাঁর আন্দোলনের মধ্যে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িকতার উগ্র পরিচয় পাওয়া যায়। তিতুমীরের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আক্রমণাত্মক নীতির সংবাদ পেয়ে গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক কলকাতা থেকে প্রচুর সৈন্য পাঠান। ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমণে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা বিধ্বস্ত হয় এবং তিতুমীর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিতুমীরের মৃত্যুর পর ফরাজিদের প্রকাশ্য আন্দোলন বন্ধ হলেও মুসলিম কৃষকগণের ব্রিটিশ সরকার এবং হিন্দু জমিদারদের প্রতি আক্রোশ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায় নি।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের নীল উৎপাদক জেলাগুলোতে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দেয়। হিন্দু ও মুসলমান কৃষকগণ মিলিতভাবে এই বিদ্রোহে যোগ দেয়। কৃষকদের নেতৃত্ব দেন যশোর জেলার নবীমাধব ও বেনীমাধব বিশ্বাস, নদীয়ার মেঘানা সরদার, হুগলির বৈদ্যনাথ ও বিশ্বনাথ সরদার। নীল বিদ্রোহীরা জল ও স্থলপথে ইংরেজ কুঠিয়াল ও তাদের সহায়ক ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের উপর ব্যাপক আক্রমণ চালায়। কোন কোন স্থানে নীল চাষীদের আন্দোলন ব্যাপক গণআন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনকারীরা বাংলাদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সক্রিয় সমর্থন লাভ করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের এই আন্দোলন চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। প্রথমদিকে ব্রিটিশ শাসকগণ কঠোর নীতি গ্রহণ করে এই আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করে। অগণিত কৃষক নীলকর সাহেবও

ইংরেজ সৈন্যদের হস্তে নিহত হয়। কিন্তু জনমতের চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার নীল চাষ সম্পর্কে তাদের নীতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে সরকার নীলকর সাহেবদের প্রধান হাতিয়ার ইণ্ডিগো কনট্রাক্টস্ অ্যাক্ট বাতিল করে দিয়ে নীল চাষীদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করে।

(৩) উপসংহার :

উনবিংশ শতাব্দীর এই কৃষক বিদ্রোহ ও গণঅভ্যুত্থান অবশ্য কোন সময়ই ব্রিটিশ কর্তৃত্বের ভিত্তিকে শিথিল করতে পারে নি। তবে ভারতীয় অর্থনীতি ও ঔপনিবেশিক শোষণ ব্যবস্থার নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার ফলে কৃষক ও আদিবাসী সম্প্রদায় যে রকম ব্যাপকভাবে বিব্রত হয়ে পড়েছিল ও অবর্ণনীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছিল তারই বিরুদ্ধে সহজাত ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের এগুলো উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যারা তাদের দুর্দশার প্রত্যক্ষ কারণ যেমন, নীলকর জমিদার বা মহাজন, অনেক সময় তারাই তাদের ক্রোধের লক্ষ্য হত। আবার অপরদিকে জমিদার, মহাজন, নীলকর প্রভৃতির স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের স্বার্থ জড়িত ছিল বলে তারা আইন-শৃঙ্খলার নাম করে বিদ্রোহীদের দমন করার চেষ্টা করত। প্রকৃতপক্ষে এই সময় ভারতের অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনসাধারণ বাস্তব-ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিকতার বিষময় ভবিষ্যতকে যতটা বুঝতে পেরেছিল, তা শিক্ষিত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত ভারতীয়রাও বুঝতে পারে নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কৃষকদের এই আন্দোলনের অসাফল্য ছিল অবশ্যম্ভাবী। বিশ্বাস, সাহস, বীরত্ব, মহৎ আত্মত্যাগের প্রেরণা সকলই তাদের ছিল কিন্তু আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ও বিশ্ব বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্পদের অধিকারী সাম্রাজ্য-বাদের কাছে দাঁড়াবার শক্তি তাদের ছিল না। নতুন কোন মতাদর্শ তাদের অধিগত ছিল না। ঔপনিবেশিকতার সম্প্রসারণের ফলে যে সব নতুন সামাজিক শক্তি জন্ম নিয়েছিল তাদের উপর ভিত্তি করে কোন সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কর্মসূচিও তারা গ্রহণ করে নি। সমাজ সম্পর্কে এমন কোন গঠনমূলক তত্ত্ব বা কোন নতুন জীবনবাদ তাদের ছিল না যা দিয়ে তারা দেশের মানুষকে ব্যাপকভাবে সঙ্ঘবদ্ধ করতে পারে। সংখ্যায় অগণিত হলেও এই ধরনের অনিয়মিত,বিক্ষিপ্ত ও অসংবদ্ধ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের শক্তিকে পরাজিত করা সম্ভব ছিল না। তার জন্য প্রয়োজন ছিল এমন এক অভ্যুত্থানের যা আধুনিক চিন্তা ও বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং যার আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা দেশের সমস্ত জনসাধারণকে রাজনৈতিক কর্মপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে তুলতে সক্ষম। এই সব কৃষক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সেরূপ ব্যাপক কোন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল না একথা সত্য, কিন্তু ঔপনিবেশিক শোষণ সম্পর্কে তারা খুবই সচেতন ছিল এবং সেই সচেতনতা তাদের প্রতিটি আন্দোলনের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।

Q. 6. How did the ethnicity and religiosity contribute to the organisation of the Santal Revolt of 1855 ?

Ans. (১) সাঁওতাল বিদ্রোহ :

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জুন ইংরেজ সরকারের ছত্র-ছায়ায় আশ্রিত ভূস্বামী, কর আদায়কারী এবং গ্রাম্য মহাজনদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে আদিবাসী সাঁওতালগণ বিদ্রোহী

হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বেও সাঁওতালগণ ইংরেজ সরকারের বিভিন্ন নীতি ও সরকারী কর্মচারীদের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ জানিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিন্তু সেই সব বিদ্রোহ ছিল সাময়িক ও বিশেষ কোন অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু ১৮৫৫ থেকে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং অত্যন্ত কঠোর ও নৃশংস নীতি গ্রহণ করে ইংরেজ সরকার এই আন্দোলন দমন করার ব্যবস্থা করেন।

এই বিদ্রোহের নায়ক ছিলেন বিহারের সাঁওতাল পরগণার ভোতানা ডিহি গ্রমের চাঁদ মুর্মুর যমজ দুই পুত্র সিদো ও কানহু মুর্মু। চিন্তাধারায় সিদো ও কানহুর মধ্যে অদ্ভুত ধরনের সাদৃশ্য ছিল। তাদের আরও চাঁদ ও ভাইরো নামে দুই ভাই ছিল। পাশ্ববর্তী সিমূল চপ গ্রামে তারা বাস করত। দরিদ্র হলেও সিদো ও কানহু ছিল সৎ ও পরোপকারী। চারিত্রিক দৃঢ়তার জন্য তারা ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের নিকট খুব জনপ্রিয় ছিল এবং বিপদে-আপদে সকলেই তাদের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করত। আদিবাসীদের ধর্মের প্রতি এবং সবপ্রাণিবাদে সিদোর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। ধর্মীয় আলোচনার জন্য অনেকেই তার নিকট উপস্থিত হত। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় 'পণ্ডিত' হিসাবে সিদোর সুখ্যাতি খুব ছড়িয়ে পড়ে এবং তার চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও সততার জন্য শুধুমাত্র সাঁওতালগণ নয় স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানরাও তাকে বিচক্ষণ পরামর্শদাতা, অকৃত্রিম বন্ধু ও পরমহিতৈষী সুহৃদ বলে মনে করত।

সাঁওতালদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ ও আপত্তি অগ্রাহ্য করে বহিরাগত সাঁওতালদের সাহায্যে বন-জঙ্গল পরিষ্কার করে সাঁওতাল পরগণার উত্তর-পূর্ব দিকে দামিন-ই-কোহ্ অর্থাৎ 'পাহাড়ের প্রান্ত' নামে বসতি স্থাপন করা হয়। অপরদিকে দিকু অর্থাৎ আদিবাসী ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের ষড়যন্ত্র ও জালিয়াতির ফলে সাঁওতালগণ উর্বর জমি থেকে ক্রমেই উৎখাত হতে থাকে এবং তাদের উৎপন্ন শস্যও 'বিদেশীদের' ঘরে জমা হতে শুরু করে। ফলে আদিবাসিগণ ক্রমেই দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়ে পড়ে। এমন কি তাদের অনেকেই 'বিদেশীদের' দ্বারা দখলীকৃত নিজেদের জমিতেই কৃষাণ হিসাবে জন-মজুরের কাজ করতে বাধ্য হয়। অপরদিকে 'বিদেশী' শোষণকারীর অবস্থার দ্রুত উন্নতি হতে থাকে। নিরুপায় সাঁওতালগণ বিদেশীদের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য দেওঘরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে বছরের পর বছর অসংখ্য আবেদন প্রেরণ করেও কোন প্রকার সুফল লাভ করে নি। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার প্রতিনিধি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদিবাসীদের সাহায্যে এগিয়ে আসার পরিবর্তে জমির রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করে এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের পক্ষ গ্রহণ করে আদিবাসীদের উপর নির্যাতনের পথ আরও সুগম করে দেয় ফলে অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। কিন্তু সাঁওতালগণ এই অবস্থা মেনে নিতে রাজী ছিল না এবং দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত বিক্ষোভ প্রথমে 'বিদেশী' শোষণকারী ও স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিদের এবং পরে ব্রিটিশ সরকারে বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের রূপ গ্রহণ করে। প্রথম দিকে এই বিদ্রোহ ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় নি।

ভারতীয় শোষণকারীদের হাত থেকে মুক্ত হয়ে সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা গঠন করাই ছিল তাদের প্রধান লক্ষ্য।

এরূপ অবস্থায় সিদো ও কানহুর পক্ষে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। সিদো ও কানহুর নেতৃত্বে সাঁওতালগণ নিজেদের বাসভূমিতে পরবাসী হওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের ঐতিহাসিক 'হুল' অর্থাৎ বিদ্রোহ শুরু করে। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে জুন সিদো ও কানহু ভোগনাডিহি গ্রামের শালবনে উপস্থিত প্রায় দশ হাজার আদিবাসীর নিকট এক স্বর্গীয় নির্দেশের কথা প্রকাশ করেন। সাঁওতালদের শোষণকারীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য তারা সকলে ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করে। সিদো ও কানহু সাঁওতালদের মনে বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে তুলতে সমর্থ হয় এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কুশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য হাজার হাজার সাঁওতাল চারদিক থেকে সিদো ও কানহুর নেতৃত্বাধীনে সমবেত হতে শুরু করে। কিন্তু তখনও ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা তাদের দাবির প্রতি কোন প্রকার কর্ণপাত করে নি। সরকারের এই ঔদাসীন্য সাঁওতালদের মনে তীব্র বিদ্বেষের সৃষ্টি করে এবং তারা সিদো ও কানহুর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভোগনাডিহি থেকে পঞ্চকাটিয়ার দিকে যাত্রা করে। সেখানে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তীর-ধনুক, বর্শা, বল্লম, কুঠার প্রভৃতি চিরাচরিত হাতিয়ারে সজ্জিত সাঁওতালদের সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রথমবারের সংঘর্ষে সাঁওতালগণ ইংরেজ সৈন্যদের অকস্মাৎ আক্রমণ করে বিব্রত করে তোলে। এই সংঘর্ষে বেশ কিছু সংখ্যক সাঁওতাল নিহত হলেও সিদো ও কানহুর বীরত্বের ফলে সাঁওতালদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। পাকুরের নিকটবর্তী ফলদলি পাহাড়, দামিন-ই-কোহ্-এর নিকটবর্তী বরহিয়েত, চরহরোয়া, রাজমহল, কামরাবাদের নিকটবর্তী ওপরডাঙ্গা, বীরভূমের সাইথিয়া এবং বর্ধমান জেলার কয়েকটি স্থানে ইংরেজ-সৈন্য ও সাঁওতালদের সংঘর্ষ দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ইংরেজ শাসকগণ তাদের সামরিক শক্তি সুসংহত করে বিদ্রোহী সাঁওতালদের দমন করার জন্য উপযুক্ত ভাবে প্রস্তুত হয়। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে এক সংঘর্ষে সিদো প্রাণ হারায়। কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সহ কানহু ব্রিটিশ সৈন্যদের হস্তে বন্দী হয়। সাঁওতালদের চোখের সামনে তাদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য কানহু ও তার সঙ্গীদের ভোগনাডিহি গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বন্দীদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। সিদো ও কানহুর মৃত্যুর পরও সাঁওতালদের সংগ্রামী মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নি। অপর-দিকে ব্রিটিশ সরকার সাঁওতালদের স্বার্থরক্ষা করার জন্য কয়েকটি আইন বিধিবদ্ধ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে সাঁওতালদের মনোভাবের বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নি। সাঁওতাল বিদ্রোহও ব্যর্থ হয় নি, এই বিদ্রোহই ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পথ প্রশস্ত করে তোলে।

(২) জাতিগত ও ধর্মগত বৈশিষ্ট্য :

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণগুলো একদিকে যেমন জটিল অপরদিকে তেমনই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তবে বিভিন্ন কারণগুলোকে সুসম্বদ্ধ করতে সাহায্য করে এই

বিদ্রোহের জাতিগত ও ধর্মগত বৈশিষ্ট্য। ভূস্বামী, কর আদায়কারী এবং মহাজনদের উপর আক্রমণ এই বিদ্রোহের প্রাথমিক কার্যকলাপ হলেও বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ ছিল অনেক গভীর ও সুদূর বিস্তৃত। ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থা এবং রেলপথ স্থাপনের বিরুদ্ধে তাদের গভীর অসন্তোষ ছিল। ভূস্বামী কর আদায়কারী, মহাজন, ব্রিটিশ রাজকর্মচারিগণ সকলেই সুসংবদ্ধ সাঁওতাল সমাজের নিকট বিদেশীরূপে পরিচিত ছিল। সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলে এইসব বিদেশীর অনুপ্রবেশ তারা কখনও পছন্দ করতে পারে নি। তারা তাদের অতীত দিনের আদর্শ সমাজের স্মৃতি বিস্মৃত হতে পারে নি এবং তারা দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করত যে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা অচিরেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এই মনোভাবই তাদের বিদেশী ভূস্বামী, মহাজন প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালাতে উদ্বুদ্ধ করে। বিশেষত মহাজনগণ ব্যক্তিগতভাবে কোন সাঁওতালকে অর্থ ঋণ দিত না, সাঁওতালদের নেতা বা মাঝি নামে পরিচিত ব্যক্তিকে তারা ঋণ দিত। ফলে সমগ্র সাঁওতাল সমাজই আত্মরক্ষার জন্য এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে।

সাঁওতাল বিদ্রোহে শ্রেণী চেতনা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোক সাঁওতালদের শোষণ করার চেষ্টা করত। ফলে সমস্ত সাঁওতালগণই তাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। সাঁওতালগণ অন্য জাতির লোক থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র বলে মনে করে এবং এই চেতনাই তাদের মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সহায়তা করে। নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সাঁওতালগণ একটি স্বতন্ত্র উপজাতি বলে মনে করেন। নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও নিজেদের উপজাতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য তারা অনেক সময় ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও শিকার কার্যের জন্য পার্শ্ববর্তী কয়েকটি গ্রামের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলার চেষ্টা করত। এই দুটি অনুষ্ঠান তাদের ঐক্য বজায় রাখার ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করত। আদিবাসী উপজাতিগুলো গোষ্ঠীগত ভাবে একতা রক্ষা করার যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সাঁওতালদের ক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম ছিল না। অপরদিকে ব্রিটিশদের শাসন ব্যবস্থাও সাঁওতালদের মধ্যে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ঐক্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। পূর্বে অনেক সময় জমি ও গ্রাম্যদেবতাকে কেন্দ্র করে সাঁওতালদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হত। ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ার ফলে এইরূপ দ্বন্দ্বের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়।

দুটি কারণ সাঁওতালদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য গঠনে বিশেষ সাহায্য করে। প্রথমত পাহাড়-পর্বতময় বনাঞ্চলে এবং তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে দূরে তারা বসবাস করত। দ্বিতীয়ত, ভারতের হিন্দু বা মুসলিম কোন সংস্কৃতিই তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। হিন্দুগণ তাদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করত না।

আবার অপরদিকে সাঁওতালগণ শাকসবজি এবং অন্ন আহারকারী হিন্দুদের অতিশয় নিম্নশ্রেণীর ভীরু মানুষ বলে মনে করত। হিন্দুদের থেকে তারা যে স্বতন্ত্র জাতির লোক একথা মনে করে তারা অহঙ্কারও বোধ করত। নিজেদের গ্রামের গণ্ডী অতিক্রম করে অন্যান্য স্থানের সাঁওতালের সঙ্গে পরিচয় হওয়ায় তাদের এই মনোভাব আরও বৃদ্ধি পায়। সেই সময় থেকেই তারা ইংরেজ শাসন ও বিদেশীদের শোষণ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে চেষ্টা করে। উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকেই দামোদর নদীর তীরে বসবাসকারী

ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে পরিচিত মোরো রাজা নামে জনৈক সাঁওতাল প্রথম তার স্বজাতি-দের ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করার চেষ্টা করে। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দেও মহাজনদের বাড়ি-ঘর আক্রমণ করে সাঁওতালগণ তাদের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার চেষ্টা করে। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের সাহায্যপুষ্ট ভূস্বামী ও মহাজনগণ নির্বিঘ্নে তাদের শোষণ কার্য চালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। ফলে এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য সাঁওতালগণ গভীর ভাবে চিন্তা করতে শুরু করে।

এই সময় সাঁওতালদের শোচনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ করার জন্য সিদো ও কানহুর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা শুরু হয়। সমসাময়িক নথিপত্র থেকে জানা যায় যে শোষকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য স্বয়ং ঈশ্বর সাঁওতালদের নির্দেশ দেন এবং তারা সিদো ও কানহুর নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে সম্মত হয়। এই দৈববাণীতে আরও বলা হয় যে শক্তিশালী ইংরেজ সৈন্য তাদের কোন ক্ষতিসাধন করতে পারবে না, কারণ দেবতার কৃপায় ইংরেজদের বন্দুকের গুলি জলে পরিণত হবে। দৈববাণী লাভের পর সাঁওতালদের উৎসাহ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের পূর্বেকার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবের অবসান ঘটে। দৈববাণীর সংবাদ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে সাঁওতাল ভোগনাডিহি গ্রামে এসে উপস্থিত হতে শুরু করে এবং অন্যান্য আদিবাসীদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার জন্য বিশেষ সতর্কতা গৃহীত হয়। অপরদিকে সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রস্তুতির সংবাদ দূরদূরান্তরের গ্রামে পৌঁছিয়ে দেওয়ার জন্যও নানারূপ প্রচার-ব্যবস্থা গৃহীত হয়। নানারূপ গুজব ছড়িয়ে বিভিন্ন স্থানের সাঁওতালদের এই সংগ্রামের প্রস্তুতির সংবাদও দেওয়া হয়। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশও জানান হয়। প্রস্তুতির সংবাদ গোপন রাখার জন্যও নানারূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়। সংগ্রামে অংশগ্রহণকারী সাঁওতালদের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্যও উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের শক্তি খর্ব করার জন্য দিকু বা বিদেশীরা যাতে কোন প্রকার জাদুকরী বিদ্যা প্রয়োগ না করতে পারে সে জন্য সাঁওতালগণ বনজঙ্গলে ডাইনী অনুসন্ধান করার মহড়া দিতে শুরু করে। বিদ্রোহী মনোভাবের সঙ্গে ধর্মীয় এই সব অনুষ্ঠান যুক্ত হওয়ার ফলে বিদ্রোহীদের মনোভাব অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় এবং তাদের সাফল্য সম্পর্কে তারা সুনিশ্চিত হয়। প্রকৃত যুদ্ধ যাত্রার পূর্বে আর একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদন করে তারা পথিপার্শ্বে একটি গোচর্ম ও একটি বাঁশি রেখে ঐ অঞ্চলকে পুরোপুরি সাঁওতালদের অধীন বলে ঘোষণা করে। সুতরাং দেখা যায় যে একদিকে সাঁওতালগণ এই বিদ্রোহের জন্য তাদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও স্বাতন্ত্র্যে উদ্বুদ্ধ হয় এবং অপরদিকে ধর্মীয় বাতাবরণ দিয়ে এই বিদ্রোহকে একটি পবিত্র অনুষ্ঠানের পর্যায়ে উন্নীত করার চেষ্টা করে।

Q. 7. What was the impact of the role of the Estates on the Zeminders after the introduction of the permanent settlement? Who were the new Zeminders ?

Ans. (১) পুরাতন জমিদারদের অবস্থা ঃ

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় নতুন

একটি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করা, কারণ তদানীন্তন কৃষি ব্যবস্থায় রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে কৃষক ও জমিদারগণ উভয়ই দারুণ ভাবে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। জমিদারী বিক্রয় সংক্রান্ত আইনের কঠোরতা একটি সামাজিক বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে তোলে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে রাজস্ব দানে অসমর্থ হলে জমিদারকে গ্রেপ্তার করা, তার জমিদারী রাষ্ট্র কর্তৃক বাজেয়াপ্ত করা এমন কি জমিদারদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার প্রথাও প্রচলিত ছিল। কিন্তু নতুন আইন অনুসারে ঘোষণা করা হয় যে সপরিষদ গভর্নর জেনারেল জমিদারদের জমিদারী অপেক্ষা সরকারী তহবিলে অর্থ জমা দেওয়াকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে পারেন। এই ঘোষণার ফল মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। পুরাতন দিনের অনেক জমিদারের পক্ষেই এই প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। আরামপ্রিয়, বিলাসী এবং খাম-খেয়ালী জমিদারদের পক্ষে রাতারাতি নিয়মিত কর আদায়কারী হওয়া সম্ভবপর ছিল না। এই আইনের ফলে নাটোরের বিখ্যাত জমিদারী প্রায় ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিধিবদ্ধ হওয়ার বাইশ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের সমস্ত ভূ সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধাংশ পর্যন্ত এই আইনের ফলে বিক্রি হয়ে যায়।

পুরাতন জমিদারদের ব্যক্তিগত এবং সাধারণ ভূ সম্পত্তি বিক্রয়, নতুন জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব এবং তাদের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অনেক তথ্যই বর্তমানে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। এমন কি নতুন বিক্রয় আইন অতি দ্রুত এরূপ পরিবর্তন সাধন করতে সমর্থ হয় তা জানাও সহজসাধ্য নয়। তবে সম্প্রতিকালে বিভিন্ন গবেষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে পুরাতন জমিদার পরিবারগুলোর ধ্বংসের কারণ এবং নতুন নতুন জমিদার পরিবারের উত্থানের অনেক কাহিনী উদ্ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। সাধারণত এই সময় দেখা যায় যে নতুন নতুন ব্যবসা-বাণিজ্যে সাফল্য অর্জনকারী উদ্যোক্তাগণ উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে ভূসম্পত্তি ক্রয় করতে শুরু করে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলা ও বিহারের জমিদারগণ নিদারুণ দুর্দিনের সম্মুখীন হন। বাংলাদেশের জমিদারদের মধ্যে রাজসাহী, দিনাজপুর, নদীয়া, বিষ্ণুপুর, বীরভূম ও মেদিনীপুরের জমিদারগণই সর্বাপেক্ষা দুর্দিনের সম্মুখীন হন। তবে বাংলাদেশের জমিদারদের দুর্দশার কথা অতিরঞ্জিত করা অযৌক্তিক। কারণ ঐ সময়ে বর্ধমানের রাজা শুধুমাত্র তাঁর জমিদারী অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি, নিজের অবস্থাকেও তিনি আরও বেশি উন্নত করতে সমর্থ হন। বিহারের বড় বড় জমিদারদের মধ্যে দারভাঙ্গা, সারণ ও চম্পারণ জেলার হাতোয়া, গয়ার টিকারি পরিবার, ডুমারাওঁ-এর দেও পরিবার, সাহাবাদের ভূপনারায়ণের পরিবার বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ও বিহারের জমিদারী পরিবারগুলো একবার জমিদার থেকে বঞ্চিত হলে সাধারণত পুনরায় অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি লাভ করে জমিদারী পুনর্দখল করতে সমর্থ হয় নি। সে ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বেনারসের জমিদারগণ জমিদারী থেকে উৎখাত হওয়ার পরে পুনরায় পুরাতন জমিদারী উদ্ধার করতে সমর্থ হন। ঐতিহাসিক বার্নার্ড কোহন মনে করেন যে বেনারসের জমিদারগণ ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর পরিমাণে ব্যক্তিগত নিষ্কর খাস মহল ভোগ করতেন বলে নীলামে বিক্রির সময় পুনরায় তাঁরা জমিদারী ক্রয় করতে সমর্থ হন। ফলে তাঁদের অর্থ নৈতিক

বিপর্যয় তাদের একেবারে ধ্বংস করতে সমর্থ হয় নি। ফলে নীলামের সময় জমিদারীগুলো হস্তান্তরিত হয় নি। বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষিপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জমিদারদের আয় বৃদ্ধি পেলে তাদের জমিদারীর নিরাপত্তা অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বাংলাদেশের জমিদারগণ এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তাঁদের জমিদারীতেও প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর জমি থাকলেও তাঁরা সেগুলো বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে এবং অনেক ব্রাহ্মণদের দান করে দেন। তবে নীলামে জমিদারী ক্রেতাগণ এইরূপ নিষ্কর জমি থেকে বঞ্চিত হতেন। কিন্তু অনেক সময় নীলামে জমিদারী ক্রেতাগণ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর সম্পত্তি জোর করে অধিকার করে নিজেদের আয় বৃদ্ধি করার চেষ্টা করতেন। তাছাড়া সরকারের পক্ষ থেকে ১৮২৮ থেকে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অধিকাংশ ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর জমি পুনরায়অধিকার করার চেষ্টা করা হয়।

(২) নতুন জমিদারদের উদ্ভব :

পূর্বে ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল ব্যবসাবাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা নীলামে জমিদারী ক্রয় করতেন। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের গবেষণার ফলে প্রমাণিত হয়েছে এই ধারণা ভ্রান্ত। কারণ অনেক জমিদারই নতুন জমিদারী ক্রয় করার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন। জমিদারীগুলোর ক্রয়-বিক্রয় সাধারণত একই শ্রেণীর সামাজিক গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় যে চৌদ্দটি জেলায় ব্যবসায়িগণ জমিদারী ক্রয়ের ব্যাপারে প্রথম স্থান লাভ করেন। আর চারটি জেলায় তারা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। সুতরাং জমিদারী ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সমাজের কোন্ গোষ্ঠী সর্বাপেক্ষা লাভবান হয়েছিল তা বলা কঠিন। নতুন নতুন জমিদার পরিবারের উত্থান সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের উপর নির্ভর করে বলা যায় যে এই সব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতাগণের অনেকেই ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে প্রচুর অর্থোপাজন করেন এবং পরে উদ্বৃত্ত অর্থের দ্বারা ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করেন। নতুন জমিদার পরিবারগুলোর উত্থানের ব্যাপারে ব্যবসা-বাণিজ্য নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু এইরূপ অর্থ-বিনিয়োগই যে নতুন জমিদারী পত্তনের একমাত্র সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ তা বলা যুক্তি-সঙ্গত হবে না।

ঠাকুর পরিবারের প্রধান শাখার জমিদারীর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা দর্পনারায়ণ চন্দননগরের ফরাসীদের অধীনে চাকরী করার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যেও আত্মনিয়োগ করেন। ঠাকুর পরিবারের অন্য শাখার সবচাইতে বিখ্যাত জমিদার দ্বারকানাথ ঠাকুর ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের দপ্তরে চাকুরী করতেন। দ্বারকানাথ পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বাংলাদেশ ও উড়িষ্যায় এক বিশাল জমিদারী লাভ করেন। সুতরাং ভাগ্যান্বেষণের জন্য তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় নি। তাঁর নিজের জমিদারীর আয় ছাড়াও বড়বড় জমিদারের জমিদারীর এজেন্ট হিসাবে তিনি প্রচুর অর্থোপার্জন করেন।

কান্দী রাজপরিবারের প্রতিপত্তি পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই শুরু হয়। অর্থলগ্নী এবং রেশমের ব্যবসার মাধ্যমেই এই পরিবার অর্থ সঞ্চয় করতে শুরু করে। তাছাড়া নতুন

শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারী চাকুরীর মাধ্যমেও তাঁরা অর্থ আয় করার সুযোগ লাভ করেন। পরবর্তীকালে এইসব অর্থের দ্বারা এই পরিবারের পক্ষে এক বিশাল ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করা সম্ভব হয়। কাশিমবাজারের রাজ পরিবারের পূর্বপুরুষগণ দীর্ঘকাল পর্যন্ত রেশম শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই জমিদার পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু ওয়ারেন হেস্টিংসের গোমস্তা ছিলেন। হেস্টিংস জমিবণ্টন সংক্রান্ত ব্যাপারে নতুন নীতি প্রবর্তন করতে শুরু করলে অতি সামান্য পরিমাণ রাজস্বের বিনিময়ে কান্তবাবু রংপুর জেলার বহরবন্দ পরগণার বিস্তৃত ভূ-সম্পত্তির জমিদার হওয়ার সুযোগ পান। বাংলাদেশের এই পরগণাই সর্বপ্রথম স্থায়িভাবে অত্যন্ত কম রাজস্বে একজন জমিদারের নিকট পত্তন করা হয়। বহরবন্দের জমিদারীর ও গাজিপুরের জায়গীরের উদ্বৃত্ত আয় থেকেই এই পরিবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় প্রচুর জমিদারী ক্রয় করতে সমর্থ হয়।

ভূকৈলাস রাজপরিবারের উত্থানের কাহিনীও প্রায় অনুরূপ। এই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা গোকুলঘোষাল মিস্টার ভেরেলেস্টের অধীনে বেনিয়ানের কাজ করতেন। তারপর তিনি লবণের ব্যবসা করতে শুরু করেন। কিছুদিন পরে তিনি সরকারী কাজে যোগ দেন এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করে চট্টগ্রামের বিশাল জমিদারী ক্রয় করার ব্যবস্থা করেন। নসীপুর-রাজ ও শোভাবাজারের জমিদার পরিবারের প্রতিষ্ঠার কাহিনীর সঙ্গে ভূকৈলাসের পরিবারের কাহিনীর কোন পার্থক্য নেই। নসীপুরের রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের রাজস্ব আদায়কারীর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে অতিরিক্ত কর আদায় করে তিনি নিজের ভাগ্যের পরিবর্তন করেন। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ রবার্ট ক্লাইভ ও হেস্টিংসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন এবং 'পলাশীর লুণ্ঠনের' একটি অংশ তিনি লাভ করেন। ইংরেজগণ দেওয়ানী লাভ করলে তিনি ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব বিভাগে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হন।

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে অনেকে জমিদারী ক্রয় করার দিকে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের দুই বা তিন দশক পর্যন্ত এরূপ ঘটনার সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। তবে নতুন জমিদার পরিবারের উত্থান সম্পর্কে একটি নির্দিষ্ট নীতিই যে অনুসৃত হয়েছিল তা বলা যায় না। কারণ কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকে বাণিজ্য থেকে আয়ের উদ্বৃত্ত অংশ ভূসম্পত্তি আয়ের জন্য বিনিয়োগ করতে শুরু করে। ঢাকার নবাব পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা কাশ্মীর থেকে বাংলাদেশে আগমন করার পর ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। পরে এই সম্পত্তির সাহায্যে প্রচুর জমিদারী ক্রয় করেন। রানাঘাটের পালচৌধুরী বংশ অতি সাধারণভাবে পানের ব্যবসা শুরু করে। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এই পরিবার প্রচুর অর্থের মালিক হয় এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর কৃষ্ণনগরের রাজার জমিদারী ধ্বংস হতে শুরু করলে পালচৌধুরীগণ এই জমিদারীর বিস্তৃত অংশ ক্রয় করতে সমর্থ হয়। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় যে দিনাজপুরের রাজার জমিদারী নীলামে বিক্রয় হওয়ার সময় ঐ জেলার দুটি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবার বৈদ্যনাথ

় ও নন্দী পরিবার নীলামে জমিদারী ক্রেতাদের মধ্যে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করত।

ব্যবসায়ী পরিবার ছাড়াও অনেক সময় ব্রিটিশ শাসকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি জমিদারী ক্রয় করার সুযোগ লাভ করতেন। হুগলি জেলার উত্তরপাড়ার জমিদার মুখার্জী পরিবারের উত্থানের কাহিনী এখানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। ভরতপুর দুর্গের লুণ্ঠনের অংশ লাভ করে জয়কৃষ্ণ মুখার্জী এই জমিদার পরিবার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি তাঁর সমস্ত অর্থ প্রথমে ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করেন কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের বাণিজ্য সংকটের পর তিনি ভূ-সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ অধিকতর নিরাপদ মনে করেন। মতিলাল শীল, রামদুলাল দে, রামকৃষ্ণ মল্লিক প্রভৃতি জমিদারগণও বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত অর্থ বিনিয়োগ করে ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করতে শুরু করেন।

(৩) উপসংহার:

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার পর বাংলাদেশের জমিদারী ব্যবস্থার মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রথমত, অনেক পুরাতন জমিদার বংশ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে সমর্থ হয় এবং অন্য জমিদারদের বিষয় সম্পত্তি ক্রয় করে জমিদারীর আয়তন বৃদ্ধি করে। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত অনেকে উদ্বৃত্ত অর্থের সাহায্যে নতুন জমিদারী ক্রয় করেন। তৃতীয়ত, সরকারী আমলাদের সঙ্গে পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি জমিদারী ক্রয় করার ব্যবস্থা করেন। তবে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এই সময়ের জমিদারী প্রথার আরও দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়: (১) অনেক জমিদার নিজের এলাকা ছাড়াও অন্যান্য এলাকার জমিদারী ক্রয় করার ব্যবস্থা করেন। বর্ধমান, কাশিম বাজার, মহিষাদল, মণ্ডলঘাট প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণ এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা আগ্রহী ছিলেন। দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের নতুন নতুন দ্বীপ ও চর অঞ্চল এই সময় জমিদারদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কম রাজস্বের বিনিময়ে উর্বর জমি দখল করার দিকে তাদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। উত্তরবঙ্গ, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণার বনাঞ্চলের দিকেও তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। (২) জমিদারদের আমলাগণও জমিদারী ক্রয়ের দিকে বিশেষ ভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশ এবং উড়িষ্যায় আমলারা সবচাইতে বেশি ছোট-খাটো জমিদারী ক্রয় করার সুযোগ পায়। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে উড়িষ্যায় ২৩২টি জমিদারী বিক্রি হয়। তার মধ্যে একষট্টি শতাংশের বেশি জমি আমলারা ক্রয় করে।

Q. 8. Analyse the causes and stages of the shift in Bengal's sea-borne trade from West to East in the 18th century.

Ans. (১) ভূমিকা:

ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবসায়ে লিপ্ত কলকাতায় অবস্থিত ইংরেজ বণিকদের সামুদ্রিক বাণিজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ও শেষ পর্বে যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও ঐ শতাব্দীর মধ্যভাগে তা যথেষ্ট পরিমাণে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। এমন কি কিছুদিনের জন্য এই বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ১৭১৫ থেকে ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা বন্দরে মোট জাহাজের যাতায়াত, তাদের পণ্যদ্রব্য পরিবহণের ক্ষমতা এবং রপ্তানি

বাণিজ্য থেকে আদায়ীকৃত শুল্ক থেকে প্রমাণিত হয় যে এই সময় বাণিজ্যের পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৭৩৫ থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত কলকাতা বন্দরে মোট জাহাজের যাতায়াত, তাদের পণ্যদ্রব্য বহনের ক্ষমতা এবং রপ্তানি শুল্ক আদায়ের মোট পরিমাণ প্রমাণ করে যে পূর্ববর্তী বিশ বছরের বাণিজ্যের তুলনায় এই পর্বে বাণিজ্যের পরিমাণ অনেকাংশে হ্রাস পায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের বছরগুলোতে এই বাণিজ্যের পরিমাণ আবার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

(২) পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য ঃ

বাংলাদেশের সমুদ্রবাহিত বাণিজ্যের প্রসারণ ও সঙ্কোচন অনেকাংশেই। বিভিন্ন বাণিজিক পণ্যদ্রব্যের বাজারের ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করত। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশেব সমুদ্র বাহিত বাণিজ্যের সেইসব বাণিজ্যকেই সবচাইতে লাভজনক বলে মনে করা হত যে-সব ক্ষেত্রে বৃহৎ জাহাজের মাধ্যমে রেশম, সুতিবস্ত্র, আফিম প্রভৃতি মূল্যবান পণ্যদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রেরণ করা সম্ভবপর ছিল। এই সব বাজারের মধ্যে কয়েকটি কুমারিকা অন্তরীপের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। তাদের মধ্যে সুরাট বন্দর এবং পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের তীরবর্তী বন্দরগুলোর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবার পূর্ব দিকে মালাক্কাযোজক অতিক্রম করে মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস দ্বীপ-পুঞ্জের ম্যানিলা এবং চীনের ক্যান্টন পর্যন্ত এই বাজার বিস্তৃত ছিল। বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, ব্রহ্মদেশ এবং সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত বিভিন্ন বাণিজ্য-বন্দরে বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যের বাজার বিস্তৃত ছিল। কলকাতা বন্দর থেকেও প্রচুর জাহাজ বাণিজ্যিক পণ্যদ্রব্য নিয়ে বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করত। তবে এই সব জাহাজ বেশি দূর দেশে যাতায়াত করত না বলে এই জাহাজগুলো বারবার যাতায়াত করার সুযোগ পেত। এই সব জাহাজে বাহিত পণ্যদ্রব্যের মূল্যও ছিল খুবই কম। সাধারণত চাল, লবণ, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য এবং নানারূপ বনজ সম্পদই ছিল এই বাণিজ্যের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। পণ্যদ্রব্যের দাম কম থাকার জন্য লাভের পরিমাণও ছিল খুবই সামান্য। ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরীয় বাণিজ্যের ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করার দায়িত্বের অনেকাংশই কুমারিকা অন্তরীপের পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্যের দ্বারা পূরণ করা সম্ভবপর হত। কিন্তু ১৭৩৫ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী কালে কুমারিকা অন্তরীপের পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্য কয়েকটি কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়। রপ্তানি বাণিজ্যের পরিমাণের স্বল্পতা আর্থিক মূল্য হ্রাসের হিসাব-পত্র থেকেই তা প্রমাণিত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে বাংলাদেশের বাণিজ্যের পরিমাণের উন্নতির প্রধান ভিত্তিই ছিল পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে তার বাণিজ্যের সম্প্রসারণ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মাদ্রাজে অবস্থিত ইংরেজ বণিকদের জাহাজগুলো ক্যান্টন ও ম্যানিলা বন্দরের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের যোগসূত্র রক্ষা করত। ১৭২৫ এবং ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের জাহাজ ক্যান্টন বন্দরে উপস্থিত হলেও এরূপ ঘটনা ছিল খুবই অস্বাভাবিক। মাদ্রাজ থেকে পণ্যদ্রব্য বোঝাই জাহাজ প্রায় প্রতিবছরই ক্যান্টন বন্দরে যেত কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে কলকাতার বণিকগণ ক্যান্টন বন্দরের সঙ্গে নিয়মিত কোন

বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে নি। পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলাদেশের বে-সরকারী ব্যবসায়িগণের হাতে প্রচুর অর্থ আমদানি হতে থাকে এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী লণ্ডনের অফিসের মাধ্যমে ক্যান্টন বন্দরের বাণিজ্যের মূল্য প্রদান করতে সম্মত হওয়ার পরই কলকাতার বণিকসম্প্রদায় ক্যান্টনের বাণিজ্যের জন্য অর্থ লগ্নী করতে উৎসাহিত হয়।

এশিয়া মহাদেশের সমুদ্রবাহিত বাণিজ্য সব সময়ই গুরুত্বপূর্ণ। ব্যয়বহুল বাণিজ্য-তরী বাণিজ্য পরিচালনার জন্য প্রচুর লোকজন সংগ্রহ, উচ্চ সুদের হার প্রভৃতির ফলে বেশি লাভ করার সম্ভাবনা না থাকলে বাণিজ্যে মন্দা দেখা দেওয়াই ছিল খুব স্বাভাবিক। সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রাকৃতিক অসুবিধাগুলো ছাড়াও জলদস্যুদের আক্রমণের ভয়ে বণিকগণ সর্বদা আতঙ্কিত থাকত। ইংরেজদের সঙ্গে ফরাসীদের বিরোধ দেখা দিলে ফরাসীদের আক্রমণের ভয়েও ইংরেজ বণিকগণের বাণিজ্য যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হত। তাছাড়া যে সব স্থানের বাজারে ইংরেজ বণিকগণ সাধারণত তাদের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করার জন্য উপস্থিত হত তাদের চাহিদাও খুব সীমাবদ্ধ ছিল।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলাও বাণিজ্যের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক ছিল। বাংলাদেশের রপ্তানিযোগ্য পণ্যদ্রব্যের ক্রেতা বণিক সব সময়ই বন্দরের শাসকদের অন্যায় জুলুম মেনে নিতে বাধ্য হত। অপরদিকে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক অশান্তি দেখা দিলে বন্দরের সঙ্গে পণ্যদ্রব্যর উৎপাদনকেন্দ্রের যোগাযোগ নষ্ট হয়ে যেত। জল ও স্থলপথে বাণিজ্য সম্ভার বন্দরে নিরাপদে বাণিজ্য-পথে আনয়ন করা অসম্ভব হত বলে রপ্তানি বাণিজ্য বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। অপরদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন বাণিজ্যবন্দরে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার ফলে বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য খুব অসুবিধার সম্মুখীন হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে মারাঠা আক্রমণের ফলে গুজরাট অঞ্চলে রাজনৈতিক অশান্তির সৃষ্টি হয় এবং স্থানীয় শাসনতন্ত্র ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়ে। সুরাট বন্দরের বাণিজ্যও খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইরাণ আফগানিস্তানের আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়। রাশিয়া ও তুরস্কের সঙ্গেও ইরাণের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অপর দিকে নাদির শাহের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ইরাণের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে পড়ার উপক্রম হয়। আরব ও তুরস্কের বিরোধের ফলেও পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য বন্দরগুলোর নিরাপত্তা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় আরবসাগর ও ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী সমস্ত বাণিজ্য কেন্দ্রের সঙ্গেই বাংলাদেশের বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়।

একদিকে পশ্চিম-এশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতা যেমন বাংলাদেশের বাণিজ্যের প্রচুর ক্ষতি সাধন করে, অপরদিকে অনুরূপ ভাবেই পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি বাংলাদেশের বাণিজ্যকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে বাংলার চিনির দাম শতকরা পঞ্চাশ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। ফলে তুলনামূলক অল্প দামের জাভা ও চীনের চিনি ধীরে ধীরে বাজার অধিকার করতে শুরু করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে বাংলাদেশের রেশমের দামও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম-এশিয়ায় চীনের

সস্তাদামের রেশমের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের রেশমের বাজার সঙ্কুচিত হতে থাকে। এমন কি এই সময় বাংলাদেশের সূতিবস্ত্রও পশ্চিম ভারত এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে প্রতিযোগিতায় ক্রমশ নতুন নতুন সংকটের সম্মুখীন হয়। তা ছাড়া, এই সময় সুরাট বন্দরের বাণিজ্যের উপর মোগল বাদশাহগণ নতুন কর ধার্য করলে সূতিবস্ত্রের ব্যবসায়িগণ বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। বাণিজ্যবন্দরের নামেমাত্র শাসকগণ সিদ্দিদের অতিরিক্ত করের চাপে সুরাটের বাণিজ্য ক্রমশই হ্রাস পেতে শুরু করে।

(৩) পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্য ঃ

পি. জি. মার্শালের মতে কয়েকটি বিশেষ কারণে কলকাতা বন্দরের মাধ্যমে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পায়। (১) লণ্ডনের জন্য চীনের পণ্যদ্রব্য ক্রয় করার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পনীর ক্যাণ্টন বন্দরে প্রচুর পরিমাণে মূলধনের প্রয়োজন দেখা দেয়। (২) কলকাতার ইংরেজ বণিকগণ চীনের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করে প্রচুর পরিমাণে অর্থোপার্জন করার দিকে বিশেষভাবে দৃষ্ট দিতে শুরু করে। মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের পূবেও বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে এই বাণিজ্যের পরিমাণ দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ইন্দোনেশিয়ার বাণিজ্য সম্পর্কে ইংরেজ বণিকগণ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে ওলন্দাজদের সকল বাধা অতিক্রম করে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার নীতি গ্রহণ করে। মালাক্কা যোজক, বোর্ণিও যোজক প্রভৃতির সাহায্যে তারা নতুন নতুন দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ব্যবস্থা করে। মালয় উপদ্বীপের পূবাঞ্চলে এবং জাভাতেও তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ ছিল চীনের সঙ্গে কলকাতার মাধ্যমে বাংলাদেশের বাণিজ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি। ক্যান্টন যাবার সময় কলকাতার জাহাজগুলো মালয় ও ইন্দোনেশিয়া থেকে টিন ও লঙ্কা সংগ্রহ করে নিত। তবে বাংলা-দেশের উপর ইংরেজদের আধিপত্য স্থাপনের ফলে ইংরেজদের পক্ষে নতুন বাণিজ্যিক সুবিধাগুলো কার্যকরী করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের উপর ইংরেজদের কর্তৃত্ব স্থাপনের ফলে নতুন নতুন পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন ও সংগ্রহ করা তাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। বিশেষত চীনে আফিমের রপ্তানি বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া ভাবেই ইংরেজ বণিকগণ অধিকার করার সুযোগ পায়। পলাশীর যুদ্ধের পূবে ওলন্দাজ বণিকগণ বিহারের উৎপন্ন সমস্ত আফিম বিদেশে রপ্তানি করার অধিকার ভোগ করত। পলাশীর যুদ্ধের পর বিহারের আফিম রপ্তানি করার দায়িত্ব ইংরেজ বণিকগণ ভোগ করতে শুরু করে। পাটনায় অবস্থিত ইংরেজদের বাণিজ্যিক প্রতিনিধি বেসরকারীভাবে বিহারে উৎপন্ন আফিমের উপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ষাটের দশকে মালাক্কা যোজকে প্রবেশাধিকার লাভ করে ইংরেজ বণিকগণ শুধু তাদের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধি করেই সন্তুষ্ট হয় নি, নতুন নতুন

বন্দর উন্মুক্ত করার সুযোগও তারা লাভ করে। ওলন্দাজ বণিকদের পরিবর্তে এই সময় ইংরেজগণই প্রকৃতপক্ষে মালয়ের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করার সুযোগ লাভ করে। নতুন নতুন বাণিজ্য-বন্দরও এই সময় তাদের নিকট উন্মুক্ত হয়। রিয়ান, থেনগ্ গান, বিনতাং প্রভৃতি বন্দরের মাধ্যমে বাংলাদেশের বণিক প্রচুর টিন ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার সুযোগ পায়। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ওলন্দাজদের বিরোধিতার ফলে রিয়ান বন্দরে কিছুকাল ইংলণ্ডের জাহাজ প্রবেশাধিকার হারালে তাদের বাণিজ্যের অনেক ক্ষতি হয়। কিন্তু ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে মালয়ের সঙ্গে কলকাতার বাণিজ্য আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে মালব দ্বীপের পেনাঙ অঞ্চলে ইংরেজদের প্রথম উপনিবেশ গড়ে উঠলে উভয় দেশের মধ্যে দ্রুত বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। অপরদিকে মালয়ের সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও কলকাতার বাণিজ্যের উন্নতি ঘটে। মালাক্কা যোজক দিয়ে অগ্রসর হয়ে ইংরেজ বণিকগণ বোর্ণিও পর্যন্ত উপস্থিত হয় এবং বোর্ণিওর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত পাসিন ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইংলণ্ডের বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এমন কি ওলন্দাজ অধিকৃত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী বাটাভিয়াও ইংরেজ বণিকদের বাণিজ্যকেন্দ্রে পরিণত হয়। অপরদিকে এই সময় কলকাতার বাণিজ্য জাহাজ উত্তর আটলান্টিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছুতে শুরু করে। ফলে কলকাতা বন্দরের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ারও সরাসরি বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

(৪) উপসংহার :

হোল্ডেন ফারবার কলকাতার বাণিজ্যের পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে পরিবর্তনের বিষয়টি বিশেষভাবে আলোচনা করেন। তাঁর মতে কলকাতা বন্দরের পশ্চিমাঞ্চলের বাণিজ্য বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য পথ তার কাছে উন্মুক্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে কলকাতার বণিকগণ বাংলাদেশের চিরাচরিত বাণিজ্য পথ অনুসরণ করেই বাণিজ্য পরিচালনা করার চেষ্টা করে। পশ্চিম ভারত ও পশ্চিম এশিয়ার পণ্যদ্রব্যের চাহিদা পূরণ করাই ছিল এই বাণিজ্যের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পর প্রচুর অর্থাগমের ফলে ইংরেজ বণিকগণ চিরাচরিত পথ পরিত্যাগ করে নতুন পথে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য আগ্রহান্বিত হয়ে ওঠে। অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের তুলনায় আফিমের ব্যবসা এই সময় বেশি গুরুত্ব লাভ করে। ক্যান্টনের সঙ্গে কলকাতার বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলেই মালয় ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গেও কলকাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পূর্বে পশ্চিম এশিয়া বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্য যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পূর্বদিকের বাণিজ্য অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করতে শুরু করে।

বাংলার ইতিহাস

(সংযোজনী—'৮৬)

Q. 1. Analyse the impact of the Land Holders' Society and Bengal British India Society on the development of political consciousness in Bengal.

Ans. (১) ভূমিকা :

আধুনিক ভারতে জাতীয় রাজনৈতিক চেতনা বিকাশ লাভ করে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। সুসংগঠিত জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে এই যুগে। এই সময় ভারতের আধুনিক বুদ্ধিজীবী সমাজ রাজনৈতিক শিক্ষা প্রসার করার জন্য দেশে রাজনৈতিক কাজের গোড়াপত্তনের জন্য কিছু কিছু রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করতে শুরু করেন। নতুন রাজনৈতিক ভাবধারা, বাস্তব সম্পর্কে নতুন বুদ্ধিনির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য, সংগ্রাম ও প্রতিরোধের নতুন শক্তি, রাজনৈতিক সংগঠনের নতুন পদ্ধতি—এ সবের উপর নির্ভর করে রাজনৈতিক কর্মসূচী গড়ে উঠবে এই ছিল তাঁদের আকাঙ্ক্ষা। মতাদর্শ, নীতি, সংগঠন এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রে তাঁরা চেয়েছিলেন যে, তাঁদের রাজনৈতিক কর্মধারা এক নতুন গতিপথের ইঙ্গিত বহন করুক। এ কাজ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। ভারতীয়গণ তখনও ছিলেন আধুনিক রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। রাজনৈতিক উপায়ে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে জনসাধারণ যে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে এই ধারণাই ছিল অভিনব। তবে প্রথম দিকে গড়ে ওঠা এই সমিতিগুলোর ও প্রথম যুগের রাজনৈতিক কর্মচারীদের কাজের গতি ছিল অত্যন্ত মন্থর। আধুনিক রাজনীতির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে নিয়ে আসতে তাই অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় লাগে।

(২) রাজনৈতিক সমিতি :

রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য যে-সব ভারতীয় নেতা আন্দোলন শুরু করেন, রাজা রামমোহন রায় তাঁদের অন্যতম। উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন রামমোহন ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলো ব্রিটিশ সরকারের নিকট তুলে ধরেন এবং এই সমস্যা সমাধানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়বিচারের নিকট আবেদন করেন। রাজা রামমোহন রায় রাজনৈতিক চিন্তাধারার যে ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠা করেন তার উত্তরসূরী ছিলেন উদারপন্থী একদল বাঙ্গালী যুবক। প্রখ্যাত অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষক হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিওর নামানুসারে তাঁরা নিজেদের ডিরোজিয়ান বলে অভিহিত করতেন।

ডিরোজিয়ানরা অসংখ্য জনসমিতি স্থাপন করে তার মাধ্যমে আধুনিক চিন্তাধারা সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সেগুলো কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে কথা চিন্তা করতে শুরু করেন। একাধিক সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র তাঁরা প্রকাশ করেন। ১৮২০ থেকে ১৮৩০-এর দশকে রাজা রামমোহন রায় এবং ডিরোজিয়ানরা এইভাবে প্রথম আধুনিক রাজনৈতিক চেতনার বীজ বপন করেন। এই রাজনৈতিক চেতনার প্রথম আত্মপ্রকাশ ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত 'বঙ্গভাষা-প্রকাশিকা-সভা'। স্বল্পায়ু এই সভা উদারপন্থী বাঙ্গালীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়ে পরবর্তী শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করে এবং সামাজিক ও অন্যান্য সমস্যার সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যাকেও সমান গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে শুরু করে।

স্থায়ী একটি প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্যে ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই নভেম্বর কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জমিদারগণ হিন্দু কলেজে মিলিত হন। চেম্বার অফ কমার্স যেমন ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষার জন্য গঠিত হয়েছিল, জমিদারদেরও ইচ্ছা ছিল নিজেদের স্বার্থে অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে জমিদারী অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তিত হয়ে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটিতে পরিণত হয়। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে জমিদারগণ এই সমিতির সদস্যপদ লাভ করার সুযোগ পান। বাংলা দেশ ছাড়াও বিহার ও উড়িষ্যার জমিদারগণও এই সমিতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। জমিদারদের সংকীর্ণ স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে এই সমিতি গড়ে উঠলেও অল্পদিনের মধ্যেই এই সমিতি ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। প্রথমতঃ, ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটিই একটি সংগঠিত সংস্থা হিসাবে সর্বপ্রথম সাংবিধানিক উপায়ে শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে। দ্বিতীয়তঃ, সোসাইটির সভ্যদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ ভারতের সর্বত্র এই সোসাইটির শাখা উদ্বোধন করে সোসাইটির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সকলকে পরিচিত করে তোলা। তৃতীয়তঃ, যে সমস্ত ইংরেজ ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন তাঁদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করাও ছিল এই সমিতির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এই সময় রাজা রামমোহন রায়ের সহকর্মিগণ ভারতে তাঁর চিন্তাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার চেষ্টা করেন এবং রাজা রামমোহন রায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইংলণ্ডে উইলিয়ম অ্যাডামও ভারতের পক্ষে জনমত গঠন করার চেষ্টা করেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম অ্যাডাম ইংলণ্ডের জনসাধারণের মনে ভারত সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করেন এবং ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে এই সমিতি ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাডভোকেট নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করে। কলকাতার ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি মিস্টার অ্যাডামের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং তাঁকে ভারতীয়দের অসন্তোষ ও দাবির প্রত্যেকটি সংবাদ পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি শুধুমাত্র

অ্যাডামের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই সন্তুষ্ট হতে পারে নি। ইংলণ্ডে রামমোহন রায়ও অ্যাডামের রাজনৈতিক আন্দোলনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রস্তাব অনুযায়ী এই সমিতি ইংলণ্ডে কয়েকজন বেতনভোগী রাজনৈতিক প্রচারক নিযুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই অভিনব সিদ্ধান্ত পরবর্তীকালে সুদূরপ্রসারী ফল প্রদান করতে সমর্থ হয়। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে টম্পসন সমিতির অন্যতম রাজনৈতিক প্রচারক নিযুক্ত হন। বাগ্মী হিসাবে মিস্টার টম্পসন ইংলণ্ডে সুপরিচিত ছিলেন এবং দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতে আগমন করেন। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে বাঙালী যুবকদের মধ্যে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করেন।

মিস্টার টম্পসনের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দের ২০শে এপ্রিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি গঠিত হয়। এই সমিতির উদ্বোধনের সময় তারাচাঁদ চক্রবর্তী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের মধ্যেই বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির মূল উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। তিনি বলেন যে, ব্রিটিশ ভারতের জনসাধারণের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে সকল প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করে তা বিভিন্ন স্থানে সরবরাহ করা এবং সকল শ্রেণীর মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য শান্তিপূর্ণ ও আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হল এই সমিতির প্রধান লক্ষ্য।

(৩) উপসংহার ঃ

প্রকৃতপক্ষে ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি নামে দুটি সমিতি গড়ে উঠেছিল। এই দুটি সমিতি সম্পর্কে সমসাময়িক জনৈক ব্যক্তি মন্তব্য করেন যে, প্রথমটি বিত্তের আভিজাত্য এবং দ্বিতীয়টি বুদ্ধিমত্তার আভিজাত্যের প্রতিভূ ছিল। যদিও এই দুটির একটিও খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারে নি, তা সত্ত্বেও জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উদ্রেক করতে তারা যে খুব সহায়তা করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই দুটি সমিতির কার্যকলাপ সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, "ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিকে এ দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথপ্রদর্শক বলা যেতে পারে। এরাই সর্বপ্রথম সাংবিধানিক উপায়ে জনসাধারণের দাবি পেশ করতে এবং স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করতে পথের সন্ধান দেয়। এ কথা ঠিক যে, জমিদারদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যেই এই দুটি সমিতি গঠিত হয়, কিন্তু জমিদারদের স্বার্থের সঙ্গে রায়তদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এবং একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা অসম্ভব।" প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে, ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য মিস্টার বেথুন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী বিচারালয়ের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে ভারতীয় ব্রিটিশদেরও তার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। ততদিন পর্যন্ত একমাত্র কলকাতায় অবস্থিত সুপ্রীম কোর্টই তাদের বিচার করার ক্ষমতা ভোগ করত। ফলে সুদূর মফঃস্বলের অধিবাসীদের পক্ষে ব্রিটিশদের শত নির্যাতন-অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না।

বেথুনের আনীত বিল খুবই ন্যায়সঙ্গত ছিল। প্রভাবশালী সমস্ত ভারতবাসীই এই বিলের প্রতি সমর্থন জানান। কিন্তু বাংলার ইয়োরোপীয় অধিবাসিগণ এই বিলকে 'কালা-কানুন' আখ্যা দিয়ে প্রচণ্ড আন্দোলন শুরু করলে মিস্টার বেথুন বিলটি বাতিল করতে বাধ্য হন। এই ঘটনায় বাংলার শিক্ষিত সম্প্রদায় অত্যন্ত মর্মাহত হয় এবং শুধুমাত্র সংগঠিত ইয়োরোপীয় সম্প্রদায়ের আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য নয়, কোম্পানীর সনদের পুনর্নবীকরণের পূর্বে ভারতীয়দের মতামত জানাবার জন্য শক্তিশালী একটি রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা সকলেই উপলব্ধি করে। বাংলার দুটি তথাকথিত রাজনৈতিক সংস্থা নিঃশব্দে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন নামে একটি নতুন সংগঠনে পরিণত হয়।

সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ সোসাইটি গঠিত হলেও এদের কার্যকলাপ সীমিত গণ্ডী অতিক্রম করে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রতিটি বিষয়ই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং ভারতীয়গণ সে-সব সম্পর্কে স্বাধীন ভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টাও এরাই প্রথম শুরু করে। শুধুমাত্র ভারত নয়, ভারতের বাইরে ইংলণ্ডেও তারা জনমত গড়ে তোলার চেষ্টা করে। জনপ্রিয়তার দিক থেকে বিচার করলে ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি কোনরূপ উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন না করলেও, ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করতে তারা যে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তা ছাড়াও, এ কথা ঠিক যে, রাজনৈতিক সংগঠনের পথিকৃৎ হিসাবে এই দুটি সমিতি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার উপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালের রাজনৈতিক সংগঠনগুলো সাফল্য অর্জন করতে সমর্থ হয়।

Q. 2. How do you define de-industrialisation? How did the decline of the Cotton Industry in Bengal affect the economy of Bengal?

Ans. (১) **ভূমিকা :**

De-industrialisation—অর্থাৎ শিল্প ধ্বংসসাধন শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটির সঙ্গে অর্থনৈতিক স্বার্থে উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনৈতিক শক্তির ব্যবহার অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো নিজেদের স্বার্থে বিজিত রাজ্যের শিল্প ধ্বংস করার যে নীতি গ্রহণ করে সেইসব ক্ষেত্রে এই শব্দটি প্রযুক্ত হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রিটিশ শক্তি কর্তৃক ভারতের শিল্প ধ্বংস করার কথা আলোচনা করলে 'De-industrialisation' শব্দটির তাৎপর্য স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের অব্যবহিত পরেই ব্রিটেনের শিল্পপতিগণ এই নতুন অধিকৃত সাম্রাজ্য নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা শুরু করে। এজন্য তাদের প্রথম প্রয়োজন ছিল কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিয়ে ভারতের বিভিন্ন শিল্প ধ্বংস করে ভারতকে তাদের শিল্পপ্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করার এবং শিল্পজাতদ্রব্য বিক্রি করার বাজারে পরিণত করা। ফলে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ সামগ্রিকভাবে ব্রিটিশ পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থে ভারতকে ব্যবহার করতে শুরু করে।

ব্রিটেনে ইতিমধ্যে শিল্প-বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। উৎপাদন এবং রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটেন পৃথিবীর মধ্যে তখন সর্বাগ্রগণ্য। ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে শিল্পপতিশ্রেণী হয়ে উঠেছিল প্রাধান্যের অধিকারী ; তাদের যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রভাবও ছিল। কিন্তু সরাসরি রাজস্ব আত্মসাৎ করে কিংবা ভারতের কারিগরি পণ্য রপ্তানির একচেটিয়া অধিকার অর্জন করে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের খুব একটা লাভ হত না। অন্যদিকে তাদের নিজেদের শিল্পোৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়ছিল এবং তা বিদেশে রপ্তানি করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। সেক্ষেত্রেও ভারতের মতো বিশাল ও জনবহুল দেশ ছিল স্থায়ী আকর্ষণ। ব্রিটিশ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য প্রয়োজন হত কাঁচামালের ; ব্রিটিশ শ্রমজীবীদের খাদ্যসামগ্রীর চাহিদাও মেটাতে হত। এই দুটি জিনিসই বিদেশ থেকে আমদানি করার দরকার হত। সুতরাং ব্রিটেন ভারতকে তার অধীনস্থ সহ-ব্যবসায়ীতে পরিণত করার চেষ্টা করে। একদিকে তাকে বাজার হিসাবে কাজে লাগানোর চেষ্টা করা হয়, অপরদিকে পরাধীন উপনিবেশ হিসাবে তাকে বাধ্য করা হয় ব্রিটেনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যসামগ্রী উৎপাদন করতে। এই জন্য ব্রিটেনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিভিন্ন কৌশলে ভারতের শিল্প ধ্বংস করে তাকে পুরোপুরি কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশে পরিণত করা।

(২) শিল্পের ক্রমাবনতি ঃ

১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁত শিল্পই ছিল বাংলাদেশের সর্বপ্রধান শিল্প। বাংলার অর্থনীতি এই শিল্পের দ্বারা প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রিত হত। তাঁত শিল্পে পূর্ণ সময় ও আংশিক সময়ের জন্য নিযুক্ত কারিগরদের সংখ্যা, শিল্পের আয়তন ও উৎপাদন ক্ষমতা, দেশী ও বিদেশী বাজার প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করলে বাংলার সামগ্রিক অর্থনীতির উপর এর প্রভাব সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। আবার এই শিল্প ধ্বংস হওয়ার ফলে বাংলার অর্থনীতি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব।

রবার্ট ওরমের রচনা থেকে জানা যায় যে, করোমণ্ডল উপকূলের মতো বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রামের নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে সকলেই তাঁত শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে সুতাকাটা ও কাপড় বোনা বাঙালীদের জাতীয় জীবিকায় পরিণত হয় এবং এই রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন প্রকার তাঁতবস্ত্রের জন্য বিশেষভাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রচুর সংখ্যক সুদক্ষ কারিগর, উপযুক্ত কাঁচামালের প্রাচুর্য, জল ও স্থল পথে

পরিবহণের সুবিধা, শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির ফলে বয়নশিল্পের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটে।

কৃষির পরেই তাঁত শিল্প বাঙালীর জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় ছিল বলে বহু লোক এই শিল্পের উপর পুরোপুরিভাবে নির্ভরশীল ছিল। আবার কৃষিকার্যে অথবা অন্য কোন প্রকার জীবিকায় নিযুক্ত ব্যক্তিরাও অবসর সময়ে সুতাকাটা, কাপড় বোনা প্রভৃতি কাজে লিপ্ত থাকত। প্রকৃতপক্ষে কৃষিকার্য ও বয়ন শিল্পের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করেই বাংলার কারিগরগণ এই শিল্পের অভাবনীয় উন্নতি সাধন করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁতশিল্পের ক্রমাবলুপ্তি বাংলার অর্থনীতির উপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। ব্রিটিশের নীতি, ব্রিটিশের শিল্পনৈপুণ্য ও ব্রিটিশের সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা বাণিজ্যিক বিপ্লব সাধন করতে সমর্থ হয় এবং কৃষি ও শিল্পের ভারসাম্যের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে পুরোপুরিভাবে ব্রিটিশের উপর নির্ভরশীল করে তোলে।

১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ থেকেই ইংলণ্ডের বয়নশিল্পের ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি দেখা দেয় এবং ভারতীয় শিল্প দারুণ প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হয়। এই সময় থেকেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সূতী শিল্পের জন্য অর্থ লগ্নির পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস করতে শুরু করে এবং পরে এই ব্যবস্থা একেবারেই বন্ধ করে দেয়। তা ছাড়া, ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ থেকে ইংলণ্ড দীর্ঘ দিন পর্যন্ত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকে এবং ফরাসী বিপ্লব শুরু হওয়ার পর ফ্রান্সে কাপড় রপ্তানি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। ভার্সাই রাজদরবার ছিল ভারতীয় তাঁত বস্ত্রের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক। হামবুর্গ, লিসবন প্রভৃতি শহরেও ভারতীয় বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস পায়। অপরদিকে ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দের কোম্পানীর নতুন সনদ ইংলণ্ডের ব্যবসায়ীদের জন্য ভারতে ব্যক্তিগত ব্যবসা পরিচালনার সুযোগ বৃদ্ধি করলে ভারতের তাঁতশিল্পের আরও ক্ষতি হয়। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের পরে বাংলার তাঁতশিল্পের ধ্বংস আরও ত্বরান্বিত হয়। এই সময় শিল্পবিপ্লবের প্রকৃত প্রভাব ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনুভূত হয়। ইংলণ্ডের বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যেই অত্যন্ত অল্পব্যয়ে এবং অল্পসময়ে উন্নত ধরনের মসলিন প্রস্তুত করতে শুরু করে। ফলে ভারতের তাঁতবস্ত্র একসঙ্গে অন্তর্দেশীয় এবং বৈদেশিক উভয় বাজার থেকেই বহিষ্কৃত হতে থাকে। এতদিন পর্যন্ত বাংলার তাঁতবস্ত্রের প্রধান বাজার ছিল ইংলণ্ড, কিন্তু ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ড সমগ্র ইয়োরোপের সূতীবস্ত্রের বাজার অধিকার করে। আবার অপরদিকে ইংলণ্ড ভারত থেকে উন্নত ধরনের তুলা আমদানি করতে শুরু করে।

উন্নত ধরনের তাঁতশিল্পের প্রধান বাজার ছিল ইংলণ্ড ও ইয়োরোপীয় অন্যান্য দেশ। ভারতের বাজারে এইসব উন্নত শ্রেণীর কাপড়ের চাহিদা ছিল খুবই কম। শ্বেত শ্রেণীর কাপড় বোনার জন্য দক্ষ কারিগরদেরও প্রয়োজন ছিল। সুতরাং বিদেশে সূতীবস্ত্র রপ্তানি বন্ধ হওয়ার সঙ্গে দক্ষ কারিগরগণ কর্মচ্যুত হতে থাকে। তাদের

কর্মচ্যুতির আর একটি কারণ ছিল ভারতে ব্রিটিশ শক্তির ক্রমবিকাশ। ভারতের উন্নত শ্রেণীর সুতীবস্ত্রের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মোগল সম্রাট ও তাঁর সহযোগী শাসকবর্গ এবং হিন্দু রাজা ও জমিদারগণ। ব্রিটিশ শক্তির ক্রমবিকাশের ফলে তাদের আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটে এবং তাঁদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, শুধুমাত্র ঢাকা থেকে বছরে প্রায় এককোটি টাকামূল্যের উন্নত শ্রেণীর কাপড় বিদেশে রপ্তানি হত। তা ছাড়া, উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে বেশ কয়েকশ' কোটি টাকার সুতীবস্ত্র ও রেশমবস্ত্র বিদেশে প্রেরণ করা হত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বস্ত্র রপ্তানি সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে পড়ায় বিদেশ থেকে অর্থাগমও বন্ধ হয়। ফলে বাংলার অর্থনীতিতে এক বিরাট সমস্যা দেখা দেয়।

(৩) **ফলাফল ঃ**

১৭৯৩ থেকে ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বাংলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে অধ্যাপক কে. এন. চৌধুরী বলেন যে, "That this was a revolutionary development in India's foreign trade there is no doubt. For the first time perhaps in the history of the trading relation with the West, India stood in the position of a buyer whose traditionally low cost products were being pushed out of both the domestic and foreign markets by European products." প্রকৃতপক্ষে এই পরিবর্তন বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এই পরিবর্তনের গুরুত্ব বোর্ড অফ ট্রেডও বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করে। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জুন বোর্ড অফ ট্রেড এইরূপ অভিমত প্রকাশ করে যে, বহু দিনের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অগ্রিম দাদন পেয়ে কারিগরগণ ইয়োরোপীয় কুঠিয়ালদের জন্য তাঁতবস্ত্র তৈরি করা এবং পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র তা রপ্তানি করা হত। এই শিল্পের উপরই কারিগরদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নির্ভর করত। কিন্তু বর্তমানে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে—বাণিজ্যের ইতিহাসের এরূপ সর্বগ্রাসী ও সম্পূর্ণ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত খুবই বিরল ("a revolution so mighty and complete we conceive is hardly to be paralleled in the history of commerce.")।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কোনদিনই ভারতীয় শিল্পের উন্নতি কামনা করে নি। ইংলণ্ডের শিল্পপতিদের স্বার্থে তারা ভারতকে শিল্পজাতদ্রব্যের রপ্তানি ক্ষেত্রের পরিবর্তে কাঁচামালের রপ্তানি ক্ষেত্রে পরিণত করার চেষ্টা শুরু করে। বিদেশী শাসকদের প্রচেষ্টায় শিল্পপ্রধান ভারত কৃষিপ্রধান দেশে পরিণত হয়। অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে বিদেশী বাজার থেকেই ভারত শুধু বহিষ্কৃত হয় নি, দেশী বাজারও তার হাতছাড়া হয়। ভারতের তাঁতবস্ত্র নিঃসন্দেহে ইংলণ্ডের মিলের তৈরী বস্ত্র থেকে উন্নত ছিল, কিন্তু দামে সস্তা বলেই বিদেশী কাপড় অল্পদিনের মধ্যেই জনপ্রিয়তা লাভ করে। বিদেশী শিল্পের

শহরের বাজার থেকে কিছু কিছু পরিমাণে শিল্পজাত বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য এবং বিদেশ থেকে রপ্তানি করা কোন কোন পণ্যদ্রব্য সঙ্গে করে গ্রামের বাজারে উপস্থিত হত। কখনও কখনও পাইকারগণ নিজেরাই এইসব পণ্যদ্রব্য বিক্রি করত, আবার কোন কোন সময় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের কাছ থেকে এইসব পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করত। পাইকারদের মধ্যে অনেকে মূলধন সংগ্রহ করে নিজেরাই স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করার সুযোগ করে নিত, আবার কখনও কখনও তারা বড় বড় ব্যবসায়ীদের দালাল রূপে সামান্য কমিশনের বিনিময়ে পাইকারের কাজ করত। বুকানন-হ্যামিল্টন যদিও তাদের সামান্য মূলধনের অধিকারী বলে মনে করেন, তথাপি এ কথা ঠিক যে, কোন কোন ব্যবসাক্ষেত্রে পাইকারগণ প্রচুর মূলধন নিয়োগ করত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ রেশম শিল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এমন কি, রেশম শিল্পে তারা বড বড় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে উৎপাদন-কারীদের দাদন দেওয়ারও ব্যবস্থা করত। হাট-কেন্দ্রিক সীমিত কৃষক-কারিগর-বাজারে একদিকে বেপারীরা যেমন গঞ্জ ও বন্দরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র স্থাপন করার সুযোগ পায়, তেমনই পাইকারগণ দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন বাজারে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়। গঞ্জ ও বন্দরের ব্যবসায়ীদের বাণিজ্য প্রসারের ব্যাপারেও পাইকারগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। পাইকারদের মাধ্যমে বড় বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অগ্রিম দাদন পেয়ে কৃষক ও কারিগরগণও নিশ্চিন্ত মনে তাদের পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করতে উৎসাহী হয়ে উঠত।

(২) **উপসংহার ঃ**

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাইকারগণ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেও তারা কখনই কোন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের সংগঠক হয়ে ওঠার সুযোগ পায় নি। তাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করলেই ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাইকারদের ভূমিকাও স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। উৎপাদন বা বণ্টনের প্রধান কেন্দ্রগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণাধীন করার জন্য পাইকারগণ কখনই চেষ্টা করে নি। ফলে বাণিজ্যের মুনাফার সিংহভাগ অধিকার করে বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মতো মূলধন তারা কখনও সংগ্রহ করতে সমর্থ হয় নি। বড় বড় মহাজনদের পথ থেকে কারিগর ও কৃষকদের দাদন দেওয়ার জন্য অগ্রিম অর্থ আদায় করা এবং সামান্য কমিশনের বিনিময়ে শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যাদি মহাজনদের আড়তে পৌঁছিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের প্রধান কাজ। ফলে পরবর্তীকালে পথ-ঘাটের উন্নতি, বন্দর ও গঞ্জের সংখ্যাবৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে কারিগর ও মহাজনদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে শুরু করলে পাইকারদের ভূমিকা ক্রমশই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। দেশীয় শিল্পের ক্রমাবনতি এবং চাহিদার হ্রাস পাওয়াই ছিল পাইকারদের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। যদিও কোন কোন শিল্পের ক্ষেত্রে যেমন, মুর্শিদাবাদের রেশম শিল্পের ক্ষেত্রে, পাইকারগণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করত। কিন্তু পরবর্তীকালে বড় বড় মহাজনগণ সরাসরিভাবে স্থানীয় কারিগরদের অগ্রিম দাদন দিয়ে শিল্পজাত সমস্ত দ্রব্য ক্রয় করার ব্যবস্থা শুরু করলে পাইকারগণের অস্তিত্ব

বিপন্ন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন জেলার বড় বড় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলোতে ও কলকাতায় মহাজনদের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হলে তারা স্থানীয় বাজার থেকে নিজেরাই পণ্যদ্রব্য ক্রয় করতে শুরু করে। শান্তিপুরের স্থতী-বস্ত্র, মুর্শিদাবাদের রেশম-বস্ত্র, মেদিনীপুরের লবণ প্রভৃতির উপর বড় বড় ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পাইকারদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা একদিকে ব্যক্তিগত উদ্যম এবং অপরদিকে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে বহৎ ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হতে ব্যর্থ হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে তাদের প্রভাব হ্রাস পায়।

Q. 4. What led to the management of the Union Bank to decide in 1837-39 in favour of a large increase in Bank's Capital? How did the particular mode of its investment affect later the fortunes of the Bank?

Ans. (১) ভূমিকা :

১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই আগস্ট ১৬ লক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কার্য শুরু হয়; দ্বারকানাথ ঠাকুর এই ব্যাঙ্কের প্রধান উদ্যোগী ও প্রস্তাবক হলেও আরও কয়েক ব্যক্তি প্রথম থেকেই এই ব্যাঙ্কের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁরা হলেন জেমস গর্ডন, জন পামার ও কর্নেল জেমস ইয়ং। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রথম সেক্রেটারী ছিলেন উইলিয়ম কার, ১৫ লক্ষ সিক্কা টাকা বা ষোল লক্ষ কোম্পানীর টাকা নিয়ে ব্যাঙ্ক খোলা হলেও ব্যাঙ্কের কার্য শুরু হওয়ার পর প্রধানতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুরের বিশেষ যত্নে প্রতি বছরই এই ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮৩৬ খ্রীস্টাব্দে কুড়ি হাজার টাকার মূলধন বাড়ে এবং ৯০০ টাকার প্রত্যেক অতিরিক্ত ৬০০ অংশ বার করে সর্ব-শুদ্ধ মূলধন দাঁড়ায় ২১,৬০,০০০ টাকা। ১৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে প্রত্যেক অংশের মূল্য আড়াই হাজার টাকা কমিয়ে দেওয়ায় মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩২ লক্ষ টাকা। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে আরও আটশ অংশ বার হওয়ার পর মূলধন চল্লিশ লক্ষে পরিণত হয় এবং মে মাসে আরও চার হাজার অংশ বার হওয়ায় মূলধন হয় আশি লক্ষ টাকা। অবশেষে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে জানুয়ারি মাসে আরও দু' হাজার অংশ বার হয়ে মূলধন দাঁড়াল এক কোটি টাকা। এই সময় দশ হাজার অংশের মধ্যে মোট সাতশ' অংশ ছিল ভারতীয়দের এবং অবশিষ্ট সমস্ত অংশই ছিল ইয়োরোপীয়দের হাতে। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর এই সময় ব্যাঙ্কের প্রতিটি কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন।

(২) ভ্রান্ত-নীতি অনুসরণ :

ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের প্রথম সেক্রেটারী উইলিয়ম কার অত্যন্ত কর্মদক্ষ ও বিশ্বস্ত লোক ছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি সেক্রেটারীর পদ ত্যাগ করায় রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় সেক্রেটারী রূপে নিযুক্ত হন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে উইলিয়ম কার দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে একযোগে কার-ঠাকুর

কোম্পানীর কারবার খোলেন। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাঙ্ক পরিচালনার সময় ইংরেজগণই ব্যাঙ্কের যাবতীয় কাজকর্মে প্রাধান্য লাভ করে। তাঁদের পরামর্শে ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী অতিরিক্ত অর্থ লগ্নি করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছামতো অংশ বিক্রি করে ব্যাঙ্কের মূলধন বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে। ফলে ব্যাঙ্কের মূলধনের পরিমাণ স্ফীত হলেও আমানত ও টাকার পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর সেক্রেটারী নিযুক্ত হন মিস্টার গর্ডন। তিনি পূর্বে ম্যাকিণ্টস কোম্পানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিই প্রথম নীল, রেশম এবং অন্যান্য কৃষিদ্রব্যের উপর দাদন দেওয়ার অনিষ্টকর প্রথা প্রবর্তন করেন। ব্যাঙ্কের নিয়মিত প্রথার ব্যতিক্রম ঘটিয়ে মিস্টার গর্ডনই সর্বপ্রথম ব্যবসায়ীর নিজের ব্যক্তিগত জামিনে টাকা ধার দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন করেন। অপরদিকে তিনিই ইংলণ্ডের সহিত বিল অফ এক্সচেঞ্জের জন্য নতুন একটি শাখা খোলেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে মীর্জাপুরেও এই ব্যাঙ্কের একটি শাখা খোলা হয়, কিন্তু তা লাভজনক না হওয়ায় এক বছর পরেই সেই শাখা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সিঙ্গাপুরে আর একটি শাখা খোলা হয়। এই শাখার প্রধান কাজ ছিল বিল অব এক্সচেঞ্জ ক্রয়-বিক্রয় করা। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে এই শাখাও বন্ধ করে দিতে হয়। প্রকৃতপক্ষে মিস্টার গর্ডন বিল অফ এক্সচেঞ্জের কাজে পারদর্শী থাকলেও অন্যান্য বিষয়ে তিনি নিতান্ত অপরিণামদর্শী এবং বিশ্বাসের অযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। দাদন প্রভৃতি প্রথা এবং অধমর্ণের নিজের জামিনে ঋণ দেওয়ার প্রথা প্রভৃতি অনিষ্টকর নিয়ম সকল প্রবর্তনের জন্য তাঁর সঙ্গে দু-একজন অংশীদারের যে পত্র-বিনিময় হয় তা থেকে অনুমান করা যায় যে, তিনি স্বার্থের জন্য ব্যাঙ্কের অনিষ্ট সাধনে কুণ্ঠিত হন নি। মিস্টার গর্ডনের পর কলডার স্টুয়ার্ট এবং তারপর এইচ. ডব্লিউ. অ্যাবট ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। এই সময় ব্যাঙ্ক গর্ডন প্রবর্তিত প্রথায় টাকা দেওয়া বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ইনলিকুইডেশন' নামে কাজ করতে থাকে। এই বছরের ২৫শে জানুয়ারী মিস্টার অ্যাবট পদত্যাগ করলে লেসলি রাসেল তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন।

(৩) **তহবিল তছরূপ ঃ**

বেঙ্গল ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব অ্যাকাউন্ট্যান্ট হেনরি হেণ্ডার্সন কর্তৃপক্ষের জামানত, কোম্পানীর কাগজ, ব্যাঙ্কের অংশ এবং বিল অফ এক্সচেঞ্জের দালালি করতেন। সেই নজির অনুযায়ী রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদকত্বকালে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট্যান্ট মিস্টার সিমকে ঐরূপ দালালি করার সুযোগ দেন। সিম ক্রমে নানা-প্রকার বাণিজ্যের জুয়াখেলা শুরু করেন এবং টাকার অনটন দেখা দেওয়ায় জুয়াচুরি করে ব্যাঙ্কের তহবিল তছরূপ করেন। ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ধরা পড়ে যে, মিস্টার সিম ব্যাঙ্কের গচ্ছিতকারীদের নামে অন্যায় পূর্বক অনেক টাকা অতিরিক্ত তুলে নেওয়া হয়েছে বলে লিখে রেখেছেন। হিসাবের গোঁজামিল দিয়েও তিনি বহু টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেন। ব্যাঙ্কের ডিরেক্টরদের কানে এ কথা পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে

তাঁরা স্থির করেন যে, ব্যাঙ্কের কোন বেতনভুক কর্মচারী কোনপ্রকার বাণিজ্য বা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হতে পারবে না এবং ব্যাঙ্কে কোন কর্মচারীর নামে বেতন ভিন্ন অন্য কোন প্রকার টাকা আদান-প্রদানের হিসাব থাকবে না। এই সময় টাকা-পয়সার হিসাবের দিকে তীক্ষ্ণ নজর দেওয়ার জন্য একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হয়। ১৮৩৭ থেকে ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রায় ১,২০,০০০ টাকা ব্যাঙ্কের তহবিল থেকে তছরূপ হয়। ব্যাঙ্কের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার এবং অন্যান্য গোলযোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর সমস্ত টাকাটা নিজে জমা দিলেন।

(৪) পতনের কারণঃ

মিস্টার গর্ডনের ভ্রান্ত নীতির ফলেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের সূচনা হয়। নীল, রেশম প্রভৃতি কুঠিয়ালদের কুঠির দলিল-দস্তাবেজ জামিন রেখে তার উপর কুঠির বাৎসরিক সম্ভাব্য উৎপাদনের পরিমাণ অনুমান করে কুঠিয়ালদের ধার দেওয়া হত। প্রকারান্তরে এই ঋণ দেওয়ার পদ্ধতি দাদন দেওয়াই বলা যেতে পারে। অধমর্ণের ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ দেওয়ার যে পদ্ধতি অনুসৃত হতে শুরু করে তাও ব্যাঙ্কের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল। অধমর্ণ সুবিধামত প্রায়ই নিজের বা অপরের ব্যক্তিগত জামিনে ধার নিত এবং যতটুকু সাধ্য তা পরিশোধ করত। গর্ডন অধমর্ণদের সুবিধার জন্য ব্যাঙ্কের নিয়ম ভঙ্গ করেও ব্যাঙ্কের কাগজপত্র ও হিসাবাদি পরিবর্তিত করে একই ব্যক্তিকে বারবার ধার দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা চিন্তা না করে মিস্টার গর্ডন কখনই এরূপ কাজ করেন নি। মিস্টার গর্ডনের এই নীতির বিরুদ্ধে পরিচালকমণ্ডলী দু-একবার আপত্তি তুললেও নানা যুক্তি প্রদর্শন করে গর্ডন তার নীতির পরিবর্তন করেন নি। এমন কি, ব্যাঙ্কেব পরিচালকমণ্ডলীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে জমিদারি, নীলকুঠি, ইমারৎ প্রভৃতি বন্ধকী রেখে গর্ডন উদার হস্তে ঋণ দিতে শুরু করেন। ফলে ফার্গুসন কোম্পানী, গিলমোর কোম্পানী প্রভৃতির পতনের ফলে ব্যাঙ্কের প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা বিনষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। গর্ডনের আমলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক বিল অফ এক্সচেঞ্জ অর্থাৎ হুণ্ডির ব্যবসায়ে লিপ্ত হয়। কিন্তু লণ্ডনের ব্যাঙ্কগুলো এই হুণ্ডি গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে ব্যাঙ্কের আর্থিক দুর্গতি ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের প্রচেষ্টায় প্রথমদিকে হুণ্ডি বিক্রির ব্যাপারে বিশেষ কোন অসুবিধা না দেখা গেলেও পরে হুণ্ডি ক্রয় করতে ইংলণ্ডের অনেক ব্যাঙ্কই অস্বীকার করে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র ইংলণ্ডেই হুণ্ডির ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় নি, ভারতেও এই ব্যাঙ্ক প্রচুর হুণ্ডির ব্যবসা শুরু করে। ফলে নীলকুঠিয়াল ও জমিদারদের অনেকেই হুণ্ডির মাধ্যমে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিতে শুরু করে। হুণ্ডি ছাড়াওহ্যাণ্ডনোট দিয়েও অনেকে ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে নিত। ফলে ব্যাঙ্কের খাতায় প্রচুর পরিমাণ হুণ্ডি ও হ্যাণ্ডনোট জমা হলেও নগদ টাকার পরিমাণ ক্রমেই হ্রাস পেতে থাকে। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, ব্যাঙ্কের পক্ষে যে-সব নোট তারা বাজারে ছেড়েছিল তার পরিবর্তে নগদ টাকা দেওয়ার ক্ষমতাও তার ছিল না। ইতিপূর্বেই ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দে

দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যু হয়। সুতরাং ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর মতো অন্য কেউ ছিলেন না যিনি ব্যাঙ্কের সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করে এই দুর্দিনে ব্যাঙ্ক রক্ষা করতে সমর্থ হন। ফলে ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। যেদিন ব্যাঙ্ক টাকা দেওয়া বন্ধ করে সেদিন তার ক্যাশ বাক্সে মাত্র ৭৪০ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। পরিচালকমণ্ডলীর একাংশের স্বার্থপরতা ও অপরিণামদর্শিতার ফলে ব্যাঙ্কের আমানত এক কোটি টাকা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়।

১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ব্যাঙ্কের পতন ঘটে। কিন্তু জুলাই মাসে শেয়ারহোল্ডারদের শতকরা সাত টাকা করে লাভ দেওয়া হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন যে, এই লাভ লোকদের গচ্ছিত টাকা ভেঙ্গে দেওয়া হয়, কারণ মূলধন বহু পূর্বেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। লোকদের প্রতারণা করার জন্য পতনোন্মুখ ব্যাঙ্কের শেয়ার ডিরেক্টরগণ নিজেরাই ক্রয় করে ব্যাঙ্কের সঙ্কটজনক অবস্থার কথা গোপন রাখার চেষ্টা করেন। সংক্ষেপে বলা যায়, ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের পতনের জন্য মূলতঃ দায়ী এই প্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ অসৎ কর্মচারিগণ। ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী, খাজাঞ্চি ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট প্রমুখ উচ্চপদস্থ সব কর্মচারীই ছিল অসৎ। উদ্দেশ্যমূলকভাবে তাঁরা ঋণ দিয়ে ব্যাঙ্কের নগদ টাকার পরিমাণ ক্রমশই হ্রাস করতে শুরু করেন। দাদন দেওয়া, হুণ্ডি ক্রয়-বিক্রয় করা এবং হ্যাণ্ডনোটের বিনিময়ে টাকা বিনিময় করার যে রীতি তাঁরা প্রবর্তন করেন তা কোন দিক থেকেই সুবিবেচনার পরিচায়ক ছিল না। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের কর্মজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

Q. 5. Would you conclude the analysis of the major entrepreneurial activities of Dwarakanath that he was essentially a comprador ?

Ans. (Part III-এর ২৪ সংখ্যক প্রশ্ন দ্রষ্টব্য।)

দ্বারকানাথের সংগঠন প্রতিভা—(ক) কার-ঠাকুর কোম্পানী ঃ

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে কিছুদিন সরকারী কর্মচারী রূপে চব্বিশ পরগণার কালেক্টরের অধীনে সেরেস্তাদারের পদে চাকুরি করেন। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা আগস্ট এই চাকুরি ত্যাগ করে তিনি ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হন। এই সময় গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্কের মাধ্যমে উইলিয়ম কার নামক জনৈক ইংরেজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং উভয়ে একযোগে কার-ঠাকুর কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। ইতিপূর্বে ভারতীয়গন সাধারণতঃ বিদেশী বণিকদের দালাল বা বেনিয়ান রূপে কাজ করতেন। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে কুঠি খুলে বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ে লিপ্ত হন। ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সনদ অনুযায়ী কোম্পানীর বাণিজ্য নিষিদ্ধ হওয়ায় সদ্য গঠিত কার-ঠাকুর কোম্পানী অনেক সুযোগ লাভ করে। তাদের বাণিজ্যও ছিল খুব বিস্তৃত। নীল, রেশম ছাড়াও কার-ঠাকুর কোম্পানীই সর্ব-প্রথম রানীগঞ্জের কয়লা, আসামের চা এবং রামনগরে চিনির উৎপাদন ও বাজার তৈরি

করার চেষ্টা করে। কার-ঠাকুর কোম্পানী ষ্টীমারের ব্যবসায়ও লিপ্ত হয়ে পড়ে। কার-ঠাকুর কোম্পানী মদের ব্যবসায়ের সঙ্গেও যুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু দ্বারকানাথের জীবিত অবস্থায়ই এই কোম্পানী নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়। ক্রমে কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে পড়তে শুরু করে। দ্বারকানাথ ঠাকুরের মৃত্যুর দু' বছর পরে এই কোম্পানী সম্পূর্ণ ভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

(খ) ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ঃ

(পূর্ববর্তী প্রশ্নের (১) ও (৪) উত্তর দ্রষ্টব্য)।

(গ) পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানী ঃ

পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানী অর্থাৎ পেনিনসুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানী প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও দ্বারকানাথের কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। প্রথমে এই কোম্পানী স্পেন ও পোর্তুগালের বন্দর পর্যন্ত জাহাজ চালাবার অধিকার লাভ করে। কিন্তু ক্রমে ১৮৪২ খ্রীস্টাব্দে রাজকীয় এক সনদ অনুসারে ভারতবর্ষ পর্যন্ত এর কার্যক্ষেত্র বিস্তৃত করার অধিকার লাভ করে। পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানী ভারত ও ইংলণ্ডের মধ্যে সরাসরি জাহাজ যাতায়াতের প্রথম সূত্রপাত করে। 'ক্যালকাটা রিভিউ' থেকে জানা যায় যে, দ্বারকানাথের একখানি জাহাজ ছিল। এর নামও ছিল দ্বারকানাথ। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই জাহাজেই প্রথমবার ইংলণ্ড যান।

(ঘ) কৃতিত্ব ঃ

কার-ঠাকুর কোম্পানী, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক, পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব বিচার করলে দ্বারকানাথকে কোনক্রমেই বিদেশী বণিকদের দালাল বা বেনিয়ান বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বাণিজ্য সংস্থার অন্যতম অংশীদার ও সংগঠক। তিনিই প্রথম জাহাজ টানা ষ্টীমার কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা, তিনিই অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের সহায়তার জন্য ইণ্ডিয়া জেনারেল স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর প্রস্তাব করে পরিকল্পনা দিয়েছিলেন; জাহাজ মেরামতি কার্যের জন্য তিনিই সর্বপ্রথম পাটোয়ারি (ডকিং বিজনেস্) কার্য বুঝতে পেরেছিলেন; সর্বশ্রেষ্ঠ কয়লার কার্য সংস্থাপিত করেছিলেন। বহির্বাণিজ্যের গুরুত্বও তিনি বিশেষভাবে উপলব্ধি করেন। ব্যাঙ্কের ব্যবসার দিকেও তাঁর প্রবণতা ছিল। বিভিন্ন বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য তাঁর কৃতিত্ব বিচার করে বলা যায় যে, ভারতীয়দের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো অপর কোন বাণিজ্য সংগঠক ছিলেন না।

Q. 6. Jones left behind him an attitude of mind a profound reference for men irrespective of their race and their different cultural background'—Comment.

Ans. Part II-এর ১৮ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দ্রষ্টব্য]।

(৪) উপসংহার ঃ

উইলিয়ম জোনস যখন ভারতে আগমন করেন তখন সাধারণতঃ ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতীয়দের সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি প্রভৃতি সম্পর্কে অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব পোষণ

করতেন। বিজিত জাতির সংস্কৃতির প্রতি বিজয়ী জাতির এই মনোভাবই ছিল খুব স্বাভাবিক। বিশেষতঃ তাদের অনেকেই মনে করতেন যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা ব্যতীত অন্য কোন সভ্যতাই কোনক্রমে উন্নত নয়। ভারতবাসীদের সম্পর্কেও তাঁরা অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। ভারতীয়দের আচার-ব্যবহার, রীতি,-নীতি, জীবনযাত্রা, চরিত্র প্রভৃতি সম্পর্কেও বিরূপ মন্তব্য করতে তাঁরা দ্বিধা বোধ করেন নি। তবে ভারতীয়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতাই ছিল তাঁদের এরূপ মনোভাবের প্রধান কারণ। কিন্তু উইলিয়াম জোনস এই সংকীর্ণতার অনেক উর্ধ্বে ছিলেন। বিভিন্ন পরিবেশে যে বিভিন্ন সভ্যতার বিকাশ ঘটে তা তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে সমর্থ ছিলেন। প্রত্যেক জাতিরও যে কয়েকটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য থাকে সে কথাও তিনি স্বীকার করতেন। তাঁর এই উদার দৃষ্টির জন্যই তিনি ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মবাণী সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থন হন। তবে শুধু ভারত নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কেও তিনি একই মনোভাব পোষণ করেন। তাঁর সমসাময়িক ইংরেজ পণ্ডিতদের অনেকেই ভারতের সংস্কৃতি সম্পর্কে বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় দিলেও, উইলিয়ম জোনস কোন দিনই তাঁদের মতামত গ্রহণ করতে সম্মত হন নি। বরং ভারতের সভ্যতার অবদানের সঙ্গে বিদেশীদের পরিচিত করে তোলার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কাজের মধ্যেই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়।

Q. 7. What were the Contribution of the Fort William College during its formative years to the cultural renaissance in Bengal ? How would you explain Charles Grant's antipathy towards the Institution ?

Ans. (Part II 2 সংখ্যক এবং 17 সংখ্যক প্রশ্ন দ্রষ্টব্য)।

(8) চার্লস গ্রান্টের মনোভাব ঃ

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতি চার্লস গ্রান্টের বিরোধিতার মূল কারণ দুটি— (১) এই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে শিক্ষার ক্ষেত্রে মিশনারীদের যে কর্তৃত্ব ছিল তার অবসানের আশঙ্কা দেখা দেয় এবং (২) কলেজে পাঠ্যসূচীতে ভারতীয় সাহিত্য, আইন প্রভৃতির অন্তর্ভুক্তি এবং ভারতীয় অধ্যাপকদের নিযুক্তি। সরকারী কর্মচারী-হলেও চার্লস গ্রান্ট মিশনারীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতি সম্পন্ন ছিলেন। মিশনারীরা ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেও, তাদের খ্রীস্টধর্ম প্রচারের প্রচেষ্টার ফলে ভারতীয়দের মনে ক্ষোভের সৃষ্টি হতে থাকে। ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতীয়দের এই মনোভাব দূর করার উদ্দেশ্যে মিশনারীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করলে চার্লস গ্রান্ট অসন্তুষ্ট হন। আবার অপরদিকে ভারতীয়দে সম্পর্কে তিনি খুব নীচ মনোভাব পোষণ করতেন। অধ্যাপক হিসাবে ভারতীয়দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নিযুক্ত করাকেও তিনি পছন্দ করতে পারেন নি। ভারতী ভাষা, সাহিত্য, প্রভৃতি পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও তিনি পছন্দ করা পারেন নি। ফলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তিনি বিরোধিতা শুরু করেন।

Q. 8. Would it be correct to argue that fluctuation in the British economy had a more decisive role to play in the commercial failures in Bengal (1829-34 and 1847-48) than the weakness of Bengal's internal economic system ?

Ans. (১) **অর্থনৈতিক সমস্যা**

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক থেকেই বাণিজ্যিক কৃষিপণ্যের উৎপাদন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কিন্তু এই পণ্যের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধনের অধিকাংশ ইংলণ্ড থেকে আমদানি করা হত। ফলে ইংলণ্ডের অর্থনীতির ওঠা-নামার সঙ্গে সঙ্গে এই মূলধনের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হত। অপরদিকে যে সব দেশে এই সব কৃষিপণ্য রপ্তানি করা হত তার বাজারের উপরও এই অর্থনীতির উন্নতি ও অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করত। চা, পাট, নীল, আফিম প্রভৃতি কৃষিজাত পণ্যদ্রব্যের ক্ষেত্রে বিদেশী অর্থের আনুকূল্য বিশেষভাবে অনুভূত হত। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের দীর্ঘ যুদ্ধের সময় ইংলণ্ড ও ইয়োরোপের সর্বত্র বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা খুব বৃদ্ধি পায়। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত ইংলণ্ডের বণিকগোষ্ঠী ভারতে প্রচুর পরিমাণে অর্থ লগ্নি করে এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন দেখা দেয়। কৃষকগণ বছরে এক ফলনের জমিতে দু'বার করে ফসল উৎপাদন করার চেষ্টা করে এবং তাদের এই প্রচেষ্টার সাফল্যের ফলে অর্থনৈতিক উন্নতিরও সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু ইয়োরোপের যুদ্ধের অবসানের ফলে বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা অনেক হ্রাস পায় অপরদিকে এই সময় ইয়োরোপের বহু দেশে শিল্প বিপ্লবের ফলে নতুন নতুন শিল্প গড়ে উঠতে শুরু করে। সুতরাং ইংলণ্ডের মহাদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। আবার এই সময় ইংলণ্ডের অর্থনীতির ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা দেখা যায় এবং নতুন করে লগ্নি করার মতো অর্থের অভাব ঘটে। তাছাড়া লাভের পরিমাণ কম হওয়ার আশঙ্কায় বাংলাদেশে অর্থ লগ্নি করতেও তাদের উৎসাহ হ্রাস পেতে থাকে। এই সব কারণের সামগ্রিক ফল হিসাবে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয়। পরবর্তীকালে ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং ইয়োরোপীয় বাজারে বাংলাদেশের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকলে বাংলার অর্থনৈতিক জীবন আবার পুনর্জীবিত হয়ে ওঠে। নতুন নতুন জমি আবাদ এবং নতুন কৃষিপণ্য উৎপাদনের দিকেও বাঙ্গালী কৃষকদের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে বাংলার কোন কোন অঞ্চলে আর্থিক পুনরুজ্জীবনের ইঙ্গিত দেখা দিলেও উত্তরবঙ্গের, বিশেষতঃ রাজসাহী বিভাগ ও পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগের কৃষকদের অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। এই দুটি বিভাগের অর্থনৈতিক দুরবস্থা বাংলাদেশের অবশিষ্টাংশের উপরও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

১৮৪৭ থেকে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটের মূল কারণ ছিল ইংলণ্ড এবং সমগ্র ইয়োরোপ মহাদেশের অর্থনৈতিক মন্দা। ইয়োরোপের জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সময় ইয়োরোপের অনুকরণে ভারতে কয়েকটি ব্যাঙ্কের উৎপত্তি ঘটে। এই ব্যাঙ্কের উৎপত্তির ফলে অর্থনৈতিক সংকটের কোন সমাধান হয় নি বরং পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ১৮৪৭ থেকে প্রায় ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সংকটের উদ্ভব ঘটে তার সঙ্গে পূর্বকালীন অর্থনৈতিক সমস্যার মূল কারণ রৌপ্যপিণ্ডের অভাবের সঙ্গে কোনই সম্পর্ক ছিল না। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের ও ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিক্রিয়া রূপে এই অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়। তবে ইয়োরোপে বা ইংলণ্ডের এই অর্থনৈতিক মন্দা অপেক্ষা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মন্দা অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের পরে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই পরিবর্তনের মূল কারণ ছিল বাংলার চালের চাহিদা বৃদ্ধি। ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় বাংলার চালের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ভারতীয় রেলপথ নির্মাণে ব্রিটিশ মূলধন বিনিয়োগ হতে শুরু করলেও বাংলার অর্থনীতিতে উন্নতি দেখা দেয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের সিপাহি বিদ্রোহের সময়ই বাংলার অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি পরিলক্ষিত হয়।

(৩) আভ্যন্তরীণ সংকট ঃ

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি সম্পদ। ব্রিটিশ শাসকদের নিকটও সেকথা অজানা ছিল না। কিন্তু এই কৃষি সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন ও বিপণনের জন্য ইংরেজ সরকার কোন প্রকার সুষ্ঠু ব্যবস্থা প্রবর্তন করার চেষ্টা করে নি। এই জন্যও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলাদেশে বারবার অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিত। কৃষির উন্নতির দিকে বিদেশী ইংরেজ সরকার কোন প্রকার দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে নি। চাষবাসের উন্নতি সাধন এবং অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য আধুনিক চাষ-বাস প্রথার প্রবর্তনের জন্য তারা কোন ব্যবস্থা করে নি। জলসেচ ব্যবস্থা অবহেলিত হওয়ার ফলে অনাবৃষ্টি দেখা দিলে শস্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হত। প্রাকৃতিক বিভিন্ন সুযোগ থাকা সত্ত্বেও জলসেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের দিকে তাদের কোন প্রকার লক্ষ্য ছিল না। দুর্ভিক্ষের হাত থেকে কৃষকদের ত্রাণ করার জন্যও কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় নি। সংক্ষেপে বলা যায় যে, কৃষকদের স্বার্থের দিকে তারা ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। এমন কি চা, পাট, নীল, আফিম প্রভৃতি বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদনকারী চাষীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যও তারা কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করে নি। অপরদিকে কৃষিপণ্য সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা না থাকার জন্য ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষকগণ তা বিক্রি করে দিতে বাধ্য হত। ফলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি কৃষকগণ নানা ভাবেই তাদের প্রকৃত আয় থেকে বঞ্চিত হত। সরকারের এই উদাসীনতাই ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক শোচনীয় অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

(৪) **উপসংহার ঃ**

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের অর্থনৈতিক দুরবস্থার জন্য উপরিউক্ত অভ্যান্তরীণ কারণ বর্তমান থাকা সত্বেও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধি হওয়ার মূল কারণ ছিল ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক মন্দা। নানারূপ অসুবিধা অতিক্রম করেও ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পর বাংলার আর্থিক অবস্থা আবার উন্নতি লাভ করতে শুরু করে। তবে এই উন্নতির অনেকাংশই ছিল ইংলণ্ডের বাণিজ্য ও অর্থলগ্নি করার উপর নির্ভরশীল। ফলে ইংলণ্ডে বাণিজ্যিক মন্দা দেখা দিলে বাংলার আর্থিক অবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অনুরূপ পরিস্থিতির জন্য বাংলাদেশে অর্থনীতি সংকটের সম্মুখীন হয়।

Q. 9.. Discuss the mportance of the mixt question in Anglo-Nawab relations upto 1763.

Ans. (১) ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর কর্মচারিগণ কলকাতায় টাঁকশাল নির্মাণ করে মুদ্রা নির্মাণের সুযোগ পাওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করেন। কিন্তু বাংলার নবাবগণ ইংরেজদের এই অধিকার প্রদান করতে কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। তাছাড়া মাদ্রাজে কোম্পানী নির্মিত রৌপ্যমুদ্রা বিনা বাট্টায় বাংলাদেশের নবাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে ইংরেজ বণিকদের অসুবিধা আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহ ফারুক-শিয়রের কাছ থেকে কোম্পানী একটি নতুন ফরমান আদায় করতে সমর্থ হয়। এই ফরমানে বলা হয় যে, মাদ্রাজে (চীনাপত্তনে) নির্মিত মুদ্রার রৌপ্যের মান বাংলাদেশে প্রচলিত মুদ্রার সমান হয়ে কোন প্রকার বাট্টা ব্যতীতই এই মুদ্রা বাংলাদেশের বণিকগণ গ্রহণ করবে। কিন্তু বাদশাহী ফরমান অনুসারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজেদের প্রয়োজনীয় মুদ্রা নির্মাণের অধিকার লাভ করলেও বাংলাদেশের নবাবের প্রচণ্ড বিরোধিতার জন্য কোম্পানী এই অধিকার থেকে সম্পূর্ণ ভাবে বঞ্চিত হয় এবং কোম্পানীর প্রচুর ক্ষতি হতে শুরু করে। কোম্পানীর মাদ্রাজের টাঁকশালে নির্মিত মুদ্রা প্রচুর বাট্টা ব্যতীত বাংলাদেশের কেউ তা গ্রহণ করতে রাজী হত না। ফলে বাংলাদেশের ইংরেজ বণিকগণ মাঝে মাঝেই দারুণ অর্থ সংকটের সম্মুখীন হতেন। ব্যবসা-বাণিজ্য ত দূরের কথা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনাকাটা করার মতো অর্থ সংগ্রহ করাও তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠত। মিস্টার ম্যাণ্ডেভিল-এর লেখা থেকে এরূপ অর্থ সংকটের কথা বেশ পরিষ্কার ভাবে জানা যায়। ১৭৫০ খ্রীস্টাব্দে তিনি লিখেছেন যে, পরবর্তী জাহাজ নতুন রৌপ্যপিণ্ডের সরবরাহ নিয়ে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের কোম্পানীর কোষাগারে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার জন্য অথবা বাজার থেকে খাদ্য সম্ভার ও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য অপরিহার্য অন্যান্য জিনিসপত্র সংগ্রহ করার উপযুক্ত অর্থও অবশিষ্ট নেই।" এরূপ

পরিস্থিতিতে প্রচণ্ড আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হয়ে কোম্পানী কখনও কখনও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে প্রচুর সুদ দিয়ে টাকা ধার করতে বাধ্য হত। সুতরাং অত্যন্ত সংগত ভাবেই কোম্পানীর আর্থিক সংকটের জন্য ইংরেজ বণিকরা বাংলাদেশের নবাবকে দায়ী মনে করতেন। বাদশাহী ফরমানের নির্দেশ অনুযায়ী নবাব যদি কোম্পানীকে মুদ্রা নির্মাণের অনুমতি দিতেন, তাহলে কোম্পানীর আর্থিক সংকট উপস্থিত হওয়ার কোন কারণই দেখা দিত না এবং ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রেও কোম্পানীর কোন প্রকার অসুবিধা হত না। বাংলার নবাব মুর্শিদকুলিখান, সুজা-উদ্-দিন, সরফরাজ খান, আলীবর্দী প্রভৃতি প্রত্যেকেই কোম্পানীর মুদ্রা নির্মাণের অধিকারকে অস্বীকার করেন। ফলে কোম্পানীর প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছর গড়ে আমদানির পরিমাণ ছিল এক লক্ষ আশি হাজার পাউণ্ড স্টার্লিং এবং এই আমদানির মোট পরিমাণের চুয়াত্তর শতাংশ ছিল রৌপ্য পিণ্ড।

(২) বিরোধিতার কারণঃ

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজ-উদ্-দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করার পরেই ইংরেজদের সঙ্গে নবাবের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। আলীবর্দীর নির্দেশ অনুযায়ী সিরাজ-উদ্-দৌলা যদিও কোম্পানীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ ভাবে সমস্ত সংঘর্ষ মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন কিন্তু পরিস্থিতির দ্রুত অবনতির ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ে। ইংরেজরা এই সময় মীরজাফরের সঙ্গে একটি গোপন চুক্তি সম্পাদন করে সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসন-চ্যুত করার ব্যবস্থা করে। এই চুক্তি অনুসারে মীরজাফর নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার সঙ্গে সন্ধির সকল শর্ত এবং পূর্বেকার নবাবদের ফরমানে ইংরেজ বণিকদের যেসব সুযোগ দেওয়া হয়েছে, সে সবই কার্যকরী করতে সম্মত হন। ফলে ফারুক শিয়রের ফরমান অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানী কলকাতায় টাঁকশাল স্থাপন করে স্বাধীন ভাবে মুদ্রা নির্মাণের অধিকার বাংলার নবাব কর্তৃকও স্বীকৃত হয়। ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের এই চুক্তি প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ কোম্পানীকে স্বাধীন ভাবে মুদ্রা নির্মাণের সুযোগ করে দেয়। মীরজাফর সিংহাসনে আরোহণের পর ইংরেজ সরকার কলকাতা, ঢাকা ও পাটনার টাঁকশালে মুদ্রা নির্মাণ করতে শুরু করে। অপরদিকে নবাবের মুর্শিদাবাদ টাঁকশাল থেকেও মুদ্রা তৈরী হত। ফলে বাজারে দুই প্রকার মুদ্রা থাকার জন্য ব্যবসায়িগণ বিনা বাট্টায় কোম্পানীর মুদ্রা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। মীরজাফরের পক্ষে বিনা বাট্টায় কোম্পানীর মুদ্রা ব্যবসায়ীদের গ্রহণ করতে বাধ্য করা সম্ভব ছিল না। বাইরে থেকে আমদানিকৃত রৌপ্য পিণ্ড নিম্নমানের ছিল বলে ভারতীয় ব্যবসায়িগণ ইংরেজদের টাঁকশালে নির্মিত মুদ্রা গ্রহণ করতে আপত্তি করে। আবার অপরদিকে সিংহাসনে আরোহণের কিছুদিনের মধ্যেই নবাব মীরজাফরের সঙ্গে ইংরেজদের মনোমালিন্য দেখা দিলে তাঁর সাহায্যে মুদ্রা সম্পর্কিত এই সংকটের সমাধান করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে। আবার অপরদিকে কোম্পানী কলকাতা টাঁকশালে মুদ্রা নির্মাণ করতে শুরু করলে নবাবের প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়। ফলে উভয় পক্ষের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে।

১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করে মীরকাশিমকে বাংলার মসনদে স্থাপন করা হয়। তাঁর রাজত্বকালে ইংরেজদের মুদ্রা সংকট আবার চরমে ওঠে। ইতিমধ্যে নবাব মীরজাফরের রাজত্বকালে ইংরেজগণ বাংলাদেশের সেরা, আফিম ও লবণের ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। এইসব পণ্যদ্রব্যের জন্য দাদন দেওয়া ও ক্রয় করার জন্য ইংরেজ কোম্পানীর প্রচুর নগদ টাকার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু কোম্পানীর টাঁকশালে নির্মিত মুদ্রা বাট্টা ছাড়া ব্যবসায়ীরা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে কোম্পানী বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করার জন্য উৎসাহী হয়ে ওঠে। কিন্তু মীরকাশিম ছিলেন মীরজাফর থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির মানুষ। ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করলেও মীরকাশিম স্বাধীন ভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করার চেষ্টা শুরু করেন। বাণিজ্যের উপর আরোপিত অন্তর্দেশীয় শুল্ক নিয়ে তাঁর সঙ্গে যেমন ইংরেজদের মতদ্বৈধ দেখা দেয়, মুদ্রা নির্মাণের ব্যাপারেও ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর তেমনই গণ্ডগোলের সূত্রপাত ঘটে। ইংরেজগণ তাদের টাঁকশালে নির্মিত মুদ্রার উপর থেকে সকল প্রকার বাট্টা তুলে দেওয়ার জন্য নবাবের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। স্বাধীনচেতা নবাবের পক্ষে কোম্পানীর এই দাবির কাছে আত্মসমর্পণ করা অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ নবাব মীরকাশিম ইংরেজদের প্রভাব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলার রাজধানী মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করলে তাঁর অভিসন্ধি সম্পর্কে ইংরেজগণ আরও সন্ধিহান হয়ে ওঠে। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রকাশ্যেই বিরোধ দেখা দেয়। এই সময় অন্যান্য দাবির সঙ্গে ইংরেজগণ নবাবের নিকট মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারেও একটি নতুন দাবি উত্থাপন করে। দেশীয় মহাজনরা যাতে কোম্পানীর টাকা বিনা বাট্টায় গ্রহণ করে এবং কোম্পানী যাতে ঢাকা ও পাটনার টাঁকশালে তিন লক্ষ টাকা তৈরি করতে পারে তার ব্যবস্থার জন্যও তারা নবাবের উপর চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে। কিন্তু মুদ্রা সংক্রান্ত এই ব্যাপারের নিষ্পত্তি হওয়ার পূর্বেই মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে কোম্পানী মীরকাশিমকে গদিচ্যুত করে মীরজাফরকে পুনরায় সিংহাসনে স্থাপন করেন।

(৩) উপসংহার ঃ

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে মীরজাফরের মৃত্যু হয়। মীরজাফরের মৃত্যুর পরই ইংরেজগণ মুর্শিদাবাদের নবাবকে নামে মাত্র শাসক হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে প্রকৃত শাসন-ব্যবস্থা নিজেরাই অধিকার করার চেষ্টা করে। মীরজাফরের পুত্র নজম-উদ্-দৌলা সিংহাসন লাভ করলেও ইংরেজগণ নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে একজন সহকারী সুবাদার নিযুক্ত করেন। এই সময় নবাবের সমস্ত প্রকার অর্থনৈতিক ক্ষমতাই খর্ব করা হয়। ফলে মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপার আবার গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু নজম-উদ্-দৌলার পক্ষে কোন প্রকার দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। বিশেষতঃ রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করার পর এই

তিনটি সুবার রাজস্ব আদায়ের সমস্ত দায়িত্ব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর ন্যস্ত হয়। নজম-উদ্-দৌলা রাজ্য শাসনের ব্যাপারে কোনপ্রকার হস্তক্ষেপ করার কোন চেষ্টা না করে বছরে মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ভাতার বিনিময়ে বাংলার সিংহাসনের উপর অধিকার বজায় রাখতে সমর্থ হন। শাসনতান্ত্রিক ব্যাপারে সমস্ত প্রকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর নবাবের পক্ষে মুদ্রা নির্মাণের অধিকারের আর কোন গুরুত্বই থাকে না। মুর্শিদাবাদের টাঁকশালের গুরুত্বও ক্রমশই হ্রাস পেতে থাকে। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদের টাঁকশাল একেবারেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলকাতা ঢাকা ও পাটনার টাঁকশাল থেকে নিজেদের নামে নতুন মুদ্রা নির্মাণ করতে শুরু করে।

Q. 10. Do you agree with the view that Rezakhan tried to maintain a balanee between the Anglo-Indian administration and Mughal administration.

Ans. (১) রেজা খান :

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে নবাব মীরজাফরের মৃত্যুর পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলকাতা কাউন্সিলের নির্দেশক্রমে মোহম্মদ রেজা খান বাংলাদেশের সহকারী নবাবের পদে নিযুক্ত হন.। মীরজাফরের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নজম-উদ্-দৌলার সিংহাসনে আরোহণের কালে স্থির হয় যে, বাংলার নবাব বাংলার শাসনকার্য পরিচালনা করবেন না। তাঁর পরিবর্তে সহকারী নবাবই বাংলাদেশের শাসনকার্য পরিচলনা করার দায়িত্ব লাভ করবেন। প্রকৃত এই সময় রেজা খান বাংলার প্রকৃত শাসকে পরিণত হন। সহকারী নবাবের পদে নিযুক্ত হলেও আসলে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবধীনস্থ ব্যক্তি রূপে শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। এই পদে তাঁর নিযুক্তির ফলে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটে এবং ইংরেজের শাসনব্যবস্থার সূচনা হয়। পরবর্তীকালে রেজা খান ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দ্বারা সহকারী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হন। ফলে বাংলাদেশের রাজস্ব বিভাগের উপরও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফৌজদারি বিচার বিভাগের দায়িত্ব ছাড়া বাংলাদেশের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্বও তাঁর উপর অর্পণ করা হয়। সুতরাং রেজা খানের মাধ্যমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলাদেশের রাজস্ব এবং সাধারণ শাসন বিভাগ পরিচালনা করতে শুরু করে।

কিন্তু এই বিরাট শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব পাওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন করার চেষ্টা করেন নি। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় (১৭৬৯-৭০ খ্রীস্টাব্দ) প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং অবশিষ্টাংশ অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে বাধ্য হয়। কিন্তু রেজা খান জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নি। ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানী স্বহস্তে রাজস্ব বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করলে রেজা খানকে সহকারী দেওয়ানের পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই সময় অন্যায় ভাবে অর্থ আত্মসাৎ করার জন্য রেজা খানকে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই অভিযোগ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। সহকারী দেওয়ানের পদ থেকে বরখাস্ত হওয়ার পরও তিনি সদর নিজামত আদালতের প্রধান বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে বিচার বিভাগের সংস্কার সাধনের পর এই পদ থেকে তাঁকে বিদায় দেওয়া হয়।

(২) শাসনের প্রকৃতি ঃ

রেজা খান বাংলাদেশের সহকারী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হওয়ার পর পূর্ববর্তী শাসন ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। মোগল শাসন-ব্যবস্থা অনুযায়ী সুবায় কোন সহকারী দেওয়ানের পদ ছিল না, কেন্দ্রীয় দেওয়ানের নির্দেশ অনুযায়ী প্রাদেশিক বা সুবার দেওয়ান রাজস্ব বিভাগ পরিচালনা করতেন। দেওয়ান ও সুবাদার পৃথক ব্যক্তি হওয়ার ফলে একে অপরের প্রতিটি কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার সুযোগ পেতেন। কিন্তু রবার্ট ক্লাইভ রেজা খানকে সহকারী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করার সময় ভারতীয় রাজস্ব বিভাগের পরিচালনার রীতি সম্পর্কে খুব বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন না। এমন কি সহকারী দেওয়ানের কার্যকলাপের প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য যে 'সুপারভাইজার'দের নিযুক্ত করা হয় শাসনতান্ত্রিক খুঁটি নাটি ব্যাপারে তাদেরও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সুতরাং রেজা খান রাজস্ব বিভাগকে পুনর্গঠন করার চেষ্টা করেন। জমিদারগণ বংশানুক্রমিক ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে জমির খাজনা আদায় করতেন কিন্তু তারা জমির মালিক ছিলেন না। কিন্তু বাংলার নবাব মুর্শিদকুলিখানের আমলে বাংলাদেশে একদল নতুন জমিদারের উদ্ভব ঘটে। তারা একদিকে যেমন প্রজাদের কাছ থেকে জমির কর আদায় করতেন অপরদিকে তারা নিজেরাই মালিকও ছিলেন। ফলে রাজস্ব বিভাগে নানা প্রকার সমস্যার উদ্ভব ঘটে। রেজা খান আমিন ও কানুনগো নামক কর্মচারীদের সাহায্যে বহু জমির পরিমাণ নতুন করে ধার্য করে পত্তনীদারদের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থা করতে শুরু করেন। ফলে বাংলাদেশে একদল নতুন ভূস্বামীর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিপ্রেক্ষিতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে নীতি গ্রহণ করে রেজা খানই সে নীতির প্রথম উদ্ভাবক। তার এই নীতির ফলে নতুন একদল জমিদার জমির মালিক রূপে দেখা দেয় এবং কৃষকগণ জমির মালিকানা থেকে বঞ্চিত হতে শুরু করে। বিদেশী ইংরেজ শাসকদের পক্ষে প্রতি কৃষকের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। তার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করা ছিল অনেক সহজ। রেজা খান মোগল যুগের নীতির পরিবর্তন করে ভূমিরাজস্ব সম্পর্কে ইংরেজ শাসকদের একটি মূলনীতিকে কার্যকরী করার চেষ্টা করেন।

রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারেও রেজা খান কয়েকটি সংস্কার সাধন করেন। তার মধ্যে প্রধান ছিল সরকারী ভাবে নগদে রাজস্ব গ্রহণ করার ব্যবস্থা। রেজা খান পূর্বে প্রচলিত

রাজস্বের হার বৃদ্ধি বা হ্রাস করার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তিনি উৎপন্ন শস্যের নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ না করে তার আনুপাতিক মূল কর হিসাবে আদায়ের ব্যবস্থা করেন। তাঁর এই নীতির ফলে কৃষকগণ প্রথম দিকে কিছু কিছু অসুবিধার সম্মুখীন হলেও ইংরেজদের প্রবর্তিত রাজস্ব নীতি ক্রমে ক্রমে তারা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

(৩) উপসংহার ঃ

তবে মোগল শাসনের সাধারণ নীতিগুলো দীর্ঘদিন পর্যন্ত এদেশে প্রচলিত ছিল ; কয়েক বছরের মধ্যে তাকে পরিবর্তন করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেটুকু পরিবর্তন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল তাই রেজা খান করার চেষ্টা করেন। তাছাড়া ইংরেজ শাসকগণও জোর করে আকস্মিক ভাবে বিশেষ কোন পরিবর্তন করার পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং রেজা খানকে সংযত করার জন্য তাঁরা বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, রেজা খান মোগল শাসন ও ইঙ্গ-ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে আধুনিক ভারতের শাসন-পদ্ধতির গোড়াপত্তন করার চেষ্টা করেন।